প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড : দ্বিতীয় ভাগ

ভারত সরকারের শিক্ষাধিকারিক বিভাগের উদ্যোগে
লিখিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকমণ্ডলী
সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্
সভাপতি
আর্দেশির রাতন্জি ওয়াডিয়া
ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত
হুমায়ুন কবির
কর্মসচিব

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতীয় দর্শনের পরম্পরাগত সম্প্রদায়সমূহ

তৃতীয় খণ্ড

ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যান্য কয়েকটি উদ্ভাবনা

চতুর্থ খণ্ড

চীন এবং জাপানের চিন্তাধারা

প্রথম খণ্ড :: দ্বিতীয় ভাগ

যাঁহারা অনুবাদ করিয়াছেন

অমিয়কুমার মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য, নীরদবরণ চক্রবর্তী, সুকুমার দত্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মনোরঞ্জন বসু, রমা চৌধুরী, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র রায় চৌধুরী, কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

• •
•

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব-মীমাংসা

১। ভূমিকা

ভারতের পূর্ব-মীমাংসা-দর্শন বেদের পূর্ববর্তী অংশ, অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে বর্ণিত ধর্মের স্বরূপসম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া থাকে ; অন্যদিকে উত্তর-মীমাংসা পরবর্তী অধ্যায়, অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে বর্ণিত ব্রহ্মের স্বরূপ অনুসন্ধান করে। ধর্মসম্পর্কে বেদকে একমাত্র প্রমাণ স্বীকার করে বলিয়া পূর্ব-মীমাংসাকে আস্তিক দর্শনরূপে গণ্য করা হয়। 'আস্তিক্য' এই শব্দটি পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকিলেও—সাধারণ অর্থে উহা বেদপ্রামাণ্যের স্বীকৃতি বুঝায়। পরমতত্ত্বের চরম জ্ঞান এবং উপলব্ধি দ্বারা মানুষের পরমমুক্তি-সাধনই এই আস্তিক দর্শনগুলির লক্ষ্য—'দর্শন' শব্দটির দ্বারা ইহারই গুরুত্ব সূচিত হয়।'

জৈমিনির 'পূর্ব-মীমাংসা সূত্র' (আঃ ৪০০ খৃঃ পূঃ) বাদরায়ণ সহ বহু আচার্যের উল্লেখ রহিয়াছে ; বাদরায়ণ আবার জৈমিনির উল্লেখ করিয়াছেন—তাই তাঁহারা সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। সূত্র সমূহের উপর সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত ভাষ্য হইতেছে দ্বাদশ অধ্যায় সমন্বিত শবরস্বামীর ভাষ্য (আঃ ২০০ খৃঃ), যদিও পূর্বোল্লেখ প্রসঙ্গ হইতে বোধায়ন, উপবর্ষ ও ভবদাসের বৃত্তিসমূহের কথা জানা যায়। ভর্তৃমিত্র এবং ভর্তৃহরিও বৃত্তিকাররূপে কথিত হইয়া থাকেন।

সপ্তম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট তাঁহার শ্লোকবার্তিকে শবর-ভাষ্যের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের তন্ত্রবার্তিকে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে তৃতীয় খণ্ড ও টুপটীকায় পঞ্চম হইতে দ্বাদশ খণ্ডের উপর ব্যাখ্যা রচনা করেন। তাঁহার বৃহটীকা এবং মধ্যমটীকায়ও ইহার উপর ভাষ্য ছিল, তবে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কুমারিলের শিষ্য গুরু নামে পরিচিত প্রভাকর শবরভাষ্যের উপর বৃহতী (নিবন্ধন), লঘ্বী (বিবরণ) দুইখানি স্বতন্ত্র টীকা রচনা করেন। এই দুইখানির উপর শালিকনাথ যথাক্রমে ঋজুবিমলা ও দীপশিখা নামে টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মণ্ডনমিশ্র এবং ভট্টোংবেকও কুমারিলের শিষ্য। বিধিবিবেক, ভাবনাবিবেক, বিভ্রমবিবেক এবং মীমাংসানুক্রমণী মণ্ডনমিশ্রের গ্রন্থ। ভট্টোংবেক শ্লোকবার্তিক

ও ভাবনাবিবেকের উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কেহ কেহ ভবভূতি বলিয়া মনে করেন। শালিকনাথ প্রভাকরের মত ব্যাখ্যা করিয়া প্রকরণপঞ্চিকা-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বাচস্পতিমিশ্র (আঃ ৮৫০ খৃঃ) বিধিবিবেকের উপর ন্যায়-কণিকা-নামক একখানি ভাষ্য এবং তত্ত্ববিন্দু-নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেন।

১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই দেবস্বামী সংকর্ষকাণ্ডের উপর একখানি ভাষ্য এবং সুচরিতমিশ্র ও পার্থসারথিমিশ্র শ্লোকবার্তিকের উপর ক্রমান্বয়ে কাশিকা ও ন্যায়রত্নাকর নামক ভাষ্য রচনা করেন। পার্থসারথিমিশ্র কুমারিলসম্মত অধিকরণ-গুলির ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রগুলির উপর শাস্ত্রদীপিকা-নামক একখানি ভাষ্য, টুপটীকার উপর তন্ত্ররত্ন এবং প্রকরণপঞ্চিকার অনুকরণে ন্যায়রত্নমালাও রচনা করিয়াছিলেন। ভবনাথমিশ্রের ন্যায়বিবেক (প্রাভাকর-মতবাদভুক্ত), ভট্টসোমেশ্বরের ন্যায়সুধা এবং পরিতোষমিশ্রের অজিতা—উভয়ই তন্ত্রবার্তিকের উপর লিখিত ভাষ্য—এই যুগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। নন্দীশ্বরের প্রভাকরবিজয়, চিদানন্দের নীতিতত্ত্বাবির্ভাব (ভাট্ট-সম্প্রদায়ভুক্ত) এবং ভট্টবিষ্ণুর নয়তত্ত্বসংগ্রহ (প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের) প্রভৃতি পুস্তিকা ; সূত্রাবলীর প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের উপর মুরারিমিশ্রের ত্রিপদীনীতিনয়ন-নামক ভাষ্য, মাধবাচার্যের ন্যায়মালাবিস্তর, অপ্পয় দীক্ষিতের শাস্ত্রদীপিকার উপর বিধিরসায়ন ও ময়ূখাবলি-নামক ভাষ্য, বেঙ্কটেশ্বর দীক্ষিতের টুপটীকার উপর বার্তিকাভরণ-নামক ভাষ্য, খণ্ডদেবের ভাট্টকৌস্তুভ, ভাট্টদীপিকা ও ভাট্টরহস্য, নারায়ণভট্ট ও নারায়ণপণ্ডিতের মানমেয়োদয়, শঙ্করভট্টের বালপ্রকাশ, আপদেবের মীমাংসান্যায়প্রকাশ, লৌগাক্ষিভাস্করের অর্থসংগ্রহ, সোমনাথের ময়ূখ-মালিকা-নামক শাস্ত্রদীপিকার উপর লিখিত একখানি ভাষ্য, ভাট্টদীপিকার উপর শম্ভুভট্টের প্রভাবলী-নামক ভাষ্য এবং প্রাভাকর-সম্প্রদায়ভুক্ত রামানুজাচার্যের তন্ত্ররহস্য—এইগুলি হইতেছে কুমারিলপরবর্তী যুগের বিশিষ্ট গ্রন্থ ; এইগুলিতে প্রমাণসমূহের এবং পূর্ব-মীমাংসায় গৃহীত শাস্ত্রার্থনির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[২]

২। প্রমাণসমূহ—জ্ঞানতত্ত্ব

উপবর্ষ, শবর ও কুমারিল ছয়টি প্রমাণের উল্লেখ করেন, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। প্রভাকর শুধু প্রথম পাঁচটি প্রমাণই স্বীকার করেন ; কারণ তিনি অভাবকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। সাধারণতঃ

প্রমাকরণরূপে প্রমাণের লক্ষণ দেওয়া হয়। প্রভাকর প্রমাকে অবিসংবাদী জ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট স্মরণ ভিন্ন সকল জ্ঞানই অবিসংবাদী। কুমারিলের মতে অনধিগত এবং অবাধিত-বিষয়ক জ্ঞানই প্রমা। অনুবাদ (পুনরুক্তি) ও ভ্রম প্রমা নহে।

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ, অর্থাৎ সকল জ্ঞান প্রমারূপে উৎপন্ন এবং প্রমারূপে জ্ঞাত হয়—এই মত মীমাংসা দর্শনের ভিত্তিস্থানীয়। প্রমাসম্বন্ধে প্রাভাকরদের ধারণা বিশেষভাবে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের পরিপোষক। তাহারা প্রথমতঃ স্বপ্রমাণ শ্রুতি হইতে লব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এইমত প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাহা প্রয়োগ করে। কারণসামগ্রীর দ্বারা উৎপন্ন হইলে জ্ঞান বিষয়কে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করে। সুতরাং স্বভাবতঃই উহার প্রামাণ্য থাকে ; জ্ঞাতৃদোষ প্রভৃতি এবং বাধক জ্ঞান না থাকিলে জ্ঞান নিরন্তরই অবিসংবাদী থাকে। বেদবাক্য হইতে যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য জ্ঞান দ্বারা বাধিত নহে ; সুতরাং তাহারা নিরন্তরই অবিসংবাদী। জ্ঞানের অপ্রামাণ্য স্বপ্রকাশ নহে, কারণ ইহা জ্ঞাতার দোষ প্রভৃতি এবং বাধক জ্ঞান দ্বারাই নির্ণীত হয়।[৩]

জ্ঞান যেমন স্বপ্রমাণ, তেমনি স্বপ্রকাশও বটে। প্রাভাকরগণ জ্ঞানের ত্রিপুটী স্বীকার করেন, অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞানের তিনটি দিক আছে, যথা—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। "আমি ইহা জানি" (অহম্ ইদং জানামি) এইরূপ জ্ঞানের তিনটি বিষয়, যথা —(১) অহম্ অথবা জ্ঞাতা, (২) ইদম্ অথবা জ্ঞেয় বিষয় এবং (৩) জ্ঞান। সর্বপ্রকার জ্ঞানে আত্মা বা উহার আশ্রয় সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাত হয়, কিন্তু জ্ঞানের প্রকার-অনুসারে তাহার বিষয় পরোক্ষ অথবা অপরোক্ষ হইয়া থাকে। জ্ঞান কেবলমাত্র সংবিদ্‌রূপেই জ্ঞাত হয়, ইহার সংবেদ্যরূপে নহে। জ্ঞান স্বীয় স্বপ্রকাশত্ব দ্বারা আপনাকেই (জ্ঞানরূপে) এবং আত্মাকে (জ্ঞাতৃরূপে) ও বিষয়কে (জ্ঞেয়রূপে) প্রকাশ করে।[৪]

কিন্তু ভাট্টগণ বলেন যে, জ্ঞান কখনও সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞাত হয় না, ইহা জ্ঞান দ্বারা উৎপাদিত বিষয়ের জ্ঞাততা হইতে অনুমিত হয়। জ্ঞানক্রিয়া জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধ বুঝায় এবং এই সম্বন্ধজ্ঞান হইতে জ্ঞাতার ক্রিয়া যে জ্ঞান তাহা অনুমান করিতে পারি। "ঘটটি আমা কর্তৃক জ্ঞাত হয়," এইরূপ অনুভব তখনই সম্পূর্ণভাবে বুঝান যায়, যখন জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-সম্বন্ধ জ্ঞাত হয়। ভাট্টগণ জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব অস্বীকার করেন, কেন না তাঁহারা বৌদ্ধগণের বিজ্ঞানবাদ অথবা শূন্যবাদের বিরুদ্ধে বাহ্যজগতের জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ সত্তা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

মুরারিমিশ্র মীমাংসা দর্শনের তৃতীয় একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তিনি জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন এবং বলেন যে, জ্ঞান ইহার প্রামাণ্যের সহিত অনুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞাত হয়।[৫]

পূর্ব-মীমাংসার চতুর্থ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষজ্ঞান বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, মনের সহিত আত্মার সন্নিকর্ষ দ্বারা উৎপন্ন হয়।[৬] ইহা ন্যায়মতের অনুরূপ। ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসার পার্থক্য শুধু সন্নিকর্ষের স্বরূপ ও সংখ্যা-বিষয়ে। নৈয়ায়িক ছয় প্রকারের সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন এবং ভাট্ট ও প্রাভাকরদের মতে সন্নিকর্ষ তিন প্রকার। সন্নিকর্ষের ব্যাখ্যায় প্রাভাকররা যেখানে সমবায়ের কথা বলেন, ভাট্টরা সেখানে তাদাত্ম্য অথবা ভেদাভেদের কথা বলেন।

প্রত্যক্ষজ্ঞান দুই প্রকার, নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক। যে জ্ঞান প্রথমে বিষয়ের আলোচন বা অনুভব মাত্র বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং যাহা নবজাত শিশুর চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যের জ্ঞানের অনুরূপ তাহাকে কুমারিল নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই জাতীয় প্রত্যক্ষে জাতি এবং বিশিষ্ট ধর্ম ইহাদের কোনটিই জ্ঞানের বিষয় হয় না। এখানে জ্ঞানে যাহা উপস্থিত হয় তাহা হইল এই উভয় ধর্মের আশ্রয়ীভূত ব্যক্তিমাত্র।[৭] প্রভাকরের মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে জাতি এবং বিশিষ্টধর্ম উভয়ই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এই প্রত্যক্ষে বিষয় যথার্থই কোন বিশেষ জাতির অন্তর্গত এবং ব্যক্তিগত গুণসম্পন্ন বলিয়া অনুভূত হয় না; কারণ, একই জাতির অন্তর্গত অন্যান্য ব্যক্তির সহিত তুলনা না করিলে ইহা জানা যায় না।[৮] কুমারিলের মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষে ব্যক্তির জাতি এবং বিশিষ্ট ধর্ম উভয়ই উপস্থিত থাকে। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ইহার ভিত্তি। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বস্তুর জাতি নাম এবং ধর্মগুলি অস্ফুটভাবে জ্ঞাত হয়। প্রভাকরের মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষে দুই প্রকার জ্ঞানের মিশ্রণ আছে। কারণ, উহাতে অন্যান্য যেসকল বস্তুর সহিত প্রত্যক্ষ বস্তুটির তুলনা করা হয় তাহাদের স্মরণও থাকে।

ভ্রম: যদি সকল জ্ঞানই স্বতঃপ্রমাণ হয় তবে তথাকথিত ভ্রান্তজ্ঞান কি করিয়া সম্ভব হয়? "ইহা রজত" (ইদম্ রজতম্) এই তথাকথিত ভ্রান্তজ্ঞান প্রভাকরের মতে একটি অখণ্ড জ্ঞান নহে বরং স্মরণ ও প্রত্যক্ষের সংমিশ্রণ। শুক্তি ও রজতে বিদ্যমান কতকগুলি সমান ধর্মসহ "ইহা"—এই অংশটুকু প্রত্যক্ষ হয়; এবং এই সমানধর্মের জ্ঞানই পূর্ব অনুভবের ধারণার উদ্রেক করে এবং তাহাতে রজতের স্মরণ হয়। অতএব, "ইহা রজত" এই ভ্রান্তজ্ঞানের ক্ষেত্রে "ইহা" এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই রজতের স্মরণ হয়। এই দুইটির মধ্যে প্রথমটি যথার্থ যেহেতু ইহা

কদাচ বাধিত হয় না। দ্বিতীয়টি পূর্বে পরত্র দৃষ্ট রজতের স্মরণ। কিন্তু এই স্মৃত রজত যে অতীত কাল ও বিশিষ্ট দেশে দৃষ্ট হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধ হইতে বর্জিত হইয়াই স্মরণের বিষয় হয় (প্রমুষ্টতত্তাক স্মরণ)। এই দুইটি জ্ঞানের ভেদ জানা না থাকায় (ভেদাগ্রহ) জ্ঞাতাতে রজত গ্রহণের ইচ্ছাজনিত ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। ভ্রম সম্বন্ধে এই মত অখ্যাতিবাদ অর্থাৎ স্মৃতি ও প্রত্যক্ষের ভেদের খ্যাতির বা জ্ঞানের অভাব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভ্রমে কেবলমাত্র দুইটি পৃথক্ জ্ঞানকে অবিবিক্তভাবে মিশাইয়া ফেলা হয়।

ভ্রমকে ভাট্ট সম্প্রদায় বিপরীতখ্যাতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মত নৈয়ায়িকের অন্যথাখ্যাতিমত ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যখন শুক্তিকে রজত বলিয়া অনুভব করা হয়, তখন "ইহা রজত" এই ভ্রান্তজ্ঞানের উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রে "ইহা" বলিতে জ্ঞাতার সম্মুখস্থ শ্বেতবস্তুকে বুঝায়। জ্ঞাতার নেত্রদোষের জন্য শুক্তির বিশিষ্ট ধর্মগুলি চোখে পড়ে না। বাস্তব রজতে বিদ্যমান রজতত্ব এখানে শুক্তিতে বিদ্যমান এইভাবে উপস্থাপিত হয়। ভাট্টমতে শুক্তি এবং রজতত্বের সম্বন্ধ অসৎ। কিন্তু, ন্যায়মতে এই রজতত্বকে অন্যত্র বিদ্যমান বলিয়া এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।[৯]

অনুমানে এমন এক বিষয়ের জ্ঞান হয় যাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ নাই। এই বিষয়টি হইতেছে সাধ্য। হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধ জানা থাকিলে উহাদের একটির (হেতুর) প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে অপরটির (সাধ্যের) জ্ঞান উৎপন্ন হয়।[১০] ভাট্টমতে ব্যাপ্তির লক্ষণ হইতেছে 'স্বাভাবিক' সম্বন্ধ এবং 'স্বাভাবিক'-এর অর্থ অপ্রাসঙ্গিক পদার্থের সম্বন্ধ রহিত (উপাধিরহিতম্); বিভিন্ন কাল ও দেশের এবং বহুদৃষ্টান্তে (ভূয়োদর্শন) হেতু ও সাধ্যের সহচার দর্শনের দ্বারা এই উপাধিরাহিত্যের জ্ঞান হয়। চিদানন্দ ভূয়োদর্শন ব্যতিরিক্ত তর্ককেও উপাধিরাহিত্য নির্ণয়ের অন্যতম উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। "যেখানে যেখানে ধূম সেখানেই অগ্নি"—এই বাক্যটি সাধারণতঃ বিভিন্ন বিশিষ্ট স্থলে পরিদৃষ্ট দুই পদার্থের নিয়ত-সম্বন্ধের জ্ঞাপক। যেখানে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে ব্যভিচার সংশয় উৎপন্ন হয় না, সেস্থলে এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমানের পক্ষে পর্যাপ্ত কারণ হইতে পারে। সামান্য লক্ষণ প্রত্যাসত্তির সাহায্যে লব্ধ সার্বত্রিক নিয়মরূপে ব্যাপ্তিরজ্ঞান যে অনুমানের পক্ষে অপরিহার্য এই ন্যায়মত ভাট্টসম্প্রদায় স্বীকার করেন না; কিন্তু তাঁহাদের মতে এইরূপ সার্বত্রিক নিয়মের জ্ঞান অনুমান হইতেই উৎপন্ন হয়।

কারণের সহিত কার্যের, অঙ্গীর সহিত অঙ্গের এবং দ্রব্যের সহিত তদাশ্রিত

গুণের যে সম্বন্ধ, ব্যাপ্তিও সেইরূপ একটি অব্যভিচারী, সত্য ও স্থায়ী সম্বন্ধবিশেষ—ইহাই প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের মত। স্থান ও কালজনিত যে পরিচ্ছিন্নতা কার্যাদির সহিত জড়িত, ইহাকে তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিলে ইহা একপ্রকার সার্বিক সামান্যীকরণের পর্যায়ে উপস্থিত হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞানে সাধ্য ও হেতু এই দুইটির বোধ মুখ্য, এবং তাহাদের ও তাহাদের সহিত জড়িত স্থান ও কালের পারস্পরিক সম্পর্ক গৌণ। এইগুলিকে কিন্তু পরস্পরের সহিত অন্বিত করা যায় না। পর্বতে ধূম দেখিলে অগ্নির অবস্থান অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু এই অনুমান হইতে অজ্ঞাতপূর্ব কোন কিছুর জ্ঞান হয় না। ইহাই প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের মত। তাঁহাদের যুক্তি হইল এই যে, এখানে অনুমানের বিষয় নূতন কিছু নয়; ইতঃপূর্বেই প্রত্যক্ষীকরণের দ্বারা যে সামান্যজ্ঞানে আমরা উপস্থিত হইয়াছি, এই বিষয়টিও তাহারই অঙ্গীভূতমাত্র। তথাপি বলিতে হইবে, অনুমান সিদ্ধ; কারণ ইহা স্মৃতি নহে। প্রাভাকর-সম্প্রদায় বলেন যে, প্রমাকে যে অজ্ঞাতপূর্ব বিষয় উপস্থাপিত করিতেই হইবে, এরূপ কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। অনুমানলব্ধ যে অভিজ্ঞতা তাহাকে তাঁহারা গৃহীত-গ্রাহী বা 'পুনরভিজ্ঞতা' শব্দের দ্বারা অভিহিত করেন। ইহা হইতে জ্ঞানের অগ্রগতি সূচিত না হইলেও এটুকু বুঝা যায় যে, একটির জ্ঞান হইতে তাহারই সহিত অব্যভিচারী ভাবে সংসক্ত আর একটির জ্ঞানে উপনীত হওয়া চলে। ব্যাপ্তিজ্ঞানের পক্ষে সাধ্য ও হেতুর একবার দর্শনই যথেষ্ট। ভূয়োদর্শনের প্রয়োজনীয়তা এইটুকু যে, উহা হইতে আমরা দেখাইতে পারি যে, প্রত্যক্ষীকরণের দ্বারা যে সম্বন্ধ আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহা কোনও বাহ্য ঘটনার দ্বারা সাধিত হয় নাই।[১১]

এইবার শব্দ বা মৌখিক প্রামাণ্যের কথায় আসা যাক। শব্দজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ নাই এমন কোনও বিষয়ের জ্ঞান যাহা উৎপন্ন করে, তাহাই শাস্ত্র বা বৈদিক শব্দ। উপবর্ষ শাস্ত্র বা বৈদিক-শব্দের এইরূপ লক্ষণই দিয়াছেন।[১২] বৈদিক ও অবৈদিক দ্বিবিধ শব্দকেই কুমারিল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি উক্ত লক্ষণ এই দ্বিবিধ শব্দের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রভাকর অবৈদিক শব্দের সিদ্ধতা স্বীকার করেন না; তিনি মনে করেন, বৈদিক শব্দই প্রকৃত শব্দ-প্রমাণ। কুমারিল এবং প্রভাকর উভয়েই শাস্ত্রকে—বেদ, স্মৃতি, আচারকে—অতিপ্রাকৃত ধর্মের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন।[১৩]

নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিকগণের মতে বেদসমূহ ঈশ্বরের সৃষ্টি। মীমাংসকগণ কিন্তু মনে করেন যে, বেদসমূহ স্বয়ংপ্রকাশ এবং কোনও প্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত পুরুষের রচনা নহে। যদি বেদসমূহ পৌরুষেয়, অর্থাৎ কোনও পুরুষকর্তৃক রচিত হইত, তাহা

হইলে রচয়িতৃগণের নাম অবরকালীন সমাজের জানা থাকিত।[১৪] আজও যেমন দেখা যায় তেমন ভাবেই অনাদিকাল হইতে বেদসমূহ গুরুশিষ্য-পরম্পরায় বিধৃত হইয়া আসিয়াছে।[১৫] কাণ্ব, কাঠক প্রভৃতি শাখাসমূহের নামগুলির তত্তৎশাখা-প্রবর্তক ঐ নামের আচার্যগণের উপদেশের উপর ভিত্তি করিয়াই দেওয়া হইয়াছে।[১৬]

বৈদিক গ্রন্থসমূহে এবং লৌকিক ভাষায় শব্দ একই। কুমারিলের মতানুসারে শব্দসমূহ অভিধা-শক্তির দ্বারাই নিজেদের অর্থ প্রকাশ করে এবং আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি, শাব্দবোধ—যেগুলি বাক্যে পদার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধকে উপস্থাপিত করে—সেইগুলিই পদার্থ-স্মৃতির উৎস। ইহাই ভাট্ট-সম্প্রদায়ের অভিহিতান্বয়বাদ।[১৭]

বাক্যার্থের বোধের পক্ষে শব্দের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে অন্বিতাভিধানবাদ। প্রাভাকর-সম্প্রদায় এই মতবাদের পোষক। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধির বলে শুধুমাত্র শব্দসাহচর্যের দ্বারা প্রথমে অন্বিতার্থসমূহের এবং তাহার পর অন্বিতপদার্থসমূহের স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। পদার্থ-স্মৃতি হইতে উৎপন্ন শাব্দবোধ অ-শাব্দ (অর্থাৎ শব্দের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে)—এইরূপ পূর্বপক্ষ করা হয়, কিন্তু পদার্থ স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া 'বাক্যলক্ষণা'র অর্থ 'বাক্যার্থ' গ্রহণ করিয়া অভিহিতান্বয়বাদিগণ ঐরূপ পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিয়া থাকেন।[১৮]

যে সাদৃশ্যবলে কোনও দ্রব্য দ্রব্যান্তরে তাহার প্রতীতির সৃষ্টি করে, অথচ সেই দ্রব্যান্তর ইন্দ্রিয়সংযোগরহিত হয়, সেই সাদৃশ্যকেই 'উপমান' বলা হয়।[১৯] গবয় (গো-সদৃশ) নামক প্রাণিবিশেষে যে সাদৃশ্য আমরা দেখি, তাহা হইতে 'আমার গো এইটির সদৃশ' এইরূপ জ্ঞানের সৃষ্টি হয়, অথচ ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ। উপমানের এই লক্ষণ কিন্তু নৈয়ায়িকগণের উপমান-লক্ষণের সহিত মেলে না। নৈয়ায়িকগণ বলেন, একটি জ্ঞাত এবং একটি অজ্ঞাত বস্তুর মধ্যে যে সাদৃশ্য তাহাই উপমান এবং ঐ সাদৃশ্যই অজ্ঞাত বস্তুটির বোধক 'গবয়' শব্দের (অসৌ গবয়-পদ-বাচ্যঃ) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মৌল শক্তির জ্ঞানের (শক্তি-গ্রহের) জনক। নৈয়ায়িক-গণের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে উপমানকে অনুমান হইতে পৃথক করা সম্ভব হয় না। অনুমানের ভিত্তির, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-জ্ঞানের এখানে কোনও প্রয়োজন নাই—এই কথা বলিয়া মীমাংসকগণ নিজেদের সমর্থন করিয়া থাকেন।[২০]

যখন কোনও বস্তুর সাহায্য ব্যতীত দৃষ্ট বা শ্রুত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব হয় না, অথচ যে বস্তুটির সাহায্য লওয়া হইতেছে তাহার অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়, তখনই হয় 'অর্থাপত্তি'।[২১] বাড়ীর বাহিরে দেবদত্ত আছে, এইরূপ আমরা যখন মনে করি, তখন ইহার ভিত্তি হইল দুইটি। প্রথমতঃ, বাড়ীর মধ্যে

দেবদত্ত নাই—আমাদের এই অভিজ্ঞতা, এবং দ্বিতীয়তঃ, দেবদত্ত বাঁচিয়া আছে —এই স্বীকৃতি। বাড়ীতে দেবদত্তের অনুপস্থিতি এবং তাহার থাকা—এই দুইটি বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধ বা অনুপপত্তি আছে। এই বিরোধের অবসান করিবার জন্যই ধরিয়া লওয়া হয় যে, বাড়ীর বাহিরে কোনও স্থানে দেবদত্ত বর্তমান আছে। আপাতবিরোধের এই সামঞ্জস্যসাধনই অর্থাপত্তিকে অনুমান হইতে পৃথক করিয়াছে। ইহাই কুমারিলভট্টের মত।

প্রভাকর কিন্তু মনে করেন যে, সংশয়ই অর্থাপত্তির জনক এবং ইহাই সুস্পষ্টরূপে অনুমান হইতে অর্থাপত্তিকে পৃথক করিযাছে। অনুমান শুধু হেতু-নিশ্চয়ের অভ্রান্ত অভিজ্ঞতার উপরই কার্যকর হইয়া থাকে। দেবদত্ত যে বাড়ীর বাহিরে আছে এই অর্থাপত্তির মূল হইল কিন্তু দেবদত্ত আদৌ বাঁচিয়া আছে কি নাই এইরূপ সংশয়বোধ এবং বাড়ীতে তাহার অনুপস্থিতির অভিজ্ঞতা হইতেই এই সংশয়ের জন্ম।[২২]

অন্য পাঁচটি প্রমাণের অনুপস্থিতিই 'অভাব' বা 'অনুপলব্ধি' এবং ইহা ইন্দ্রিয়-সংযোগ-ব্যতিরেকেই অভাবের বোধের সৃষ্টি করে।[২৩] প্রভাকর অভাবকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে গ্রহণ করেন নাই। তিনি মনে করেন যে, অভাব অধিষ্ঠান-স্বরূপ ছাড়া আর কিছুই নহে, এবং সেইজন্য তিনি অভাব বা অনুপলব্ধিকে জ্ঞানের কারণ রূপে স্বীকার করেন না। কুমারিল অভাবকে অনুপলব্ধি-প্রসূত স্বতন্ত্র পদার্থরূপে গ্রহণ করিযাছেন। অভাবকে প্রত্যক্ষ করা যায়—নৈয়ায়িকদের এই যে মতবাদ, তাহার তিনি পোষকতা করেন না। সুতরাং, প্রথম পাঁচটি প্রমাণ হইল 'ভাব-প্রমাণ', যেহেতু তাহারা ভাব-এর জ্ঞান সৃষ্টি করে; আর 'অভাব-প্রমাণ' অভাবের জ্ঞান সৃষ্টি করে।[২৪]

কেহ কেহ সম্ভব ও ঐতিহ্যকে পৃথক্ প্রমাণ বলিযা মনে করেন। মীমাংসকগণ কিন্তু ঐ দুইটিকে যথাক্রমে অনুমান ও শব্দের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

৩। তত্ত্ববিদ্যা

পদার্থের শ্রেণীভেদ : ন্যায়-বৈশেষিকের ন্যায় পূর্ব-মীমাংসাও বৌদ্ধগণের বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ খণ্ডন করিয়া জগতের বস্তু-সত্তা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। কুমারিল পাঁচটি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম চারটি ভাবাত্মক—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য; পঞ্চমটি অভাবাত্মক—অভাব। যাহার পরিমাণ আছে, তাহা দ্রব্য। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, অন্ধকার, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা, মন ও শব্দ হইল

দ্রব্য। অন্ধকারকে দ্রব্য বলিয়া মনে করা হয়, কারণ আলোকের অভাবস্থলে চক্ষুর সাহায্যে ইহার জ্ঞান জন্মে। ইহা ভাবাত্মক দ্রব্য, কারণ ইহা নীলবর্ণ এবং ইহার ক্রিয়া আছে।

নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, অণুসমূহ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। এই মত ঠিক নহে। ইহারা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দ্রব্য (উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে চলমান রৌদ্র-করোজ্জ্বল ধূলিকণাসমূহের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে)। অণুসমূহ বিভিন্ন আয়তনের দ্রব্য সৃষ্টি করে। নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, কার্য ও উপাদানকারণের সম্বন্ধটি সমবায়-সম্বন্ধ। তাহা নহে। ইহা হইল সংযোগ-সম্বন্ধ। ইহা হইতেই মীমাংসকগণের সৎকার্যবাদ বুঝা যাইবে। সৎকার্যবাদ বলে যে, মূল দ্রব্য এক, যদিও বিভিন্ন রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিণতির প্রভূত পার্থক্য জন্মে। মৃত্তিকা সেই একই, কখনও কলস, কখনও বা বাটির রূপ গ্রহণ করে মাত্র। পরিণামের পরিবর্তন হইলেও দ্রব্যটি একই থাকিয়া যায়। সাংখ্যগণ এই সৎকার্য-বাদ ও পরিণামবাদ স্বীকার করেন। এই দিক দিয়া মীমাংসকগণের সহিত সাংখ্য-সম্প্রদায়ের মিল আছে।

ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা, মন ও শব্দ শাশ্বত ও সর্বব্যাপী—এবং মন ছাড়া প্রত্যেকটিকেই প্রত্যক্ষ করা চলে। জীবাত্মা অসংখ্য হইয়াও শাশ্বত ও সর্বগত। ইহারাই জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির ধারক। কাজেই নশ্বর দেহ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও জ্ঞান হইতে তাহারা পৃথক। কুমারিলের মতে আত্মা চৈতন্যাত্মক এবং মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়। মন সর্বগত এবং দুইটি সর্বগত দ্রব্যের—যেমন আত্মা ও মন—সংযোগে পার্থিব দেহের সীমিত আধারে জ্ঞান প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। শব্দও নিত্য ও সর্বব্যাপী এবং ধ্বনি বা নাদের দ্বারাই ইহার প্রকাশ হইয়া থাকে।[২৫]

নৈয়ায়িকগণের মতই কুমারিল চব্বিশটি গুণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শব্দ, ধর্ম ও অধর্মকে গুণ বলিয়া স্বীকার না করিলেও, ধ্বনি, প্রাকট্য ও শক্তিকে গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ধ্বনি হইল বায়ুর গুণ এবং নিত্য শব্দের প্রকাশক। বস্তুর জ্ঞান হওয়ার পর সেই জ্ঞাত বস্তুর গুণ হইল প্রাকট্য। দ্রব্য, গুণ, সামান্য ও ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া যে শক্তি বর্তমান—তাহা সহজই হউক বা উৎপন্ন (আধেয়ই) হউক তাহারই নাম 'শক্তি'। সাধারণ দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা ইহা বুঝিতে পারি—যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি। বেদবিধিসমূহও বৈদিকযজ্ঞগুলির স্বর্গ বা অন্য কোনও ফল-প্রদানের শক্তির কথা বলিয়া থাকে।

ক্রিয়াসমূহের প্রত্যক্ষ হয়। গতি বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের কারণ এবং যে

সব দ্রব্য সর্বগত নহে তাহাদের আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে। ব্যক্তিতে ইহা ভেদ-সহ অভেদ সম্বন্ধে অবস্থিত থাকে। সত্তা হইল সামান্য পদার্থ; দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ছাড়াও ইহা অন্যত্র অবস্থান করে।

কুমারিলের মতের সহিত প্রভাকরের মতের কয়েকটি ক্ষেত্রে অমিল আছে। প্রভাকর অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে গ্রহণ করেন না, কারণ অভাব অধিকরণ-স্বরূপাতিরিক্ত কিছু নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভূমিতে ঘটাভাবের অর্থই হইল শুধু ভূমি। এক্ষেত্রে অভাবের প্রতিযোগী হইল ঘট এবং তাহা ভূমিতে থাকিলে দেখা যাইত। দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সামান্যছাড়াও—প্রভাকর পরতন্ত্রতা, শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যাকে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কুমারিল শক্তি ও সংখ্যাকে গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সমবায়ের স্থলে তাদাত্ম্যকে গ্রহণ করিযাছেন এবং সাদৃশ্যকে দুই বা ততোধিক সদৃশ বস্তুর কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্যমাত্র বলিযা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ হইতে কর্মের অনুমান করিতে হয়, ইহা প্রভাকরের মত। কুমারিল কিন্তু কর্মকে প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া মনে করেন। দ্রব্যসমূহের মধ্যে কেবল সামান্যকেই প্রভাকর স্বীকার করিরাছেন। কুমারিল ও প্রভাকর উভয়েই শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন। এই শক্তির বলেই সকল বস্তু কারণধর্মী হইয়া কার্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। অন্ধকার আলোকের অভাব এবং ব্যোম কাল ও দিক্ অপ্রত্যক্ষ—ইহাই প্রভাকরের মত। ব্যোমকে শব্দগুণের আধার বলিয়া অনুমান করিতে হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন, মন হইল শুধু একটি শাশ্বত অণু-পদার্থ। জীবাত্মাসমূহ শাশ্বত হইলেও অসংখ্য এবং বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন। প্রতিটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে তত্তদ্‌জ্ঞানের আধার বলিয়া মনে করা হইযা থাকে। জীবাত্মাসমূহই কর্তা, ভোক্তা ও বিভু।[২৬]

আত্মা : আত্মা একটি শাশ্বতী সত্তা এই যে ধারণা, পূর্ব-মীমাংসায় এ ধারণার মূল্য অনেকখানি। এই বিষয়ে জৈমিনি নীরব। উত্তর-মীমাংসায় ৩।৩।৫৩ সূত্রে উপবর্ষ এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং শবরস্বামী তাঁহার ভাষ্যে (১।১।৫) উপবর্ষের এই আত্মবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন। দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি—সবই ধ্বংস হইয়া থাকে এবং উপবর্ষ ও শবরস্বামী আত্মাকে এইগুলির অতিরিক্ত একটি শাশ্বতী সত্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। যজমান জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে পুত্র, স্বর্গ প্রভৃতি ফল শ্রৌত যাগাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা ভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া শ্রৌত বিধিসমূহ শ্রৌত যাগাদি বিহিত করিয়াছে। অন্য কোন বিধি না থাকিলে

কর্তাই কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন—ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যজমানের আত্মা মৃত্যুর পরেও অবস্থান করে এবং দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি নশ্বর বস্তুনিচয় হইতে তাহা পৃথক্। এই আত্মাই হইল জ্ঞাতা, জ্ঞানের আশ্রয়। জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধনগুলি হইতে ইহা পৃথক। ইহা নিত্য ও সর্বব্যাপী দুই-ই। ইহা অণুধর্মী নহে। ইহাই কর্তা এবং কর্মফলের ভোক্তা। শবরস্বামী বলেন যে, ইহা স্বয়ংপ্রকাশ। নৈয়ায়িকগণের মত মীমাংসকগণও আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেন, কারণ ইহা স্বীকার না করিলে কর্মের, বিশেষ করিয়া ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্যের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। 'জড়ো বোধাত্মকশ্চ' (অর্থাৎ আত্মা জড় ও চেতন)—এইটুকুর মধ্য দিয়াই মধুসূদন সরস্বতী আত্মা সম্বন্ধে ভাট্টগণের ধারণা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। যেহেতু ইহা চৈতন্যের আধার এবং যেহেতু ইহা আত্মজ্ঞানের বিষয়, সেইহেতু ইহা অচেতন।[২৮]

প্রভাকর বলেন যে, আত্মা জড় বা অচেতন এবং জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির আধার। কোনও বস্তুকে পূর্বে দেখিয়া আমরা যে পরে তাহাকে মনে করিতে পারি ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, একটা কিছু নিত্য পদার্থ আছে। পূর্বের প্রত্যক্ষ ও বর্তমানের স্মৃতি—দুইয়েরই আধারভূমি হইল এই নিত্য-আত্মা। ইহা স্বয়ংক্রিয় নহে, তাহা হইলে সুষুপ্তিতেও আমাদের জ্ঞান হইত। জ্ঞান তাহার বিষয়ীভূত দ্রব্যের সহিত নিজের আধারভূত আত্মাকে জাগ্রত করে। এই আত্মা কর্তা, ভোক্তা, বিভু কিন্তু জড়, কারণ, ইহা জ্ঞান হইতে পৃথক্।[২৯]

অপূর্ব : যজ্ঞ এবং তজ্জন্য ফলের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে 'অপূর্ব'কে স্বীকার করিতে মীমাংসকগণ বাধ্য হইয়াছেন। যজ্ঞসমূহ কতকগুলি অনুষ্ঠানমাত্র। ফল উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত তাহারা স্থায়ী হয় না। 'অপূর্ব'কে স্বীকার না করিলে এই অনুষ্ঠানসমূহ ও তাহাদের ফলের মধ্যে কার্য-কারণ-সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কুমারিল বলেন যে যজমান যে, কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন তাহার বলে তাঁহার নিত্য আত্মায় 'অপূর্ব' উৎপন্ন হয়, এবং যতদিন না তিনি সেই অনুষ্ঠিত কর্মসমূহের ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করেন, ততদিন পর্যন্ত ইহা স্থায়ী হইয়া থাকে। যজ্ঞ একটি কর্ম বা কতকগুলি কর্ম-পরম্পরামাত্র। যজ্ঞের ফল যদি স্বর্গ হয়, তবে সেই স্বর্গফলের উৎপাদনকাল পর্যন্ত ইহা স্থায়ী হয় না। যতক্ষণ না আমরা যজ্ঞ এবং তাহার ফল—স্বর্গ—এই উভয়ের মধ্যে কোনও যোগসূত্র মানিয়া না লই, ততক্ষণ 'স্বর্গকামো যজেত' (অর্থাৎ স্বর্গের কামনায় যাগ করিবে) এই যে বিধিবাক্য আছে, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারি না। এই শাস্ত্রনির্ভরা স্বীকৃতিই (শ্রৌতার্থাপত্তি) অপূর্বের প্রমাণ।

কর্মের সূক্ষ্ম শক্তি এই 'অপূর্ব' কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া কর্মফলের উৎপত্তিকাল পর্যন্ত যজমানের নিত্য আত্মায় বিধৃত থাকে, এইরূপ ধরিয়া লইতে হইবে। আত্মায় অপূর্ব অবস্থান করে এই মত প্রভাকর মানেন না। তাঁহার মতে কর্মে বা যে চেষ্টার ফলে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই চেষ্টায় ইহার অবস্থান করা উচিত। প্রথমটির সঙ্গে সঙ্গেই নাশ হইয়া থাকে এবং পরেরটি (বিধিবাক্যে যাহা লিঙ্ প্রত্যয়ের দ্বারা জ্ঞাপিত এবং যাহার পারিভাষিক নাম 'কার্য') ফলোৎপত্তির কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় এইরূপ মনে করা হয়। এই 'কার্য' কর্মের চোদক এবং বিধ্যাত্মিকা শক্তি, এবং এই বিধিবাক্যটি ছাড়া জ্ঞানের যত প্রকার উপায় আছে তাহা হইতে নূতন কিছু। এই 'কার্যে'র নামান্তর 'নিয়োগ' বা 'অপূর্ব'।৩০

ঈশ্বর : জীবাত্মা সম্বন্ধেও যেমন, ঠিক সেইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও জৈমিনি নীরব। ঈশ্বরই পরাশক্তি এই যে ধারণা, তাঁহার পূর্ব-মীমাংসা যে ইহার কতখানি বিরোধী তাহা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, নৈয়ায়িকগণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি-জালের অবতারণা করেন, তাহার এবং বেদসমূহ ঈশ্বরের সৃষ্টি এই মতের পূর্ব-মীমাংসা বিরোধী। ঈশ্বর শ্রৌত যাগসমূহের ফল প্রদান করেন—বৈদান্তিকগণের এই যুক্তিও পূর্ব-মীমাংসা সমর্থন করে না ; কারণ ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়াও যাগসমূহ অতীন্দ্রিয় অপূর্বের সাহায্যে নিজেরাই কার্য করিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে ঈশ্বরকে স্বীকার করায় লাভ কি? লোকে কর্মানুষ্ঠান যদি না করে, তবে ঈশ্বরের তো কাহাকেও কর্ম-ফল ভোগ করিতে দিবার শক্তি নাই। তাহা যদি, থাকে তবে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য এই দুইটি দোষে ঈশ্বর দুষ্ট হইয়া পড়েন। জৈমিনির মতে ঈশ্বর নহে—অপূর্বই কর্মফলপ্রদাতা। উত্তর-মীমাংসায় জৈমিনির এই মতের সমালোচনা করা হইয়াছে। যুক্তি দেখানো হয় যে, জৈমিনি যদি 'ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা' এইরূপ ধারণার বিরোধী হইতেন, তাহা হইলে সৃষ্টিসম্বন্ধী অন্যান্য মতের সহিত বাদরায়ণ এই মতেরও সমালোচনা করিতেন। পূর্ব-মীমাংসা বিশ্বাস করে যে, ব্রহ্মাণ্ডের আদিও নাই, অন্তও নাই ; বর্তমানে ইহা যেমন আছে সেইরূপেই ইহা চিরকাল ছিল এবং চিরকাল থাকিবে (ন কদাচিদনীদৃশং জগৎ)। বিশ্বের সৃষ্টিও নাই, সার্বিক প্রলয়ও নাই। কাজেই ঈশ্বরকে এই বিশ্বের কারণ বলিয়া ভাবা যায় না। সংক্ষেপে বলিতে হয় যে, বেদসমূহের পরম প্রামাণ্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, তেমন কোন মতবাদ পূর্ব-মীমাংসা গ্রহণ করিতে পারে না।

কুমারিল বা প্রভাকর কেহই ঈশ্বরকে স্বীকার করার বিরোধী নহেন।

অতিপ্রাকৃত 'ধর্ম' ও 'মোক্ষে'র প্রামাণ্যরূপে বেদকে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই তাঁহাদের প্রধান কার্য ছিল। নিত্য আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জৈমিনি নীরব। এই বিষয়ে কুমারিল বলেন যে, নাস্তিকতাবাদের খণ্ডন করিবার জন্যই শবরস্বামী যুক্তিতর্কের সাহায্যে শাশ্বতী সত্তারূপে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন (এই যুক্তিসমূহ বেদান্তসূত্রের (৩।৩।৫৩) উপবর্ষের বৃত্তি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে); তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঐ আত্মার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান নিয়ত উপনিষদ্‌পাঠের দ্বারাই লাভ করা যায়।[৩১] ঈশ্বরসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য হইল—'বাঙ্ময় ব্রহ্মস্বরূপ বেদশাস্ত্র এক পরমাত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত।'[৩২] ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-কারণসমূহের আদি অন্ত থাকিলেও ব্রহ্মাণ্ড যে অনাদি ও অনন্ত, এই মত প্রভাকরও গ্রহণ করিয়াছেন। জড় ও চেতন পদার্থ-সমূহের সৃষ্টিকল্পে ঈশ্বরের আভিমুখ্য তিনি অনুমোদন করেন না।

অবরকালীন মীমাংসকগণের মধ্যে এমন একটি গুরু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহার ফলে অনেকেই ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারূপে গ্রহণ করার এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয়কে স্বীকার করার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতি প্রলয়ে ঈশ্বর বেদ সংরক্ষিত করিয়া থাকেন এবং প্রলয়ান্তে নবসৃষ্ট বিশ্বকে সেই অক্ষত বেদ পুনরায় প্রদান করেন। এই কথা বলায় বেদের প্রামাণ্যও পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল।[৩৩]

'দেবতা' সম্বন্ধে মীমাংসকগণের ধারণা অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে। স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির জন্য বিহিত যাগসমূহকে দেবতার উদ্দেশে আহুতিত্যাগ বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং এখানে ভাবনা হইল এইরূপ—'ইহা অগ্নির জন্য, আমার নহে' (অগ্নয়ে ইদং, ন মম)। এখানে ত্যাগক্রিয়াই প্রধান; হবিঃ ও দেবতা শুধু আনুষঙ্গিক সহায়। যেহেতু অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের যেখানে যেখানে আহ্বান করা হয়, তাঁহাদিগকে যুগপৎ সেই বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকিতে হয় এবং বিভিন্ন যজমান তাঁহাদের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করেন, সেকারণ ধরিযা লওয়া হয় যে, ঐ দেবতাগণ অশরীরী এবং 'অগ্নি', 'ইন্দ্র' প্রভৃতি কতকগুলি নিত্য শব্দছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা হইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে আসিয়া পৌঁছিতে হয়; তাহা হইল এই যে, মন্ত্রগুলিতে দৃষ্ট শব্দসমূহের এবং তাহাদের আনুপূর্বীর কোনও পরিবর্তন করা চলে না। এই তথ্য পাওয়া গেলেও ইহা লক্ষণীয় যে, বেদের চূড়ান্ত প্রামাণ্যের ও মানুষের উপর কর্মের তর্কাতীত শক্তির প্রতিষ্ঠাকল্পে মীমাংসকগণের যে অতি-উৎসাহ, তাহাই তাঁহাদিগকে দেবতাদের অশরীরী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিল এবং দেবতাগণ অবহেলিত অবস্থায় একপার্শ্বে কর্মাপেক্ষা গৌণস্থানে

প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মীমাংসকগণ বিশ্বাস করেন যে, দেবতাগণ বিচিত্র ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী এবং সংখ্যায় অনেক। কর্মকে যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহা কোনও প্রকারেই দেবতাগণের গুরুত্ব খর্ব করে না। যথাবিধি উপাসিত হইলে তাঁহারা উপাসককে আশীর্বাদ করেন এবং কর্মফল ভোগ করিবার অধিকার দান করেন।

মোক্ষ ঃ পূর্ব-মীমাংসা 'ধর্ম' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে। এই 'ধর্ম'ই স্বর্গ প্রভৃতি অভ্যুদয়ের জনক। জৈমিনি, শবরস্বামী, এবং প্রভাকর মোক্ষের কথা বলেন নাই। কুমারিল, শালিকনাথ এবং তাঁহাদের অনুবর্তিগণ ইহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই, কারণ ইহাকে বাদ দিলে শাস্ত্র সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। কুমারিল মনে করেন যে, পুনর্জন্ম হইল দুঃখ-কষ্টের কারণ এবং পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিই মোক্ষ। জ্ঞানের দ্বারা পূর্বের কর্ম যখন সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সেই কর্মের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না যাহার ফলে দেহের সৃষ্টি হইতে পারে, তখনই মোক্ষ আসে। কোনও নিষিদ্ধ কর্ম করা বা ফল-কামনায় কোনও কর্ম করা মুমুক্ষুগণের উচিত নয়, কারণ ঐ দ্বিবিধ কর্মই নূতন বন্ধনের জনক হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি শুধু নিত্য ও নৈমিত্তিক এই দ্বিবিধ বাধ্যতামূলক কর্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন, এবং উহার অকরণে তাঁহার পাপ ও দুঃখ লাভ হইবে। ইহাই গীতার নিষ্কাম-কর্ম।

জ্ঞান মোক্ষের প্রত্যক্ষ কারণ নহে। যাহাতে পুনর্জন্ম না হয় সেইভাবে কর্মকে পরিচালিত করিতে জ্ঞান মানুষকে সাহায্য করে মাত্র। জ্ঞান, উপাসনা ও মননের রূপ পরিগ্রহ করিয়া জীবকে মোক্ষের পথে পরিচালিত করে। মুক্ত আত্মা সর্ববিধ সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া জ্ঞানশক্তিরূপ নিত্য অবস্থায় উপনীত হয়, কারণ ইহার কোনও দেহ বা ইন্দ্রিয় থাকে না এবং ঐগুলির ক্রিয়া হইতেও ইহা মুক্ত থাকে। এইরূপে কুমারিল ও তাঁহার অনুবর্তিগণ জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদ ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার মতে জ্ঞান ও কর্ম দুই-ই মোক্ষের জনক। মোক্ষ বা পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতিসম্বন্ধে কুমারিলের যে ধারণা তাহা অদ্বৈতবাদিগণের ধারণার সহিত মিলিয়া যায়। 'ন পুনরাবর্ততে' (যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না) এই শ্রুতিবাক্য এবং 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' এই ব্রহ্ম-সূত্রের (৪।৪।২২) উপর ভিত্তি করিয়া অদ্বৈতবাদিগণও মোক্ষের ঐরূপ ব্যাখ্যাই দিয়াছেন।[৩৪]

শালিকনাথের মতানুসারে 'ধর্ম' ও 'অধর্ম' হইল জীবের পুনর্জন্মের এবং সুখ-দুঃখের কারণ, এবং 'ধর্ম' ও 'অধর্মে'র অবলুপ্তিই 'মোক্ষ'। অদ্বৈতবাদিগণ

মনে করেন, মোক্ষ একপ্রকার আনন্দময় অবস্থা। শালিকনাথের মতে তাহা নহে, পরন্তু ইহা আত্মার স্বাভাবিক রূপ। আত্মা যখন কোনও দেহে বা ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ হইয়া থাকে না, তখন তাহার সকলপ্রকার দৈহিক এবং মানসিক কষ্ট চলিয়া যায় এবং তাহা শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া পড়ে। কুমারিলের মত শালিকনাথও মোক্ষের উপায়রূপে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্তব্যসমূহের অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধ ও কাম্য-কর্মের ত্যাগ, পূর্বসঞ্চিত কর্মের ক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান এবং আত্মজ্ঞানলাভের উপর জোর দিয়াছেন। সন্তোষ, আত্মসংযম ও অন্যান্য আত্মিক গুণাবলীর সহিত সঙ্গত হইয়া এই উপায়সমূহ আর কর্ম সঞ্চিত হইতে দেয় না।[৩৫]

৪। নীতি

পূর্ব-মীমাংসাকে ধর্ম-মীমাংসা বলা হয়। ইহা সার্থক। নৈতিক শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির কারণরূপে শাস্ত্রসমূহ যে বিধান দিয়াছে তাহাই 'ধর্ম'। পূর্ব-মীমাংসায় 'ধর্মে'র এইরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। নিজের প্রতি, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, সম্প্রদায় ও জাতির প্রতি মানুষের যে নৈতিক কর্তব্য রহিয়াছে, পূর্ব-মীমাংসা সেইগুলির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। কর্ম যে সর্বশক্তিমান এবং ঈশ্বরও যে—যদি অবশ্য তিনি থাকেন—কর্মের শক্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, একথা পূর্ব-মীমাংসা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। বেদসমূহ হইল এই ধর্মের একমাত্র প্রমাণ। যে হিংসা মৃত্যুর জনক তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাহা 'অধর্ম'। কিন্তু বেদবিহিত (অগ্নীষোমীয়) যজ্ঞে পশুবধ হিংসা হইলেও অধর্ম বলিয়া বিবেচিত হয় না, কারণ যজ্ঞ হইল পুরুষার্থ এবং পশুটিকে ঈশ্বরের উপাসনা বা যজ্ঞেই উৎসর্গ করা হয় (ক্রত্বর্থ)। সাধারণ লোকে দ্বিবিধ হিংসা একই দৃষ্টিতে বিচার করিলেও নীতির ক্ষেত্রে কর্মানুষ্ঠানের পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তাহাই কর্মের স্বরূপ নির্ধারণ করে—সে কর্ম হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক যাহাই হউক না কেন। এই সব অতি-প্রাকৃত বিষয়ে বেদসমূহই একমাত্র প্রমাণ।

কর্মকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—(১) নিত্য (২) নৈমিত্তিক এবং (৩) কাম্য। প্রথম দুইটি বাধ্যতামূলক। তাহাদের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় হয়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় যে প্রার্থনা করিতে হয় (অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত) তাহা নিত্য-কর্ম। গ্রহণকালে যে স্নান করিতে হয় তাহা নৈমিত্তিক কর্ম, কারণ ঐ স্নান-কর্ম গ্রহণরূপ নিমিত্তের উপস্থিতিতেই করণীয়। যখন কেহ কোনও নির্দিষ্ট

ফলের কামনায় কোনও কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাই কাম্য কর্ম। ইহা নিত্য নহে। প্রধান ও আনুষঙ্গিক যাগাদির অনুষ্ঠানে যাঁহাদের সামর্থ্য ও অধিকার আছে (যথা-বিনিয়োগম্ অধিকারঃ), তাঁহারাই কেবল ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান ছাড়া শুধু প্রধান কর্মেরই অনুষ্ঠান করার শক্তি আছে, তাঁহাদিগকেও সারা জীবন ধরিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে হয় (যথাধিকারং বিনিয়োগঃ)।[৩৬]

যেসকল বৈদান্তিক আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির অন্যতম উপায় হিসাবে কর্ম যোগকে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও মোক্ষের কারণরূপ এই 'ধর্ম'গুলির উপর এক আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। উপনিষদে বলা হইয়াছে—'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন'। ইহার মূল কথা হইল যে, অনাসক্তচিত্তে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া সেগুলিকে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বলিয়া ভাবিতে পারিলে আত্মজ্ঞানলিপ্সু ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মন পবিত্র হইয়া থাকে।

দ্ব্যর্থবোধক ও সংশয়াত্মক বৈদিক মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যাকল্পে কতকগুলি বিধি উপস্থাপিত করিয়া এবং ধর্মের স্বরূপানুসন্ধান করিয়া পূর্ব-মীমাংসা এক বিশিষ্ট দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ব্যাকরণ ও ন্যায় যেমন যথাক্রমে পদ-শাস্ত্র ও প্রমাণ-শাস্ত্র নামে অভিহিত, ঠিক সেইরূপ পূর্ব-মীমাংসাও বাক্য-শাস্ত্র নামে পরিচিত।

দ্রষ্টব্য

১। A Primer of Indian Logic, Introduction, পৃঃ ৮-৯

২। বর্তমান লেখকের সম্পাদিত তত্ত্ব-বিন্দু ১ম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩। "যস্য চ দুষ্টম্ করণম্ যত্র চ মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীচীনঃ, প্রত্যক্ষঃ" (শবর-ভাষ্য ১।১।৫)।

৪। একটি জ্ঞান যদি অপর জ্ঞানের বিষয় হিসাবে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় জ্ঞান আবার অপর জ্ঞানের বিষয় হইবে এবং এইরূপ অনবস্থার সৃষ্টি হইবে।

৫। তত্ত্ব-বিন্দু, ভূমিকা পৃঃ ৭২-৪ দ্রষ্টব্য এবং গঙ্গানাথ ঝা'র সম্পাদিত পূর্ব-মীমাংসা, পৃঃ ১৫, ২৩-৪ দ্রষ্টব্য।

৬। "সৎ-সম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়ানাম্ বুদ্ধি-জন্ম তৎ প্রত্যক্ষম্" (P.M.S.)

৭। শ্লোক-বার্তিক, চতুর্থ সূত্র, শ্লোক ১১২-১৩।

৮। প্রকরণ পঞ্চিকা, পৃঃ ৫৪-৫ দ্রষ্টব্য।

৯। A Primer of Indian Logic, পৃঃ ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

১০। "জ্ঞাত-সম্বন্ধস্যৈকদেশ-দর্শনাদেক দেশান্তরে সন্নিকৃষ্টেঽর্থে বুদ্ধিঃ" (S.B. I.I.5)

১১। প্রত্যক্ষতো-দৃষ্ট-সম্বন্ধ এবং সামান্যতো-দৃষ্ট-সম্বন্ধ এই দ্বিবিধ অনুমানের জন্য দ্রষ্টব্য শ্লোক-বার্তিক, ১।১।৫, অনুমান-খণ্ড (শ্লোক ১৪১—৪৪)

১২। শাস্ত্রং শব্দ-বিজ্ঞানাৎ অসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বিজ্ঞানম্—(শবর-ভাষ্য ১।১।৫)

১৩। মীমাংসকগণের মতে শব্দ, 'নাদ' বা 'ধ্বনি'র দ্বারা প্রকাশিত বর্ণরাশি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। (দ্রষ্টব্য—পূ. মী. সূ., ১।১।৫)

১৪। বেদা অপৌরুষেয়া অস্মর্যমাণ-কর্তৃকত্বাদ্ যন্নৈবং তন্নৈবম্।

১৫। তুলঃ—বেদস্যাধ্যায়নং সর্বং গুর্বধ্যয়নপূর্বকম্—শ্লোকের দুই পাদ বেদাধ্যয়নসামান্যাৎ অধুনা-ধ্যয়নং যথা।

১৬। আখ্যাপ্রবচনাৎ—(পূ. মী. সূ, ১।১।৮)

১৭। পদৈরভিহিতাঃ পদার্থা বাক্যার্থং বোধয়েয়ুঃ—(শবর-ভাষ্য, ১।১।৭)

১৮। তত্ত্ববিন্দু (দ্বিতীয় খণ্ড), লেখকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য, তত্ত্ববিন্দুর বিশ্লেষণ, পৃঃ, ১৭১-৯৭

১৯। উপমানমপি সাদৃশ্যম্ অসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বুদ্ধিমুৎপাদয়তি, যথা গবয়দর্শনং গো স্মরণস্য—(শবর-ভাষ্য ১।১।৫)

২০। লেখকের মীমাংসা-শ্লোক-বার্তিক (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৮-৪৭)-এর সংস্করণের লেখকেরই ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২১। অর্থাপত্তিরপি দৃষ্টঃ শ্রুতো বার্থোঽন্যথা নোপপদ্যতে ইত্যর্থকল্পনা—(শবর-ভাষ্য, ১।১।৫)

২২। কুমারিলের মতের জন্য দ্রঃ তন্ত্ররহস্য, পৃঃ ১৪ ; দ্রঃ—মানমেয়োদয়, অর্থাপত্তি-খণ্ড এবং মীমাংসা-শ্লোক-বার্তিক (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪০-৪৪)

২৩। অভাবোঽপি প্রমাণাভাবঃ নাস্তীত্যস্যার্থস্যাঽসন্নিকৃষ্টস্য—(শবর-ভাষ্য, ১।১।৫)

২৪। মীমাংসা-শ্লোক-বার্তিক-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য ; পৃঃ ৩৪-৪৫

২৫। মীমাংসকগণ বৈয়াকরণদের স্ফোটবাদ সমর্থন করেন না, কারণ ইহা বর্ণ ব্যতীত সমুদয় শব্দ গ্রহণ করিয়াছে।—তত্ত্ববিন্দু, লেখকের ভূমিকা ; পৃঃ ১২-৬৭

২৬। দ্রঃ—মানমেয়োদয়, মেয়খণ্ড, রাধাকৃষ্ণন্, ইণ্ডিয়ান ফিলসফি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৪-১৭ ; ঝা, প্রাভাকর স্কুল অফ্ মীমাংসা, পৃঃ ৮৮-১০১ এবং পূর্ব-মীমাংসা, পৃঃ ৬১-৭৬।

২৭। স্ব-সংবেদ্যস্য ভবতি, নাসাবন্যেন শক্যতে দ্রষ্টুম্—শবর-ভাষ্য, ১।১।৫

২৮। দ্রঃ ন্যায়-রত্নাবলী 'আত্মনোঽস্ত্যংশ-দ্বয়ম্ চিদংশোঽচিদংশশ্চ, চিদংশেন দ্রষ্টৃত্বম্, অচিদংশেন জ্ঞান-সুখাদি-পরিণামিত্বম্, মামহং জানামীতি জ্ঞেয়ত্বং চ'।

২৯। 'কর্তা ভোক্তা জড়ো বিভুরিতি প্রাভাকরাঃ—স. বিন্দু। ন্যায়-রত্নাবলীতে 'জড়'কে এইরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—স চ জ্ঞান-স্বরূপ-ভিন্নত্বাদ্ জড়ঃ ; জানামীতি জ্ঞানাশ্রয়ত্বেন স ভাতি, ন জ্ঞান-রূপত্বেন।'

৩০। দ্রঃ প্রকরণ-পঞ্চিকা, পৃঃ ১৮৫ এবং ডাঃ ঝা'র পূর্ব-মীমাংসা, পৃঃ ২৫৭-৬০

৩১। দ্রঃ—শ্লোক-বার্তিক, আত্ম-বাদ, শ্লোক ১৪৮।

৩২। শব্দ-ব্রহ্মেতি যচ্চেদং শাস্ত্রং বেদাখ্যমুচ্যতে।
তদপ্যাধিষ্ঠিতং সর্বম্ একেন পরমাত্মনা। (তন্ত্র-বার্তিক, পৃঃ ৭১৯)

৩৩। দ্রঃ—আপদেবের মন্তব্য : ঈশ্বরো গত-কল্পীয়ং বেদমস্মিন্ কল্পে স্মৃত্বোপদিশতি (পৃঃ ২)।

৩৪। শাস্ত্র-দীপিকা, পৃঃ ১৩০ এবং দ্রঃ ডাঃ গঙ্গানাথ ঝা'র পূর্ব-মীমাংসা, পৃঃ ২৩-২৫।

৩৫। দ্রঃ—রাধাকৃষ্ণন্, ইণ্ডিয়ান ফিলসফি, খণ্ড ২, পৃঃ ৪২২-২৩, ডাঃ গঙ্গানাথ ঝা'র পূর্ব-মীমাংসা, পৃঃ ৩৬-৩৭

৩৬। দ্রঃ—যথা-শক্তি-ন্যায়, পূ-মী., সূ., ৬।৩।১

গ্রন্থবিবরণী

জৈমিনি : পূর্ব-মীমাংসা-সূত্র—শবরস্বামীর ভাষ্যের সহিত (শ. ভা), বারাণসী, ১৯১০

ভট্টকুমারিল : শ্লোক-বার্তিক, বারাণসী

ভট্টকুমারিল : শ্লোক-বার্তিক (সুচরিতমিশ্রের কাশিকার সহিত), ৩য় খণ্ড, ত্রিবান্দ্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থমালা, নং ১৫০, ত্রিবান্দ্রাম্, ১৯৪৩

ভট্টকুমারিল : তন্ত্র-বার্তিক, বারাণসী

প্রভাকর : বৃহতী (ঋজু-বিমলা সহ), মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত গ্রন্থমালা, নং ৩, মাদ্রাজ, ১৯৩৪

মিশ্র, শালিকনাথ : প্রকরণ-পঞ্চিকা, বারাণসী, ১৯০৩

মিশ্র, পার্থসারথি : শাস্ত্র-দীপিকা, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বে, ১৯১৫

আপদেব : মীমাংসা-ন্যায়-প্রকাশ, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বে, ১৮৩৩

ভট্ট, নারায়ণ ও পণ্ডিত, নারায়ণ : মান-মেয়োদয়, আড়িয়ার, ১৯৩৩

রামানুজাচার্য : তন্ত্র-রহস্য, গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরীজ, নং ২৪, বরোদা, ১৯২৩

সুরেশ্বর : নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি, বোম্বে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সিরীজ, নং ৩৮, বোম্বে

রাধাকৃষ্ণন্, সর্বপল্লী : ইণ্ডিয়ান ফিলসফি, খণ্ড ২, লণ্ডন, ১৯২৭

দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ : এ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান ফিলসফি, খণ্ড ১, কলিকাতা, ১৯২২

শাস্ত্রী. ম. ম. এস্ কুপ্পুস্বামী : এ প্রাইমার এফ্ ইণ্ডিয়ান লজিক, মাদ্রাজ, ১৯৩২

দত্ত, ডি. এম্ : সিক্স্ ওয়েজ অফ্ নোইং, লণ্ডন ১৯৩২

শাস্ত্রী, পশুপতিনাথ : ইনট্রোডাক্শন্ টু পূর্ব-মীমাংসা, কলিকাতা, ১৯২৩

কীথ, এ. বি : কর্ম-মীমাংসা, হেরিটেজ অফ ইণ্ডিয়া সিরীজ

ঝা, গঙ্গানাথ : প্রাভাকর স্কুল অফ মীমাংসা, ইণ্ডিয়ান থট্, এলাহাবাদ, ১৯১১

ঝা, গঙ্গানাথ : পূর্ব-মীমাংসা, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৪৩

শাস্ত্রী, ভি. এ. রামস্বামী : এ সর্ট হিষ্ট্রী অফ পূর্ব-মীমাংসা (তত্ত্ববিন্দুর সংস্করণে লেখকের ভূমিকা, আন্নামালাই সংস্কৃত সিরীজ, নং ৩), আন্নামালাইনগর, ১৯৩৬

কানে, মঃ মঃ পি ভি : পূর্ব-মীমাংসা সিস্টেম্

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বেদান্ত—অদ্বৈতবাদ

ক। শংকর

বেদান্ত: বেদের অন্ত বা শেষ এই অর্থে উপনিষদ্ সমূহকেই বেদান্ত বলা হয়। প্রাচীনকালে উপনিষদের তত্ত্বগুলির একটি সঙ্গত ও সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থের 'উপনিষদ্' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, উপনিষদে দুইটি পৃথক্ চিন্তাধারা আছে। এক ধারা অনুসারে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎকে অভিন্ন বলা হইয়াছে; অন্য মতে এই তিন তত্ত্বকে পৃথক্ বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই আপাতবিরোধী দুইটি উক্তির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা আবশ্যক। জীব ও জগৎ একই সময়ে কি করিয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন হইতে পারে? বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র অথবা বেদান্তসূত্রে এই জাতীয় সমন্বয়ের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্মসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপনিষদের চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা আরও অনেকে করিয়াছেন, যথা ঔডুলোমি, কাশকৃৎস্ন, বাদরি, জৈমিনি, কার্ষ্ণাজিনি ও আশ্মরথ্য। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও গ্রন্থ আমাদের হাতে আসে নাই বলিয়া বাদরায়ণের গ্রন্থই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে।

উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শনের তিনটি ভিত্তি। ইহাদিগকেই বেদান্তের প্রস্থানত্রয় বলা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মসূত্রের আর এক নাম উত্তর-মীমাংসা; ইহা পূর্ব-মীমাংসা (যাহা যাগযজ্ঞাদি লইয়া আলোচনা করে) হইতে পৃথক্। মীমাংসার (অর্থাৎ প্রণালীবদ্ধ আলোচনার) মতে বেদে যাহা দেওয়া আছে, তাহার তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য আলোচনা প্রয়োজন।

ব্রহ্মসূত্রের শংকর-ভাষ্য: ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি পাদ অথবা পরিচ্ছেদ। ব্রহ্মসূত্রের সংক্ষেপে বর্ণিত বিষয়বস্তু নানাবিধ ব্যাখ্যার সুযোগ দিয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্যের মধ্যে প্রধানগুলি হইতেছে শংকরের অদ্বৈত, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত, মধ্বাচার্যের দ্বৈত, নিম্বার্কের ভেদাভেদ এবং বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈত। ইঁহারা বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে উল্লিখিত প্রাচীন পরম্পরাগত মতগুলির মধ্যে কোন না কোন একটি অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন

প্রকারের উপদেশের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনের শংকর-কৃত ব্যাখ্যা এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়।

শংকর খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তিনি নিজেকে গোবিন্দের শিষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; গোবিন্দ গৌড়পাদের শিষ্য। শংকর বত্রিশ বৎসর কাল বাঁচিয়াছিলেন এবং তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে প্রধান উপনিষদ্‌গুলি ভগবদ্‌গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে শংকরকে গণ্য করা হইয়া থাকে, কিন্তু সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

উপনিষদের মূল বক্তব্য আত্মৈকতত্ত্ববাদ অথবা অদ্বৈতবাদ—শংকর এই মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মূলমধ্যমককারিকার লেখক নাগার্জুন বলিতে চান যে বুদ্ধের প্রধান মত হইল চরম অদ্বয়-বাদ। গৌড়পাদ তাঁহার মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকাতে উপনিষদাবলীর অন্তর্গত বিরোধী বাক্যের বিবরণ দিয়াছেন। অদ্বৈত দর্শনের মূল তত্ত্বগুলির প্রথম ব্যাখ্যা পাওয়া যায় গৌড়পাদের কারিকাতে। এই মূল তত্ত্বগুলি হইল সত্তার স্তরভেদ, জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব, মায়াবাদ, কার্যকারণ সম্পর্ক প্রভৃতি বৌদ্ধিক রূপের পরমতত্ত্বে প্রয়োগের অযৌক্তিকতা, মোক্ষপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ উপায় রূপে জ্ঞানের আবশ্যকতা। মাধ্যমিকের নেতিবাচক তর্কশাস্ত্রের সহিত উপনিষদের ভাবাত্মক চৈতন্যবাদের এক সমন্বয়সাধনের চেষ্টা কারিকাতে করা হইয়াছে। এই বিষয়ে গৌড়পাদ অবশ্য একটি সুপ্রাচীন অদ্বৈত ভাবধারার কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার কারিকা চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত) প্রথম অধ্যায়ে (আগম) মাণ্ডুক্য উপনিষদের বাক্যগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গৌড়পাদ ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে তাঁহার মত শ্রুত্যনুসার এবং যুক্তিসিদ্ধ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (বৈতথ্য) যুক্তির সাহায্যে বহুত্ব ও ভেদযুক্ত জগতের মিথ্যাত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। শেষ অধ্যায়ে (অলাতশান্তি) অদ্বৈতবাদের আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া আত্মাই যে একমাত্র সত্য এবং আমাদের সাধারণ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান যে ব্যবহারিক এই কথা বলা হইয়াছে। একটি দণ্ডের একদিকে আগুন জ্বালইয়া যদি খুব জোরে উহা ঘুরান হয় তাহা হইলে আগুন যেন বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে এই রকম ভ্রম উৎপন্ন হয়। ইহাকে অলাত-চক্র বলা হয়। জগতের বহুত্ব ও এইরকম ভ্রম-প্রসূত। গৌড়পাদ তাঁহার করিকায় যোগাচার মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বুদ্ধের নাম প্রায় ছয়বার উল্লেখ করিয়াছেন।

যে যুগে বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচলন ছিল গৌড়পাদ সেই যুগের লোক। স্বভাবতই

তিনি বৌদ্ধ মতের সহিত সুপরিচিত ছিলেন এবং বৌদ্ধমতের যে অংশ তাঁহার অদ্বৈত মতের সহিত অবিরোধী তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে তাঁহার আবেদনের যুক্তি ছিল এই যে, তাঁহার মত কোন ধর্মশাস্ত্র বা শ্রুতির উপর নির্ভরশীল নহে। গোঁড়া হিন্দুদের নিকট তিনি বলিতেন যে তাঁহার মত প্রাচীন স্বীকৃত মতানুসারী। তাঁহার মত মোটামুটি উদার ছিল বলিয়া গৌড়পাদ বৌদ্ধমতের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মত গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে অদ্বৈতবাদের পরিকল্পনার সহিত সমন্বিত করিয়া লইয়াছিলেন।

মনে হয় গৌড়পাদ তাঁহার নিজের মতের সহিত বৌদ্ধমতের কোন কোন বিষয়ের সাদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। সেইজন্যই তিনি একটু বেশী প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন তাঁহার মত বৌদ্ধ মত নহে। তাঁহার কারিকার উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন: "ইহা বুদ্ধের উক্তি নহে।" শংকর ইহার উপর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "বৌদ্ধ মত ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে সাদৃশ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু যে অদ্বৈতবাদ বেদান্ত দর্শনের কেন্দ্র ইহা সেই জাতীয় অদ্বৈতবাদ নহে।"

গৌড়পাদের গ্রন্থে বৌদ্ধ প্রভাব, বিশেষত বিজ্ঞানবাদ ও মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বাহ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বিজ্ঞানবাদীরা যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন গৌড়পাদও ঠিক সেই জাতীয় যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। বাদরায়ণ এবং শংকর উভয়েই দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে জাগ্রৎ জীবনের অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নজগতের অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যিকার পার্থক্য রহিয়াছে এবং জাগ্রৎ জীবনের প্রতীতি বাহ্য বস্তু নিরপেক্ষ নয়। গৌড়পাদ অবশ্য জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় জগতের জ্ঞানকে একত্র করিয়া দেখিয়াছেন। একদিকে বিজ্ঞানবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট আভাসবাদ হইতে শংকর তাঁহার দর্শনকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অপরদিকে গৌড়পাদ আভাসবাদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদকে চরম মত বলিয়া গৌড়পাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন বিষয়ের ন্যায় বিষয়ীও অসৎ। ইহার ফলে, তাঁহার মত বিপজ্জনক ভাবে শূন্যবাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। নাগার্জুনের মত গৌড়পাদও কার্যকারণ সম্পর্কের বৈধতা এবং পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করিয়াছেন। "ধ্বংস ও নাই, সৃষ্টিও হয় নাই, কেহ বদ্ধ নহে, কেহ মোক্ষের জন্য সচেষ্ট নহে, কেহ মুক্ত নহে; ইহাই চরম সত্য।" ব্যবহারিক জগতের উৎস অবিদ্যা অথবা নাগার্জুনের ভাষায় সম্বৃতি। "মায়িক বীজ হইতে মায়িক অংকুরের উদ্ভব হয়; এই অংকুর

নিত্য নয় অনিত্যও নয়। পদার্থের স্বভাবও এইরূপ এবং তাহার কারণও ইহাই।" জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটিকে অতিক্রম করিয়া যে চরম অবস্থা বিদ্যমান তাহাকে অস্তি, নাস্তি, ইহারা উভয়, ইহাদের কোনটি নহে—এইরূপ কোন বিশেষণই দেওয়া চলে না। গৌড়পাদ এবং নাগার্জুন মনে করেন যে, এই চরম অবস্থা ব্যবহারিক সত্তাকে অতিক্রম করিয়া আছে। মতের দিক দিয়া এই সকল মিল ছাড়াও উভয়ের ব্যবহৃত বাক্য ও বাক্যাংশ বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায় যে, বৌদ্ধমত বেদান্তকে নিঃসন্দেহে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। 'ধর্ম' কথাটি বস্তু ও পদার্থ অর্থে ব্যবহার করা, 'সম্বৃতি' অর্থে আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক জ্ঞান বুঝা, 'সংঘতা' বলিতে বস্তুনিষ্ঠ সত্তা বুঝা—এই সকলই বৌদ্ধমতানুসারী। বৌদ্ধ গ্রন্থে অলাতচক্রের তুলনা মিথ্যাত্বই সূচিত করে।

শ্রুতি, অনুভূতি, প্রজ্ঞা : শ্রুতিবাক্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শংকর উপনিষদের বাক্যগুলির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া উহাদের আন্তর্নিহিত ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন।[২] নিজ মতের সমর্থনে শংকর শুধু শ্রুতিবাক্যের প্রাধান্যই স্বীকার করেন নাই, নিজ বক্তব্যের যৌক্তিকতা ও অপরোক্ষানুভূতির উপরও জোর দিয়াছেন। এই বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান পরস্পর-বিরোধী নয়। কার্য-কারণ যুক্তির সাহায্যে আমরা এক চরম তত্ত্বের অস্তিত্বে উপনীত হইতে পারি। জগৎকে কার্য-রূপে গ্রহণ করিয়া ইহার চরম কারণের আবশ্যকতা আমরা অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারি। এই ধরণের অনুমান অবশ্য কারণের স্বভাব প্রকাশ করিতে পারে না। কেবল অপরোক্ষানুভূতির সাহায্যেই সত্তার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। চরম সত্তা কোন তাত্ত্বিক পদার্থ নহে, ইহা চিৎসত্তা। ইহা অনুমানের বিষয় নহে, ইহা কেবল অপরোক্ষানুভূতি-লভ্য। শংকর শ্রুতিকে এই অর্থে প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন যে, ইহাতে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের অনুভূতির কথা লিপিবদ্ধ আছে।[৩] যেহেতু শ্রুতিতে লিপিবদ্ধ অনুভূতি স্বতঃপ্রমাণ, সেইজন্য শ্রুতির স্বতঃপ্রামাণ্যও স্বীকৃত হইয়াছে। সূর্যালোক যেমন দৃশ্যমান বস্তুকে উদ্ভাসিত করে তেমনি শ্রুতি ইহার বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকে।[৪] শ্রুতিকে স্মারক বা জ্ঞাপক হিসাবে দেখিতে হইবে, ইহা কারক নহে।[৫] শুদ্ধ প্রজ্ঞা মানুষকে অপরোক্ষানুভূতির দিকে লইয়া যায়[৬] এবং অপরোক্ষানুভূতির লিপিবদ্ধরূপই শাস্ত্র বা শ্রুতি।

শংকর শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া, যুক্তির সাহায্যে এই সত্যে উপনীত হইয়াছেন যে, ব্রহ্ম অপরোক্ষানুভূতি-লভ্য। প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, শব্দ প্রভৃতি কোন প্রমাণের বিষয়রূপেই ব্রহ্মাকে পাওয়া যায় না।[৭] ব্রহ্মাকে

সাক্ষাৎ প্রতীতির দ্বারা পাইতে হইবে, যুক্তিতর্কের সাহায্যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ঘটে না। এই অনুভূতিতে সর্বভূতে আত্মাকেই উপলব্ধি করা হয়। ব্রহ্মানুভূতি হইলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটীর বিলয় ঘটে। ব্যবহারিক জ্ঞানে যে সকল সর্ত থাকা প্রয়োজন, এই অনুভূতিতে সে-জতীয় কোন সর্ত থাকে না। কেবল ধ্রুবত্বের বোধ বিদ্যমান থাকে। শংকর প্রশ্ন করিয়াছেন, "একজন ব্রহ্মজ্ঞের অনুভূতি, যাহা তাহার অন্তরের সুদৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্যে নিহিত, তাহা কেমন করিয়া অপরে অস্বীকার করতে পারে?"[৮] ব্রহ্মানুভূতি অন্তের অনুভূতি এবং ইহা অনির্বচনীয়। আত্মাই কেবল এই অনুভবের সাক্ষী, আত্মসাক্ষিকমনুত্তমম্।[৯] দুঃখ বিরহিত শুদ্ধচৈতন্যই জীবের স্বরূপ ব্রহ্মানুভূতিতে ইহাই প্রতিভাত হয়। চরম সত্তা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেই দুঃখের উদ্ভব হয়;[১০] এই বিচ্যুতি দূরীভূত হইলেই দুঃখও দূরীভূত হয়।

ব্রহ্ম: উপনিষদের অনেক স্থানে বলা হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের ইতিবাচক লক্ষণ নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। 'নেতি নেতি' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ অংশটির অর্থ হইল যে ব্রহ্ম কোন প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন। তিনি সমস্ত প্রত্যক্ষমূলক চিন্তার অতীত। তর্কানুগামী জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না। তিনি নিছক অন্তর্মুখীনতা, যাহার বোধগম্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তিনি অবিভাজ্য, অবিচ্ছেদ্য। তিনি বাহ্য নন, বাহ্য কারণের অধীনও নন। ব্রহ্মেরলক্ষণ নির্ধারণ করিতে গেলে তাঁহাকে বস্তুরূপে গ্রহণ করিতে হয়। তিনি যে 'এক' সে কথাও আমরা বলিতে পারি না। তিনি অদ্বৈত মাত্র।

প্রত্যক্ষগম্য পদার্থরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ করা চলে না। তাই বলিয়া ব্রহ্ম যে কেবল ভাবময় বা শূন্যতাবিশেষ তাহাও নহে।[১১] ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন দিগ্-দেশাদিভেদশূন্য অদ্বয় ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিগণের নিকটেই অসৎ রূপে প্রতিভাত হন।[১২] Spinoza-র দ্রব্য (অর্থাৎ ঈশ্বর) সম্বন্ধে সমালোচনা প্রসঙ্গে Hegel বলিয়াছেন যে, দিগ্-দেশাদিভেদশূন্য পরমতত্ত্ব অসৎ-এরই মত। শংকর এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন না। শংকরের মতে যিনি পরম সত্য, তিনিই পরিপূর্ণ 'সৎ'। সমস্ত জগৎকে উড়াইয়া দিলেও আমরা এক পরম 'সৎ'কে স্বীকার না করিয়া পারি না। এই অস্তিত্ব-নিষ্ঠাকে (notion of being) পূর্ব হইতে মানিয়া না লইলে জীবন অর্থহীন হইয়া পড়ে। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না।[১৩] যে কোনও জিনিসের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, 'সৎ' বলিয়া কিছু আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড সন্মূল, সদাশ্রয় ও সৎ-প্রতিষ্ঠ। এই 'সৎ' হইল শাশ্বত ও স্বয়ং-সৎ। তাহা নিজের জন্যই নিজে বর্তমান। ইহা অদ্বৈত ও অমিশ্র। বিবিধ

উপাধিকে আশ্রয় করার ফলেই তাহা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। "জীবদেহকে আশ্রয় করিয়া যখন তাহা কার্য করে, তখন তাহাকে বলি 'প্রাণ'; যখন কথা বলে, তখন বলি 'জিহ্বা'; যখন দেখে, তখন বলি চক্ষু'; যখন শ্রবণ করে, তখন 'কর্ণ'; যখন মনন করে তখন বলি 'মন'।"[১৪]

এই 'সৎ' হইলেন 'চিৎ'। পরমতত্ত্ব 'সৎ' ও 'চিৎ'—দুই-ই। যে চৈতন্যের আলোক ব্রহ্মাণ্ডকে উদ্‌ভাসিত করে, তাহাই ব্রহ্ম। "অবিমিশ্র চৈতন্যরূপে সেই পরমাত্মা স্বয়ংবিধৃত এবং সব কিছু নিরপেক্ষ। কখনও তাহার অভাব হয় না।"[১৫] আত্মচৈতন্য সম্বন্ধেই কেবল আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা আছে। আমরা কোনও বস্তু সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিতে পারি অথবা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে না পারি; কিন্তু আমরা নিজের সত্তাকে অস্বীকার করিতে পারি না, কারণ এই সংশয় ও অস্বীকৃতিই যে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।[১৬] আত্ম-সত্তা স্বয়ং-সিদ্ধ।[১৭] সেই পরম তত্ত্ব সকল বিষয়ী ও বিষয়ের পার্থক্যের অতীত হইলেও—আমাদের আত্মা। সেই তত্ত্ব বাহিরের কিছু নয়, একেবারে ভিতরের জিনিস। 'ভিতরের' বলিতে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, জীবের তাহা একান্ত নিজস্ব বিশেষ গুণ বা ধর্ম। 'ভিতরের' বলিতে ইহাই বুঝিব যে, উহা জীবের অন্তরতম পরমাত্মা। আত্মা প্রমাতা (subject) নয়, কিন্তু প্রমাতা-প্রমেয়ের সকল পার্থক্যের মূল। যখন আমরা প্রমাতা ও প্রমেয়ের ভেদ করি এবং একটিকে আর একটির প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে খাড়া করি, তখন বুঝিতে হইবে যে আমরা প্রত্যক্ষ জগৎ সম্বন্ধে কথা বলিতেছি। আত্মা নিজের জন্যই বর্তমান থাকে। আর সব কিছু যে বর্তমান রহিয়াছে তাহা ঐ আত্মারই মধ্যে এবং আত্মারই মাধ্যমে। অনাত্ম-বস্তুরও প্রতিষ্ঠা ঐ আত্মাতেই। আত্মা হইল 'ভূত-বস্তু' যাহাকে আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ব্রহ্ম হইলেন সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সেই পরম আনন্দের এক ভগ্নাংশকে আশ্রয় করিয়া জগৎ অবস্থান করিতেছে।[১৮] ব্রহ্ম পরিপূর্ণ সৎ, অসীম চৈতন্য, পরম আনন্দ। ব্রহ্ম দ্রব্য এবং ঐগুলি তাঁহার গুণ—তাহা নহে। ঐগুলি হইল ব্রহ্মের স্বভাব। ব্রহ্ম জ্ঞান-গুণাশ্রয় নন, জ্ঞান-স্বরূপ তিনি। ব্রহ্মের সারভূত হইল জ্ঞান। উহা তাঁহার কোনও উপাধি নহে।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোনও বোধগম্য আলোচনা করিতে গেলে প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে উদ্ভূত ধারণা সমূহ ব্যবহার করিতে হয়।[১৯] ঐ সমস্ত ধারণা যে সম্বন্ধাশ্রয়ী চিন্তা-পরম্পরার সুবিধার জন্যই প্রয়োজন তাহা যাঁহারা প্রাজ্ঞ তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন; কিন্তু যাহারা অজ্ঞ তাহারা ঐগুলিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই গ্রহণ করে।[২০] কূটস্থ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইল ব্যবহারিক আলোচনাপদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হয়।[২১]

ব্রহ্মকে ব্যবহারিক অবস্থাসমূহের অধীন করিয়াই কেবল আমরা তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে পারি। পরব্রহ্মকে যখন আমরা ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও শাসনকর্তা রূপে দেখি, তখনই তাঁহাকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম (দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে, নাম-রূপ-বিকার-ভেদোপাধি-বিশিষ্টং, তদ্বিপরীতং সর্বোপাধিবর্জিতম্)। দুই-ই ব্রহ্মের সিদ্ধরূপ। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইলেন চেতন—যাহা বর্তমান সব কিছুর সমষ্টি। প্রমাতা-প্রমেয় রূপ ভেদবর্জিত নির্গুণ ও নিরুপাধি ব্রহ্মকে প্রমেয়-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাতারূপে কল্পনা করা হয়। পরস্পরের উপর এই দুইয়ের ক্রিয়াই হইল সৃজনপ্রক্রিয়া। দিব্য প্রেরণা ও প্রভাবের বশবর্তী হইয়া তুচ্ছতার পীঠভূমি হইতে ঈশ্বরের রাজ্যে উদ্‌গতির পথে এই সৃজনপ্রক্রিয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক সম্পদ সঞ্চিত করিতে থাকিয়া শেষ পর্যন্ত মহিমময় হইয়া উঠে।

<u>বিশ্বের স্থান</u>ঃ শঙ্কর ব্রহ্ম ও জগতের তাদাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করেন না। তিনি শুধু উভয়ের ভেদ অস্বীকার করিয়াছেন।[২২] "আমরা ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ বা ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করি না।" অদ্বৈত বেদান্তে প্রকৃতির নামান্তর 'মায়া'। প্রকৃতির সৃষ্টিই জগতের বিকাশ। কিন্তু এই প্রকৃতি বা মায়া ব্রহ্মনিরপেক্ষ নয়। ইহা ব্রহ্মনির্ভর। প্রকৃতি বা মায়ার সাহচর্যে ব্রহ্ম হন সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। জীবাত্মা ও পদার্থসমূহের বৈবেধ্য ও বৈচিত্র্যকে তখন তিনি আত্মসাৎ করেন। সকল সৃষ্টির অধিপতি সেই ঈশ্বর সৃষ্টির সর্বত্র অনুস্যূত। ব্রহ্ম জীব ও ঈশ্বর দুই-ই। অথচ জীবরূপে ও ঈশ্বররূপে তিনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যে সব আনুষঙ্গিক গুণাবলীর সহিত যুক্ত সেগুলির মধ্যে প্রভেদ আছে। এই দিক দিয়া জীব ও ঈশ্বরেও প্রভেদ বর্তমান। ঈশ্বর প্রাকৃত মায়ার সহিত যুক্ত, আর জীব অবিদ্যার সহিত জড়িত। পরব্রহ্ম কোনওরূপ অবিদ্যার অধীন নহেন। জন্য পদার্থসমূহের রূপান্তর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আসক্তি বলিলেই পছন্দ বা অপছন্দের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। ঈশ্বর কিন্তু অনাসক্ত, কারণ তিনি সব কিছুতেই আসক্ত। ঈশ্বরকে কখনও কখনও ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বলা হয়। তখন মায়াকেই বলা হয় তাঁহার শক্তি। এই শক্তির সাহায্যেই তিনি সৃষ্টি করেন। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-কারণও বটে, নিমিত্ত-কারণও বটে।[২৩] আত্মা আছে বলিয়াই অনাত্মবস্তুময় এই জগৎ সার্থক হইয়াছে এবং, এই জগৎ সেই আত্মারই বিষয়ীভূত। আত্মা বা চৈতন্যকে বাদ দিলে এই জগৎ অ-সৎ হইয়া পড়ে। আত্মাই শুধু 'স্বার্থ' অর্থাৎ নিজের জন্যই ইহার সত্তা। বহির্জগৎ পরার্থ, অর্থাৎ ইহার সত্তা অন্যের জন্য। জগতের নিজের জন্য সত্তা নহে। এই অর্থে জগৎ ব্রহ্ম অপেক্ষা কম সত্য।

ব্রহ্ম সৎ। জগৎ পূর্ণ সৎ নহে, কিন্তু ইহা অ-সৎও নহে। জগতের একটা ব্যবহারিক সত্তা আছে। এই ব্যবহারিক সত্তা ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অ-সৎ কিছুই থাকিতে পারে না। শশশৃঙ্গ বা বন্ধ্যাপুত্র বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। বিশ্বকে যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন ইহাকে অ-সৎ বলা যায় না।[২৪]

আর একটি সত্যকে স্বীকার না করিলে ব্যবহারিক জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না শংকর এই বলিয়াই শূন্যবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। একটি ভ্রমকে বাতিল করিতে হইলে একটি প্রমাকে স্বীকার করিতে হয়।[২৫]

শংকর মনে করেন যে, শূন্যবাদ সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করিয়াছে অথচ একটি মূলীভূত সত্যকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। দ্বৈত-মিথ্যাত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক জগতের অসত্যতা শংকরও স্বীকার করেন, নাগার্জুনও স্বীকার করেন। তবে বেদান্তানুগামী শংকর ব্যবহারিক জগতের মূল হিসাবে ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে নাগার্জুন একেবারে নীরব।

প্রায়ই বলা হয় যে শংকর জগৎকে মায়া বলিয়া মনে করেন। জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বর্ণনা করিতে যাইয়া শংকর যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা হইতে ঐ মত সমর্থিত হয়। যে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় তাহা সৎ ও নহে, অ-সৎও নহে। ইহার অনুভব হইয়া থাকে কিন্তু ইহা সদ্বস্তু নহে। ভাল করিয়া বস্তুটি দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে উহা সর্প নহে, রজ্জু মাত্র। প্রমাজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ভ্রম থাকে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, জগৎ ব্রহ্মমূল এই প্রমাজ্ঞান না হওয়া পর্যন্তই জগৎকে সত্য বলিয়া মনে হয়। বোধ উদয় হইলে আমরা উপলব্ধি করি যে ইহা ব্রহ্মের প্রকাশমাত্র। ঐ দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শংকর ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে জগৎ সদসদ্বিলক্ষণ কিছু। জাগতিক সমস্ত দ্রব্য পরম তত্ত্ব, ব্রহ্ম ও মিথ্যার মাঝামাঝি স্তরে অবস্থিত। সর্প দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা সত্য নহে আবার একেবারে মিথ্যাও নহে। যতক্ষণ ভ্রম থাকে ততক্ষণ সর্প থাকে। জ্ঞান হয়, সর্প যেন আছে। একেবারে যাহা মিথ্যা তাহার কখনও জ্ঞান হইতে পারে না। জগৎকে হয় সত্য নয় মিথ্যা এভাবে দেখা চলে না। ইহা অনির্বচনীয়। অদ্বৈত বেদান্ত অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ গ্রহণ করিয়াছে। যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাপদ্ধতির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হইতেছে বিরোধাভাব, সত্য ও মিথ্যার মাঝামাঝি শব্দের বর্জন ইত্যাদি। কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাপদ্ধতিই সব নহে। যে জগৎকে একমাত্র 'অনির্বচনীয়' বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়, তাহাকেই আবার কখনও কখনও 'মায়া' বলা হয়। ইহা সৎও নহে, অ-সৎও নহে, আবার দুইয়ের মিশ্রণও

নহে সৎ বা অ-সৎ বলিয়া ইহাকে অভিহিত করা যায় না। ইহা মিথ্যাভূত ও সনাতন।[২৬]

ব্রহ্মের উপর জগৎ নির্ভর করে, জগতের উপর ব্রহ্ম নির্ভর করে না। এই একদেশী নির্ভরতা বুঝাইবার জন্যই শংকর রজ্জু ও সর্পের দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। রজ্জুর অবস্থিতির উপর সর্পভ্রম নির্ভরশীল, কিন্তু রজ্জুর অবস্থিতি সর্পভ্রমের উপর নির্ভর করে না। ব্রহ্মকে বাদ দিলে জগৎ থাকিবে না শুধু এই অর্থেই বলা চলে যে, জগৎ ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। জগৎ না থাকিলে ব্রহ্মের কোনও তারতম্য হয় না। সর্প যেমন রজ্জুর উপর নির্ভর করে, জগৎ সেইরূপ ব্রহ্মের উপর নির্ভর করে।

অবরকালীন অদ্বৈত বেদান্তে 'পরিণাম' শব্দের স্থলে 'বিবর্ত' শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়া এই একদেশী সম্পর্কই সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠান হইয়াও জগদতিগ। জাগতিক বস্তুর পরিবর্তন হয়, কিন্তু ব্রহ্ম সর্ববিধ পরিবর্তনের অতীত হইয়াই থাকেন।

শংকরের মতে কারণবাদের ধারণা বস্তু জগতের মধ্যেই প্রযোজ্য। জগৎ কতকগুলি কার্য-কারণের স্থান এবং ঠিক ঠিক বলিতে হইলে ব্রহ্ম জগতের কারণ একথা আমরা বলিতে পারি না। কার্য-কারণের ব্যাপারটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়। যাহা নিজেই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার অতীত, তাহার সম্বন্ধে কার্য-কারণবাদ প্রযোজ্য হইতে পারে না। শংকর জোর দিয়াই বলিয়াছেন যে জগৎ স্বপ্নাদিবৎ হইতে পারে না।[২৭] নিয়মতান্ত্রিক জগৎ কতকগুলি ঘটনা সমবায়ের সুশৃঙ্খল রূপ। ঐ ঘটনাগুলির পশ্চাতে রহিয়াছে স্থান, কাল ও কারণের সমবেত প্রভাব। স্বপ্নের রাজ্যে এই শৃঙ্খলা ও নিয়ম নাই।

যে কোনও জ্ঞান একটি বস্তু সাপেক্ষ (বস্তুতন্ত্রং হি জ্ঞানম্)। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়, তাহার বস্তু স্বপ্নলব্ধ অভিজ্ঞতার বস্তু হইতে ভিন্ন পর্যায়ের। স্বপ্নোপলব্ধ বস্তু বাধিত হয় কিন্তু টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি জাগৃতোপলব্ধ বস্তুনিচয় কোনও অবস্থাতেই বাধিত হয় না।[২৮] মানসিক অবস্থাসমূহের দ্বারা অপ্রভাবিত ও অবিকৃত কোনও কোনও বস্তুকে তাহার স্বরূপে জানাই হইল আদর্শ জ্ঞান। পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহাতে জ্ঞানের এই আদর্শ বজায় থাকে না। প্রকৃত বিষয়-বিষয়ী নিরপেক্ষ হইয়া নিজেতেই নিজে অবস্থান করে। পরীক্ষালব্ধ তথ্যসমূহ অন্যসাপেক্ষ। স্বপ্নোপলব্ধ বস্তুসমূহের স্বপ্নেই অবস্থিতি, স্বপ্নের বাইরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। স্বপ্নের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ তাহার দ্বারাই তাহারা কবলিত হইয়া নিঃশেষ হইয়া পড়ে। যাহা সদ্‌বস্তু তাহা স্বয়ং

প্রকাশ। যে সব বিষয় লইয়া পরীক্ষা করা চলে তাহারা স্বপ্নের বিষয় হইতে স্বতন্ত্র। তাহাদের জ্ঞান না হইলেও তাহারা অবস্থান করিয়া থাকে।

শংকর বিজ্ঞানবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদ বাহ্য বস্তু সমূহকে বিজ্ঞানময় অবস্থায় লইয়া যায়।[২৯] যাহা মূলতঃ বিজ্ঞানাবস্থা তাহাকে বাহ্য বস্তুর সহিত এক বলিয়া মনে করা হয়। ইহা ঠিক নহে এবং এইখানেই বিজ্ঞানবাদের ত্রুটি। যে বস্তুটি আছে তাহা 'পরিকল্পিত', আর বিজ্ঞান হইল একমাত্র তত্ত্ব। শংকর বলেন যে, জ্ঞাত বস্তু জ্ঞানক্রিয়া-নিরপেক্ষ। ইহা 'বস্তু-তন্ত্র'। যাহা উপস্থিত আছে তাহারই জ্ঞান হয়। বস্তুতান্ত্রিক পরাবিজ্ঞানবাদই শংকরের আদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞানবাদ নহে। যে মতবাদ বস্তুত্বকে তাহার প্রত্যক্ষত্বের সহিত এক বলিয়া মনে করে, শংকর তাহা গ্রহণ করেন নাই। বর্তমান থাকিবার জন্য জগৎকে প্রত্যক্ষকারীর উপর নির্ভর করিতে হয় একথা শংকর বলেন না। আত্মা মূল তত্ত্ব একথা বলা, আর কোনও জিনিসকে আমরা জানিলে তবে তাহা সত্য হইল একথা বলা এক নহে।

স্বপ্নের জগৎ এবং জাগরণের জগৎ দুই-ই অনির্বচনীয়, কারণ তাহারা হয় সত্য নয় মিথ্যা এভাবে তাহাদের দেখা চলে না। আর অ-বাধিতত্ব যদি সত্য বিচারের মাপকাঠি হয়, তবে তাহা কোনওটিতেই নাই। সেই পরম তত্ত্ব ব্রহ্মই কেবল অবাধিত। পরাবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিতে গেলে ঐ দুই জগৎই তত্ত্বের অনেক নীচে পড়িয়া থাকে। তথাপি ঐ দুই-এর পার্থক্য আছে। ভ্রান্তির ফলে যাহা সত্যরূপে প্রতিভাত হয় তাহা প্রত্যক্ষকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা যে তত্ত্বে উপস্থিত হওয়া যায় তাহা হয় সর্ব-লোক-প্রত্যক্ষ। পরীক্ষার দ্বারা আমরা যে তত্ত্বে উপনীত হই তাহাকে স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান ও সেই পর জ্ঞান হইতে পৃথক করিতে হইবে।[৩০]

শংকর-দর্শনে 'মায়া' শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—(১) জগৎ নিজে নিজের কারণ দর্শাইতে পারে না; ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে ইহা একটি দৃশ্য প্রপঞ্চ। 'মায়া' শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়া থাকে। (২) যাহারা ব্রহ্মের শুদ্ধ সত্তা স্বীকার করে এবং বোধের ভুমিতে দাঁড়াইয়া জগতের সহিতে ব্রহ্মের যে সম্পর্ক যুক্তিনিষ্ঠ মনের দ্বারা দেখিয়াই তাহার ব্যাখ্যা দাবী করে। তাহাদের কাছে ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধের প্রশ্নটির একটি অর্থ আছে। ব্রহ্ম ও জগৎ—এই দুইয়ের কোনও দিক দিয়াই মিল নাই এবং ইহাদের স্বরূপালোচনায় সকল চেষ্টা বৃথা হইতে বাধ্য। সেই ব্রহ্ম কী করিয়া এই বহু বিচিত্র জগতের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইতে পারেন তাহা আমরা কিছুতেই ভাবিতে পারি না। 'মায়া' শব্দ ব্রহ্মের এই বোধাতীতত্বই জ্ঞাপন

করে (৩) ব্রহ্মকে আমরা যখন জগতের কারণরূপে দেখি, তখন এই বুঝি যে জগৎ ব্রহ্মে অবস্থান করে, অথচ ব্রহ্মকে জগৎ কোনও দিক দিয়াই স্পর্শ করিতে পারে না। যে জগৎ ব্রহ্মে অবস্থিত তাহাই 'মায়া' (৪) জগৎ রূপে ব্রহ্মের প্রকাশের কারণ দর্শাইতে আমরা যে যুক্তিপদ্ধতি অনুসরণ করি, তাহাকেও বলা হয় 'মায়া'। (৫) সমস্ত অভিনিবেশকে দৃশ্যমান জগতের মধ্যে সীমিত করিয়া আমরা যদি তর্কশাস্ত্রানুমোদিত যুক্তিপদ্ধতির অনুসরণ করিতে পারি তাহা হইলে স্বয়ংপ্রকাশ পূর্ণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মে। সেই ঈশ্বর যে শক্তির বলে নিজেই নিজেকে প্রকট করিয়া থাকেন, সেই শক্তিকে বলা হয় 'মায়া'। (৬) ঈশ্বরের এই শক্তিই উপাধি রূপে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাই 'অব্যক্তা প্রকৃতি'; ইহা হইতেই সব কিছু আসিয়াছে। অব্যক্তা প্রকৃতি হইল বিষয়, ঈশ্বর বিষয়ী। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডকে গড়িয়া তোলেন। "এই সমগ্রবিশ্ব কতকগুলি পরম্পরাবদ্ধ চিন্তা ও কর্মের, উপায় ও লক্ষ্যের, ক্রিয়া ও তৎফলের সমষ্টি। সুবিন্যস্ত কর্ম ও অসংখ্য পদার্থের ধারণার দ্বারা ইহা একত্র বিধৃত থাকিলেও ইহা অস্থায়ী, অবিশুদ্ধ, সারহীন। ইহা প্রবহমানা নদী বা দীপ্যমান দীপশিখার ন্যায়, কদলীর ন্যায় আঁশহীন, বুদ্বুদ, মরীচিকা ও স্বপ্নের ন্যায়। যাহারা ইহার সহিত নিজেদের একীভূত করিয়া দেখে তাহাদের নিকট ইহা অবিনশ্বর, শাশ্বত ও সারবান রূপে প্রতিভাত হয়।"

জীবাত্মা: আত্মা ও অনাত্মার সংমিশ্রণ হইল 'জীব'। এই দুইয়ের স্বরূপ নির্ধারণে আমাদের ভ্রান্তি হয়, তাহার উপরেই আমাদের সকল অভিজ্ঞতা নির্ভর করে। আত্মা ও অনাত্মাকে এক বলিয়া ভাবাই 'অধ্যাস'। এই অধ্যাসই সমস্ত অভিজ্ঞতার মূল। অন্তঃকরণ প্রভৃতি কতকগুলি উপাধির সংস্পর্শে আসিয়া আত্মা ভোক্তারূপে কাজ করে এবং পুনর্জন্ম বা বন্ধনের অধীন হইয়া পড়ে। জীব জন্মিয়াছে বা বৃদ্ধি পাইতেছে একথা যখন আমরা বলি তখন এই বুঝি যে, ইহার উপাধিগুলিই জন্মিয়াছে বা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার অর্থ ইহা নহে যে, আত্মা জন্মায় বা বাড়ে। ব্রহ্মের দর্শন-স্পর্শনযোগ্য রূপ প্রকাশ হইল জীব। ইহার পরিচ্ছিন্নতা বা পৃথকত্ব উপাধিজন্য। চিরাগত সংসারের অসংখ্য পদার্থের মধ্যে মানুষও একটি।

জীবকে উপাধিবর্জিত করিয়া যখন আমরা তাহার স্বরূপের অনুধাবন করি, তখন উপাধিবর্জিত জীবকেই বলা হয় 'সাক্ষী'। ইহা হইল শুদ্ধ বিজ্ঞান। ইহা 'বৃত্তি-জ্ঞান' নহে। বৃত্তি-জ্ঞান হইল আন্তর ইন্দ্রিয়েরই রূপান্তর। শুদ্ধ বিজ্ঞান হইল স্বরূপ-জ্ঞান। যত কিছু রূপান্তর সব এই স্বরূপ-জ্ঞানে হইয়া থাকে, কিন্তু স্বরূপ-জ্ঞানের কোনও রূপান্তর হয় না। 'সাক্ষী' সকল সময়েই থাকে, কিন্তু যে পরিবর্তনগুলি ইহা দেখে

তাহা আসে আবার চলিয়া যায়। পরীক্ষামূলক সকল জ্ঞান ইহার মধ্যে হইয়া থাকে, অথচ ইহা নিজে কোনও জ্ঞানের বিষয় হয় না। কোনও জিনিসই একসঙ্গে বিষয় ও বিষয়ী দুই-ই হইতে পারে না। চক্ষু অন্য জিনিস দেখিতে পায়, নিজেকে দেখিতে পায় না। আমরা যখন বলি যে আমরা নিজেকে জানিয়াছি তখন যে আত্মাকে অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা যায় সেই আত্মার কথাই বলি। পরমাত্মাকে বিষয়রূপে জানা যায় না ; যদিও তাহা বিষয়ীরূপে স্বয়ংপ্রকাশ।

আত্মা জীবের সহিত কিরূপে যুক্ত হয় ? পরিচ্ছিন্ন গুণ বা উপাধিগুলি প্রকৃতি হইতে জাত। তাহাদের সহিত শুদ্ধ আত্মার সম্পর্ক কী ? শংকর বলেন, আত্মা অনাত্মার এত বিরোধী যে, একটিকে আর একটির বিধেয় করা যায় না।[৩১]

ঐ দুইয়ের সম্বন্ধ যুক্তিদ্বারা বুঝানো যায় না। ঐ সম্বন্ধ অনির্বচনীয়। জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধের সাহায্যেও তাহা বুঝানো চলে না। আত্মাকে সত্য বলিয়া ভাবার একটা ঝোঁক আমাদের আছে। যুক্তিদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা না গেলেও তাহা আমাদের চরিত্রগত হইয়া পড়িয়াছে।

জগতের বহুত্ব ও জীবের অন্যনিরপেক্ষত্ব যে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহার কারণ আমাদের মনের নৈসর্গিকী প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির মূল হইল 'অবিদ্যা' বা অজ্ঞান। এই অবিদ্যা অনাদি। ইহা নেতিমূলক বা ইতিমূলক দুই-ই হইতে পারে। পদার্থ সমূহের বহুত্বের পিছনেও যে একত্ব আছে তাহার জ্ঞানের অভাবের ফলে যে অবিদ্যা জন্মলাভ করে তাহা নেতিমূলক। আবার এই অবিদ্যা হইতেই ভ্রমের জন্ম ; সুতরাং ইহা ইতিমূলকও বটে। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত এই বিচিত্র জগৎকে আমরা দেখিয়া থাকি। অবিদ্যা নেতিমূলক হইলে আমাদের খণ্ডজ্ঞান হইয়া থাকে ; ইতিমূলক হইলে ভ্রমের সৃষ্টি হয়। জ্ঞানের দ্বারাই এই অবিদ্যাকে আমাদের দূর করিতে হইবে।

'মায়া' সমস্ত প্রপঞ্চকে আবৃত করিয়া আছে ; আর 'অবিদ্যা ব্যষ্টিগত অজ্ঞান। জীবের যে পরিচ্ছিন্নতা তাহা সেই সেই জীবাত্মার অবিদ্যাপ্রসূত। উপাধি সমূহের গুণগত তারতম্যই জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্যের কারণ। এই সকল উপাধি হইতে মুক্ত হইলে 'জীবাত্মা'গুলির মধ্যে আর কোনও পার্থক্য থাকে না। তত্ত্বমসি—এই বিখ্যাত শ্রুতিবাক্য এই ঐক্যের কথাই বলিয়াছে। জীব ও ঈশ্বরের এই ঐক্য বাস্তব না হইলেও ইহা সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে। আত্মস্বরূপের বোধ হইলে কর্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তৃত্বাভিমান হইতে আমরা মুক্ত হই। উপাধিসমূহ হইতে মুক্ত হইলে জীব 'মুক্ত' হয়। বাস্তব জীবনে আমরা জীবের উপর এমন

কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের আরোপ করি যাহা জীবের স্বরূপগত নহে অথচ আরোপের সময়ে সেগুলি বর্তমান থাকে। এই সব উপাধি হইতে আমরা যদি নিজেদের মুক্ত করিতে পারি তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব উপলব্ধি করিতে পারি।

মোক্ষ : আত্মলাভ ও আত্মজ্ঞান এক কথা।[৩২] জ্ঞানের যাহা লক্ষ্য তাহা মানুষের সকল চেষ্টারও লক্ষ্য। ব্রহ্মকে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য বলার মর্ম এই যে আমরা সীমাকে অতিক্রম করিয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে পারি। আমাদের যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহাতে পৌঁছানোই আমাদের চরম লক্ষ্য। আত্মা ও উপাধিকে যে ভুল করিয়া আমরা এক বলিয়া ভাবি, ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই সেই ভুল আমাদের ভাঙ্গিতে হইবে। এই পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে চিন্তার জগতে, বস্তুজগতে নহে। বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাকে দূর করিতে হইবে। মাধ্যমিকদের মত অনুসারে সংসার ও নির্বাণ একই। এই দুইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী শুধু পৃথক।[৩৩] "জগৎকে যখন আমরা কতকগুলি কারণ বা খণ্ডকারণরূপে বিবেচনা করি, তখনই তাহাকে বলি বস্তুজগৎ; আর সেই কারণ বা খণ্ডকারণগুলিকে অগ্রাহ্য করিলে সেই জগৎকেই বলি নির্বাণ।"[৩৪] জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাই হইল তত্ত্ব। যখন অজ্ঞানের আবরণ দূর হয়, তখন এই তত্ত্বোপলব্ধি হইয়া থাকে। মোক্ষে বহুত্বের নাশ হয় এবং কেবলমাত্র এক আত্মা অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ আমাদের অন্তরস্থ জ্ঞাতা এ ধারণা ভুল।[৩৫] অহং-বোধ হইতে মুক্ত হইলে জীবন ও অস্তিত্ব হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। গ্রন্থ পড়িয়া জীব ও ব্রহ্ম এক এই জ্ঞান হইলেই চলিবে না, নিজের মধ্যে উহার প্রত্যক্ষোপলব্ধি হওয়া চাই। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার। সেই চৈতন্যময় ব্রহ্মকে আমরা "হয় সর্বোপাধিবর্জিতরূপে নয় সর্বোপাধিময়রূপে" দেখিয়া থাকি। তিনি সকল মোক্ষের আত্মা, সর্বাত্ম-ভাব। "এই ব্রহ্মাণ্ড আমি, আমিই এই সব কিছু। সব কিছুর সহিত তাদাত্ম্য আত্মার পরাবস্থা, তাঁহার সহজ ও শ্রেষ্ঠ অবস্থা।"[৩৬] জীবিত অবস্থায়, অর্থাৎ বিবিধ উপাধির সহিত যুক্ত থাকা কালেই যে মানুষ মুক্ত হন, তিনিই জীবন্মুক্ত। মনুষ্যজাতির সেবায় তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। সকল মানুষই এক—তাঁহার এই উপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ মানুষের সেবায়। মৃত্যুতে জড় দেহ তিনি পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা বিদেহমুক্তি লাভ করে।

বিবুদ্ধ আত্মা বোধিলাভের পরও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে কিনা, এ প্রশ্ন উঠিয়াছে। শংকর বলেন যে, কতকগুলি আত্মা ঈশ্বর কর্তৃক তাহাদের উপর অর্পিত কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। ব্যাস-বশিষ্ঠ-ভৃগু-নারদ—প্রভৃতয়ঃ

পরমেশ্বরেণ তেষু তেষ্বধিকারেষু নিযুক্তাঃ সন্তঃ কর্ম-সমাপ্তি পর্যন্তং সংসারে অবতিষ্ঠন্তে।[৩৭] প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে যে বোধিলাভের সহিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার কোনও বিরোধ নাই। তাঁহাদের আত্মা ঐহিক জীবনে অনাসক্ত হইলেও তাঁহাদের জীবন বর্ণহীন বা নিষ্ক্রিয় নহে। তাঁহারা নিজের শক্তিকে একটি প্রাণবান সত্তায় রূপান্তরিত করিয়া থাকেন। প্রেম ও শক্তির মধ্য দিয়া সেই সত্তা নিজেকে প্রকাশ করে। সৃজনক্রিয়ার মতই তাঁহাদের জীবন উদ্দেশ্যময় আবার উদ্দেশ্যবিহীন।

বস্তুস্বরূপের জ্ঞান হইলে আর কর্মের অবসর থাকে না (ন কর্মাবসরোঽস্তি)।[৩৮] তাহার আর কর্মের প্রয়োজন থাকে না।

কর্ম : শংকর কর্মবাদকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অবিদ্যা হইতে কর্ম, কর্ম হইতে ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি। আমরা যে জগতে জন্মিয়াছি তাহা ঠিক আমাদের কৃত-কর্মের ফলের অনুরূপ (ক্রিয়া-কারক-ফলম্)। জীবদেহ একটা যন্ত্রবিশেষ (কার্য-কারণ-সংঘাত)। কর্মানুষ্ঠান করিয়া এবং তাহার ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া ঋণমুক্ত হইবার জন্যই তাহার সৃষ্টি। কখনও কখনও পর পর কয়েক জন্ম ধরিয়া এক জন্মের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অতীত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইলে আবার নূতন কর্ম সঞ্চিত হইতে থাকে। এমনি করিয়া চক্রাকারে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান চলিতে থাকে। নৈতিক জীবন চিরপ্রবহমান, চিরকর্মময়। তাহার বিরাম নাই। মনুষ্যজীবনের বিভিন্ন অবস্থার চাপে পড়িয়া তাহার রূপও হয় অনন্ত। যতদিন না পূর্ণজ্ঞান হয়, ততদিন ধরিয়া এই প্রক্রিয়াই চলিতে থাকে। পূর্ণজ্ঞান লাভ হইলে কর্মের বীজ ধ্বংস হয় এবং পুনর্জন্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে। মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য হইল কর্মের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করা। অবিদ্যা হইতে মুক্তি পাইলেই কর্ম হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। জীব যতদিন দেহবদ্ধ হইয়া গণ্ডীর মধ্যে থাকে, ততদিন তাহাকে কর্মাধীন থাকিতে হয় ; অর্থাৎ একটা আদর্শে পৌঁছিবার জন্য সে সতত চেষ্টা করে, অথচ সেই আদর্শে পৌঁছিতে পারে না। সদসদ্বিবেকবোধ গন্তব্যে পৌঁছিবার একটি ধাপ মাত্র ; উহাই গন্তব্য নহে। ফল কামনায় যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহারা কর্মফলবাদের নীতি অনুসারেই ফল দান করে ; কিন্তু অনাসক্তির সহিত, ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত হইল মনে করিয়া যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা মনকে পবিত্র করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে ইহা বুঝায় না যে, আমরা গত কর্মের সূত্রে বাঁধা থাকিয়া পুত্তলিকার মত নড়াচড়া করি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জীব তাহার কর্মের জন্য দায়ী। ঈশ্বর শুধু সহায়ক মাধ্যম—জীবের কৃতকর্মসমূহের ফলসংরক্ষণ-

কর্তা। ঈশ্বর কাহাকেও কোন কিছু করিতে বাধ্য করেন না। যে সকল প্রবণতা আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমরা অতিক্রম করিতে পারি। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে অবাধিত চেষ্টার দ্বারা বন্ধনমুক্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। ঐ প্রবৃত্তির ফলে তাহার তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। মানুষ যদি সহজাত প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ঐ প্রবৃত্তির দাস হইয়া থাকিতে হইবে। তাহার কর্মসমূহ যতদিন ঐ প্রবৃত্তিসমূহ দ্বারা নিয়মিত হইবে, ততদিন পর্যন্ত তাহারা স্বাধীন হইতে পারিবে না। কিন্তু মানুষ তো শুধু কতকগুলি প্রবৃত্তির সমষ্টিমাত্র নয়। তাহার মধ্যে এক অসীম সত্তাও আছে। কারণশক্তিরূপে আত্মা দৃশ্য বস্তুনিচয়ের বাহিরে থাকিয়া তাহাদিগকে রূপ দান করে। মানুষের ইতিহাস পুতুল খেলার রঙ্গমঞ্চ নয়। ইহা একটি সৃজনধর্মী বিবর্তন।

<u>নীতি ও ধর্ম</u>ঃ বৈরাগ্য ও অনাসক্তির সাধনা না করিলে বোধিলাভ হয় না। অহমিকাকে দমন করিয়া অনাসক্তি ও শৃঙ্খলার সহিত আমাদের কর্তব্য করা উচিত। বেদান্তপাঠের জন্য প্রয়োজন সাধন চতুষ্টয়ের কথা শংকর বলিয়াছেন। তাহারা হইল (১) নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে পার্থক্যাবধারণের শক্তি; (২) ইহলোক বা পরলোকে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের ইচ্ছা হইতে নির্মুক্তি; (৩) শম, দম, তিতিক্ষা, ধৈর্য, মনঃসংযোগ ও বিশ্বাস; (৪) মোক্ষলাভের ইচ্ছা।[৩৯] নৈতিক জীবন আমাদের আসক্তিকে বিশোধিত করিয়া এবং অহমিকা দূর করিয়া আমাদিগকে সত্যোপলব্ধির যোগ্য করিয়া তোলে।

শংকর বলেন যে, কর্ম অথবা নীতিনিষ্ঠ ক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে আমাদিগকে আত্মিক মুক্তির পথে লইয়া যায় না। ইহা শুধু আমাদের মধ্যে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে। ইহাই মোক্ষের জন্য পরোক্ষ প্রস্তুতি। মোক্ষ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল নয়।[৪০] কর্মফল অনিত্য, মোক্ষ নিত্য। আমাদের কর্ম আমাদিগকে জ্ঞানলাভের জন্য প্রস্তুত করে। জ্ঞান-লাভ লইলে তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। যাহা তত্ত্ব তাহা প্রাপ্তির বস্তু নহে। তাহা 'অসাধ্য', কারণ তাহা অনাদি তত্ত্ব। ইহা নিত্যসিদ্ধ। পূর্ণতা সব সময়েই আছে। ইহা অর্জনের জিনিস নয়। আত্মা মালিন্যমুক্ত হইলেই তাহা প্রতিফলিত হয়। উপলব্ধির পথে যে বাধাগুলি আছে তাহা আমাদের লঙ্ঘন করিতে হইবে। জ্ঞানলাভের পথে যে বাধা তাহা উত্তীর্ণ হইতে কর্ম আমাদিগকে সাহায্য করে।

শংকর কর্মযোগ স্বীকার করেন না, কর্মদ্বারা মোক্ষ হয় এ মতও স্বীকার করেন না। আত্মায় ব্রহ্মোপলব্ধি মানুষের সকল চেষ্টার লক্ষ্য। ব্রহ্মকে আত্মা হইতে ভিন্ন

বলিয়া চিন্তা করাই মনুষ্য মনের স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা। ব্রহ্মকে দিব্য সত্তা বলিয়া কল্পনা করা হয়—মনে করা হয় তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা, শাসক ও ধারক। তিনিই নিয়মকর্তা ও নিয়ামক—এই মনে করিয়া তাঁহার উপাসনা করা হয়। জ্ঞান ও উপাসনা এক জিনিস নয়। উপাসনার ক্ষেত্রে উপাস্য ও উপাসকের ভেদজ্ঞান থাকে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা স্বরূপাবস্থিত তত্ত্বকে উপলব্ধি করি ; আর উপাসনায় সেই তত্ত্বকে আমরা নাম ও রূপের গণ্ডীর মধ্যে জানি।[৪১]

এই দুই উপায়েই সেই এক ব্রহ্মকে জানা যায়। উপাসনার দ্বারা আমরা উপাস্য-উপাসকের ভেদজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া তত্ত্বকে স্বরূপে জানিতে পারি। উপাসক যখন উপলব্ধি করেন যে তিনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, সেই ঈশ্বর তাঁহারই অন্তরাত্মা, তিনি বাহিরের বস্তু এই জ্ঞান যখন লুপ্ত হইয়া যায়, তখনই উপাসক উপাস্যকে প্রাপ্ত হন।

উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। এক এক পদ্ধতিতে উপাসনা করিলে এক এক প্রকার ফল হয়। পরিচ্ছেদক ধর্মসমূহের বিভিন্নতা অনুসারেই পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন পদ্ধতিগুলিই আমাদের পক্ষে সেই পরম তত্ত্ব জানিবার মাধ্যম।

শংকর ও বৌদ্ধধর্ম

হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকল্পে শংকর তার্কিকের মন লইয়া বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন—ইহা ভারতীয় মত। বৌদ্ধ মতবাদও ইহার সমর্থন করে। বৌদ্ধ মতবাদ বলে যে, শংকর ও পূর্ব-মীমাংসায় প্রসিদ্ধ টীকাকার কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ মতবাদের প্রধান সমালোচক ছিলেন। শংকরের রচনাবলী দ্বারা কিন্তু এই মত সমর্থিত হয় না। অদ্বৈতমতের সমর্থনের জন্যই তিনি লেখনী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠাপিত করার জন্যই অন্যান্য মতবাদকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের মত গ্রন্থে যে যে অংশে তিনি বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা অতি সামান্য। তাঁহার সাংখ্য দর্শনের সমালোচনা বরং আরও তীব্র ও বিস্তৃত। অন্যান্য মতবাদের বিরুদ্ধে বলা অপেক্ষা অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাপনই তাঁহার রচনাবলীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রাচীন ও অবরকালীন অনেক সমালোচক মনে করেন যে, শংকর নিজেই বৌদ্ধ চিন্তাধারা দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে "মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র" এবং "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত।"[৪২] পদ্মপুরাণের এই অংশটির উল্লেখ করা হয়। যমুনাচার্যও

অনুরূপ অভিযোগ আনিয়াছেন। শংকরের অদ্বৈত-বেদান্ত ও মহাযানধর্মাবলম্বী বৌদ্ধগণের বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে, এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধগণও তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ মতবাদ ও শাংকর মতবাদের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে।[৪৩] বৌদ্ধগণের যে সকল যুক্তি লোকপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের কতকগুলি শংকর তাঁহার অদ্বৈতবাদের স্বপক্ষে প্রয়োগ করিয়াছেন। শংকর নিজে এক সর্বাতিশয়ী অদ্বয় ব্রহ্মে বিশ্বাস করিতেন এবং সেই বিশ্বাসের পক্ষে কোনও যুক্তি প্রদর্শন করিতে বাকী রাখেন নাই। গৌড়পাদ ছিলেন শংকরের আচার্যেরও আচার্য। বৌদ্ধ-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ বাচনভঙ্গী ও উপমাগুলিকে তিনি তাঁহার মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সতর্কতার সহিত এইগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া পরলোকগত De La Vallee Poussin মন্তব্য করিয়াছিলেন —"গৌড়পাদ-কারিকার ভাষা ও অত্রত্য প্রধান প্রধান ধারণাগুলি এমনভাবে বৌদ্ধ-চিন্তাধারার ছাপ বহন করিতেছে যে, পাঠক তাহাতে বিস্মিত না হইয়া পারেন না। মনে হয়, ইহার লেখক বৌদ্ধ-সাহিত্য ও বৌদ্ধ-উক্তিগুলির ব্যবহার করিয়াছেন এবং সেগুলিকে বেদান্তের কাঠামোয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, শ্লেষ-প্রয়োগ তাঁহার বিলাস। গৌড়পাদ যখন শংকরের আচার্যের আচার্য তখন এই তথ্য তুচ্ছ নয়।"

শংকরের মতগুলি যে উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের একটি সরল ও বলিষ্ঠ পরিণতি, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই মতগুলির মধ্যে শংকর এমন নূতন কিছুই আনেন নাই যাহার উৎস অনুসন্ধানের জন্য বৌদ্ধপ্রভাব স্বীকার করিতে হইবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা আজ ভুলিয়া গিয়াছি যে, উপনিষদে যে ভিত্তির প্রতিষ্ঠা, বৌদ্ধধর্ম তাহার উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। একই পীঠভূমি হইতে সমান্তরালভাবে বৌদ্ধ ও বেদান্তমত উৎসারিত হইয়াছিল। পার্থক্য এই যে, ঐ দুইটি মত যে সব বিষয়ের উপর জোর দিয়াছে, সেগুলি ভিন্ন। শংকরের অদ্বৈতবাদের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের কয়েকটি শাখার মতবাদের সাদৃশ্য অস্বাভাবিক কিছু নহে।

দার্শনিকতার যে স্তরে শংকর পৌঁছিয়াছিলেন, তাহা অতি উচ্চ। প্রগাঢ় ও চিত্তাকর্ষক চিন্তা প্রয়োগ করিয়া তিনি তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এক উচ্চ আত্মিক আদর্শবাদের দ্বারা বিচার করিয়াছিলেন এবং মনুষ্যজীবনকে যাহা দিব্য মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তোলে, সেই ভূমার প্রতি নিবদ্ধলক্ষ্য হইয়া দর্শনের আলোচনা করিয়াছিলেন। এইখানে শাংকর-দর্শনের মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব।

দ্রষ্টব্য

১। সাধারণতঃ খৃঃ ৭৮৮-৮২০ শংকরের জন্ম ও মৃত্যুর বৎসর ধরা হইয়া থাকে।

২। অর্থ-জ্ঞান-প্রধানত্বাদ্ উপনিষদাঃ—শং-তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ভাষ্য ১।২।১

৩। শং ভা—১।৩।২৮ ; ৩।২।২৪

৪। বেদস্য হি নিরপেক্ষ—স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপ-বিষয়ে—শং ভা ২।১।১

৫। শং ভা বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২।৪।১০ ; ১।৪।২০ ও দ্রষ্টব্য।

৬। অনুভবাবসানত্বাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানস্য—শং ভা ১।১।২

৭। শং ভা ১।১।৪

৮। শং ভা ৪।১।১৫

৯। শং ভা বৃহ-উপনিষদ ৪।৪।৮

১০। সর্বদুঃখ—বিনির্মুক্তৈক—চৈতন্যাত্মকোঽহম্ ইত্যেষ আত্মানুভবঃ—শং ভা ৩।১।১

১১। ৮।১।১

১২। দিগ্-দেশ-গুণ-গতি-ফল-ভেদ শূণ্যং হি পরমার্থ সদ্ অদ্বয়ং ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধীনামসদিব প্রতিভাতি।

১৩। নাভাবাদ্ ভাব উৎপদ্যতে—শংকর, বৃ-উ, ২।২।২৬ ; দ্রঃ শবরভাষ্য, ২।৩।৯

১৪। শংকর, বৃ-উ, ১।৪।৭

১৫। উপদেশ-সাহস্রী, ১।২।৯১

১৬। য এব হি নিরাকর্তা ত দেব তস্য স্বরূপম্—শবর ভাষ্য, ২।৩।৭

১৭। স্বয়ংসিদ্ধত্বাৎ—ঐ।

১৮। শংকর, বৃ-উ, ৪।৩।৩৩

১৯। অধ্যারোপিত—নাম-রূপ-কর্ম-দ্বারেণ ব্রহ্ম নির্দিশ্যতে—শংকর, বৃ-উ, ২।৩।৬

২০। শংকর, বৃ-৬, ২।১।২০

২১। অব্যবহার্যমপি ব্যবহারগোচরমাপদ্য—শংকর, মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৪।১০০

২২। তুলঃ বাচস্পতিঃ ন খলু অনন্যত্বমিতি অভেদং ব্রূমঃ কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ, ভামতী, ২।১।১৪

২৩। শ্বেতাশ্বতর উপ, ৪।১০

২৪। নাভাব-উপলব্ধেঃ, ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২৮

২৫। শংকর-ভাষ্য, ২।২।৩১

২৬। তুলঃ বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার যোগ-বার্তিক-ভাষ্যে আদিত্য পুরাণ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন—
নাঽসদ্রূপা ন সদ্রূপা মায়া নৈবোভয়াত্মিকা।
সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী।

২৭। বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ, ব্রহ্মসূত্র ২।২।২৯

২৮। নৈবং জাগরিতোপলব্ধং বস্তু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং বাধ্যতে—শবরভাষ্য ২।২।২৮

২৯। শংকর-ভাষ্য, ২।২।২৮-২৯

৩০। শংকর, বৃ-উ, ১।৫।২

নাগার্জুনের মতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় মায়া, স্বপ্ন ও গন্ধর্বনগরের মত—

যথা মায়া যথা স্বপ্নো গন্ধর্বনগরং যথা।

তথোপাদস্তথা স্থানং তথা ভঙ্গা উদাহৃতাঃ।

—মাধ্যমক—কারিকা, ৭।৩৭

মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পধৃতশেখরঃ।

এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ।

(মৃগতৃষ্ণাবারিতে অবগাহন করিয়া, মস্তকে আকাশকুসুমাভরণ ধারণ করিয়া এবং হস্তে শশশৃঙ্গ-নির্মিত ধনু গ্রহণ করিয়া এই বন্ধ্যাসুত চলিয়াছে।

৩১। ভূমিকা, শংকর-ভাষ্য।

৩২। জ্ঞানলাভয়োরেকার্থত্বম্—শংকর, বৃ-উ, ১।১।৪

৩৩। ন সংসারস্য নির্বাণাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্।

ন নির্বাণস্য সংসারাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্।

—মাধ্যমক—কারিকা, ২৫।২৯

৩৪। য আজবং জাবীভাব উপাদায় প্রতীত্য বা।

সোঽপ্রতীত্যানুপাদায় নির্বাণমুপদিশ্যতে।

—মাধ্যমক—কারিকা, ২৫।৯

৩৫। ডয়সন, সিস্টেম্ অফ্ দি বেদান্ত ইং অনুবাদ, পৃ-২১৪

৩৬। শংকর-ভাষ্য, ৩।৩।৩২

৩৭। শংকর, বৃ-উ, ১।৩

৩৮। শংকর-ভাষ্য, ১।১।১

৩৯। অনুষ্ঠেয়-কর্ম-ফল-বিলক্ষণম্—শংকর ভাষ্য, ১।১।৪

৪০। শংকর-ভাষ্য, ১।১।১২

৪১। শংকর-ভাষ্য, ১।১।২

৪২। মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।

৪৩। De La Vallee Poussin বলেন—"অন্ততঃ তত্ত্ববিষয়ক কয়েকটি মতের দিক হইতে বিজ্ঞানবাদ প্রচ্ছন্ন বেদান্তমত ছাড়া কিছু নয়। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, বেদান্তের অর্থেই সেগুলিকে বুঝিতে হয়"—জার্ণাল অফ দি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯০০), পৃঃ ১৩২। কীথ বলেন—"বেদান্ত ও বিজ্ঞানবাদের সাদৃশ্যগুলি অতি স্পষ্ট এবং সেগুলিকে অস্বীকার করা যায় না"—ঐ (১৯১৬), পৃঃ ৩৭৯

গ্রন্থবিবরণী

মাধবানন্দ স্বামী—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (শংকর ভাষ্য সহ)।

শাস্ত্রী, মহাদেব—ভাগবদ্গীতা (শংকর ভাষ্য সহ)।

থিবো—বেদান্তসূত্র (শংকর ভাষ্য সহ)।

ডয়সেন—দি সিস্টেম্ অফ্ বেদান্ত।

সিং, আর, পি—দি বেদান্ত অফ্ শংকর।

বেদান্ত—অদ্বৈত সম্প্রদায়

খ। শংকরোত্তর যুগ

উপক্রমণিকা

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মতবাদগুলিকে উপনিষদ হইতে প্রবাহিত আধ্যাত্মিক পরম্পরার অঙ্গরূপে গণ্য না করিলে তাহাদের মর্ম ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা অসম্ভব। এমন কি বৌদ্ধ ও জৈনসম্প্রদায়ের নাস্তিক দর্শনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। কারণ বেদের প্রতি কোনরূপ আনুগত্য প্রদর্শন না করিলেও তাহাদের মধ্যে উপনিষদ ও আস্তিক সম্প্রদায়ের আত্মিক অন্তর্মুখীনতার ঐতিহ্যটি অক্ষুণ্ণ আছে। তাহারা একই আধ্যাত্মিক সত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া তাহার সহিত জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক সত্তা আত্মা, শূন্য অথবা ব্রহ্ম—যাহাই হউক না কেন, আমাদিগেরই অন্তরে ইহার প্রকাশ বিদ্যমান এবং মনের মণিকোঠায় উহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্তর ও বাহির, অন্তরতম সত্তা এবং বহিস্থ জড় জগৎ,—ইহাদের সম্বন্ধটির প্রকটনই যে দর্শনের কর্তব্য, ইহা সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। একমাত্র চার্বাক সম্প্রদায়ই ইহার ব্যতিক্রম, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কেহই এই সম্প্রদায়ের অনুগামী নহে। অন্যান্য সম্প্রদায়, তাহা বস্তুগামী বা বিজ্ঞানবাদী, অদ্বৈতবাদী বা বহুতত্ত্ববাদী, বিষয়ীকেন্দ্রিক অথবা বিষয়কেন্দ্রিক—যেরূপই হউক না কেন, তাহাদের সম্পর্কে উপর্যুক্ত মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য। একমাত্র আবহমানকাল হইতে বহুতত্ত্ববাদী এবং বস্তুবাদী জৈন সম্প্রদায় ব্যতিরেকে আস্তিক এবং নাস্তিক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বস্তুবাদ বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি ভেদ দৃষ্ট হয়। তথাপি প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত।

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, সকলই ব্রহ্ম (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম), তিনি সত্যের অন্তর্নিহিত সত্য (সত্যস্য সত্যম), এবং আত্মা ও ব্রহ্ম একই। (অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম)। এই উক্তিগুলির আক্ষরিক অথবা লক্ষণার্থ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে তাহাদের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যে সকল চিন্তানায়ক তাহাদের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেন, শংকরাচার্য তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত। শংকর জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা (অদ্বৈত) সমর্থন

করিতেন এবং উপনিষদে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হওয়ায়, জড় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। জগৎ স্বরূপতঃ মিথ্যা এবং ভ্রান্তিবশতঃ ব্রহ্মে তাহার ভান হয় (অধ্যস্ত)। বস্তুতঃ জগৎসত্তা ব্রহ্মেরই সত্তা। কিন্তু ব্রহ্মই যদি একমাত্র সৎপদার্থ, তাহা হইলে কেন এবং কিরূপে ব্রহ্ম হইতে এই বৈচিত্র্যময় জগতের উদ্ভব হয়? ইহার উত্তরে শংকর বলেন যে, মায়াপ্রসূত মিথ্যা উপাধিগুলি হইতেই জগতের উদ্ভব হয়। ব্রহ্ম যে সান্ত জীবরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন তাহাও মায়াপ্রসূত উপাধির ফল। "উপনিষদ্," "ব্রহ্ম-সূত্র" ও "ভগবদ্‌গীতা"র উপরে শংকর যে সকল ভাষ্য রচনা করেন, তাহাতে তিনি সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, পঞ্চরাত্র, পাশুপত, বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুভাবধারার অনুবর্তী আরও কতকগুলি অপ্রধান সম্প্রদায়ের মতবাদগুলি খণ্ডন করিয়া উহাদিগকে বর্জন করেন। বিরোধীপক্ষ খণ্ডনে এবং স্বপক্ষসমর্থনে তিনি যুক্তি ও শ্রুতি (উপনিষদ্) উভয়েরই ব্যবহার করেন। শংকরের মতবাদ তাঁহার অনুবর্তী ও বিরোধিগণের নিকট অভিনব বোধ হইলেও বর্তমানকালের দূরত্ব হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার গুরু "মাণ্ডুক্য-কারিকা"-কার গৌড়পাদের মতবাদগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৌড়পাদ উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদ ও শৈব-স্পন্দবাদের সংমিশ্রণ ও সামঞ্জস্য সাধন করেন। শংকরের বিরোধিগণ তাঁহার বৈদগ্ধ্য, প্রতিভা এবং সর্বোপরি বৌদ্ধ ও শৈববাদের মৌলিক সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও তিনি তাহাদের যে রীতিতে সমালোচনা করেন, তাহার দ্বারা চমৎকৃত ও বিহ্বল হইয়া পড়েন। ফলে, শংকরের জীবদ্দশাতে তাঁহার মতবাদের অন্তর্নিহিত গুরুতর সমস্যাগুলি ও তাঁহার যুক্তিগুলির ত্রুটির প্রতি তাঁহাদের সবিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু শংকরের অনুবর্তিগণ যখন তাঁহার মতবাদের সুসম্বদ্ধ রূপ প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তাঁহারা শংকরের যুক্তিগুলিকে নূতন সংযোগসূত্র দ্বারা গ্রথিত করিতে এবং যুক্তির ত্রুটিগুলি সংশোধন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা করিতে গিয়া তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হইল এবং বহু উপ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল।

শংকরের মৃত্যুর পরে বিরোধী দার্শনিকগণ তাঁহার আক্রমণের আঘাত ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণ আরম্ভ করেন। "উপনিষদ্", "ব্রহ্মসূত্র" এবং "ভগবদ্‌গীতা", এই তিনটি প্রস্থানেরই উপর যাঁহাদের গ্রন্থাদি পাওয়া যায়, সেই সকল ভাষ্যকারদের মধ্যে শংকরই প্রাচীনতম। অন্যান্য যে সকল সম্প্রদায় উপনিষদের ভাবধারার অনুবর্তী বলিয়া আপনাদিগকে দাবী করিত এবং সেইজন্য অনুরূপ ভাষ্যরচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহারা শংকরের সিদ্ধান্তকে

খণ্ডন করিয়া স্বমত সমর্থন করিত। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা অদ্বৈতবাদের অগ্রগতির সহায়ক হইয়াছিল, সেগুলি রামানুজ ও মধ্ব এই দুই বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত। রামানুজ ও মধ্বের সময়কাল যথাক্রমে একাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী। রামানুজের মতবাদটি "বিশিষ্টাদ্বৈত" অথবা বিশিষ্ট ব্রহ্মের অদ্বৈততাবাদ রূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য হইল এই যে, ঈশ্বর, জগৎ ও আত্মা প্রত্যেকে ভিন্ন, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নহে এবং 'সবই ব্রহ্ম' উপনিষদের এই উক্তিকে আত্মা ও জগৎ ঈশ্বরেরই বিশেষণ, এইরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আত্মা ও জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। ফলে, ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকৃত হইল অথচ জীবও সৎ বলিয়া বিবেচিত হইল। ব্রহ্ম ও অপর দুইটির মধ্যের সম্বন্ধটি আত্মা ও দেহের সম্বন্ধের অনুরূপ।

মধ্বের দার্শনিক মতবাদ দ্বৈতবাদ নামে খ্যাত। ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের দ্বৈততা স্বীকার করা হইয়াছে। জড় জগৎও সৎ এবং বস্তুতঃ তাহা তৃতীয় পদার্থ বিশেষ। অতএব, এই মতবাদ বহুত্ববাদ এবং কেবল দ্বৈতবাদ নহে। তথাপি যেহেতু ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধটির যথার্থ স্বরূপ নিরূপণই ইহার মূল লক্ষ্য, সেইহেতু মধ্বের মতবাদ পরম্পরায় দ্বৈতবাদ বলিয়া খ্যাত। যদিও জীব এবং জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, তথাপি তাহারা ব্রহ্মেরই শক্তির রূপান্তর বলিয়া তিনি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম। জীব ও জগৎ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের (বিশেষ) জন্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অদ্বৈতবাদিগণ মায়াকে সৎ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না, ব্রহ্মাতিরিক্ত তাহার কোন নিজস্ব সত্তা নাই। কিন্তু মধ্বের ন্যায় দ্বৈতবাদীগণ তাহার নিজস্ব সত্তা স্বীকার করেন। বস্তুতঃ-পক্ষে মায়াও একটি "শক্তি"।

রামানুজ ও মধ্ব উভয়েই "শক্তি"কে সৎরূপে স্বীকার করার ফলে তাঁহারা অদ্বৈতবাদ-সম্মত মায়াবাদের বিরুদ্ধেই প্রধানতঃ তাঁহাদের আক্রমণ পরিচালিত করেন। তাঁহারা যে "মায়া" পদটির ব্যবহারে আপত্তি করেন তাহা নহে, কিন্তু মায়াবাদী "মায়া" শব্দের যে লক্ষণ দিয়াছেন তাহার সমালোচনা করেন। রামানুজ ও মধ্বের অনুবর্তীগণ "মায়ার" সমালোচনায় অসাধারণ তার্কিক নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন ; অপরপক্ষে শংকরের অনুবর্তীগণ স্বপক্ষ সমর্থন ও প্রত্যাক্রমণে তাঁহাদের তার্কিক নিপুণতায় সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা "ভেদ" ও "অভাব" এই দুইটি প্রত্যয়ের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। এই সকল বাদানুবাদের ফলে অদ্বৈতবাদসম্মত ধারণাগুলি ক্রমশঃ আরও অধিক যথাযথ রূপ ধারণ করে এবং অদ্বৈত দর্শন অধিক হইতে অধিকতর সুবিন্যস্ত আকার ধারণ করে।

ইতিমধ্যে নৈয়ায়িকগণ তাঁহাদের বিচারশৈলীর উন্নতিসাধন করিয়া অদ্বৈত-সিদ্ধান্তকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। ন্যায়দর্শনের সূচনায় আন্তর সত্যের উপলব্ধির উদ্দেশ্যে উপযোগী পদার্থতত্ত্ব নির্ণয় ও তদনুযায়ী জীবনগঠনই ছিল মূল লক্ষ্য। কিন্তু বিভিন্ন বিরোধী সম্প্রদায়ের বাদানুবাদের ফলে আলোচনায় ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলির বিশদ ব্যাখ্যা ও লক্ষণ নির্ণয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং কালক্রমে জীবন ও বাস্তবতা হইতে বিচ্ছিন্ন ন্যায়শাস্ত্রের শুষ্ক আকারসর্বস্ব বিচারের উদ্ভব হইয়াছিল। দুরূহবাক্‌জাল সমাচ্ছন্ন জটিল লক্ষণবাক্য প্রণয়ন এবং যে কোন বিষয় প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার জন্য অনুমানগঠন বা উদ্ভাবন ইহাই তৎকালে প্রচলিত প্রথা হইয়া দাঁড়াইল। কোন কোন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও তার্কিকদের মনোযোগ মুখ্যত এই দুইটি ক্রিয়াতে ব্যাপৃত রহিল। উদয়নাচার্যের "লক্ষণাবলী" (১০ম শতক) ও কুলার্ক পণ্ডিতের "দশশ্লোকী মহাবিদ্যা সূত্র" (১১শ শতক) ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রথমোক্তটিতে ন্যায়দর্শন-সম্মত পদার্থগুলির যথাযথ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টিতে অবচ্ছেদকের সাহায্যে পদগুলিকে বহুল পরিমাণে বিশেষিত করিয়া কি ভাবে অভিমত সিদ্ধান্তলাভ করা যাইতে পারে তাহা ষোড়শ অনুমানের সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহাতে ব্যাপ্তিবাক্যের ব্যতিক্রম দেখান যাইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে পূর্বপক্ষীয় আপত্তির রূপটি কল্পনা করিয়া নিজ ব্যাপ্তিবাক্যকে যথাযথরূপে পরিসীমিত বা অবচ্ছিন্ন করার কৌশলের উপরেই এইরূপ অনুমানের কার্যকারিতা নির্ভর করে। কুলার্কপণ্ডিত মীমাংসকসম্মত শব্দনিত্যতাবাদখণ্ডন-প্রসঙ্গে কেবলান্বয়ী অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকার অনুমানে অভিধেয়ত্ব ও প্রমেয়ত্বের ন্যায় সর্বত্র ব্যাপ্ত ধর্ম হেতু ও সাধ্য হইয়া থাকে। এইরূপ অনুমান প্রয়োগের উদ্দেশ্যটি অনায়াসে বোধগম্য। ইহার ফলে পূর্বপক্ষীকে কোনরূপেই ব্যাপ্তিবাক্যে দোষ উদ্ভাবন করিবার সুযোগ দেওয়া হয় না। ত্রয়োদশ শতকের বাদীন্দ্র কিন্তু তাঁহার "মহাবিদ্যাবিড়ম্বনা"-গ্রন্থে এই সকল অনুমান খণ্ডন করিয়াছেন। এই সকল সর্বব্যাপী ধর্ম কেবল ব্যাপ্তিবাক্যরূপেই ব্যর্থ নহে, পরন্তু ইহাদের মধ্যে কোন কোন প্রকারের হেত্বাভাসও লক্ষিত হয়। এইরূপ লক্ষণ প্রণয়ন ও ন্যায়প্রয়োগের পদ্ধতি, তাহা কেবলান্বয়ী বা অন্য যে কোন প্রকারের হউক না কেন, অদ্বৈত মতের সহিত বিবাদকালে ব্যবহৃত হইতে থাকিল। তাহার ফলে অদ্বৈত দার্শনিকগণকে স্বপক্ষ সমর্থন ও পরপক্ষনিরাকরণকালে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া অনুরূপ বিচারশৈলী অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপে অদ্বৈতবাদের সমর্থনে বিতর্কমূলক গ্রন্থাদি লিখিত হইতে থাকিল।

শংকরোত্তরকালীন অদ্বৈতবাদের বিকাশকে সুবিধার্থে প্রধানতঃ দুইভাগে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ অদ্বৈত সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং দ্বিতীয়তঃ বিরোধীদর্শনগুলির সহিত বাদানুবাদে ব্যাপৃত বিতর্কমূলক অদ্বৈতবাদের বিকাশ। শংকরোত্তর অদ্বৈতবাদী ভাবধারা অনুসরণের এই দুইটি বিভাগের সহিত দুইটি অনুচ্ছেদ যোগ করা যাইতে পারে ; একটি ভারতের প্রাচীন দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির উপর অদ্বৈতবাদের প্রভাব সম্পর্কে এবং অপরটি সমসাময়িক ভারতীয় চিন্তানায়কগণের উপর অদ্বৈতবাদের প্রভাব সম্পর্কে। উপর্যুক্ত চারটি অনুচ্ছেদের পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে।

সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ

শংকরোত্তর অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে তাঁহার সমসাময়িক শুধু বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে গণনা করিলে চলিবে না, পরন্তু যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে তিনি স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও গণনা করিতে হইবে। শেষোক্তগণের মধ্যে "ব্রহ্ম-সিদ্ধি"কার মণ্ডনমিশ্রই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ। পরম্পরাগত মতানুসারে তিনি "নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি", "বৃহদারণ্যকবার্তিক" এবং "তৈত্তিরীয়বার্তিকের" রচয়িতা সুরেশ্বরের সহিত অভিন্ন। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত সুরেশ্বর ও মণ্ডনের মতবাদে পর্যাপ্ত ভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। "পঞ্চপাদিকা"কার পদ্মপাদ শংকরের একজন সাক্ষাৎ শিষ্য এবং অদ্বৈতবাদের এক প্রস্থানের প্রবর্তক ছিলেন। "পঞ্চপাদিকাবিবরণ"কার প্রকাশাত্মা (ত্রয়োদশ শতাব্দী) ও "বিবরণপ্রমেয়," "পঞ্চদশী" ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা বিদ্যারণ্য প্রভৃতি সর্বজনমান্য অদ্বৈতিগণ যে শ্রেষ্ঠ অদ্বৈত-পরম্পরার সমর্থক তাহা পদ্মপাদ প্রবর্তন করেন। মণ্ডন, সুরেশ্বর এবং পদ্মপাদ অষ্টম শতাব্দীর লোক।

নবম শতাব্দীর যে মহাপণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র অদ্বৈত অপর প্রস্থানের প্রবর্তক, তিনি শংকরের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন না এবং অদ্বৈতবাদ ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থের উপরেও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্বৈতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইতেছে শংকরকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের "ভামতী" নামক টীকা। মণ্ডন, সুরেশ্বর, পদ্মপাদ ও বাচস্পতি—অদ্বৈতবাদের চারিটি ভিন্ন ভিন্ন ধারার প্রবর্তক। প্রত্যেকেরই বহু অনুগামী আছে। কিন্তু এই সকল ভাবধারার ক্রমবিকাশ যে পরস্পরের কোনরূপ অপেক্ষা না রাখিয়াই হইয়াছিল, এইরূপ বলা সঙ্গত হইবে না। বস্তুতঃ এই ধারাগুলি

অনেকস্থলে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং পরস্পরের সহিত বাদ-বিবাদে যখনই কোন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তখনই এই সকল ধারার অনুগামীরা উহাদের নিজ নিজ স্বতন্ত্র সমাধান দিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদে শংকরই যুক্তিবিচারের ব্যবহার আরম্ভ করেন ; অবশ্য বিচারের ন্যায়-সম্মত বিশুদ্ধ প্রণালী বহু পরবর্তীকালে প্রবর্তিত হইয়াছিল। মণ্ডন তাঁহার "ব্রহ্ম-সিদ্ধি"তে বিচার দ্বারা ভেদের খণ্ডন করেন। উত্তরকালে আনন্দবোধ (একাদশ কিম্বা দ্বাদশ শতাব্দী) তঁহার "ন্যায় মকরন্দ" গ্রন্থে এবং নৃসিংহাশ্রম (পঞ্চদশ শতাব্দী) তাঁহার "ভেদ-ধিক্কার" গ্রন্থে এই ভেদ-খণ্ডন আরও বিস্তারিতভাবে করিয়াছেন। এই-স্থলে ইহা বলা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক অদ্বৈতবাদী তার্কিকই "ভেদ" খণ্ডনকে আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। কারণ, অ-ভেদই (অদ্বৈত) হইতেছে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য প্রধান সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ তার্কিক হইতেছেন "খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যের" রচয়িতা শ্রীহর্ষ (দ্বাদশ শতাব্দী)। অদ্বৈতবাদী তর্ক-প্রণালীর প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী তিনিই চিরকালের জন্য নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। "খণ্ডন-খণ্ডে"র টীকা ও তাহারই আদর্শে রচিত "তত্ত্বপ্রদীপিকা" গ্রন্থের রচয়িতা চিৎসুখাচার্য (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং "অদ্বৈতসিদ্ধি" ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের রচয়িতা মধুসূদন সরস্বতীও (পঞ্চদশ শতাব্দী) মহাতার্কিক ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত অপ্পয়দীক্ষিত (ষোড়শ শতাব্দী) তাঁহার "সিদ্ধান্ত-লেশ-সংগ্রহ" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। উপরন্তু নীলকণ্ঠের শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপর তাঁহার টীকা "শৈবাদ্বৈত-নির্ণয়ে" তিনি উক্ত দর্শনের যে অদ্বৈতপর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ।

"প্রকটার্থ-বিবরণ" (দ্বাদশ শতাব্দী) এবং তদনুরূপ আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রচনা এখনও বিদ্যমান, যদিও তাহাদের রচয়িতাদের নাম আজও অজ্ঞাত। অপর পক্ষে প্রথিতযশা কতিপয় লেখকের রচনা অপ্রাপ্য। সাধারণতঃ, ভাষ্য ও টীকা রচনার সাহায্যে এই ভাবপরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখা হইতেছিল, যদিও "ভেদ-ধিক্কারের" ন্যায় প্রকরণ-গ্রন্থ বা "বেদান্ত-পরিভাষা"র ন্যায় বেদান্তসিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। অবশ্য তাহাদেরও ভাষ্য ও টীকা আছে।

শংকরাচার্যের চিন্তাধারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের, ভাবধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। অপ্পয়দীক্ষিত যে শৈবদর্শনকে অদ্বৈতবাদী দৃষ্টি হইতে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার এই প্রচেষ্টা যে সার্থক হয় নাই তাহার কারণ

তিনি অদ্বৈতবাদ যাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে চাহিয়াছিলেন তিনি একনিষ্ঠভাবে বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের উপর একটি স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করিলেই তিনি অধিকতর সাফল্যলাভ করিতেন। কাশ্মীরীয় শৈববাদ একান্তরূপে শংকরের কাশ্মীর ভ্রমণের ফল। তৎকালীন কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনই আধিপত্যলাভ করিয়াছিল এবং তাহার প্রভাবে স্থানীয় শৈববাদ চাপা পড়িয়া যায়। কিন্তু শংকর বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা করিলে সেই মৃতকল্প শৈববাদ পুনরায় মাথা তুলিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। "শিবসূত্র" ও "স্পন্দকারিকা"র প্রণয়নকর্তা বসুগুপ্ত (নবম শতাব্দী) এই সম্প্রদায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যাকর্তা। তাঁহার "স্পন্দকারিকা" সুস্পষ্ট-ভাবেই গৌড়পাদের "মাণ্ডুক্যকারিকা"র স্মারক।[১] কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও দার্শনিক অভিনবগুপ্ত এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার ছিলেন।

শাক্তধর্ম যে প্রাচীনতায় বেদের সমতুল্য এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই সম্প্রদায়ের কতকগুলি "তন্ত্র" বা "আগমে"র রচনাকাল প্রাক্-শংকরীয়। শংকর স্বয়ং এই সাম্প্রদায়িক মতবাদের বিরুদ্ধসমালোচনা করিলেও, অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে তাঁহাকেই এই সাম্প্রদায়িক মতবাদের অন্যতম প্রামাণ্য-গ্রন্থ "প্রপঞ্চ-সার-তন্ত্রের" রচয়িতা বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। শুধু এই সম্প্রদায়ের পরম্পরাই নহে, পরন্তু সাম্প্রতিককালে উড্‌রফের ন্যায় বিশেষজ্ঞদ্বারাও শংকরের গ্রন্থকারত্ব সমর্থিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া "সৌন্দর্যলহরী" নামক শিবভার্যা শক্তির উদ্দেশ্যে রচিত যে অনবদ্য কবিতাটিতে শাক্তদর্শনের ভাবধারা দেখা যায়, বহু প্রাচীনপন্থী অদ্বৈতবাদী তাহা শংকরেরই রচনা বলিয়া স্বীকার করেন। শংকরের মৃত্যুর পরে ভাস্কর রায়ের ন্যায় শাক্তসাম্প্রদায়িকগণও নিজেদের দর্শনে শংকরকে মহত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছেন। কাশ্মীরীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁহাদিগের চিন্তাধারাও অদ্বৈতবাদেরই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ মাত্র।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে বল্লভাচার্যই (পঞ্চদশ শতাব্দী) শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী। তিনি স্বকীয় মতবাদকে "শুদ্ধাদ্বৈতবাদ" নামে শাংকরিক অদ্বৈতবাদ হইতে বিশিষ্ট করেন। শংকরের অদ্বৈতবাদকে তিনি অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য করেন ; কারণ, শংকর অশুদ্ধ মায়া কল্পনা আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মের বিশুদ্ধি স্থাপন করেন। ইহা ব্যতীত শুক ভাগবত সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে যে অদ্ভুত রকমের অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

<u>অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে মতভেদ :</u> শংকর জগৎকে "মায়া" আখ্যা দান করেন এবং জগৎকারণরূপেও মায়ারই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকজন অনুবর্তী

ইহাতেই মোটামুটি সন্তুষ্ট হইয়া নিজদিগের দৃষ্টি জগৎ হইতে ফিরাইয়া অন্তঃনিগূঢ় নির্ব্যূঢ় তত্ত্বে নিবদ্ধ করেন। কিন্তু অধিকাংশের নিকটেই অন্ততঃ মায়ার ভিত্তিতেও জগতের একটি নির্দিষ্ট বুদ্ধিগ্রাহ্যরূপ কল্পনা করিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহারা "মায়ার" ধারণাকে মূল্যদ্যোতক প্রত্যয়রূপে না দেখিয়া তাহাকে সৃষ্টি ও ব্যাখ্যাকার্যের বীজমন্ত্ররূপে গণ্য করিতে আরম্ভ করেন। "মায়া" যতই রহস্যময় পদার্থ হউক না কেন, তাহার অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকিবে এবং তাঁহারা ইহাকে বুদ্ধিদ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

"মায়া" শব্দটির প্রকৃত অর্থ অনির্বচনীয়তা হইলেও উহা একটি দ্রব্যবাচক পদ হওয়ায় এবং উহার সহিত সাংখ্যদর্শনোক্ত জগতের মূল কারণ প্রকৃতির সহিত সংসর্গ থাকায়, শংকরের অনুবর্তিগণ ব্রহ্মের সহিত "মায়া" যে কোন না কোন প্রকারে জগৎসৃষ্টির কারণ ইহা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

অদ্বৈতবাদিগণের নিকট স্বভাবতঃই যে প্রশ্নটি প্রথম প্রকট হইয়া উঠিল, তাহা এইঃ জগৎ যদি "মায়া" হয় এবং সুতরাং সদ্বস্তু না হয়, তবে জগতের উদ্ভবই কিরূপে সম্ভবপর হয়? শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জড়জগতের উৎপত্তি কিরূপে হয়? এই জগৎ উৎপত্তিতে মায়ার কি কোনও ভূমিকা আছে? যদি থাকে, তবে তাহা কি? শংকর ব্রহ্মকেই একমাত্র তত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়া জগৎকে ''মিথ্যা'' ও "মায়া" আখ্যায় অভিহিত করেন। এখন প্রশ্ন উঠিল জগৎকে "মায়া" বলিয়া স্বীকার করিলেও অস্বীকার্যরূপে প্রতিভাসমান এই জগতের আদৌ উদ্ভব হইল কিরূপে? সুরেশ্বরাচার্য ও তাঁহার শিষ্য সংক্ষেপশারীরককার সর্বজ্ঞ (নিত্যবোধ, নবম শতাব্দী) স্বয়ং ব্রহ্মকেই জগতের কারণরূপে গণ্য করেন।২ পদ্মপাদ ও তাঁহার অনুবর্তিগণ ব্রহ্ম ও মায়া উভয়কেই সম্মিলিতভাবে জগতের কারণ বলিয়াছেন। অপর-পক্ষে ''বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী"কার প্রকাশানন্দ (ষোড়শ শতাব্দী) সম্ভবতঃ মণ্ডনমিশ্রের "ব্রহ্মসিদ্ধি"র অনুসরণ করিয়া একমাত্র মায়াকেই জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মণ্ডনমিশ্রের মতে জীবগণ মায়ার কার্য এবং জগৎ জীবের কার্য। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে যে, "ব্রহ্ম" ও "মায়া" ইহাদের নিজ নিজ ভূমিকা কি? পদার্থতত্ত্বনির্ণয়কার বলেন যে, ব্রহ্ম জগতের বিবর্ত-কারণ এবং "মায়া" তাহার পরিণাম-কারণ। এইস্থলে বিবর্ত-কারণ ও পরিণাম-কারণ এই দুই জাতীয় কারণের পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কতকগুলি কারণ এরূপ আছে যে, কার্যাবস্থায় তাহাদের নূতন ধর্মের উদ্ভব হয়। যথা, দুগ্ধ যখন দধিতে রূপান্তরিত হয়, তখন আর তাহা দুগ্ধরূপে বর্তমান থাকে না। কিন্তু কতকগুলি কারণ কার্যে পরিণত হইলে আপন

আপন পূর্বতন স্বরূপ হারায় না; যেমন, স্বর্ণের বলয়াকারে পরিবর্তন তাহাকে অন্যধাতুতে পরিণত করে না এবং তাহার স্বর্ণরূপ অক্ষুণ্ণই থাকে। প্রথমোক্ত কারণগুলিকে পরিণাম-কারণ এবং শেষোক্ত কারণগুলিকে বিবর্ত-কারণ বলে।

এইভাবে দুইপ্রকার কারণের মধ্যে পার্থক্য করিয়া প্রকৃতপক্ষে জগৎপ্রবাহ চলিতে থাকার কালেও ব্রহ্মের নিত্যত্ব ও চিরশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সুরেশ্বর ও সর্বজ্ঞ, যাঁহারা একমাত্র ব্রহ্মেরই কারণতা স্বীকার করেন, তাঁহারা মায়ার নিমিত্তকারণতামাত্র স্বীকার করেন। মায়াকে নিমিত্ত করিয়াই ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এই বিষয়ে বাচস্পতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আছে। তাঁহার মতে ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, মায়া তাঁহার সহকারিমাত্র। অবশ্য ব্রহ্ম পরিণাম কারণ হইতে পারেন না, তিনি বিবর্ত-কারণমাত্র, কিন্তু মায়া এই দুইটির মধ্যে কোনটিই নহে। "বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী"কার প্রকাশানন্দ ইহার একান্ত বিরোধিতা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কালাতীত ব্রহ্ম কখনই উপাদান কারণ হইতে পারেন না, মায়াই জগতের উপাদান করেন।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উথাপিত হয়। বহুত্ব কি শুদ্ধব্রহ্মজন্য অথবা মায়োপহিত যে ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা হয়, তজ্জন্য? অথবা জীবজন্য? স্পিনোজীয় দর্শনের একটি অনুরূপ সমস্যার কথা স্মরণ রাখিলে প্রশ্নটির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। স্পিনোজা বলিয়াছিলেন যে, সসীম বস্তুগুলিকে চরম সৎবস্তু হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিতে হইবে, অথচ ইহাদের সসীমরূপে প্রতিভাত হওয়ার কারণ হইতেছে সসীমবস্তুদের অপরিণত বুদ্ধি। সমালোচকগণের প্রশ্ন করা অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে যে, সসীমবস্তুদের প্রতিভাত হওয়া যদি সসীমবস্তুদেরই অপূর্ণতার ফল হয়, তাহা হইলে এই সসীম বস্তুগুলিরই উদ্ভব কিরূপে সম্ভবপর হইল? সসীমবস্তুগুলি যদি পূর্বেই না উপস্থিত থাকে তাহা হইলে সসীমবস্তুদের প্রতিভাস হয় না, অপরপক্ষে সসীমবস্তুগুলির খণ্ডদৃষ্টি ব্যতিরেকে উহাদের অস্তিত্বই সম্ভবপর হয় না। কিন্তু কেহ এইরূপ বলিতে পারেন যে, বহুত্ব সসীম বস্তুগুলি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে অথবা চরম সদ্বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অনুরূপ বিবেচনা হইতেই প্রশ্ন জাগিল জগৎ কি হইতে উদ্ভূত হয়? ব্রহ্ম ঈশ্বর অথবা জীব হইতে?

"সংক্ষেপ-শারীরক" অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ শুদ্ধব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়াছেন।৩ যাঁহারা বিবরণের অনুবর্তী তাঁহাদের মতে মায়াসংশ্লিষ্ট ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই নিশ্চয় জগৎ কারণ। কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর দেশস্থ বহির্জগতের কারণ, আর জীবের মন (অন্তঃকরণ) ঈশ্বরের মায়াসম্ভূত উপাদান সহিত জীবের অবিদ্যা (মায়ার

যে অংশ জীবে আছে) হইতে উদ্ভূত। যাঁহারা মায়া ও অবিদ্যার ভেদ স্বীকার করেন ইহা তাঁহাদেরই মত (নিম্নে দেখুন)। কিন্তু যাঁহারা এই দুইয়ের অভিন্নতায় বিশ্বাসী, তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে জীব সূক্ষ্ম শরীরের (লিঙ্গ-শরীর) কারণ। মতান্তরে ঈশ্বর জাগতিক সকল পদার্থেরই কারণ, কিন্তু জীব স্বপ্ন ও প্রতিভা-সমূহের কারণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মণ্ডনের মতে জীবই জগতের কারণ। কিন্তু এই বিষয়ে একটি চরমপন্থী মত হইল এই যে, ঈশ্বর ও অন্যান্য সকল কিছুই স্বপ্নের ন্যায় জীব হইতে নিঃসৃত হয়।

এইস্থলে "মায়া" ও "অবিদ্যার" সম্বন্ধ আলোচনা করা যাইতে পারে। উভয়েই স্বরূপতঃ অজ্ঞানরূপে স্বীকৃত। কিন্তু কেহ কেহ তাহাদের মধ্যে ভেদ স্বীকারের অপরিহার্য আবশ্যকতা অনুভব করেন। কারণ, তাঁহাদের মতে যে অজ্ঞানের কবল হইতে স্বয়ং ঈশ্বরও মুক্ত নহেন তাহা জৈবিক অজ্ঞানের তুলনায় অবশ্যই কোন ব্যাপকতর অজ্ঞান হইবে। যদি উভয়েরই ক্ষেত্রে অভিন্ন অজ্ঞান স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জীবের ক্ষমতাদি ঈশ্বরের সমতুল্য হওয়া উচিত। সর্বজ্ঞের মতে মায়া অবিদ্যারই নামান্তর মাত্র। কিন্তু "প্রকটার্থ-বিবরণে" অবিদ্যাকে মায়ার অংশ বিশেষ-রূপেই কল্পনা করা হইয়াছে। "তত্ত্ববিবেক"কার মায়া ও অবিদ্যাকে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণাদিসম্পন্না "মূলা-প্রকৃতি"র দুইটি ভিন্ন রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সত্ত্বগুণ-প্রধান মূলা-প্রকৃতিই মায়া, এবং রজঃতমাদিগুণপ্রধান মূলা-প্রকৃতিরূপে তাহাই অবিদ্যা। কেহ কেহ মূলা-প্রকৃতিকে দ্বিবিধ শক্তিযুক্তা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন—এক "আবরণ শক্তি" যাহার সাহায্যে তাহা সত্যকে আবৃত করে, এবং দ্বিতীয় "বিক্ষেপ-শক্তি" যাহার দ্বারা তাহা প্রপঞ্চ ও ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, আবরণ-শক্তিবিশিষ্টা মূলা-প্রকৃতিই অবিদ্যা এবং বিক্ষেপশক্তিসম্পন্না মূলা-প্রকৃতিই মায়া। প্রসঙ্গতঃ, মায়া এক অথবা বহু, এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা যাইতে পারে। মায়া যেহেতু অনির্বাচ্য এবং স্বভাবতঃই অনধিগম্য, সেইজন্য কেহ কেহ তাহার যুগপৎ এক ও বহু হইতে কোন বাধা দেখেন না। উদাহরণতঃ, "সর্বদর্শন-সংগ্রহ"কার মাধবাচার্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-ঐক্যতাবাদ পরীক্ষাকালে এক অনিষ্টপ্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতি এক বলিয়া স্বীকার করিলে জীববিশেষের মুক্তিকালে প্রকৃতির নিবৃত্তি হয় বলিয়া জীবমাত্রেরই তৎকালে মুক্তিলাভ হইতে পারে। মাধবাচার্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদে এই সমস্যার উদ্ভব হয় না, কারণ মায়া যুগপৎ এক ও বহু হইতে পারে।[৪] কেহ কেহ বলেন, মায়া ঈশ্বরের উপাধি এবং এক ; অপরপক্ষে অবিদ্যা জীবগণের উপাধিরূপে বহু। মতান্তরে

মায়া এক এবং অবিদ্যা হইতে অভিন্ন। কিন্তু মায়ার ঐক্য স্বীকার করিলেই জীব-বিশেষের মুক্তিকালে সকল জীবের মুক্তিপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয় না। কোনও জাতি তজ্জাতীয় সকল ব্যক্তিতে আশ্রিত হইলেও কোনও বিশেষ ব্যক্তির নাশে তজ্জাতীয় সকল ব্যক্তির নাশ প্রসঙ্গ হয় না। এইস্থলে প্রকাশানন্দ মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার মতে একাধিক জীবই স্বীকৃত না থাকায় আপত্তিটি ইষ্ট নহে। কিন্তু মায়া যদি জগৎ-সৃষ্টিতে ব্রহ্মের সহিত কার্যকরী হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধটির স্বরূপ কি? সাংখ্যকারগণ পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধপ্রসঙ্গে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, এই প্রশ্নটি তদনুরূপ। যদি পুরুষ ও প্রকৃতি কোন সম্বন্ধকে অপেক্ষা রাখিয়াই ব্যতিষক্ত হয়, তবে তাহাদের সেই ঐক্যরূপটির স্বরূপ কি? অতএব, পুনরায় সমাধান প্রচেষ্টায় অবিসম্বাদিতরূপে অনির্বাচ্য প্রত্যয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া মতভেদ দেখা দিল।

ব্রহ্ম ও মায়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে এক আকর্ষণীয় বাদানুবাদের উদ্ভব হইল। মায়া সৎপদার্থ নহে, তথাপি তাহা যে ব্রহ্মের উপাধিরূপে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বা সীমায়িত করে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মায়া কিরূপে ব্রহ্মের উপাধি হইয়া পড়ে? এই বিষয়ে আভাষবাদ, প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদ নামে তিনটি মতবাদ প্রচলিত আছে। সুরেশ্বর মতে অবিদ্যাসম্পন্ন ব্রহ্ম "সাক্ষী" (নিম্নে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং বুদ্ধি-সমাচ্ছন্ন ব্রহ্ম "জীব" রূপে প্রতিভাত হয়। এই সম্প্রদায়ে "সাক্ষী" ঈশ্বররূপেই কল্পিত হইয়াছে। "প্রকটার্থ-বিবরণে" মায়াতে প্রতিফলিত ব্রহ্মকে ঈশ্বর এবং মায়ার অংশ অবিদ্যায় তাঁহার প্রতিফলনকেই জীবরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। "তত্ত্ব-বিবেক"কার মতে মূলাপ্রকৃতির সত্ত্ব অংশে ব্রহ্মের প্রতিফলনই ঈশ্বর এবং অন্যান্য অংশে প্রতিফলন "জীব"। "সংক্ষেপ-শারীরক"কার অবিদ্যায় প্রতিফলনকে ঈশ্বর-রূপে গণ্য করিয়া অন্তঃকরণে প্রতিফলনকেই জীবরূপে গণ্য করিয়াছেন। "বিবরণ" সম্প্রদায়িগণের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বর ও জীব উভয়েই যে প্রতিবিম্ব,—এইরূপ মতবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জীবই প্রতিবিম্ব এবং ঈশ্বর তাহার বিম্ব। প্রতিবিম্ব, বিম্ব এবং মূলব্রহ্ম, এইরূপ ত্রৈবিধ্য স্বীকারের যুক্তি এই যে, কোন অনন্ত পদার্থের প্রতিফলন সম্ভব নহে বলিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রতিফলন হইতে পারে না। সান্ত বস্তুরই প্রতিফলন হইতে পারে। অপরপক্ষে জীব প্রতিবিম্বস্বরূপ হওয়ায়, ঈশ্বর তাহার অবশ্যস্বীকার্য বিম্ব। অতএব, জীবের অপেক্ষা রাখিয়াই ঈশ্বরকে কল্পনা করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মের ধারণায় জীবকল্পনার অপেক্ষা নাই।

বাচস্পতি মিশ্র এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত অবচ্ছেদবাদ নামক এক তৃতীয় মতবাদের সূচনা করেন। মায়া সৎপদার্থ না হইলেও তাহা ব্রহ্মকে সীমায়িত

বা অবচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হওয়ায় জীবের উদ্ভব হয়। যাহা অনুরূপ ভাবে অর্থাৎ মায়ার দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে তাহাই ঈশ্বর। একক ব্রহ্ম অবিদ্যার বিষয়রূপে ঈশ্বর এবং অবিদ্যার আশ্রয়ই জীব। অবিদ্যা জীবের উপাধিরূপে তাহাকে বিমূঢ় করে। কিন্তু তাহা ঈশ্বরের উপাধিও নহে এবং ঈশ্বর তাহার দ্বারা বিভ্রান্ত হন না। "চিত্রদীপ"-কারের মতে মায়ার দ্বারা অনুপহিত বিশুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্ম, এবং জীবগণের বুদ্ধি মায়াতে যে সংস্কার রাখিয়া যায়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রতিফলনই ঈশ্বর। জীবগণের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ চৈতন্যকে "কূটস্থ সাক্ষী" আখ্যা দান করা হইয়াছে। এবং "কূটস্থ সাক্ষী"তে অন্তঃকরণের প্রতিফলনই জীব। এই মতবাদটি প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদের মিশ্রণ।

ক্রমশঃ এইরূপ ধারণার উদ্ভব হইতে থাকে যে, মায়া ও অবিদ্যা, ব্রহ্ম ও জীবের সহিত একই প্রকারে সম্বন্ধ হইতে পারে না। এইরূপ বিবেচনা হইতে একাধিক নুতন ধারণার উদ্ভব হইল।

ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব, ইহাদিগের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা ইতিপুর্বে আলোচনা করিতেছিলাম। "সংক্ষেপ-শারীরক" অনুসারে ঈশ্বরের উপাধিটি "কারণ-ঘটিত-অবিদ্যা" (কারণোপাধি) এবং জীবের উপাধিটি "কার্যঘটিত-অবিদ্যা" (কার্যোপাধি)। "ব্রহ্মানন্দ," "চিত্রদীপ" ইত্যাদির লেখক মাণ্ডূক্য উপনিষদ অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মুল শুদ্ধ ব্রহ্ম দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন। একটি তাঁহার বিশ্বরূপ এবং অপরটি তাঁহার অনুরূপ। উভয়রূপেরই পুনশ্চ ত্রিবিধ প্রকার ভেদ আছে। প্রথমটির বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এবং দ্বিতীয়টির বিরাট, হিরণ্যগর্ভ (অপর নাম, সূত্রাত্মা) এবং ঈশ্বর। ব্রহ্মের দ্বিবিধরূপের এই ত্রিবিধ প্রকার ভেদ জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অনুরূপ। ইহা "বিবরণ" সম্প্রদায়সম্মত সিদ্ধান্তেরই উন্নত সংস্করণ। "দৃগ্-দৃশ্য-বিবেকে" ত্রিবিধ জীব স্বীকার করা হইয়াছে,—কূটস্থ জীব; ব্যবহারিক জীব ও প্রাতিভাসিক জীব। কূটস্থকে অনেকেই জীব হইতে স্বতন্ত্র সাক্ষীরূপে গণ্য করেন। কিন্তু এইস্থলে তাহাদের অভিন্নতা কল্পনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার সমুদ্র তরঙ্গ ও তরঙ্গশীর্ষস্থিত বুদ্বুদের উপমার সাহায্যে ত্রিবিধ জীবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কূটস্থ হইলেন পরমার্থ বা বস্তুতঃ সৎ জীব এবং তাহা অবচ্ছেদজন্য। অপর দুইটি প্রতিবিম্বস্বরূপ। বুদ্ধি কূটস্থেই উৎপন্ন হয়, এবং সেই বুদ্ধিতে শুদ্ধচৈতন্যের প্রতিফলনই হইল ব্যবহারিক জীব। প্রাতিভাসিক জীব দেহে এই প্রতিফলনের, অর্থাৎ স্বপ্নের প্রতিফলন।

কূটস্থের আক্ষরিক অর্থ হইল যাহা কূট অর্থাৎ শীর্ষস্থিত। এইস্থলে শীর্ষস্থিত

বলিতে জাগতিক সুখ-দুঃখের ভোক্তা জীবের ঊর্ধ্বস্থিত "চিৎ" বা "শুদ্ধচৈতন্য" বুঝিতে হইবে। সুতরাং ইহা শুদ্ধ দ্রষ্টা বা "সাক্ষী"। ' কূটস্থ-দীপ" অনুসারে ইহা জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বিশুদ্ধ দ্রষ্টা। "নাটক-দীপা"নুসারে রঙ্গমঞ্চের দীপের ন্যায় ইহা ঈশ্বর ও জীব উভয়কেই উদ্ভাসিত করে, অর্থাৎ ইহা জীব ও ঈশ্বর উভয় হইতে ভিন্ন। "তত্ত্ব-প্রদীপিকা"তেও এই মতাশ্রয় করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যে, জীব বা ঈশ্বর নহেন এমন যে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম, তিনিই জীবের ক্ষেত্রে সাক্ষী (জীবাভেদেন)। ঈশ্বর সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী এবং জীব আপন অনুভবাদি দ্বারা আবিল। "সাক্ষী" এইরূপ কোনও গুণের অধিকারী নহেন, কিন্তু তিনি সকল ভোগের "দ্রষ্টা"। ঈশ্বরের কৃতিসমূহ কিন্তু তদ্দ্বারা উদ্ভাসিত হয় না। কিন্তু "কৌমুদী"কার মতে সাক্ষী জীবের অন্তঃস্থিত (জীবান্তরঙ্গ) হইলেও, তাহা স্বয়ং ঈশ্বরেরই "প্রাজ্ঞ" নামক অক্ষমরূপ। সাক্ষী জীবের অবিদ্যার ভাসক, অতএব তাহা জীবান্তরস্থ বলিয়া স্বীকৃত। "তত্ত্ব-শুদ্ধি"তে এই মতবাদটি প্রকারান্তরে সমর্থিত হইয়াছে। "ইহা রজত" এইরূপ ভ্রমস্থলে যেরূপ "ইহা"রূপ বিশেষ্যতাটি প্রকৃতপক্ষে শুক্তিনিষ্ঠ হইলেও রজতনিষ্ঠ হইয়া প্রতিভাত হয়, তদনুরূপ সাক্ষিত্ব প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের হইলেও তাহা জীবের, এইরূপ প্রতিভাস হয়। কিন্তু অপর অনেকে সাক্ষীকে ঈশ্বরের রূপান্তর বলিয়া স্বীকার না করিয়া তাহাকে স্বয়ং জীব বলিয়া গণ্য করেন। কেননা জীবই নিজ অন্তরানুভবের দ্রষ্টা হইতে পারে। কিন্তু অপর কেহ কেহ জীব ও সাক্ষীকে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলেও বলেন যে ইহা অবিদ্যা নহে, পরন্তু অন্তঃকরণের দ্বারা সীমায়িত জীবই সাক্ষী। তাঁহারা প্রতি জীবের ক্ষেত্রে ভিন্নতা নিবন্ধন অবিদ্যার বহুত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অন্তঃকরণেরই বহুত্ব সম্ভব। অনন্তের সহিত উপাধির সঙ্গ যদি তাহাকে সান্তে রূপান্তরিত করে এবং এই উপাধিটি যদি একক হয়, তাহা হইলে বহু সান্তের উদ্ভব কিরূপে সম্ভব হয়? জীব কি এক অথবা বহু?—এই প্রশ্নটি অদ্বৈত-বাদিদের নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির অন্যতম। কাহারও মতে জীব একক এবং তাহার শরীরও একক। অন্যান্য জীবের সত্তা স্বপ্নদৃষ্ট বহুত্বের সমতুল্য এবং সৃষ্টি বা মোক্ষও স্বপ্নবৎ। অপরে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ "হিরণ্যগর্ভ"ই মূল জীব এবং অন্যান্য জীব তাহারই প্রতিবিম্ব। অনেকে ইহা সমর্থন করেন না এবং একই জীব যোগীর ন্যায় বহু শরীর সৃষ্টি করে এবং বহুরূপে প্রতিভাত হয়, এইরূপ কল্পনা করেন। কিন্তু অধিকাংশ অদ্বৈতবাদী জীবের বহুত্ব স্বীকার করেন, অন্যথা জীব-বিশেষের মুক্তিতে সকল জীবের মুক্তির আপত্তি হয়। জীবের বহুত্ব অবিদ্যার বহুত্ব অথবা অন্তঃকরণের বহুত্ব স্বীকৃতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

অপর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল অধ্যাসের স্বরূপ। শংকর স্মৃতিরূপ পূর্বদৃষ্ট পদার্থের পরত্র অবভাসকেই অধ্যাস বলিয়াছেন। কিন্তু উত্তরকালীন অদ্বৈত-বাদিগণ আপন সম্প্রদায়ের যৌক্তিকতার প্রয়োজনে এই লক্ষণটির সংশোধন করিয়া তাহা হইতে "পূর্বদৃষ্ট" ও "স্মৃতিরূপ" পদ দুইটি পরিহার করেন। তাঁহাদের মতে "এক বস্তুতে ভিন্নবস্তুর অবভাস"ই অধ্যাসের লক্ষণ।৬ অন্যথা "পূর্বদৃষ্ট" এবং "স্মৃত" পদার্থ সৎ হয় বলিয়া তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদ (ভ্রমের বিষয়টি সদসৎবিলক্ষণরূপে অনির্বাচ্য) ত্যাগ করিয়া অন্যথাখ্যাতিবাদ (অর্থাৎ ভ্রমে এক সৎ পদার্থের অপর সৎ পদার্থরূপে ভান) আশ্রয় করিতে হয়। শংকর বলিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিগত অথবা জাগতিক ভ্রান্তিতে সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটে (সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য)। রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে এই সংমিশ্রণ কিরূপে ঘটে? এই-স্থলের প্রত্যক্ষটি "ইহা সর্প" এইরূপেই হয়। কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, এই জ্ঞানটিতে বিশেষণাংশেই ভ্রম সংঘটন হয়, কিন্তু "ইহা"রূপ বিশেষ্যটি সম্বন্ধে কোনও ভ্রান্তি হয় না। বিশেষ্যরূপ "ইহাটি" সত্য ও বিশেষণরূপ "সর্প"টি মিথ্যা। বিশেষ্যটি "ইহা সর্প" রূপ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ও তাহার উত্তরকালীন "ইহা রজ্জু" এইরূপ অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ, উভয়ের ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকে। এইরূপ-উভয়প্রত্যক্ষসাধারণ কোন বিশেষ্য স্বীকার না করিলে উত্তরকালীন জ্ঞানটি পূর্বতন জ্ঞানটির নিষেধ করিতে পারে না। তদনুযায়ী এই সাম্প্রদায়িকগণ বলিয়া থাকেন যে, "ইহা সর্প" এইরূপ জ্ঞানে কেবল "ইহা" সম্বন্ধীয় অবিদ্যারই নাশ হয়, কিন্তু রজ্জুত্ব প্রকারিকা অবিদ্যার নাশ হয় না এবং তাহা সর্পাকারে পরিণত হয়। মতান্তরে, বিশেষ্য ও বিশেষণকে কোন জ্ঞানেই বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নহে। রজ্জুতে সর্পভ্রমকালেও "ইহা" এবং "সর্প" পৃথকরূপে জ্ঞানের বিষয় হয় না। অতএব, বিশেষ্য যে "ইহা" তৎসম্বন্ধীয় অবিদ্যাই—সর্পাকারে পরিণত হয়। এই ভ্রান্তিতে অবিদ্যার যে আবরণ-শক্তি "ইহা"কে আবৃত করে, তাহার নিবৃত্তি-ঘটিলেও তাহার অক্ষুণ্ণ "বিক্ষেপ-শক্তি" দ্বারা তাহা সর্পরূপের সৃষ্টি করে। নৃসিংহভট্ট এই বাদবিবাদকে অনর্থকরূপে গণ্য করেন, কেননা তাঁহার মতে ভ্রান্তিতে "ইহা" ও "সর্প" বিষয়ক একটি অখণ্ড বিশিষ্ট বুদ্ধি হয়। রোগাদি দ্বারা দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ অবিদ্যায় সংক্ষোভ সৃষ্টি করিলে তাহাই সর্পাকারে পরিণত হয়, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত প্রত্যক্ষসাধারণ কোন কিছু স্বীকৃত না হইলে, উত্তরকালীন অভ্রান্ত প্রত্যক্ষটি কিরূপে পূর্বতন প্রত্যক্ষটির নিষেধ করিতে পারে? সর্প ও রজ্জু এই দুইটি বিশেষণই যদি একই বিশেষ সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হয়,

তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকারেই বিরোধ উপস্থিত হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, যদিও ভ্রমে "ইহা" বিষয়ক একটি বিশিষ্ট বুদ্ধি হয়, তথাপি তাহা প্রথমে সর্পকেই প্রকাশিত করে এবং উত্তরকালে যখন রজ্জুকে প্রকাশ করে, তখন "সর্প" একটি সুপ্ত সংস্কাররূপে রহিয়া যায়। কেহ বা "ইহা" বিষয়ক একটি জ্ঞান ও "ইহা সর্প" এইরূপ অপর আর একটি জ্ঞান স্বীকার করেন। স্বভাবতঃই "ইহা রজ্জু" এই জ্ঞানটি তৃতীয় জ্ঞান হইবে। এবং "ইহা"টি এই জ্ঞানত্রয় সাধারণ।

এই স্বল্পপরিসর অধ্যায়ে অদ্বৈতবাদিগণ কর্তৃক যে সকল প্রশ্ন বিচারের জন্য উত্থাপিত করা হইয়াছিল তাহার সবগুলির উপস্থাপন সম্ভব নহে, তাহাদের আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলি তো দূরের কথা। কিন্তু স্বপ্ন ও মোক্ষ সম্বন্ধীয় সমস্যার একটি ক্ষুদ্র বিবরণ যোগ করা যাইতে পারে। ইউরোপীয় দর্শনের তুলনায় ভারতীয় দার্শনিক বিচারে স্বপ্নের মহত্তর ভূমিকা আছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে স্বপ্নকে জাগ্রত ও সুষুপ্তির ন্যায় আত্মার অবস্থাভেদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মিথ্যাজ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকৃত। কিন্তু স্বাপ্নিক জগৎ প্রাতিভাসিক সৎ হইলেও প্রশ্ন জাগে যে, তাহা কাহাতে অধ্যস্ত হয়? কেহ কেহ বলেন স্বপ্নের জগৎকে ব্রহ্ম-চৈতন্যেই অধ্যস্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ সুষুপ্তির "তমস্," রূপ যে অজ্ঞান, তাহাই স্বপ্ন ও ভ্রান্তির মূল কারণ। এবং অজ্ঞান ব্রহ্মে অধ্যস্ত হওয়ায়, স্বপ্ন ও জাগ্রতচৈতন্যকেও অনুরূপভাবে কল্পনা করা যাইতে পারে। অপর কাহারও মতে স্বপ্ন জাগ্রত চৈতন্যে অধ্যস্ত, কেননা জাগৃতির অনন্তর জাগতিক পদার্থের জ্ঞানের দ্বারা স্বাপ্নিক প্রতিভাস বাধিত হয়। মতান্তরে স্বাপ্নিক প্রতিভাসের সমবায়িকারণ মূল অজ্ঞান নহে, পরন্তু তাহার "অবস্থাভেদ" সুষুপ্তিই স্বাপ্নিক প্রতিভাসের কারণ। কিন্তু স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় থাকিলেও স্বপ্নকালীন বিষয়গুলির প্রত্যক্ষ কিরূপে সম্ভবপর হয়? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গুলি বস্তুর ভাসক নহে, পরন্তু জ্ঞাতা স্বয়ংই (স্বয়ং জ্যোতিঃ) তাহাদের উদ্ভাসক। অতএব "আমি শ্রবণ করিতেছি" এইরূপ যে অনুভব, তাহা ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে।

মোক্ষ সম্পর্কে মুখ্যতঃ দুইটি বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়—সর্বমুক্তিবাদ ও প্রত্যেকমুক্তিবাদ। প্রথমোক্তটি অনুযায়ী সকল জীবের একই কালে মুক্তি হয় এবং দ্বিতীয় মতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপেই জীবসকল মুক্তিলাভ করে। বাচস্পতি ও তাঁহার কিছুসংখ্যক অনুবর্তী ও অপ্পয় দীক্ষিত প্রথম মতাশ্রয়ী, কিন্তু অধিকাংশ অদ্বৈতবাদীই দ্বিতীয় মতবাদ সমর্থন করেন। প্রথমেই জিজ্ঞাস্য ছিল: জীব মোক্ষানন্তর কাহার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে, ব্রহ্মের অথবা ঈশ্বরের? মায়া ও জীব প্রত্যেকেরই একত্বতা

সমর্থনকারী মুক্তাবলীকারের মতে মায়ার বিনাশের অব্যবহিত উত্তরক্ষণে জীব ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। এমন কি যাঁহারা জীবের বহুত্ব স্বীকার করেন এবং জীব ও ঈশ্বরকে প্রতিবিম্বরূপে গণ্য করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অবিদ্যার বিনাশোত্তর-কালে জীব আপন বিম্ব ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়, এরূপ মতবাদ প্রচলিত আছে। অপরপক্ষে যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিবিম্বতা স্বীকার না করিয়া তাঁহাকে জীবরূপ প্রতিবিম্বের বিম্বরূপে কল্পনা করেন, তাঁহাদের মতে মোক্ষে জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতা স্থাপিত হয়। এবং ঈশ্বর স্বয়ং সকল জীব মুক্ত হইলেই ব্রহ্মত্বলাভ করেন। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ অবিদ্যা ও তাহার জীব বর্তমান থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বর তাহার বিম্ব না হইয়া পারেন না। বাচস্পতি প্রতিবিম্ববাদ গ্রহণ না করিলেও, তিনি নিজস্ব "অবচ্ছেদবাদ" অবলম্বনে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি জীবের বহুত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, যাবৎকাল একটি অবিদ্যা বর্তমান থাকে, তাবৎকাল ঈশ্বর অবিদ্যা-বিষয় বলিয়া তিনিও থাকেন, এবং মুক্তজীব ঈশ্বরেই বিলীন হইয়া যায়।

ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্যা হইল অবিদ্যার বিলয়সম্বন্ধীয়। ব্রহ্মসিদ্ধিকার অবিদ্যার ধ্বংসকেই ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিমুক্তাত্মার মতে অবিদ্যা সৎ, অসৎ, সদসৎ ও মিথ্যা এই চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত হওয়ায় তাহা পঞ্চমকোটিস্বরূপ। এই মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তি এই যে, অবিদ্যার নিষেধ যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হয় তাহা হইলে নিত্য-ব্রহ্মের ন্যায় অবিদ্যাধ্বংস নিত্য হইবে ; ফলে, অবিদ্যা বিনাশের নিমিত্ত কোনরূপ আয়াসের প্রয়োজন হইবে না। এই অবিদ্যাধ্বংসকে অনির্বাচ্য বা "মায়া"রূপে গণ্য করা যায় না। কারণ মায়া জ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত হয়, কিন্তু কোন জ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যার ধ্বংসকে অপসারিত করা যায় না। কিন্তু অদ্বৈতবিদ্যাচার্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, অবিদ্যার বিনাশ অবিদ্যার ন্যায়ই অনির্বাচ্য, কারণ উৎপাদ ও বিনাশ সমস্তরের সত্তাসম্পন্ন হয়।

<u>যুক্তি-বিচারের ভিত্তিতে আক্রমণ ও সমর্থন</u> : উপর্যুক্ত অসংখ্য মতভেদ হইতে ইহাই দেখা যায় যে, অদ্বৈতবাদিগণ "মায়া" ও "মিথ্যা"র কল্পনাকে বর্ণনাত্মক তার্কিক প্রত্যয়রূপেই উপযোগ করিয়াছিলেন, মূল্যদ্যোতক প্রত্যয়রূপে নহে। তথাপি শংকর যে জগৎকে পুনঃ পুনঃ সৎ হইতে ভিন্ন বলিয়াছিলেন, তাহাতে বিচলিত হইয়া তাঁহার সমালোচকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কেহ তাঁহার মতে বিজ্ঞানই একমাত্র সৎ, কেহ তাঁহার মতে জগৎ কল্পনাসৃষ্ট, এবং কেহ বা তিনি শূন্যবাদী—এইরূপে তাঁহার দর্শনকে দেখিতে থাকেন। অপরপক্ষে,

অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের যুক্তিসৌধটি সম্পূর্ণরূপে তাহার মিথ্যাজ্ঞানসম্পর্কীয় মতবাদভিত্তিক হওয়ায় প্রত্যেক বিরোধী সম্প্রদায় তাহার খণ্ডন করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করিতে থাকেন। অদ্বৈতবাদিগণের দৃষ্টিতে চরমতত্ত্ব ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও স্বতঃপ্রকাশ হওয়ায় তাঁহারা নিজেদের জ্ঞানসম্পর্কীয় বিচারে সর্বদা সত্য মাত্রেরই—তাহা নিরপেক্ষ চরম সত্য বা সাপেক্ষ সত্য যাহাই হউক না কেন—স্বপ্রকাশকত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু এই মতবাদ হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, সত্তা ও জ্ঞান অভিন্ন এবং তাহা স্বপ্রকাশ। ফলে, জ্ঞান বা বোধকে আর "ধর্ম" বলিয়া গণ্য করা যায় না, পরন্তু তাহার ধর্মি-স্বরূপতা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের কতকগুলি সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ এই সকল মতবাদ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা স্বপ্রকাশবাদ নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ আক্রমণ, প্রত্যাক্রমণ ও প্রত্যুত্তর দ্বারা এক বিশাল তার্কিক-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। অপরাপর সম্প্রদায়সম্মত ভাব-ধারণা হইতে আপন সম্প্রদায়ের ধারণা-কল্পনাগুলির বিশেষত্ব প্রকট করিবার জন্য অদ্বৈতবাদিগণকে বাধ্য হইয়া সেইগুলির বিশদীকরণ এবং বিরোধী সম্প্রদায়সম্মত ধারণাগুলির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

অদ্বৈতবাদের যে কেন্দ্রীয় ধারণাটির বিরুদ্ধে বিরোধী সম্প্রদায়গুলির ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা "মায়া"। রামানুজ জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী আশ্রয় করিয়া "অজ্ঞান"-এর (অবিদ্যার) ধারণার কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। "অজ্ঞান" হইতেছে জ্ঞানের অভাব। জ্ঞানাভাবরূপ একটি অভাবাত্মক পদার্থ কিরূপে জগতের কারণ হইতে পারে? কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, অজ্ঞান কেবল একটি অভাবাত্মক পদার্থ নহে, পরন্তু তাহা ভাব পদার্থ। সুষুপ্তিতে যখন আমাদের কোন বিষয়ের জ্ঞান হয় না, তখন আমরা অজ্ঞানকে উপলব্ধি করি। "আমি সুষুপ্তাবস্থায় কোন বিষয়কে জানি নাই" এইরূপেই ইহার উপলব্ধি হয়। ইহা যে অভাব পদার্থ নহে তাহার কারণ অভাব মাত্রই কোন বিশিষ্ট বস্তুর অভাব। যে বস্তুর বাস্তবিক কোন সত্তা নাই, তাহার অভাবের কোন অর্থ আছে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। যে বস্তু নাই তাহার অভাব সাধারণভাবে তাহার প্রতিযোগী। এইরূপ যে অভাবের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা যায় না, তাহাও তাঁহাদের দ্বারা স্বীকৃত নহে। আবার, "আমি কিছু জানি নাই" এইরূপ বলিতে হইলে কোন ব্যক্তির যে জ্ঞান ছিল না, এইরূপ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সুতরাং, সুষুপ্তিতে যে আমাদের কোন জ্ঞান ছিল না ইহা সত্য নহে। তৎকালে যাহা বিষয়রূপে প্রতিভাত

হইয়াছিল সেই "অজ্ঞান"টিও জ্ঞানের কোন বিশেষ বিষয় হইবে। অতএব, অজ্ঞান একটি ভাব-পদার্থ।

কিন্তু জগৎ যদি ভাবপদার্থ হয়, তাহা হইলে শঙ্কর তাহাকে "মিথ্যা" (মায়া) বলিলেন কেন? মধ্বের শিষ্য ব্যাসতীর্থ তাঁহার 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থে "মায়ার" ধারণার অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য উহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতী এই সকল আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য তাঁহার 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাহাতে "মায়া"র ধারণাটির অধিকতর বিশদ ব্যাখ্যা করেন। এই বাদানুবাদের কয়েকটি আলোচ্য বিষয় এই স্থলে দেওয়া যাইতে পারে। ব্যাসতীর্থ অদ্বৈতবাদিগণের সম্মুখে এইরূপ একটি কূটন্যায় উপস্থিত করেন; জগতের মিথ্যাত্ব যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে জগৎ সৎ হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে জগতের মিথ্যাত্ব যদি মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সৎ পদার্থ থাকিবে। উভয় বিকল্পই ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের প্রতিকূল। অদ্বৈতবাদিগণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, প্রথম বিকল্পটি স্বীকার করিলেও জগতের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। জগতের মিথ্যাত্ব এবং সেই মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব, উভয়ই চরমতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হওয়ায় একই পর্যায়ভুক্ত।

মায়াকে যে অনির্বচনীয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ ইহা যে সৎ নহে, অসৎ নহে, উভয় নহে এবং উভয় ভিন্নও নহে এইরূপ বলা হইয়াছে—ইহার বিরুদ্ধে ব্যাসতীর্থ যে আপত্তি করিয়াছেন তাহারও অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আপত্তিটি হইতেছে এই যে, যদি কোনও পদার্থ সৎ না হয় তাহা অবশ্যই অসৎ হইবে, এবং যদি তাহা অসৎ না হয়, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই সৎ হইবে। সদসৎ বা সদসৎভিন্ন কোনও পদার্থ অপ্রসিদ্ধ। অদ্বৈতবাদিগণ ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন যে, সৎভিন্ন হইলেই তাহা নিশ্চয়ই অসৎ হইবে এইরূপ নহে। মিথ্যাবস্তু সৎ ও অসৎবিলক্ষণ তৃতীয় জাতীয় পদার্থ। যাহা ব্রহ্মের ন্যায় অবাধিত তাহাই সৎ এবং যাহা শশশৃঙ্গবৎ অলীক এবং যাহা কখনও উপলব্ধির বিষয় হয় না তাহাই অসৎ। মিথ্যাবস্তু বাধিত হয় বলিয়া তাহা সৎ নহে, অপরপক্ষে ভাবপদার্থরূপে প্রতিভাত হয় বলিয়া তাহাকে অসৎও বলা যায় না। অতএব তাহা সৎ ও নহে অসৎও নহে। ইহার তাৎপর্য এই যে, 'চরম সত্তা' ও 'চরম অসত্তা', ইহারা অত্যন্ত বিসদৃশ বা বিপরীত হইলেও তাহারা পরস্পরবিরোধী নহে; ফলে তৃতীয় বিকল্পের সম্ভাবনা থাকায় "মিথ্যা"র উপপত্তি হয়।

মধুসূদন তদনুযায়ী "মিথ্যা"ত্বের পাঁচটি বিকল্পলক্ষণ প্রণয়ন করিয়াছেন। যুক্তির দিক হইতে এই সকল লক্ষণের মূল ভাবটি হইল এই—যে আশ্রয়ে যাহা অনুভূত হয়

সেখানেই তাহা বাধিত হইলে তাহা মিথ্যা। অনুভূত হয় বলিয়া "মিথ্যা বস্তু"কে বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় অসৎ এবং বাধিত হয় বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায় সৎ বলা যায় না।

কিন্তু ভ্রমের স্বরূপ কি? তাহা কি এক বস্তুতে অপর বস্তুর অনুভবই নহে? কিন্তু তাহা হইলে সম্মুখবর্তী পদার্থ এবং তাহাতে যে পদার্থের ভ্রান্তি হয়, এই উভয় পদার্থই সৎ হওয়ায় মিথ্যাবস্তুকে সদসৎ-বিলক্ষণ না বলিয়া সৎ বলা উচিৎ। 'অখ্যাতি' ও 'অন্যথাখ্যাতি' বাদ ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়টির বস্তু-সত্তা স্বীকার করে। প্রথমোক্তটি প্রভাকরানুবর্তী মীমাংসক ও দ্বিতীয়টি নৈয়ায়িকগণ দ্বারা সমর্থিত। অদ্বৈতবাদী মতটি 'অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদ' নামে প্রসিদ্ধ। অন্যান্য প্রচলিত মতবাদগুলি এই তিনটি মতবাদেরই রূপান্তর। অখ্যাতিবাদ (অগ্রহণ) অনুসারে পুরোবর্তী পদার্থ ও ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় যে পদার্থ, এই দুইটির মধ্যের ভিন্নতার অগ্রহণই ভ্রম। ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়রূপে যে পদার্থটির প্রকাশ ঘটে তাহা স্মৃত সৎ পদার্থ। অন্যথাখ্যাতিবাদ (এক বস্তুকে অপর বস্তুরূপে জ্ঞাত হওয়া) অনুসারে সম্মুখবর্তী পদার্থটিকে অন্যত্র প্রত্যক্ষ এবং বর্তমানে স্মৃত অন্য কোন পদার্থরূপে জ্ঞাত হওয়াই ভ্রম। অদ্বৈতবাদিগণ ইহার বিপক্ষে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে 'অখ্যাতি' রূপ যে অগ্রহণ তাহা অভাবাত্মক হওয়ায় তাহার দ্বারা মিথ্যাসর্পজন্য ভীতি প্রভৃতির ব্যাখ্যা হয় না এবং ভ্রমে আমাদের কোনরূপ স্মরণের অনুভব হয় না। তাঁহারা দ্বিতীয় মতবাদটিকেও অনুরূপ যুক্তিতেই অগ্রাহ্য করেন। চাকচিক্যযুক্ত যে পীতবস্তুটি স্বর্ণরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা যদি স্বর্ণের স্মৃতি হইত, তাহা হইলে তাহা আমাদিগকে তাহার প্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্ত করিত না। অর্থাৎ, ভ্রান্তির বিষয়টি স্মৃত নহে, তাহা প্রত্যক্ষবস্তু; এবং ভ্রান্তিকে একপ্রকারের স্মৃতিরূপে গণ্য না করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষরূপেই গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং ভ্রান্তির বিষয়টি সৎ নহে। তাহাকে কল্পিত পদার্থও বলা যায় না, কারণ কল্পিত বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব, ভ্রান্ত বিষয়টি সদসৎ-বিলক্ষণ অনির্বাচ্য (অর্থাৎ, সৎ বা অসৎ রূপে যাহার নির্বচন হয় না)।

জ্ঞান বা সত্যতার স্বপ্রকাশতাবিষয়ক জ্ঞানীয় সমস্যাটি উপরোক্ত সমস্যার সহিত জড়িত। কোনও প্রত্যক্ষের অভ্রান্ততা বা প্রামাণ্য কিরূপে জ্ঞাত হয়? 'ইহা সর্প' এইরূপ ভ্রমস্থলে দৃষ্ট হয় যে, ভ্রান্তজ্ঞান তাহার উত্তরকালীন 'ইহা রজ্জু' এইরূপ জ্ঞান দ্বারা নিষিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় জ্ঞানটির দ্বারাই প্রথম জ্ঞানটির ভ্রান্ততা জানিতে পারা যায়। অতএব, অদ্বৈতবাদিগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, অপ্রামাণ্য বা ভ্রান্ততা স্বতঃপ্রকাশ নহে, পরন্তু তাহা অন্য কোন অন্তরানুভব দ্বারাই জ্ঞাত হয়। (পরতঃ অপ্রামাণ্য) কিন্তু "ইহা রজ্জু" এই জ্ঞানটির সত্যতা কিরূপে প্রকাশিত হয়? তাহার প্রামাণ্য কি তাহার দ্বারাই প্রকাশিত হয়, অথবা জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা রাখিয়াই তাহার প্রামাণ্য সূচিত হয়?

অদ্বৈতবাদিগণ প্রথম কোট আশ্রয় করিয়া স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ সমর্থন করেন। ইহা দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত করা হয় যে জ্ঞানমাত্রই স্বতঃপ্রমা বা স্বরূপতঃ অভ্রান্ত, কিন্তু তাহা জ্ঞানান্তর দ্বারাই বাধিত বা অপ্রমা হয়। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ মতে প্রমাত্ব বা অপ্রমাত্ব কেহই জ্ঞানের স্বভাব নহে এবং তাহাদের জ্ঞাপনও অপরকে অপেক্ষা রাখিয়াই হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গুলির কার্যের দোষ বা গুণই প্রত্যক্ষকে প্রমাত্ব বা অপ্রমাত্ব দান করে। এইস্থলে তাঁহারা জ্ঞান ও যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের সহিত শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নের মিশ্রণ করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক নৈয়ায়িকসিদ্ধান্তের মূল বক্তব্যটি এই যে, জ্ঞান কখনই স্বভাবতঃ ভ্রান্ত অথবা অভ্রান্ত হইতে পারে না। তাহার ভ্রান্তি ও অভ্রান্তি অপরসাপেক্ষ। সাংখ্য-দার্শনিকগণ মতে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়েই জ্ঞানের স্বভাবান্তর্ভুক্ত। এবং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে জ্ঞান স্বভাবতঃ ভ্রান্ত কিন্তু প্রবৃত্তিসফলতা (অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্ব) ইত্যাদি অন্য কিছুর সাহায্যেই তাহা প্রমা হইয়া উঠে। অদ্বৈতবাদিগণ এইসকল মতবাদগুলির কোনটিকেই গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। "অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্বকে" তাঁহারা জ্ঞানের প্রমাত্ব বা বস্তুসত্তার জ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রবৃত্তিসফলতা কেবল ব্যবহারিক সত্তা বা সত্যের প্রতিপাদক হইতে পারে, চরম তত্ত্ব বা সত্যের প্রতিপাদন তাহার দ্বারা হইতে পারে না। কদাচিৎ ভ্রান্তজ্ঞানও প্রবৃত্তি সফল করিয়া থাকে।

দৃশ্যমান জগৎ যদি অনির্বাচ্য হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই জাগতিক পদার্থের তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য নৈয়ায়িকগণ যে সকল লক্ষণ প্রণয়ন করিয়া থাকেন তাহাদের নির্বচন অসম্ভব হইয়া পড়ে। নৈয়ায়িকমতে বিষয়মাত্রেরই নিজস্ব সত্তা ও নির্দিষ্ট স্বরূপ আছে। অদ্বৈতবাদিগণ নির্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রের সত্তা স্বীকার করেন এবং বিশেষ বিশেষ পদার্থ-গুলির কোন নির্দিষ্ট স্বরূপ আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। সংক্ষেপতঃ তাঁহাদের মতে যাহা কিছু বিশেষ করে, তাহাই মিথ্যা, অনির্বাচ্য। অপরপক্ষে নৈয়ায়িকগণ ইহার প্রত্যুত্তররূপে অকাট্য লক্ষণরাশি উপস্থিত করেন। উদয়নাচার্যের "লক্ষণাবলী" এই জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। শ্রীহর্ষ এই সকল লক্ষণের স্বগতঃ-বিরোধ প্রদর্শনদ্বারা তাহাদের খণ্ডন করেন। তিনি কারণ, দ্রব্য, গুণ, সম্বন্ধ ইত্যাদির খণ্ডনে যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা ব্র্যাডলের "Appearance and Reality" নামক গ্রন্থের প্রত্যয়পরীক্ষার পূর্বানুভব বলা যাইতে পারে। অবশ্য শ্রীহর্ষের পূর্বে বিখ্যাত বৌদ্ধ-তার্কিক নাগার্জুন তাঁহার "মূল-মধ্যমক-কারিকা" গ্রন্থে অনুরূপভাবে প্রত্যয় পরীক্ষায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এবং বস্তুতঃ শ্রীহর্ষ ও নাগার্জুনের যুক্তিরাজিও অভিন্ন। উভয়েরই পরপক্ষের খণ্ডনই লক্ষ্য এবং তাঁহাদের এইরূপ কোন স্বপক্ষ নাই,

যাহা পূর্ব্বপক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। উভয়েই সকলপ্রকার বিশিষ্টতার স্বরূপশূন্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সৎ, অসৎ ও সদসৎবিলক্ষণ—ইহার কোনটির দ্বারাই যে তাহার নির্বচন হয় না ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীহর্ষ যেস্থলে সকলপ্রকার বিশেষণাদির অন্তরালস্থিত নির্বিশেষ চৈতন্যকেই একমাত্র সৎপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, নাগার্জুন সেইস্থলে স্বরূপশূন্যতাই তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

প্রাচীন দার্শনিক সম্প্রদায়ের উপর অদ্বৈতবাদের প্রভাব: শঙ্করাচার্য উপনিষদের অদ্বৈত প্রতিপাদক অংশগুলিকেই প্রাধান্য দান করিয়া তাহাদিগকে যুক্তি ও শৃঙ্খলাসম্মতভাবে উপস্থাপিত করেন। বৌদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়া তিনি যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তাহার ফলে তাঁহার চিন্তাধারা শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাবধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। "আগম" ও বিচার-বিবেচনা যে কোন প্রকারের অদ্বৈততত্ত্বেরই প্রতিপাদক, এই বিষয়ে তাহারা একমত। কাশ্মীরে বসুগুপ্ত অদ্বৈতবাদের আবাহন করিয়া শৈববাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে শৈবাদ্বৈতের সৃষ্টি হয়। তিনি উপনিষদের ব্রহ্মকে শৈব আগমের শিব হইতে অভিন্ন কল্পনা করিয়া শিব ও জীবের তাদাত্ম্য প্রচার করেন। কিন্তু মায়া যে সৎ নহে, ইহা স্বীকার করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তিভেদ বলিয়া তাঁহা হইতে অতিরিক্ত নহে। জগৎসৃষ্টি এই শক্তিরই পরিণাম। কোন কোন অদ্বৈতবাদীর মতে জগৎ মায়ার পরিণাম এবং ব্রহ্মের বিবর্ত, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কাশ্মীরীয় শৈববাদ এই মতবাদে একমাত্র মায়া অসৎ ইহা ব্যতিরেকে অপর কিছুই আপত্তিকর দেখে না। উপরন্তু শংকর স্বয়ং মায়াকে "মায়াশক্তি" আখ্যা দান করিয়াছেন। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারে বসুগুপ্ত নিজ দর্শনকে গৌড়পাদের ন্যায়—জাগৃতি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—আত্মার এই অবস্থাত্রয়ের উপরই ভিত্তি করিয়া রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়পাদ ও শংকর "চতুর্থাবস্থা"কেই শুদ্ধ আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলেও, বসুগুপ্ত তাহাতে অশুদ্ধতা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে "আকাশ-স্বরূপ" বলিয়াছেন। আত্মা হইতে অভিন্ন "শিব" হইলেন পঞ্চমাবস্থা।

শাক্ত আগমের দার্শনিক চিন্তা কাশ্মীরীয় শৈববাদ হইতে ভিন্ন নহে। উভয়ের মধ্যে কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে বল্লভাচার্য অদ্বৈতবাদীরূপে সমধিক প্রসিদ্ধ। "অদ্বৈত" তত্ত্বের প্রতিনিষ্ঠায় তিনি শংকরকেও অতিক্রম করিতে চাহিয়াছিলেন এবং মায়ার আশ্রয় না করিয়াই তাহা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। তদনুযায়ী তিনি স্বপ্রবর্তিত ভাবধারার "শুদ্ধাদ্বৈত" রূপে

পরিচয় দান করেন। তিনি জীবকে অসৎ না বলিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় ব্রহ্মেরই অংশরূপে গণ্য করেন।

শুক অদ্বৈত দৃষ্টিভংগী হইতে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনা করিলেও নিজকে "ভাগবত" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

অপ্পয় দীক্ষিত নীলকণ্ঠের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর যে টীকা রচনা করেন, ইতিপূর্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। অপ্পয় যে কৃতকার্য হন নাই তাহার কারণ রামানুজ যেরূপ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত একনিষ্ঠ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন, নীলকণ্ঠ সেইরূপ শৈবসম্প্রদায়ের একনিষ্ঠ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন।

ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অদ্বৈতবাদ শিখধর্মকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। শিখ সন্ন্যাসীদিগের "উদাসীন" শাখা শংকর মতের সর্বথা অনুসরণ করেন। ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ ও গীতার উপর রচিত শাংকরভাষ্যগুলির অনুশীলন তাঁহাদের অবশ্য করণীয়গুলির অন্যতম।

সমসাময়িক অদ্বৈতবাদী

ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে শংকর প্রবর্তিত "স্মার্ত" নামক সম্প্রদায় সর্বাধিক সম্মানিত। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তাঁহার দর্শনের পরম্পরাগত রূপটির পঠন-পাঠন অদ্যাবধি সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনগণ পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ পরিচিত নহেন। যাঁহারা পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত, তাঁহাদের ভাবধারায় প্রতীচ্যদর্শনেরও গভীর প্রভাব দৃষ্ট হয়। ডঃ রাধাকৃষ্ণন্, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ডঃ ভগবান দাস ও জে. কৃষ্ণমূর্তি ইঁহারা সকলেই কোন না কোন প্রকারের অদ্বৈতবাদী। রাধাকৃষ্ণন্ ও ভগবানদাস জগৎকে সৎ ও অসৎ ব্যতিষক্ত বলিয়া গণ্য করেন, এবং শংকরের রচনায় অবশ্যই তাহার কিঞ্চিৎ সমর্থন আছে (সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য)। অপরপক্ষে শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই জগৎকে বাস্তবিক সৎ বলিয়া গণ্য করেন। অরবিন্দের নিজস্ব চিন্তাধারায় শাক্তবাদ ও কাশ্মীরীয় শৈববাদের আনুকূল্য দৃষ্ট হয় এবং রবীন্দ্রনাথ আপন ভাবধারার ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় অদ্বৈতবাদের নিকটবর্তী। রবীন্দ্রনাথ চরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মের ব্যক্তিস্বরূপতা স্বীকার করেন। যাঁহারা মায়াকে সৎ ভিন্ন অন্যরূপে স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহারা স্বভাবতঃই অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়া থাকেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে শংকরের পরব্রহ্মকে অস্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে, তথাপি তিনি জীবের পক্ষে এই জাগতিক প্রতিভাসেরই অধিকতর মূল্যবত্তা

ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। কৃষ্ণমূর্তি বের্গসঁর 'এলাঁ ভিতাল' সদৃশ "প্রাণ"কেই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থিত শক্তি বলিয়াছেন। গান্ধীজির ভাবধারার দার্শনিক পটভূমিকাটিও অদ্বৈত-তত্ত্বেরই অনুপন্থী। এই সকল চিন্তানায়কগণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণন্ই শঙ্করের একনিষ্ঠ অনুবর্তী। রবীন্দ্রনাথ নিজ চিন্তায় বহুলাংশে বৈষ্ণবধর্ম ও প্রেমধর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। ভগবান দাসের মতে ব্রহ্ম "অহং" মাত্রস্বরূপ নহেন, পরন্তু বিষয়ী, বিষয় ও তাহাদের মধ্যের নেতিবাচক সম্বন্ধকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া তিনি "আমি-তাহা-নহি" (অহম্-এতন্ ন) স্বরূপ।

দার্শনিকগণের মধ্যে প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিপাদন করিবার প্রবণতা বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে। শংকরের উপদেশসমূহের বিবৃতি ও ব্যাখ্যার পরিবর্তে তাঁহারা প্রতীচ্য ধারানুযায়ী চিন্তার সাহায্যেই অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদন করেন। এই জাতীয় চিন্তানায়কগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কাণ্টের জ্ঞানের চরমাদর্শ সম্পর্কীয় অজ্ঞেয়বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মের উপলব্ধি কিরূপে সম্ভবপর তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপলব্ধি অবশ্যই কোনপ্রকারের প্রাকৃত বুদ্ধি হইতে পারে না, পরন্তু রাধাকৃষ্ণন্ যাহাকে "অখণ্ড বোধি" আখ্যা দান করিয়াছেন তদনুরূপ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য

১। **Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute** ষড়বিংশ খণ্ডের প্রথম ভাগে প্রকাশিত প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ **"An Uunoticed Aspect of Gaudapada's Mandukya-karikas"** দেখুন।

২। সিদ্ধান্ত-লেশ-সংগ্রহ, পৃঃ ৫৭ ইঃ (হরিদাস গুপ্ত অ্যাণ্ড সন্স্, বারাণসী)

৩। ঐ

৪। সর্বদর্শনসংগ্রহ, পৃঃ ১৪৪ (আনন্দাশ্রম সং)

৫। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, পৃঃ ১৮৯

৬। সিদ্ধান্ত-বিন্দু, পৃঃ ২৬ (গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ)

গ্রন্থবিবরণী

রাধাকৃষ্ণন্, এস্—**Indian Philosophy**, ২য় খণ্ড

দাসগুপ্ত, এস্, এন্—**History of Indian Philosophy** ১ম ও ২য় খণ্ড

শাস্ত্রী, এস্, সূর্যনারায়ণ—**Siddhanta-lesa-samgraha (English translation)**

শাস্ত্রী, অশোকনাথ—**Post-Sankara Dialectics**

রাজু, পি, টি—**Thought and Reality ; Hegelianism and Advaita.**

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বেদান্ত—বৈষ্ণব (ঈশ্বরবাদী) সম্প্রদায় সমুহ

অ। রামানুজ (বিশিষ্টাদ্বৈত)

ভূমিকা

আধুনিক যুগে বেদান্তই ভারতবর্ষের প্রাণবন্ত দর্শন। বেদান্ত জনপ্রিয় ; কারণ, ইহা একই সঙ্গে একটি মতবাদ ও জীবনযাপনের প্রণালী। একদিকে উহা পরমসত্তা ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিক জিজ্ঞাসা, আবার অপর দিকে জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্যরূপে ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সাধন। বেদান্তের মুখ্য সম্প্রদায় তিনটি—অদ্বৈত, দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত। এগুলির মধ্যে অদ্বৈত এত প্রসিদ্ধ যে, কখনও কখনও বেদান্তকে অদ্বৈত-মত হইতে অভিন্ন বলিয়া গণ্য করা হয়, এবং দ্বৈত মতের মধ্যে যুক্তি-নিরপেক্ষ ও বস্তু-তান্ত্রিক প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও, ইহাকে একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করা হয়। সমন্বয়মূলক প্রেমের দর্শনরূপে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের গুণ এই যে, উহাতে চরম অদ্বয় ও ঈশ্বরবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্যান্য সমন্বয়সাধক দর্শনের ন্যায় ইহার সম্বন্ধেও উহার অনুগামী এবং সমালোচক উভয়েই ভ্রান্ত মত পোষণ করেন। ধর্মমতরূপে ইহাকে শ্রীবৈষ্ণববাদ বলা হয়। ইহার আধুনিক নেতৃস্থানীয় ব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে অনেকে উহাকে সগুণ অদ্বৈত অথবা বিশেষণযুক্ত অদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করেন, কিন্তু তখন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ইহার একটি মূল মত এই যে, জীব দ্রব্যও বটে আবার গুণও বটে।

দ্বৈতবাদী নির্বন্ধসহকারে বলেন—জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে চিরন্তন বৈলক্ষণ্য ও ভেদ রহিয়াছে, ভেদাভেদবাদীরা জীব এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধ দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই, এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্বেশ্বরবাদী বলেন, 'সমস্তই ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরই সমস্ত'। কিন্তু উক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এই সকল মত হইতে পৃথক, কারণ এই মতে ঈশ্বর সর্বভূতে অন্তর্যামীরূপে অনুস্যূত হইয়া আছেন, আবার একই সঙ্গে তিনি বিশ্বাতীতও। সত্তা ও মূল্য এক, এবং ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিবার কারণ এই যে, উহা স্বরূপতঃ অসীম এবং একই সঙ্গে উহা সসীম আত্মার মধ্যস্থ বস্তুটিকে ধ্বংস না করিয়া উহাকে অসীম করিতে অর্থাৎ ব্রহ্মে পরিণত করিতে পারে। তথাপি, বিশিষ্টাদ্বৈত নামের সহিত পরম্পরাগত যে সকল

ধারণা জড়িত আছে তাহার জন্য এবং ঐতিহাসিক বিকাশে উহা যে অর্থসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহার জন্য এই মতের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নাম বজায় রাখা যাইতে পারে।

বিশিষ্টাদ্বৈত মূলতঃ ধর্ম-মূলক দর্শন। এই দর্শনে 'যুক্তি' এবং 'বিশ্বাস' এক হইয়া যুক্তিসম্মত বিশ্বাসে পরিণত হয়। ইহার আলোচ্য প্রশ্ন এই, "যাহা জানিলে সব কিছুই জানা যায় তাহা কি?" এবং উত্তর এই, "ইহা হইতেছে ব্রহ্ম"।[১] সদ্বস্তুকে জানা অথবা উপলব্ধি করা সম্ভবপর, উহা অজ্ঞেয় নহে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের[২] বরুণ ও তৎপুত্র ভৃগুর সংবাদ এই যুক্তিসম্মত বিশ্বাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিষ্যের মুখ হইতে গুরু এই উত্তর বাহির করিলেন যে, ব্রহ্ম অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়; এবং শিষ্য একপ্রকার আধ্যাত্মিক যুক্তি-প্রক্রিয়াদ্বারা এই কথাগুলির সত্যতা ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করার চেষ্টা করিলেন।

বেদান্তের অন্য সম্প্রদায়গুলির ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতেরও ইতিহাস স্মরণাতীত ঐতিহ্যের প্রামাণ্য দাবী করে। ইহা তিনটি প্রামাণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যথা—(১) উপনিষদের ঋষিগণ, (২) বাদরায়ণের বেদান্তসূত্র—ইহাতে ঋষিদের সাক্ষাৎ অনুভূতিগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে (৩) উপনিষদের সার গীতা। বিশিষ্টাদ্বৈতের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাতা রামানুজ তদীয় বেদার্থ-সংগ্রহে ও বেদান্ত-সূত্রভাষ্য শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন যে, তাঁহার মতবাদ প্রাচীন আচার্য-রচিত বোধায়ন-বৃত্তির উপর এবং তৎ-পূর্ববর্তী দ্রমিড়, টঙ্ক এবং গুহদেবের প্রাচীন উপদেশের উপর স্থাপিত। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মরমী নম্মাল্বারের উপদেশের মধ্যেও রামানুজীয় সিদ্ধান্তের মূল পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতীয় ভাগবত সম্প্রদায়ের অনুগামী নাথমুনি (জন্ম খৃঃ ৮২৪-দক্ষিণ আর্কট) তামিল ভাষায় রচিত আল্বারদের দিব্য সঙ্গীতগুলিকে তাঁহার প্রসিদ্ধ উভয়-বেদান্ত নামক মতবাদে বেদান্তের সমস্তরে উন্নীত করিয়াছিলেন। উভয়-বেদান্তে বলা হইয়াছে যে, শুধু মুখের শব্দ নহে কিন্তু হৃদয়ের ভাষাই যথার্থ আধ্যাত্মিক ভাষা। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টাদ্বৈতমতের উপদেষ্টার নাম আলবন্দার। তিনি নাথমুনির পৌত্র। তিনি পঞ্চরাত্রের বৈদান্তিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার পরেই আসেন রামানুজ (জন্ম খৃঃ ১০১৭) তিনি আলবন্দারের বৈদান্তিক উত্তরাধিকারী ও বিশিষ্টাদ্বৈতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। শঙ্কর বৌদ্ধ নির্বাণের পুনর্ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং এইভাবে তিনি অদ্বৈতের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। শংকরের পরে আসেন ভাস্কর। 'উপাধি' ও ভেদাভেদ স্বীকার করিয়া তিনি শংকরের মায়াবাদ খণ্ডন করেন। ভাস্করের পরবর্তী যাদব ভেদাভেদ তত্ত্বটির অধিক বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাহার পর রামানুজ তাঁহার প্রেমের সমন্বয়মূলক মতবাদদ্বারা দার্শনিক বিচারকে নূতন পথে চালিত করেন।

তাহার অল্পপরেই উভয়-বেদান্তে প্রভুও শ্রীরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ এবং ভক্তিও প্রপত্তির অর্থ-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ উৎপন্ন হইয়াছিল। বেদান্তদেশিক এই উভয় মতের মোটা-মুটিভাবে সামঞ্জস্যসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পিল্লৈলোকাচার্য তামিল বেদান্ত, একেশ্বরের ধারণা ভগবৎকৃপার ফলবত্তা এবং ঈশ্বর সেবার (কৈঙ্কর্য) সামাজিক দিকের উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন।

"যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরমপুরুষার্থ লাভ করেন"[৩] এই উপনিষদ্-বাণীতে প্রকাশিত তত্ত্ব, হিত এবং পুরুষার্থ এই তিনটি শীর্ষকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিপাদন করাই ইহার প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি; এবং বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতের ব্যাখ্যার এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হইয়াছে। এখানে ব্রহ্ম, অচিৎ ও চিৎ এই তিন সদ্বস্তুর (অথবা তত্ত্বের) জ্ঞান, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় (অথবা হিত) এবং ব্রহ্ম-প্রাপ্তির স্বরূপ (অথবা পুরুষার্থ) এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কাণ্ট দর্শনের মূল প্রশ্নটিকে এইভাবে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, "আমি কী জনিতে পারি ?" "আমার কী করা উচিত ?" এবং "আমি কী আশা করিতে পারি ?" কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতের এই পদ্ধতি ইহাপেক্ষা অধিক সমীচীন। কারণ, ইহাতে সন্দেহবাদ পরিহার করা হয় এবং অধিবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধিত হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতের অধিবিদ্যার মধ্যে প্রমাতত্ত্ব ও প্রমাণ সমূহের আলোচনা এবং সত্তাশাস্ত্র অথবা তত্ত্ব-ত্রয়ের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। বিশিষ্টাদ্বৈতীয় নীতিবিজ্ঞানে সাধনসমূহ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় সকল আলোচিত হইয়াছে এবং উহার ধর্মতত্ত্বে মুক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

জ্ঞানতত্ত্ব

সদ্বস্তুকে জানা সম্ভবপর, ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতী প্রমাতত্ত্বের প্রধান ধারণা। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, অনুমিতি এবং ব্রহ্মজ্ঞানরূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতি এই সবগুলিই 'দর্শন' এই ব্যাপক অর্থে জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সত্তা ও জ্ঞানের মধ্যে সেতুহীন ব্যবধান আছে এইরূপ বলিলে প্রমাতত্ত্ব অপ্রমাতত্ত্ব হইয়া পড়ে, এবং সন্দেহবাদ ইহার অনিবার্য ফল। কাণ্ট পারমার্থিক সত্তা ও প্রতিভাত সত্তার যে বিরোধ স্বীকার করিয়াছেন, ব্র্যাড্‌লি সদ্বস্তু ও আভাসের মধ্যে যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, এবং শংকর পারমার্থিক সত্য ও ব্যবহারিক সত্যের মধ্যে যে ভেদ মানিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একই বিচার-প্রবণতা স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। রামানুজ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, বিজ্ঞান ও দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মের অখণ্ড ও সাক্ষাৎ অনুভূতি পর্যন্ত সর্ব-স্তরেই জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া এই সঙ্কট পরিহার করিয়াছেন। ব্রহ্মই পরম সত্য এইভাবে যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞান (ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা)

হইলে উহা হইতে পরে ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি (ব্রহ্মানুভব) হয়। জ্ঞান হইতেছে সত্তাবিষয়ক নিশ্চয়, এবং নিষেধও তৎপূর্ববর্তী নিশ্চয় ব্যতীত সম্ভবপর নহে। ব্রহ্ম সত্য হইলে, ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত জগৎও সত্য এবং আমরা অংশের জ্ঞান হইতে পূর্ণের জ্ঞানে উপনীত হইতে পারি। জ্ঞানের সত্যতার নির্ধারক (Criterion) জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত। তত্ত্বজ্ঞান সত্য ; উহা ক্রমশঃ অধিকাধিক সত্যতা লাভ করে এবং পরিশেষে উহা পরম তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ সদ্বস্তুর শাশ্বত মূল্যরূপে পূর্ণ চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রামানুজ ব্রহ্মকে জানিবার সর্ব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং 'ধর্ম-ভূত-জ্ঞান' নামক তত্ত্ব (Principle), 'অ-পৃথক্-সিদ্ধ বিশেষণ' নামক যুক্তিশাস্ত্রীয় নিয়ম, 'সামানাধিকরণ্য' নামক ব্যাকরণের নিয়ম এবং বস্তুতান্ত্রিক সংকার্য-বাদ ব্যবহার করিয়াছেন।

'ধর্ম-ভূত-জ্ঞান'বাদ অর্থাৎ 'জ্ঞান হইতেছে আত্মার গুণ' এই মত বিশিষ্টাদ্বৈতী প্রমাশাস্ত্রের ভিত্তিস্থানীয় তত্ত্ব ; কারণ, ইহা দ্বারা বাহ্যজগৎ, আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের পূর্বে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ; কারণ জ্ঞান আত্মার অত্যাবশ্যক গুণ। জ্ঞান কখনও নিজেকে জানিতে পারে না। আত্মাও উহার জ্ঞান ভিন্ন হইলেও উহারা পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য। আত্মজ্ঞান বলিলে, চেতন আত্মা ও আত্মার চেতনা এবং চিদ্বস্তু ও ধর্মভূত চৈতন্য এই দুইয়ের আলোক ও তাহার প্রকাশের ন্যায় পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়।

সূর্যের কিরণ যেরূপ একই সঙ্গে গুণ এবং বর্ণসমূহের আশ্রয়, জ্ঞানও তেমনই একই সঙ্গে গুণ ও দ্রব্য। সংসারাবস্থায় জ্ঞান অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং কর্মদ্বারা সঙ্কুচিত হয় ; ইহা বাহ্যবস্তুর প্রকাশক ; এবং ইহা সহজাত প্রবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া লোকোত্তর জ্ঞানের স্তর পর্যন্ত, স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও বুদ্ধ্যতীত মনোবিজ্ঞানে আলোচিত সর্বমানসিক অবস্থার উৎস। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—জ্ঞানের এই তিনটি অবস্থা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একই জ্ঞানের প্রকারভেদ ; সুতরাং উহারা ধারাবাহিক এবং উহাদের মধ্যে কোন স্ববিরোধ নাই। যখন জ্ঞান অবিদ্যা ও কর্ম হইতে মুক্ত হয় তখন উহা প্রসারিত হইয়া অনন্ত হইয়া যায় এবং ভগবানের অখণ্ড চেতনায় (ব্রহ্মানুভবে) পরিণত হয়।

এখন জ্ঞানের স্বভাবানুসারে (রামানুজের) প্রমাতত্ত্ব (Theory of Judgment) বিবৃত করা যইতে পারে। আত্মা সদা স্বপ্রকাশ, এবং কর্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মার এই জ্ঞান বাহ্যজগৎকে বিবিধ বিষয়রূপে অথবা সমগ্ররূপে প্রকাশ করে। সুতরাং অবধারণ স্বপ্রকাশ আত্মার জ্ঞান-ক্রিয়া দ্বারা জনিত, উহা দৃশ্য ও স্পৃশ্য জগৎ হইতে নিষ্ক্রিয়ভাবে

প্রাপ্ত মানসিক সম্মুদ্রণ (Impressions) নহে। সর্বপ্রকার জ্ঞানই সবিকল্প অথবা বিশেষণযুক্ত। উহা কখনও নির্বিকল্প অথবা ভেদহীন, নির্বিশেষ প্রত্যক্ষ নহে। রামানুজের মত এই যে, বাহ্য বস্তু জ্ঞানের বিষয় কিন্তু জ্ঞানীয় ধর্ম নহে এবং উহা বস্তু সকলকে প্রকাশ করে। এই মতের বিশেষ গুণ এই যে, উহা সরল এবং চরম বস্তুবাদ এবং চরম জ্ঞানবাদে যে অচলাবস্থা উৎপন্ন হয় তাহা পরিহার করিতে পারে। বস্তুবাদ বলে যে, বিষয় জ্ঞানের নিকট প্রদত্ত, কিন্তু চিন্তাদ্বারা নির্মিত নহে—এই দিক্ হইতে বস্তুবাদ সমর্থনের যোগ্য ; জ্ঞানবাদ স্বীকার করে যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতির পূর্ব হইতেই অস্তিত্ববান্ এবং বিষয় যে জ্ঞানের সম্পূর্ণ বাহিরে এই কথা অস্বীকার করে—জ্ঞানবাদের এই মত যথার্থ। চিৎ ও অচিৎ-এর বিষয়ী-বিষয় সম্বন্ধ হইতে জ্ঞানের উদ্ভব ; এবং প্রত্যেক অবধারণ-জ্ঞানের অন্তিম উদ্দেশ্য অথবা বিশেষ্য হইতেছে সমগ্রসত্তা। পরমাত্মাই সর্ব চিন্তক এবং চিন্ত্য বিষয়ের মধ্যে প্রকাশমান, অথচ তিনি তাহাদের ঊর্ধ্বে।

বিচার ও বস্তুর দিক হইতে অবধারণাত্মক জ্ঞানের কি অর্থ তাহা অ-পৃথক্-সিদ্ধ-বিশেষণবাদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিশেষণতাবাদ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়। "মানুষ বিচার-বুদ্ধিশীল" এই বাক্যে বিধেয় পদার্থটি উদ্দেশ্য পদার্থের অবিচ্ছেদ্য অথবা স্বরূপ-গত ধর্ম, কিন্তু উদ্দেশ্য পদার্থটি শুধু ধর্মঘটিত নহে, কিন্তু উহা হইতেও অধিক কিছু। গুণ দ্রব্য হইতে পৃথক্ হইলেও দ্রব্যে থাকে এবং দ্রব্যত্বের অধিকারী। জ্ঞাতারূপে জীবাত্মা একটি নিত্য চিন্তাশীল বিষয়ী এবং চৈতন্য উহার অবিচ্ছেদ্য গুণ (প্রকার)। বিচার সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক বাক্যের অন্তিম উদ্দেশ্য হইতেছে সমগ্র সত্তা। বিচারের দিক হইতে যাহা বিষয়ী, তাহা হইতেছে চৈতন্যগুণযুক্ত চিদাত্মা ; এবং সত্তার দিক হইতে যাহা বিষয়ী, তাহা হইতেছে আত্মার আত্মা অথবা অন্তিম দ্রব্য (প্রকারী) রূপে ব্রহ্ম। যেমন জ্ঞান হইতেছে দ্রব্য-গুণাত্মক, তেমনই চিদাত্মাও নিজে দ্রব্য আবার ব্রহ্মের গুণ বা বিশেষণ। বিচার-কারী অহংরূপে জীবাত্মা হইতেছে ব্রহ্মের প্রকার, কিন্তু নৈতিক কর্তারূপে এই অহম্ হইতেছে একটি বিশিষ্ট স্বরূপ চিদণু (Monad)। জীবাত্মা একই সঙ্গে একটি চেতন অবয়বী এবং ব্রহ্মের একটি অবয়ব।

ব্যাকরণের সামানাধিকরণ্য[৪] নিয়ম এবং মীমাংসার শব্দার্থ বিষয়ক শক্তিবাদ দ্বারাও এই একই সত্য পরিস্ফুট করা হইয়া থাকে। প্রথম নিয়মানুসারে কোন বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক শব্দগুলি একই পদার্থের নির্দেশক, যথা—'ইনি দেবদত্ত'। এই বাক্যের শব্দগুলির অর্থ বিভিন্ন হইলেও উহারা একই পদার্থে আছে এবং উহাতে যে অভেদ ব্যক্ত হয় তাহা ভেদবর্জিত নয়, ভেদযুক্ত। মীমাংসা-মতানুসারে জাতি ও গুণবোধক শব্দসকল ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি ও গুণীবোধকও বটে ; উদাহরণস্বরূপ "ইহা একটি গরু" এবং

"তুমিই তিনি" এই উপনিষৎ বাক্য। এক দ্রব্য অপর দ্রব্যের শরীর অথবা ধর্ম হইতে পারে; এবং শরীরবোধক শব্দ শরীরী অথবা আত্মাকেও বুঝাইতে পারে। শেষের উদাহরণটিতে 'তুমি' এই শব্দটির অর্থ (শরীররূপে) জীব বুঝাইলেও (শরীরীরূপে) ব্রহ্মকেও বুঝাইতে পারে। এইভাবে বেদান্তের চরম তত্ত্বের দৃষ্টিতে, বস্তু অথবা ব্যক্তি অথবা দেবতাবোধক সর্ব শব্দই সকলের উৎপত্তিস্থল, আশ্রয় এবং চরম আত্মারূপে ব্রহ্মকেও বুঝায়।

প্রামাণ্যবাদ

বিশিষ্টাদ্বৈত মতানুসারে শুধু সদ্বস্তুরই জ্ঞান হইতে পারে, এবং 'কেবল-নিষেধ' বলিয়া কিছু নাই। পরমতত্ত্ব মায়ার বিরোধী ব্রহ্ম নহে, কিন্তু উহা হইতেছে ব্রহ্মময়; এবং যেহেতু ব্রহ্ম সত্য; অতএব উহাতে প্রতিষ্ঠিত জগৎও সত্য। সত্তা ও মূল্য (কল্যাণ) পরস্পর হইতে অভিন্ন এবং যে বস্তু যত বেশী সৎ ততই উহা বেশী সত্য। অচিৎ-বস্তু চির পরিবর্তনশীল এবং উহাকে অস্থির অথবা অসৎ বলা হয়। চিৎ বা আত্মা হইতেছে নিত্য। অবশ্য ইহার জ্ঞান ইহার কর্মানুসারে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। এবং উহাকে স্থির অথবা সত্য বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্য, শুদ্ধ এবং পূর্ণ। উহাই চরম সত্তা (সত্যস্য সত্যম্)। প্রত্যেক সত্যই সত্য; এবং উহা নিজের স্বরূপ অধিকাধিক প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রসারিত হইয়া পরম সত্যে পরিণত হয়। ব্রহ্মই এই পরম সত্য, কারণ উহাই একমাত্র সদ্বস্তু যাহা সর্ববস্তুর সত্তারও সত্তারূপে উহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে স্বীয় মুখ্য সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য যতদূর সম্ভবপর কার্যকরত্ববাদ, বস্তুবাদ এবং জ্ঞানবাদ প্রভৃতি প্রামাণ্য সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার মতেরই সাহায্য গ্রহণ করা হয়। সাধারণতঃ প্রমার (সত্যের) এইরূপ লক্ষণ ধরা হয় যে, বস্তু যেইরূপ সেইরূপে উহার জ্ঞান এবং সে জ্ঞান জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধন করে।[৫] বিষয়ের স্বরূপ যদি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অনুরূপ না হয়, তাহা হইলে এই প্রত্যক্ষজ্ঞানকে ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করা হয়। শুক্তিকে রজত বলিয়া মনে করা এইরূপ ভ্রান্তির একটি উদাহরণ। মরীচিকা প্রভৃতি স্থলে কার্যকরত্বের পরীক্ষা উপযোগী। মরীচিকা মিথ্যা; কারণ, ইহা তৃষ্ণানিবারণরূপ ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধন করিতে অসমর্থ। স্বপ্ন হইতেছে 'কর্ম' রূপ নৈতিক নিয়ম দ্বারা জনিত মনের বাস্তবিক অবস্থা। জ্ঞান বিশুদ্ধ হইলে উহা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে এবং এইভাবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু সংসারাবস্থায় জ্ঞান অপূর্ণ থাকে। জ্ঞানের এই অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ অনুমান এবং শাস্ত্র এই তিনপ্রকার জ্ঞানের প্রত্যেকটিতেই সুস্পষ্ট। এই তিনটির কোনওটিতেই জ্ঞানের

পরিসমাপ্তি হয় না, কিন্তু উহারা হইতেছে জ্ঞানের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর। ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয় উহা আংশিক, তথাপি ইহাতে আমরা যেটুকু জানিতে পারি তাহাই বিশ্বাসযোগ্য। অনুমানে কার্যকারণসম্বন্ধের যথার্থতা প্রতিপাদন করা হয় এবং দার্শনিক দৃষ্টিতে কারণ যে হেতুর সহিত এবং সর্বশেষে জ্ঞানের অধিষ্ঠানের সহিত অভিন্ন তাহাও প্রমাণ করা হয়। প্রত্যেক স্থলেই প্রমা হইতেছে সত্যের দিকে অধিকাধিক প্রগতি এবং উহা শুধু অবিরোধ এবং বাধের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বরূপস্থ আবরণ নহে, কিন্তু উহা হইতেছে কর্ম। এই অবিদ্যা জীবের একটি দোষ বা অপূর্ণতা এবং যখন জীব এই অপূর্ণতাকে দূর করিতে চেষ্টা করে, তখন সে ব্রহ্মকে পাইতে চাহে অথবা মমুক্ষু হয়।

তত্ত্ববিদ্যা

বিশিষ্টাদ্বৈতীয় তত্ত্ববিদ্যার মুখ্য সিদ্ধান্ত এই যে, অধিবিদ্যার চরমতত্ত্ব এবং ধর্মের ঈশ্বর পরস্পর হইতে অভিন্ন। সাধারণতঃ নির্গুণব্রহ্মের অর্থ এইরূপ করা হয় যে উহা সম্বন্ধাশ্রয়ী বিচারের দ্বৈতভাবের ঊর্ধ্বে; এবং সগুণ অথবা ঈশ্বরবিজ্ঞানের পুরুষরূপী ঈশ্বর হইতেছেন পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের চিন্তায় সর্বোচ্চ ধারণা; কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত মতে এই নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের ভেদ অস্বীকার করা হয়। ভাস্কর ও যাদবের ভেদাভেদ সম্প্রদায়গুলিতে শ্রুতি, যুক্তি ও প্রত্যক্ষের সাহায্যে এই দুইটি দৃষ্টির মধ্যে বিরোধ প্রদর্শন করা হয় এবং যে নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণায় সত্তা ও অসত্তাকে এক করিয়া ফেলা হয়, তাহাকে শুধু বিমূর্ত চিন্তার ফল বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হয়। যদি শ্রুতি প্রথমে সগুণ ব্রহ্মের বিধান করিয়া পরে তাহার নিষেধ করে, তাহা হইলে উহা নিজে মূর্খ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। নির্গুণ-ব্রহ্ম স্বীকার করিলে নীতি ও ধর্মবিষয়ক চেতনার অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়। ('অস্থূল, অহ্রস্ব' ইত্যাদি) শ্রুতির নিষেধ বাক্যগুলি দ্বারা সমগ্রসত্তার সান্ততা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সান্ত বস্তুর নিষেধ করা হয় নাই। ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে আছেন, কিন্তু নিজে পরিচ্ছিন্ন নহেন; এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে উপলব্ধ দেশ ও কালের জগৎ যদি মিথ্যা ও অসৎ হইত তাহা হইলে বিশ্বমিথ্যাত্ব-বাদ ও শূন্যবাদই অনিবার্য হইত। রামানুজ ভাস্করকৃত দ্বৈতবাদের নিরাকরণ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মের উপাধি আছে ভাস্করের এই মত ঈশ্বরে অপূর্ণতা আরোপ করায় উহাকে সদোষ[৬] বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। প্লোটিনাস্, স্পিনোজা ও হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকের পাশ্চাত্য ব্রহ্মবাদগুলির বিশিষ্টাদ্বৈত অপেক্ষা ভেদাভেদবাদের সহিত অধিক সাদৃশ্য আছে। এক হইতে বহুর নিঃসরণ হয় প্লেটিনাসের এই মত, দ্রব্য ও তাহার বহু

প্রকার সম্বন্ধীয় স্পিনোজার দর্শন, পরস্পরবিরুদ্ধ তত্ত্বসমূহের মিশ্রণরূপ হেগেলীয় মত—এই সবগুলিই ভাস্করসম্মত উপাধিবাদের পাশ্চাত্য রূপভেদ; এমন কি বোসাঙ্কেটের বিশেষণবাদও ব্রহ্মে অপূর্ণতা আরোপ করে এই দোষে দুষ্ট। সর্বেশ্বরবাদ বলিতে যদি এমন বুঝায় যে এই মতে ব্রহ্মের বিশ্বাতীতত্ব অক্ষুণ্ণ না রাখিয়া উঁহাকে বিশ্বের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয় তাহা হইলে কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায়কেই সর্বেশ্বরবাদী বলা যায় না। বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে শংকরের যুগ হইতে রামানুজের যুগ পর্যন্ত ক্রমিকধারায় বেদান্ত মতে এই সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শংকরের মিথ্যা-উপাধি মতের পর ভাস্করের সত্য-উপাধি মত এবং যাদবের পরিণামবাদ ও নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের পর রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত আবির্ভূত হইয়াছে; এবং এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জীবনের ভ্রান্তি ও দোষগুলির জন্য সান্ত জীবকে দায়ী করা হইয়াছে।[৭] কিন্তু বাস্তবজীবনে অদ্বৈতের অনুশীলন করিতে গিয়া যে শংকর বাসুদেব অথবা সর্বাত্মার উপাসনা করিয়াছেন, তাঁহার সহিত রামানুজ অথবা প্লোটিনাসের অধিক পার্থক্য নাই। সমাধি-সুখের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে প্লোটিনাস রামানুজের নিকটতম।

রামানুজ ব্রহ্মকে পরমতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। ব্রহ্ম হইতেছেন সমগ্র সত্তা এবং সত্য, মঙ্গল, সৌন্দর্য ও আনন্দরূপ নিত্য গুণ অথবা পরম মূল্যসমূহের আশ্রয়। অদ্বিতীয় এবং অনবদ্য সদ্বস্তুরূপে ব্রহ্ম পূর্ণ; এবং তাহাতে সর্বকল্যাণতম গুণ বিদ্যমান (সত্যম্, জ্ঞানম্, অপহতপাপ্মত্বম্,[৮] সুন্দরম্ ও আনন্দম্)। এইভাবে ব্রহ্ম অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং রহস্যবাদের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক প্রয়োজন চরিতার্থ করেন।

'সত্যম্' শব্দ দ্বারা এইরূপ ব্যক্ত হয় যে ব্রহ্ম হইতেছেন প্রকৃত সদ্বস্তু, অর্থাৎ তিনি সত্যেরও সত্য, অর্থাৎ তিনি সংসারী জীব ও নশ্বর প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তিনি পরিবর্তন ও পরিণামের অধিষ্ঠানীভূত সত্তা, তিনি হইতেছেন সেই এক যাহা দ্বারা বহুর ব্যাখ্যা হয়। তিনি কালপ্রবাহস্থ নিত্য তত্ত্ব। তিনি শুদ্ধ সত্তা, এক, অথবা কালাতীত নহেন। ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ এবং জ্ঞানবান্, তিনি প্রকাশসমূহের প্রকাশ (জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ)। তিনি স্ব-সম্বদ্ধ, কিন্তু নিষেধ-প্রক্রিয়াদ্বারা প্রাপ্ত নির্বিষয়, শুদ্ধ জ্ঞান নহেন, তিনি আনন্ত্যগুণ-সম্পন্ন অনন্ততত্ত্ব (অনন্তম্)। ব্রহ্মকে শরীরী[৯] বলা হইয়াথাকে। এই শব্দটি একটি প্রতীক-রূপে ব্যবহৃত নাম; ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ববস্তুর আধার, নিয়ন্তা এবং গন্তব্যস্থল (শেষী)। তিনি এই ত্রিতয়ের ঐক্য।[১০] ব্রহ্ম হইতেছেন চিৎ ও অচিৎ সর্ববস্তুর উৎপত্তিস্থল এবং তাহাদের অন্তর্যামী, উহাদের অস্তিত্ব ব্রহ্মেরই তুষ্টিসাধনের জন্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্যামিবিদ্যাতে এই তত্ত্বপ্রতিপাদক প্রধান বাক্যটি আছে: "যিনি জীবের মধ্যে, জীবের সহিত বাস করেন, যাহাকে জীব জানে না, জীব

যাহার শরীর এবং তাহাকে যিনি ভিতর হইতে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই আত্মা, অন্তর্যামী এবং অমৃত।[১১] তাঁহাকে কেহ জানে না। তথাপি তিনি মন এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই জানেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন জ্ঞাতা নাই। অন্য সব কিছুই মন্দ"। ব্রহ্ম আমাদের জীবনেরও জীবন, তিনি অন্তর্যামী, তিনিই উপায় এবং উপেয়। তিনি আধার অর্থাৎ আমাদের সত্তারও সত্তা, তাঁহাতেই আমরা বাস করি এবং কর্ম করি; তাঁহাতেই আমাদের অস্তিত্ব। তিনিই সর্ববস্তুতে অনুস্যূত, তাহাদের অধিষ্ঠান এবং তিনিই তাহাদের অন্তঃস্থ তাৎপর্য। আধ্যাত্মিক সংযোগের জন্য ঈশ্বর ও জীবের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অত্যাবশ্যক তাহা এই ধারণা দ্বারা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় এবং ইহাতে সর্বেশ্বরবাদের দিকে যাওয়ার প্রবণতা পরিহার করা হয়। এই মতে জীব ও ঈশ্বরের (আত্মা ও পরমাত্মার) ভেদ স্বীকৃত হইলেও এরূপ বলা হয় না যে উহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। ব্রহ্ম জীবের নিয়ন্তা এই ধারণা দ্বারা তাঁহার বিশ্বাতীতত্বের উপর জোর দেওয়া হয় এবং উহা নৈতিক ধর্মানুষ্ঠানে অনুপ্রেরণা দেয়। ইহাতে আমরা পূর্বমীমাংসায় ব্যাখ্যাত কর্তব্যপালনের বৈদিক আদেশ হইতে বিশ্বের চরম নিয়ন্তারূপে ঈশ্বরের বৈদান্তিক ধারণায় উপনীত হই। আধাররূপে ব্রহ্ম আমাদের অন্তরাত্মা, কিন্তু নিয়ন্তারূপে তিনি বিশ্বাতীত শাসনকর্তা, পবিত্র এবং পূর্ণ এবং সেইজন্য তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং পাপমগ্ন মানুষ হইতে ভিন্ন। বিশ্বের নৈতিক শাসনকর্তারূপে ঈশ্বর জীবকে তাহার কর্ম অনুসারে সুখ দুঃখ প্রদান করেন এবং ধর্মের ঐশ্বরিক নিয়মের মধ্যে কোনপ্রকার যথেচ্ছাচার এবং নিষ্ঠুরতা নাই। যথা কর্ম তথা ফল—এই নিয়মটি গণিত এবং আইনশাস্ত্রের নিয়মের মত, এই নিয়মের অধীনে থাকিলে উদ্ধারের কোন অবকাশ অথবা আশা থাকে না। নৈতিক ধর্মরূপে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ঈশ্বরকে শুধু জগতের শাসনকর্তা বলিয়া না ভাবিয়া জগতের রক্ষক বলিয়াও ভাবা হয়। কর্মের নৈতিক নিয়ম কৃপার ধর্মে চরিতার্থতা লাভ করে, শুধু মৃদুতা লাভ করে না। ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রেরণা কৃপাদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া বিধি ও প্রেম (নারায়ণ ও শ্রী) এই দ্বিবিধ আকারে পরিণত হয়।[১২] কৃপাপরবশ হইয়া ঈশ্বর পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বের সঙ্কটকালে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হন।[১৩] অবতার গ্রহণের প্রক্রিয়াতে পরব্রহ্ম কৃপার অপর তিনটি পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করেন[১৪]—ইহারাও সমপরিমাণে বাস্তব এবং মূল্যবান। এই রূপগুলি হইতেছে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের বিশ্বলীলা অথবা ক্রীড়ার উপভোক্তা অনন্ত অথবা বিশ্বাত্মারূপ ঈশ্বর; সর্বজীবের হৃদয়ে বিদ্যমান অন্তর্যামী —সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে অনুভব করুক ইহাই এই রূপ ধারণের উদ্দেশ্য; এবং উপাসনার জন্য মন্দিরস্থ দেবতা। পূর্বনির্দিষ্ট নারায়ণ ও শ্রী এবং এই তিন রূপ মিলিয়া ব্রহ্মের পঞ্চ প্রকট রূপ।

ব্রহ্মকে শেষী বলার তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর হইতেছেন জগতের প্রাপ্তব্য আদর্শ। জীব (চিৎ) ও প্রকৃতি (অ-চিৎ)র অস্তিত্ব ঈশ্বরের তৃপ্তির জন্য; এবং ঈশ্বর একই সঙ্গে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির উপায়। এই আত্মজ্ঞান এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দরুণ জীব উপলব্ধি করে যে, পরমাত্মাই জগতের সর্বকর্মের প্রকৃত কর্তা এবং অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার জীবোদ্ধারের ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে মিলাইয়া দেয়। আত্মজ্ঞ জীব বলে, "আমি আছি তথাপি আমি নয়, কিন্তু আমাতে বিদ্যমান ঈশ্বরই আছেন।" এই দৃষ্টিতে মানুষের স্বাধীনতা এবং ঈশ্বরের স্বাধীনতার বিরোধ দূরীভূত হয়।

ব্রহ্মকে ভুবনসুন্দর অথবা চরম সৌন্দর্যবান্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি সত্য ও কল্যাণস্বরূপও বটে, তথাপি তাঁহার সাক্ষাৎ অনুভূতির জন্য প্রথম বর্ণনাটি অধিক আবশ্যক। বিশিষ্টাদ্বৈতের সৌন্দর্যতত্ত্ব ভাগবত গ্রন্থে এবং আল্বারগণের স্বর্গীয় সঙ্গীত সমূহে পরম শ্রদ্ধার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই সৌন্দর্যতত্ত্বে যে শ্রীকৃষ্ণ জীব সকলকে মুগ্ধ করিয়া স্বীয় সঙ্গদ্বারা তাহাদের দেহজ কামনা দূর করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিশিষ্টাদ্বৈতের ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ধারণা অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ এবং পরমেশ্বরবাদ হইতে পৃথক্। এই মতকে উপাধিযুক্ত অদ্বৈতবাদ, সবিশেষ ব্রহ্মবাদ অথবা সমগ্র বিশ্ব একটি চেতন অঙ্গী এইরূপ একতত্ত্ববাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে ভুল করা হয়। ইহা বেদান্তের একটি সমন্বয়মূলক দর্শন। অন্যান্য দর্শন ও সাম্প্রদায়িক মতে যাহা কিছু ভাল এবং সত্য তাহা গ্রহণ করিবার মত ইহার ব্যাপক উদার দৃষ্টি আছে, তথাপি ইহাকে বিভিন্ন প্রকার মতের সংগ্রহ-মাত্র মনে করিলে সঙ্গত হইবে না। ইহাতে চরম একতত্ত্ববাদ ও বহুতত্ত্ববাদের এবং ঈশ্বর হইতেছেন শাস্তা এবং ঈশ্বর হইতেছেন ত্রাতা এই দুই বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে উপনিষদের ব্রহ্ম অথবা নারায়ণকে পাঞ্চরাত্রের বাসুদেব, পুরাণসকলের ঈশ্বর, ইতিহাসসমূহের অবতারগণ এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতিবাদের সুন্দরের সহিত এক বলিয়া মনে করা হইয়াছে।

বিশ্ব-তত্ত্ব

নিয়মানুবর্তিতার যান্ত্রিকতা এবং নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যমূলকত্ব ও আধ্যাত্মিকতা এই সবগুলিই কার্যকারণ সম্বন্ধের বিভিন্ন রূপ এবং উহার এই সমগ্ররূপের উপর বিশিষ্টাদ্বৈতের বিশ্ব-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। জগৎ-ব্যবস্থার স্রষ্টা, পালক এবং ধ্বংসকর্তারূপে

ব্রহ্ম উহার বিশ্বানুস্যূত এবং বিশ্বাতীত মূল কারণ। শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি হয় নাই, সৃষ্টির অর্থ হইতেছে বীজাবস্থা হইতে বাস্তব অবস্থায় পরিণতি (সৎ-কার্যবাদ)। কালিক দৃষ্টিতে এবং যৌক্তিক দৃষ্টিতে কার্য-পদার্থ কারণ-পদার্থের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান। একের সহিত অন্যের কোন বিরোধ নাই। ধর্মের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া বেদান্তী ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ব্রহ্মকে জানিলে সব কিছুই জানা হয়। অদ্বিতীয় সদ্বস্তু বহু[১৫] হইতে ইচ্ছা করেন এবং নিজের অন্তঃস্থ সৃষ্টিপ্রেরণা দ্বারা নামরূপাত্মক জগতে পরিণত হন। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর নাম ও রূপের ভেদশূন্য অবস্থায় থাকেন এবং সৃষ্টির পরে ইনিই দেশকালের অনন্তজগৎ এবং জীবসমূহের বিভিন্ন আকারে নিজেকে বিভক্ত করিয়া উহাদের অন্তরাত্মারূপে বর্তমান থাকেন।[১৬] এই সুশৃঙ্খল বিশ্ব জড় ও নৈতিক নিয়মের অধীন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা বিধৃত। ধর্মের উপর অধর্মের আধিপত্য ঘটিলে ঈশ্বর জগৎ সংহার করেন এবং এইভাবে অমঙ্গল নিবারণ করেন। জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বর জীবের অকল্যাণ করিবার ক্ষমতা কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত রাখেন; শেষবিচারে শাস্তি (দণ্ড) ও ঈশ্বরের দয়ারই ফল বলিয়া প্রতিভাত হইবে।[১৭] সৃষ্টি ও সংহার অনন্তকাল একের পর এক চক্রাকারে ঘটিয়া থাকে। জীবসমূহের মুক্তিই সমগ্র সংসার-প্রবাহের উদ্দেশ্য।

কার্যকারণ সম্বন্ধের অর্থ এই যে, পরিবর্তন সত্ত্বেও অবিচ্ছিন্নতা অক্ষুণ্ন থাকিবে। প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ এমন পরিবর্তন ঘটে যাহাতে বীজাবস্থা অভিব্যক্তাকার ধারণ করে এবং কারণ কার্যের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত থাকে। পূর্ণতা লাভের জন্য প্রযত্ন করার ব্যাপারে জীবের নৈতিক স্বাধীনতা আছে। কেবল জীব নিজেই এই স্বাধীনতার একমাত্র প্রতিবন্ধক। জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত প্রকৃতির ক্রিয়া-গুলির সামঞ্জস্য ঘটাইয়া জীবকে স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ করিয়া গঠন (তন্ময়) করাই ঈশ্বরের অন্তঃস্থ উদ্দেশ্য। প্রকৃতির অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মত সাংখ্য মতের ন্যায়। কিন্তু এই মতে ঈশ্বর অথবা পুরুষোত্তম নামক ষড়বিংশতিতত্ত্ব স্বীকার করিয়া সাংখ্য মতের অপূর্ণতা দূর করা হইয়াছে। এই পুরুষোত্তম সৃষ্ট জগতের অন্তরে শরীরী অথবা পরমাত্মারূপে প্রবিষ্ট। ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রেরণা প্রকৃতিকে সক্রিয় করে এবং প্রকৃতি তখন মহৎ, অহঙ্কার, মন সহ একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চভূতের আকারে অভিব্যক্ত হয়। ব্যষ্টিকরণ প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর জীবসমূহের অন্তরাত্মারূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাহাদের পূর্বকর্মানুসারে তাহাদিগকে ন্যায়সঙ্গতভাবে যথাযোগ্য শরীর প্রদান করেন। এইভাবে এককোষবিশিষ্ট জীব হইতে আরম্ভ করিয়া দেবযোনি পর্যন্ত জীবসমূহের সংখ্যা অনন্ত। অভিব্যক্তির পরে বীজাবস্থা; এবং এই প্রক্রিয়া

নিয়মিত তালে চলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সৃষ্টির অর্থ হইতেছে ঈশ্বরের ক্রীড়ারূপ স্বতঃস্ফূর্তি অথবা লীলা। এই লীলার ধারণায় প্রকৃতি, পুরুষ ও পুরুষোত্তমের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এবং চরম স্বভাববাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং জ্ঞানবাদ পরিহার করিয়া পরিণামের ধারণা ও কর্মের নৈতিক ধারণার নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতির অভিব্যক্তিতে জীব (পুরুষ) নৈতিক উন্নতি ও দেবত্বলাভের সুযোগ পায়। বেদান্তের সাক্ষাৎ প্রয়োজন হইতেছে জীব কর্তৃক ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ; সুতরাং প্রকৃতি-দর্শনরূপে বিশ্ব-তত্ত্ব এইরূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের কেবল গৌণ উপায়মাত্র।

মনস্তত্ত্ব

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কতকগুলি দোষযুক্ত লক্ষণ এবং মত পরীক্ষা করিয়া আত্মা কি নয় তাহা দেখাইয়া আত্মার মনস্তত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। আত্মা যে কতকগুলি পরমাণু এবং জড় প্রক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র এই জড়বাদী (চার্বাক) মত ভ্রান্ত; কারণ জড়বস্তুর পক্ষে চিন্তা করা এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করা অসম্ভব। ঐ একই যুক্তিবলে প্রাণবাদীদের মত যে, যে প্রাণ আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া বা প্রাণাবেগ এবং নিজেকে পুষ্ট করে এবং নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাহাই আত্মা, তাহা সমর্থনযোগ্য নয়। বৌদ্ধদের প্রত্যক্ষবাদী কিংবা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী মত যে আত্মা কতকগুলি সংবেদনের অথবা দেহ এবং মন দ্বারা গঠিত পঞ্চস্কন্ধের একটি সমাবেশ তাহা স্থায়ী আত্মার ঐক্য এবং ধারাবাহিকতা অস্বীকার করে বলিয়া উহাকেও প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। মন বা অন্তঃকরণ নিজেই প্রকৃতির একটি বিকার এবং চিন্ময় দ্রব্য নহে। যে বুদ্ধিবাদী বা জ্ঞানবাদী বলেন, "যে হেতু আমি চিন্তা করি সেই হেতু আমি আছি" তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর এবং বিরতির দিকে লক্ষ্য রাখেন না এবং "যে হেতু আমি আছি সেই হেতু আমি চিন্তা করি" ইহা বলাই অধিক সত্য হইবে। সমাজতত্ত্ববিৎ যখন আত্মাকে সমাজদেহের অঙ্গমাত্র বলিয়া মনে করেন, তখন তিনিও ভুল করেন। যে বিশেষণ-বাদ আত্মাকে পরমতত্ত্বের একটি গুণ বলিয়া বর্ণনা করে, তাহা উহার অসাধারণত্বকে উপেক্ষা করে। সর্বশেষে জীব যে অবিদ্যায় প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রাতিভাসিক প্রতিবিম্ব মাত্র এই অদ্বৈতবাদী মত জীবকে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবিহীন কল্পিত বা অলীক বস্তুমাত্র বলিয়া মনে করে। রামানুজ এই সকল মতকেই প্রত্যাখ্যান করেন। 'Soul', 'Spirit', 'Self'—পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত এই শব্দগুলি জড়-জীবন ও প্রেতের ধারণার অনুষঙ্গ হইতে মুক্ত নয় বলিয়া 'আত্মা' শব্দই

জীবের নিত্য আত্ম-সংবিৎ এবং মুক্ত স্বভাবকে অধিক বিশদভাবে ব্যক্ত করে। ইহা পরমাত্মার ন্যায়ই একটি তত্ত্ব এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানদ্বারা নয়, কিন্তু অতি-মানস এবং যৌক্তিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়া ইহার অর্থ এবং মূল্য নির্ধারণ করা উচিত।

আলবন্দার, রামানুজ এবং বেদান্ত-দেশিক যেভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে তাহা ইহাকে প্রকৃতি এবং পরমাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া ইহার স্বভাবকে প্রকটিত করে। আত্মা প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে পৃথক্; ইহা নিত্য, স্বয়ংপ্রকাশ এবং নৈতিক স্বাধীনতাবিশিষ্ট।[১৮] পূর্বতন অবিদ্যার ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ ইহা নিজেকে প্রকৃতি বলিয়া ভ্রম করে, দেহে বদ্ধ হয় এবং দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। কিন্তু ত্যাগের দ্বারা ইহা নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারে। তখন আত্মা অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয় এবং তাহার নিজস্ব মূল্য আছে ইহা বুঝিতে পারে। জীব নিরবয়ব চৈতন্যময় পদার্থ[১৯] এবং নিরতিশয় সূক্ষ্ম, কিন্তু ইহার জ্ঞান আলোক এবং তাহার দীপ্তির ন্যায় অনন্ত এবং সর্বব্যাপী, যদিও বর্তমানকালে ইহা কর্মদ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুযায়ী ইহা নিজেকে সঙ্কুচিত এবং বিস্তৃত করিতে পারে এবং অভিব্যক্তি এবং বিলয়ের বিভিন্ন স্তরে থাকিতে পারে। সুষুপ্তির নিজ্ঞ'ান-অবস্থায় ইহা প্রায় নিষ্ক্রিয়, স্বপ্নের অর্ধচেতন অবস্থায় ইহা স্তিমিত, জাগ্রদবস্থায় পরিস্ফুট এবং ভ্রমপ্রত্যক্ষ, মায়াবলোকন মূর্ছারোগ প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থায় অভিভূত হইয়া থাকে। এই অবস্থাগুলি ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত মিশিয়া যায় এবং পরস্পর হইতে অবিচ্ছিন্ন। তাহারা আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরোধী নয়। মন-সমীক্ষণবাদীরা এবং বিজ্ঞানবাদীরা স্বপ্ন সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্বের নৈতিক এবং ধর্মীয় তাৎপর্য উপেক্ষা করে। সূক্ষ্ম শরীরে যে সকল মানসিক ও দৈহিক অবস্থাদ্বারা জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত হয় তাহারা এবং তাহাদের প্রীতিকরতা বা অপ্রীতিকরতা কর্মের নৈতিক নিয়মের উপর নির্ভর করে। জ্ঞান অবিদ্যাদ্বারা আচ্ছন্ন হইতে পারে এরূপ মনে করিলে, সর্বজ্ঞতাও বিশ্বব্যাপী অজ্ঞানে পরিণত হয় এবং সন্দেহবাদই এইরূপ বিশ্ব-মায়াবাদের একমাত্র ফল হয়। সুতরাং আত্ম-সংবিৎরূপে জ্ঞান আত্মার একটি অবিচ্ছেদ্য গুণ। ইহা স্বয়ং-নির্ভরশীল কিন্তু গুণরূপে জ্ঞান (ধর্মভূতজ্ঞান) আত্মার প্রকাশক ধর্ম হিসাবে আত্মার উপর নির্ভরশীল। এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ করা যায়, কিন্তু ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

আধার, নিয়ন্তা, শেষী এবং সুন্দররূপে পরমাত্মার যে তিনটি গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহার পূর্বেই জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তারূপে আত্মার সহিত

পরমাত্মার কি সম্বন্ধ তাহা বলা হইয়াছে। জ্ঞাতা-আত্মা কারণরূপ (উপাদান), ব্রহ্মের কার্য (উপাদেয়) ইহা ব্রহ্মের অ-পৃথক্‌সিদ্ধ বিশেষণ ও অংশ। ব্রহ্ম মূলকারণ, জ্ঞাতা এবং বিভু। শুদ্ধ এবং পবিত্র ব্রহ্মের সহিত কর্তারূপে ইহার সম্বন্ধ হইতেছে এই যে, ইহা ব্রহ্মের শেষ অথবা দাস অথবা পুত্র এবং তাঁহার পরিতৃপ্তির জন্যই উহার অস্তিত্ব, উহা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতারূপ ঐশ প্রয়োজন সিদ্ধ করে। ভোক্তা আত্মা ব্রহ্মের সৌন্দর্য এবং আনন্দ উপভোগ করে বলিয়া ইহাতে (ব্রহ্মের) অন্তরঙ্গতা এবং পবিত্রতার মিলন হয় এবং ইহা দিব্য আকার ধারণ করে। এইভাবে ব্রহ্ম জীবের শরীরী আদি কারণ, আধার এবং নিয়ন্তা। জীব যদিও উহার নিজের জ্ঞানের জ্ঞাতা উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জীব নিজেই ঈশ্বরের প্রকাশ, ঈশ্বর প্রকারী এবং জীব তাঁহা হইতে অবিচ্ছেদ্য।

জীব ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত—ভেদাভেদবাদীর এই ব্যাখ্যা জীবকে তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য হইতে বঞ্চিত করে। অদ্বৈতবাদী ব্যক্তিত্বকে অবিদ্যাপ্রসূত কল্পনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেয়। রামানুজের মত জীব যে স্বাধীনতাবিশিষ্ট একটি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দ্রব্য ইহার উপর জোর দিয়া বহু-বাদ এবং এক-বাদ, নৈতিকতা-বাদ এবং রহস্যবাদের সমন্বয় ঘটাইয়াছে, কিন্তু জীব পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গ[২০] এবং সেইজন্য ইহা পরমাত্মার সহিত রসঘন অবস্থায় একীভূত হইতে পারে বলিয়া ইহা যে পরমাত্মা হইতে পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ তাহা অস্বীকার করে। ইহা নিজেই একটি অবয়বী আবার ব্রহ্মের অবয়ব। অবিদ্যাকে কর্মের সহিত একীভূত করিয়া এবং অবিদ্যা, কর্ম, কাম প্রভৃতি দোষগুলি জীবেই বর্তমান থাকে ইহা বলিয়া রামানুজের মত অবিদ্যার একটি নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছে! প্রত্যেক জীবই ঈশ্বর হইতে আসে এবং সর্বৈশ্বর্যের আলয় তাঁহাতেই ফিরিয়া যায় এবং দৈবভাব প্রাপ্ত হয়।

সাধন-মুক্তির উপায়

যে অনুধ্যানশীল দার্শনিক পরমসত্তা বা তত্ত্বরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, তিনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রযত্নদ্বারা মুক্তিকামী বা মুমুক্ষু হইয়া উঠেন। কর্মযোগ বা আত্মশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ বা আত্মোপলব্ধি এবং ভক্তিযোগ বা গীতা-নিরূপিত প্রেমরূপে ঈশ্বরের উপলব্ধির অভ্যাস এই ত্রিবিধ প্রণালীতে মুক্তিলাভ হয়।

'কর্মযোগ' হইতেছে নিষ্কামকর্মের অভ্যাস, অর্থাৎ ফল কি হইবে বা না হইবে তাহা চিন্তা না করিয়া কর্তব্য বলিয়াই কর্তব্যপালনের অভ্যাস।[২১] দেবতা অথবা ঈশ্বর কেহই কর্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না। সংবিৎ সকল স্তরেই কর্মপ্রবণ, এমন কি যে অন্তর্মুখীনতার লক্ষ্য হইতেছে কর্ম হইতে বিরতি (নিবৃত্তি), তাহাও কর্মপ্রবণ এবং মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অ-কর্ম জীবন অসম্ভব।[২২] যে নীতিতত্ত্ব এই মনোবৈজ্ঞানিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অধ্যাত্মশাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। যদিও প্রাণীমাত্রেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে কেবলমাত্র মানুষেরই বুদ্ধি অর্থাৎ বিচার-শক্তি এবং প্রযত্ন আছে বলিয়া তাহার মনে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকে। কিন্তু প্রকৃতি এবং তাহার গুণসমূহ দ্বারা গঠিত দেহের সহিত ভ্রান্ত তাদাত্ম্যবোধের ফলে তাহার দৈহিক সুখ উপভোগ করিবার বাসনা জন্মায় এবং এই বাসনা ব্যাহত হইলে ক্রোধ, সম্মোহ ও নৈতিক প্রণাশ উপস্থিত হয়।[২৩] প্রত্যেক সাংসারিক কর্মই এই সকল বাসনা (কাম) দ্বারা পরিচালিত এবং বাহ্যবস্তু সংক্রান্ত সুবিধাজনক লাভের উদ্দেশ্যদ্বারা প্ররোচিত। ইহা সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি গুণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[২৪] কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই তাহার গুণ সমূহ এবং তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করিবার নৈতিক স্বাধীনতা আছে। তাহার নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তি অথবা ব্যবহারিক বিচারশক্তি প্রয়োগ করিয়া সে দৈহিক অনুভূতির উপর নির্ভরশীল ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে দমন করিতে পারে এবং পার্থিব জীবনের দুইটি বিপদ অহঙ্কার এবং মমকার হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে। তখন তাহার কর্ম কামের স্বার্থপর প্ররোচনা হইতে মুক্ত হয় এবং নিষ্কাম কর্ম অথবা কর্তব্যের জন্যই কর্তব্যে পরিণত হয় এবং নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ স্বারাজ্য প্রাপ্ত হয়।[২৫] তখন সে আর গুণ সমূহ দ্বারা পরিচালিত এবং বাহিরের শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃত বস্তু থাকে না, কিন্তু আত্মশক্তি দ্বারা লব্ধ নৈতিক স্বাধীনতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়। সে তখন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি, সে তখন কর্ম হইতে মুক্ত হয় না, কিন্তু কর্মের মধ্যেই মুক্তিলাভ করে।

কর্মযোগ অথবা নিঃস্বার্থ কর্ম জ্ঞানযোগ দ্বারা লভ্য আত্মোপলব্ধির সোপানমাত্র। যখন নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ তাহার আত্মাকে অ-চিৎ হইতে পৃথক করিয়া জানিবার চেষ্টা করে, তখন সে নৈতিক স্তর হইতে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়। নিষ্কাম কর্ম, অর্থাৎ মানুষের যাহা করা উচিত, তাহা হইতে মানুষের যাহা হওয়া উচিত তাহাতে মানুষের গতি হয়। এইরূপ জ্ঞান-নিষ্ঠার জন্য বৈরাগ্য এবং নিরন্তর অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। তত্ত্বচিন্তায় রত ব্যক্তি যোগাভ্যাস দ্বারা যে অবিদ্যার

প্রভাবে তিনি আত্মাকে দৈহিক অনুভূতির সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, সেই অবিদ্যাজনিত ভ্রমসমূহ হইতে এবং যে কাম তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের দিকে আকর্ষণ করে তাহার প্ররোচনা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন। তিনি কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে সচেষ্ট হইবেন।

জ্ঞানযোগ দ্বারা লব্ধ কৈবল্যে কিন্তু বিষয়ীসর্বস্ববাদ এবং নৈষ্কর্ম্যবাদরূপ দোষ আসিয়া পড়িতে পারে এবং এই সকল দোষ ভক্তিযোগ দ্বারা দূরীভূত হয়। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগে যে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা করা হয়, ভক্তিযোগেই তাহার চরম পরিণতি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যেন নীতি হইতে ধর্ম এবং ধর্ম হইতে ঈশ্বরের সহিত রহস্যময় ঐক্যানুভূতির একটি সোপান নির্মাণ করে। রামানুজ ভক্তির সহায়করূপে বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ এবং অনুদ্ধর্ষ এই সাতটি প্রাচীন সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন।[২৬] প্রথমটি হইতেছে ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দিররূপ দেহের শুচীকরণ এবং এইরূপ শুচিতা দেবভাবের সমতুল্য। কাম এবং ক্রোধরূপ চাঞ্চল্যকর অবস্থা হইতে মনের আন্তরিক মুক্তিই বিমোক। ঈশ্বরকে সকলের অন্তরাত্মারূপে নিরন্তর উপলব্ধি করিবার চেষ্টাই অভ্যাস। চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির জীবনের সামাজিক দিক হইতেছে ক্রিয়া ; ইহা হইতেছে মনুষ্যেতর প্রাণী, মনুষ্য ও দেবগণের সেবারূপ কর্তব্য। কর্তব্যের অন্তরের দিক যে ধর্ম তাহার অনুশীলনই হইতেছে কল্যাণ এবং দান ও অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির অন্তর্ভুক্ত। অনবসরের অর্থ হতাশা-পরিহার এবং অনুদ্ধর্ষের অর্থ হর্ষোচ্ছ্বাসের অভাব, সুতরাং এই দুইটি ধর্ম পরস্পরের সহচর। এই সকল সাধনের লক্ষ্য হইতেছে মানুষের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় উন্নতিসাধন এবং ইহারা ভগবদ্‌ভক্তির অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ। গ্রীকরা মানুষের পশু-প্রকৃতি এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সমন্বয়-সাধন সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করিত, তাহা হইতে এইগুলি ভিন্ন এবং শংকরের সাধনসমূহ হইতেও ভিন্ন। এই শেষোক্তগুলিকে সাধন বলা চলে না, কারণ ব্রহ্ম স্বয়ং-সিদ্ধ এবং কোন নূতন বস্তুরূপে প্রাপ্তব্য নহেন। দর্শনের দৃষ্টিতে যাহা চরমতত্ত্ব, ধর্মের দৃষ্টিতে তাহাই ভগবান অথবা ঈশ্বর, এবং রামানুজের মতে বেদান্ত অথবা ব্রহ্মের জ্ঞান, ঈশ্বরের ধ্যান অথবা উপাসনা অথবা ভগবচ্চিন্তা এবং ভক্তি ইহারা সকলেই সমার্থক এবং ইহারা জ্ঞান এবং ভক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং ঐক্য সূচিত করে। মৃত্যু পর্যন্ত বাসুদেব বা নারায়ণকে অন্তরাত্মা বা নিজের আত্মা মনে করিয়া, "হে পরমদেবতা, আমিই তুমি এবং তুমিই আমি" এইভাবে চিন্তা করাকে ধ্যান বলা হয়।[২৭] ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, জীব যেমন দেহের আত্মা, ব্রহ্মও

তেমনই জীবের আত্মা (শরীরী)। আত্মা এবং দেহের ন্যায় তাহারা অবিচ্ছেদ্য কিন্তু অভিন্ন নহে। ভক্তি যখন গাঢ় হইয়া পরা-ভক্তি এবং প্রেমে পরিণত হয়, তখন ভগবানকে পাইবার ইচ্ছা তাঁহার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষার রূপ ধারণ করে। কিন্তু ভগবানের প্রতি জীবের যে আকর্ষণ, তাহা জীবের প্রতি ভগবানের আকর্ষণের ন্যায় অত তীব্র নয়। যে ভক্তকে তিনি তাঁহার নিজের আত্মা বলিয়া মনে করেন, তাহার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য বিশ্বাতীত শাশ্বত পুরুষ মনুষ্যের আকারে প্রেমের অবতারের রূপ ধারণ করেন। ইহার ফলে যে মিলন সংঘটিত হয়, তাহাতে প্রেমের জন্যই প্রেম আকাঙ্ক্ষিত এবং মুক্তির অপেক্ষা ভক্তিই অধিক কাম্য।

ভক্তি পরম-পদে পৌঁছাইবার জন্য পৃথিবীতে স্থাপিত সোপানস্বরূপ।[২৮] ইহা নির্মাণ করা অতীব কষ্টসাধ্য। ইহার পথে বহু অদৃশ্য বিপদ থাকার জন্য ইহা আরোহণ করা প্রায় অসম্ভব। উপনিষদীয় জ্ঞানের সারস্বরূপ গীতা ভ্রান্ত মানবের প্রতি অসীম করুণাপরবশ হইয়া প্রপত্তি বা আত্ম-নিবেদনকেই মুক্তির সর্বাপেক্ষা সহজ এবং স্বাভাবিক উপায় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। সর্বমুক্তির ধর্ম হিসাবে গীতার ধর্ম প্রত্যেক মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছেদরূপ পাপে ভারাক্রান্ত অথচ ঈশ্বরের সন্তানরূপে তাঁহার চরণে আশ্রয় লইতে আহ্বান করে এবং তাহার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী এইরূপ আশ্বাস দেয়।

আল্বারেরা ঔপনিষদিক ঋষিদের ন্যায় ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন এবং যে তামিল স্তোত্রগুলিকে তাহাদের ঈশ্বরীয় জ্ঞানের জন্য বেদান্তের সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করা হয় তাহারা প্রপত্তির উচ্চতর মূল্যের উপর জোর দিয়াছে কারণ ত্রাণকারী প্রেমরূপী ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রিয় এবং জন্ম, যোগ্যতা এবং সাংসারিক প্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে সকল জীবই ইহা পাইতে পারে। বিধি-নিষেধমূলক ধর্মে করুণা দ্বারা ন্যায়পরায়ণতাকে কোমল করা হয়, কিন্তু ত্রাণবাদী ধর্মে ন্যায়পরায়ণতা ও কর্মফল অপেক্ষা ঈশ্বরের ত্রাণশক্তিই প্রবলতর এবং এমনকি তথা-কথিত দণ্ডনের মূলও দয়ায় বর্তমান।

বিশিষ্টাদ্বৈতসম্মত ধর্ম হইতেছে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম। এই ধর্মে ঈশ্বর হইতেছেন নারায়ণ এবং শ্রী উভয়েই, এবং তাঁহাতে নিয়ম এবং প্রেমের নির্ব্যক্তিক গুণগুলি এই দুই ব্যক্তির মধ্যে চিরকালের জন্য ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইয়া আছে। নিয়ম যদি প্রেমের উপর আধিপত্য করে, তাহা হইলে কর্ম হইতে মুক্তি অসম্ভব এবং প্রেম নিয়মের উপর আধিপত্য করিলে স্বেচ্ছাচার অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে, কিন্তু ঈশ্বরের

প্রকৃতিতে এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে এবং ইহারা মিলিত হইয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীবৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে দুইটি বিরুদ্ধমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে—পিল্লৈলোকাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তেঙ্কলৈ সম্প্রদায় এবং বেদান্ত-দেশিক কর্তৃক পরিচালিত বড়কলই সম্প্রদায়। ঈশ্বরের দয়া যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং কোন সর্তাধীন নয় (নির্হেতুক কটাক্ষ) প্রথম সম্প্রদায় এই মত পোষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু দ্বিতীয় সম্প্রদায় স-হেতুক-কটাক্ষবাদী, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের দয়া এবং জীবের প্রপত্তি-যোগ উভয়েরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর নিজে উপায় এবং উপেয় দুই-ই এবং কৃপাদ্বারা কর্ম খণ্ডিত হয়। সমস্যাটির সমাধান হেতু বা কারণ এইরূপ কোন তর্কশাস্ত্রসম্মত ধারণার সাহায্যে করা যায় না, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত মিলনের রহস্যময় অনুভূতির মধ্যে ইহা বিলীন হইয়া যায়।

ত্রাণ সম্বন্ধে শ্রীবৈষ্ণব এবং খৃষ্টীয় মতবাদ দুই-ই নীতিমূলক ধর্ম। তাহারা ঈশ্বরীয় বিধান ভঙ্গ করাই যে পাপ এই কথা বলে, তাহারা বিশ্বাস করে যে, পাপ ক্ষমার যোগ্য এবং বস্তুতঃ ঈশ্বর কৃপা করিয়া উহা ক্ষমা করেন এবং বিশ্বাস দ্বারা এবং কর্মদ্বারা যে পাপ মোচন হয় এই মতবাদ গ্রহণ করে, এইজন্য তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু বৈষ্ণব মতবাদে এমন একটি সার্বজনীন আবেদন আছে যাহা আমরা খৃষ্টধর্মসম্মত ঈশ্বরের একজাত পুত্র, আদিম পাপ এবং বিচারের দিবস সম্বন্ধে মতবাদগুলির মধ্যে পাই না। প্রথম মতে কর্মফল ভোগের পর পরিত্রাণ আসে এবং প্রথমটি দ্বিতীয়টিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় মতে কর্মফলভোগের পর বিচার দিবস আসে এবং তখন সারবিশিষ্ট দ্রব্যগুলিকে অসার দ্রব্য হইতে পৃথক্ করা হয়। শ্রীবৈষ্ণব মতে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছেদই পাপ, এবং প্রেমের দেবতার সহিত এক হইয়া যাওয়া এবং তাহার পর সকল জীবের অন্তরে যে ঈশ্বরীয় প্রেম বিরাজ করিতেছে তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সকল জীবের সেবা করাই যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। ভক্তির সর্বোচ্চ অবস্থা হইতেছে প্রেমলীলা। ইহাতে ভগবান্ প্রেমিকরূপে তাঁহার ভক্তের সহিত লুকোচুরি খেলিয়া থাকেন এবং পরিশেষে তাঁহারা উভয়ে চিরকালের জন্য মিলিত হইয়া থাকেন। এই প্রেমলীলার দুইটি স্তর আছে; মিলনের আনন্দ (সংশ্লেষ) এবং বিচ্ছেদের বেদনা (বিশ্লেষ) একের পর আরেকটি উপস্থিত হয় এবং তাহার পর আত্মার অমানিশার বৈচিত্র্যহীনতার ক্লান্তি দেখা দেয়। এই লীলার শেষে জীব মুক্তির শাশ্বত আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

মুক্তি

ধর্ম অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত আচরণের অভ্যাস, অর্থ, অর্থাৎ ধন-সম্পত্তিলাভ, কাম, অর্থাৎ ঐহিক জীবনে ও স্বর্গে সুখ-ভোগ এবং মোক্ষ অর্থাৎ যাবতীয় সাংসারিক ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ—এই চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে শেষেরটিকেই বেদান্ত মানব-জীবনের চরমগতি ও লক্ষ্য বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। অজ্ঞান ও কাম হইতে মুক্ত হইয়া ভক্ত ক্ষণস্থায়ী ঈশ্বরানুভূতির মধ্যে ইহজীবনেই ব্রহ্মানন্দের পূর্বাস্বাদ এবং অমরতার আভাস পাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহজীবনের ব্রহ্মানুভূতি শাশ্বত এবং অখণ্ড নয়, কেবলমাত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেই মুক্তপুরুষ নিশ্চিত এবং স্থায়ী অমৃতত্ব লাভ করেন। অদ্বৈতবাদী মনে করেন যে, মুক্তি হইতেছে স্বয়ং-সিদ্ধ নিগুর্ণ ব্রহ্মের জ্ঞান। এই জীবনে এই স্থলে এবং এখনই মুক্তি (জীবন্মুক্তি) সম্ভবপর এবং পরেও সম্ভবপর (বিদেহ-মুক্তি)। অন্য বেদান্তীরা এই মত প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহাদের মতে মুক্তি একই ; ইহা সাংসারিক জীবনে স্বাধীনতালাভ নয়, পরন্তু বস্তুতঃ দেশ ও কালের জগৎকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক জীবন হইতে মুক্তিলাভ।

ব্রহ্মকে কোনও সাধন দ্বারা নূতন করিয়া লাভ করা যায় না—অদ্বৈতবাদীদের এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নৈতিক প্রচেষ্টা ও ধর্মার্জন নিরর্থক ও মূল্যহীন হইবে। বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ দেশ-কাল ও সুখদুঃখের ব্যবহারিক জগৎ এবং সত্য, শিব, সৌন্দর্যও আনন্দের অক্ষয় মূল্য-ধাম 'পরম পদে'র মধ্যে পার্থক্য করিয়া এই সকল দোষ পরিহার করিয়াছেন। ইহাতে মুক্তপুরুষ দেহের বিলয়ের পর দেব-যানের সরল ও দীপ্ত পথ দিয়া কিভাবে আনন্দময় বৈকুণ্ঠধামে আরোহণ করেন তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।[২১] সেই ধামে জড় এক অপ্রাকৃত উপায়ে দীপ্তিশীল এবং তাহাতে কোন পরিবর্তন নাই। কাল সেখানে নিত্যতার রূপ ধারণ করে এবং মুক্তপুরুষ কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় অনন্ত জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ঈশ্বর-সদৃশ হইয়া যান, কিন্তু তাঁহাতে জগতের নিয়ন্তৃস্বরূপ গুণ থাকে না।

মুক্তপুরুষ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন এবং তাঁহার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত আনন্দে মগ্ন হইয়া যান। তাঁহার কাছে বহুত্বপূর্ণ জগৎ থাকে, কিন্তু যে দৃষ্টি বহুত্বকে চরম বলিয়া স্বীকার করে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। আত্মা এবং ব্রহ্মের পার্থক্য চিরকালের, কিন্তু অ-বিভাগ অবস্থায় সেই পার্থক্য-বোধ অন্তর্হিত হয়। ব্যক্তিত্বের লোপ হয় না। মুক্তপুরুষ ঈশ্বরের সহযোগিতা করিয়া তাঁহার সেবা করেন না, "আমি আছি অথচ নাই, আমাতে তুমি আছ" এইরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজের অহঙ্কার বিসর্জন দেন।

উপসংহার

বিশিষ্টাদ্বৈত এমন একটি ধর্ম-দর্শন যাহা যাবতীয় বস্তুকে একত্রভাবে অথবা ব্রহ্ম-জ্ঞানের সহিত একীভূত করিয়া চিন্তা করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মা এবং ব্রহ্মের মিলন উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ব্রহ্মই সর্বজীবের আশ্রয় এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক প্রযত্নের লক্ষ্য। শাস্ত্র কতকগুলি আধ্যাত্মিক সত্যের সমষ্টি এবং এইগুলিকে আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা পরীক্ষা করা যাইতে পারে—এইভাবে শাস্ত্রের লক্ষণ নির্ণয় করিয়া ইহা শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা দূর করিয়াছে এবং অন্ধ বিশ্বাস, অজ্ঞেয়তাবাদ এবং সংকলনবাদরূপ দোষসমূহ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়াছে। ইহার তত্ত্ববিষয়ক মত যে ব্রহ্ম সর্বজীবের আত্মা, মূল কারণ, আশ্রয় এবং গতি, সৃষ্টির দিব্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে। প্রকৃতি নিত্য পরিবর্তনশীল, পুরুষ প্রগতিশীল এবং পরমাত্মা জীবাত্মার পূর্ণতা সাধনের যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। যতদিন জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে, ততদিন জীবাত্মা বস্তুর ন্যায় নহে পরন্তু নিত্য পুরুষরূপে অবস্থান করে এবং ব্রহ্ম হইতেছেন সেই অসীম পুরুষ যাঁহার লক্ষ্য সসীম জীবকে অসীমে রূপায়িত করা। এই মত জড়বাদ, পুরুষবাদ এবং কেবলাদ্বৈতবাদের ভ্রম এবং দোষ সমূহ পরিহার করে। কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি এই তিনটি অধ্যাত্মমার্গ অবলম্বন করিলে ইচ্ছাশক্তি, চিন্তা এবং বেদনা এই তিনটি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এইগুলি নৈতিকতাবাদ, বুদ্ধিসর্বস্ববাদ এবং ভাবসর্বস্ববাদের বিপদগুলিও পরিহার করে। নির্বিশেষে সকল জীবই যে ঈশ্বরকে লাভ করিবে প্রপত্তিবাদ এইরূপ নিশ্চিন্ত আশ্বাস দিয়া থাকে এবং সকলকেই আধ্যাত্মিকতা ও সেবার প্রেরণা দেয়। প্রত্যেক জীবই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে এবং সকল জীবই ব্রহ্মে আছে এবং ব্রহ্ম সকল জীবে আছেন এই সত্য উপলব্ধি করিয়া অন্যের সেবা করিতে পারে। এই মতবাদে অনুধ্যানী অন্তর্দৃষ্টি এবং কর্মনিষ্ঠ বহির্দৃষ্টির মিলন ঘটিয়াছে। এইভাবে বিশিষ্টাদ্বৈত সমন্বয়ের পথে চলিয়াছে এবং মানুষের মধ্যে ঐশ প্রেম কিভাবে কাজ করে তাহা দেখাইয়াছে।

রামানুজের পরের যুগে দাক্ষিণাত্যের 'বড়কলৈ' ও 'তেংকলৈ' শ্রীবৈষ্ণব-বাদের এই দুইটি শাখা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং পিল্লৈকলোকাচার্য এবং বেদান্ত-দেশিকের সময়ে এই সকল মতবিরোধ চরমে উঠিয়াছিল। অনাবশ্যক সংঘর্ষ এবং ঈর্ষার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পূর্বে অধ্যাত্ম চেষ্টা যে উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছিল তাহা হইতে উহাকে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু প্রগতি সর্বদা সরল

পথে হয় না এবং ভারত-ইতিহাসের তথাকথিত মধ্যযুগে, বিশেষতঃ উত্তর-ভারতে ইস্‌লামের বিধর্মীদিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিবার উৎসাহকে বাধা দিবার জন্য এবং হিন্দু-ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য বহু মহান্ বৈষ্ণব সংস্কারকের উদ্ভব হইয়াছিল। রামানন্দ নামে রামানুজের এক শিষ্য উত্তর-ভারতে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে বৈষ্ণব আন্দোলনের অগ্রণী হন। এই আন্দোলনের প্রভাব পঞ্জাব এবং বঙ্গদেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রামানন্দ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মজীবনে যথাক্রমে রামরাজ্যের তিনটি সত্য যথা—রাজতন্ত্র,একদারপরায়ণতা এবং একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া ধরাতলে রাম-রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এইভাবে মহাত্মা গান্ধীর অগ্রদূতস্বরূপ হইয়াছিলেন। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে কবীর, দাদু এবং তুলসীদাস সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে কবীর (জন্ম খৃঃ ১৩৯৮) উপদেশ ও আচরণদ্বারা এবং বেদান্ত এবং সুফী মতবাদের মধ্যে যে সকল বিষয়ে ঐক্য আছে তাহাদের উপর জোর দিয়া হিন্দু-মুস্‌লিম ঐক্য সাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য করিয়াছিলেন। তামিল কবিতায় রামায়ণের অনুবাদক কম্বরের মত তুলসীদাসও রামায়ণের হিন্দী অনুবাদ করিয়া অমরত্বলাভ করিয়াছেন। দাদু (১৫৪৪-১৬০৩ খৃঃ) ইস্‌লাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের জন্য প্রায়ই আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সহিত শ্রীবৈষ্ণব দর্শনের রহস্যবাদের, বিশেষ করিয়া পুষ্টি-ভক্তির অথবা নাম্মাল্বার এবং আঁড়ালের নায়ক-নায়িকা প্রেমের সহিত তুলনীয় রাধা-কৃষ্ণের গভীর প্রেম সম্বন্ধে ইহার উপদেশাবলীর নিকট-সম্বন্ধ আছে। নদীয়ায় শ্রীচৈতন্য (জন্ম খৃঃ ১৪৮৫) অচিন্ত্যভেদাভেদ নামে পরিচিত বঙ্গীয় বৈষ্ণব দর্শনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং ইহা মধ্বের বৈষ্ণব দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা ভক্তিবাদ দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা যীশুকে একজন প্রধান ভক্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়া, অথচ বাহ্য অনুষ্ঠানমূলক সাম্প্রদায়িকতা প্রত্যাখ্যান করিয়া, খৃষ্টধর্মের আক্রমণকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম প্রধানতঃ আবেগময়, কিন্তু জ্ঞানদেব ও নামদেবের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয় ভক্তদের বৈষ্ণবধর্ম রামানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল এবং ইহা জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়েরই উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। ঈশ্বর যে প্রেমস্বরূপ এই বিষয়ে সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই একমত এবং তাঁহাদের মতের সহিত শৈবদের প্রেম-স্বরূপ শিবসম্বন্ধে মত, সুফী সাধকদের উপদেশ এবং খৃষ্টীয় রহস্যবাদের সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করিতে বাধ্য হই। ঈশ্বরকে 'সুন্দর' রূপে কল্পনা করা মোটের উপর বৈষ্ণবধর্মের বিশেষত্ব। অতএব বলা যাইতে পারে যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। চরমতত্ত্ব যে বিশ্বের আত্মা

এই সামগ্রিক অন্তর্দৃষ্টি দর্শনের ক্ষেত্রে ইহার বিশেষ দান এবং জীবনের এবং সত্য শিব ও সুন্দর এই তিন শাশ্বত শ্রেয় যাহাতে অধিষ্ঠিত, তাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধিই হইতেছে ধর্মের ক্ষেত্রে ইহার বিশেষ দান। ইহা প্রত্যেক মানুষকেই অধ্যাত্ম-জীবনলাভ এবং সেবার জন্য শ্রেষ্ঠ প্রেরণা দিয়া থাকে এবং তাহাকে ব্রহ্ম-সাজুয্যের অমর আনন্দলাভে সক্ষম করে।

দ্রষ্টব্য

১। ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ ৬।১।৩
২। তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ভৃগুবল্লী
৩। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।১
৪। বেদার্থ-সংগ্রহ-পৃঃ ৮০
৫। যতীন্দ্র-মত-দীপিকা ১।৯
৬। বেদার্থ-সংগ্রহ, পৃঃ ১৭৭
৭। শ্রীভাষ্য ২।৩।১৮
৮। তৈত্তিরীয় উপনিষদ, আনন্দবল্লী, ১
৯। শ্রীভাষ্য ২।১।৯ ২য় খণ্ড পৃঃ ১৫
১০। রহস্য-ত্রয়-সার, তৃতীয় অধ্যায়
১১। বৃহদারণ্যক-উপনিষদ, অন্তর্যামি-বিদ্যা
১২। পুরুষ-সূক্ত
১৩। ভগবদ্গীতা ৪।৭
১৪। যতীন্দ্র-মত-দীপিকা ৯।১২৯
১৫। ছান্দোগ্য-উপনিষদ ৬।১।৪
১৬। বেদান্ত-সূত্র, ২।১।১৫
১৭। দয়া-শতক, ১৬
১৮। শ্রীভাষ্য, ২।৩।১৯, ৩৩
১৯। শ্রীভাষ্য, ২।৩।২৬
২০। ভগবদ্গীতা, ১৫।৭
২১। ভগবদ্গীতা, ২।৪৭
২২। ভগবদগীতা, ৩।৫
২৩। ভগবদ্গীতা, ২।৬২-৬৩
২৪। ভগবদ্গীতা ১৪।৩
২৫। কঠোপনিষদ ১।৩।৬
২৬। শ্রীভাষ্য ১।১।১
২৭। শ্রীভাষ্য ৪।১।৩
২৮। পরম-পদ-সোপান
২৯। কৌষীতকি-উপনিষদ

গ্রন্থবিবরণী

স্বামী, কপিষ্টলম্ দেশিকাচার্য: অধিকরণ-রত্ন-মালা ভগবদ্ বিষয়, চেৎলুর নরসিংহাচারিয়ার কর্তৃক সম্পাদিত ভাস্কর, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য—চৌখাম্বা গ্রন্থমালা।

রাণাড়ে আর ডি—মহারাষ্ট্রে রহস্যবাদ (ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস-৭ম খণ্ড)

শ্রীনিবাসাচারি, পি, এন্: বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শন (আড়িয়ার লাইব্রেরী গ্রন্থমালা)

শ্রীভাষ্য (ব্রহ্ম-সূত্রের রামানুজভাষ্য) থিবোর অনুবাদ (এস্, বি, ঈ গ্রন্থমালা)

পিল্লৈলোকাচার্য—শ্রীবচনভূষণ

স্বামী, কপিষ্টলম্ দেশিকাচার্য: শারীরক-রত্ন-মালা উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, রঙ্গ-রামানুজ-ভাষ্য সমেত, নবনীতং কৃষ্ণমাচারিয়ার কর্তৃক সম্পাদিত।

উপনিষদ সমূহ (সেক্রেড বুক্‌স অফ দি ঈষ্ট): ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ।

বেদার্থ-সংগ্রহ, এস্ বসুদেবাচারিয়ার্ কর্তৃক সম্পাদিত যতীন্দ্র-মত-দীপিকা, ভি, কে, রামানুজাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত।

বেদান্ত—বৈষ্ণব (ঈশ্বরবাদী) সম্প্রদায় সমূহ

আ। মধব (দ্বৈত)

মধব এবং তাঁহার রচনাবলী : মধব কর্তৃক ব্যাখ্যাত ব্রহ্মমীমাংসা সাধারণতঃ দ্বৈত নামে অভিহিত। মধব ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে উদিপির নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সামাজিক পরিবেশ দ্বৈতদর্শনের সাধারণ মতসমূহের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তত্রত্য পণ্ডিতেরা বিশেষ আগ্রহের সহিত এই দর্শন অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই দর্শনের অর্থ সম্বন্ধে প্রচলিত মতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

তাঁহার রচনাবলীতে একই উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়। ইহাদের অধ্যয়নের জন্য ইহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে : (১) ব্রহ্মবিষয়ক দর্শনে উপনীত হওয়ার জন্য জ্ঞান ও সত্তার মূল ধারণাগুলির পরীক্ষা; (২) ব্রহ্মবিষয়ক দর্শনের ব্যাখ্যা; এবং (৩) ব্রহ্ম-বিষয়ক দর্শনের প্রয়োগ।

১। ব্রহ্মবিষয়ক দর্শনের জন্য প্রাথমিক পর্যালোচনা

১

মধ্বের মতে যাহা নিজ বিষয়কে যথার্থভাবে জানে তাহাই প্রমা এবং প্রমাণ। প্রমা এবং প্রমাণ উভয়েই নিজ বিষয় যেরূপ সেইভাবেই উহাকে গ্রহণ করে, সুতরাং উভয়েই যথার্থ। ইহা অস্বীকার করিলে প্রমার সম্ভাবনাই অস্বীকার করিতে হয়। কোন প্রমাই বিষয়হীন নহে। কোন বিষয়ই অপ্রমেয় নহে। প্রমা ও উহার বিষয় প্রত্যেকে একই সুশৃঙ্খল জগতের এমন একটি অংশ যাহা অপরের সহিত জড়িত। প্রমাকে বিষয়হীন বলিলে উহাকে ভিত্তিহীন বলা হয়। বিষয়কে জ্ঞানের উপর অধ্যস্ত বলিয়া মানিলে প্রচ্ছন্নভাবে উহার প্রকৃত অস্তিত্বই স্বীকার করা হয়; কারণ ঐরূপ স্বীকার না করিলে অধ্যাসই অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রকৃত রজত স্বীকার না করিয়া ভ্রান্ত জ্ঞানে শুক্তিতে রজতের অধ্যাস অসম্ভব। জ্ঞান ও বিষয়কে পরস্পর হইতে পৃথক্ করায় একদেশদর্শী জ্ঞানবাদ অথবা বিষয়বাদের ন্যায় ভ্রান্ত মতের উদ্ভব হয়।

যে জ্ঞান নিজ বিষয়কে উহা যেরূপ নয় সেইভাবে জানে উহা ভ্রান্তজ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান জ্ঞানই নহে। নিজ কারণের কোন দোষের জন্যই এইরূপ ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়। প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান ভ্রান্তির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ভ্রান্তি প্রমার উপর নির্ভর করে। শুক্তিতে রজতভ্রমের জন্য একটা কিছু উজ্জল পদার্থের যথার্থ-জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

যথার্থ-জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য অথবা সংবাদ থাকে। তথাপি যাথার্থ্যের এইরূপ কোন পরিমাপক ব্যতীতই প্রমা নিজেই সাক্ষাৎভাবে যথার্থ বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং জ্ঞানের সত্যতা স্বতঃসিদ্ধ। শুধু সন্দেহের স্থলে উক্ত সংবাদ রূপ পরিমাপক সত্যনির্ণয়ের সাহায্য করে। মিথ্যাজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইতেছে উক্ত সংবাদের অভাব। এই সংবাদের অভাব হইতে মিথ্যাত্বের অনুমান করা হয়।

এরূপ বলা সমীচীন হইবে না যে, কোন জ্ঞানের যাথার্থ্য উহার কারণ সামগ্রীর (যথা—ইন্দ্রিয়, বিষয় প্রভৃতির) গুণ হইতে অনুমান করা হয়, কারণ এরূপ বলিলে জ্ঞানের স্বরূপগত ধর্ম-প্রামাণ্যকে জ্ঞানবহির্ভূত কারণের উপর নির্ভরশীল বলিয়া মানিতে হয়। জ্ঞান যদি স্বরূপেই যথার্থ না হইত (অর্থাৎ যদি উহা বিষয় যেরূপ সেইরূপেই বিষয়কে না জানিত) তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, (১) জ্ঞান বিষয়হীন এবং তাহার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহাদ্বারা উহার ব্যাখ্যা হইতে পারে (২) এবং জ্ঞান কতকগুলি বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে।

বিষয় যেইরূপ জ্ঞান উহাকে সেইভাবেই গ্রহণ করে। উহা 'সাক্ষী'রূপ আত্মার নিকট প্রতীত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একটি 'সাক্ষী' আছে। প্রত্যেক চেতন জীবের জীবনে যাহা কিছু ঘটে, তাহার সবই এই 'সাক্ষী' জানে।

আত্মা, জ্ঞাতা, জ্ঞান, 'সাক্ষী' এবং উহাদের স্বপ্রকাশ স্বভাব এইগুলি কেবল একই তত্ত্বের ভেদ। ইহারা যদি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইত তাহা হইলে উহাদের মিলনই সম্ভবপর হইত না। জ্ঞানের সম্বন্ধে বিশুদ্ধ অ-ভেদ অথবা অদ্বয়ের কথা বলা একান্তই অযৌক্তিক। প্রত্যেক অ-ভেদ সম্বন্ধের স্থলেই ইহাও অনিবার্যভাবে জড়িত থাকে যে, যে দুইটি পদার্থকে অ-ভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করা হয়, তাহাদের মধ্যে কিছু না কিছু ভেদ অবশ্যই থাকে। সুতরাং অ-ভেদ মাত্রই স-বিশেষ। পদার্থ সকলকে দ্রব্য ও গুণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করাও সমর্থনের অযোগ্য।

'সাক্ষী' বলিতে স্বয়ং আত্মাই বুঝায়। ইহা সর্ব অবস্থাতেই অপরিবর্তিতরূপে বিদ্যমান থাকে। জাগ্রৎ অবস্থায় ইহা প্রত্যক্ষ, অনুমিতি এবং শব্দ প্রমাণদ্বারা জনিত জ্ঞানসকল সাক্ষাৎভাবে দর্শন করে।

প্রত্যক্ষ প্রমিতি হইতেছে 'সাক্ষী', মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ এইসকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোনও না কোনও একটির ব্যাপারের ফল। কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ই স্বতঃক্রিয় নহে, ইহা আত্মাদ্বারা সঞ্চালিত হয়। সুতরাং আত্মা একটি ক্রিয়াশীল তত্ত্ব। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, আত্মা ইহার বহিস্থ পদার্থদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নিয়ত সহচার (ব্যাপ্তি) আছে এবং কোন যোগ্য পক্ষে এইরূপ হেতু বিদ্যমান, এইরূপ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যদি হেতুর জ্ঞান হইতে সাধ্যের জ্ঞান হয়, তাহা হইলে ঐরূপ জ্ঞানকে অনুমিতি বলা হয়। ভূয়োদর্শন দ্বারা সহচার নির্ধারিত হয়। "যদি হেতু, তাহা হইলে সাধ্য" এইভাবে এই সহচার ব্যক্ত করা হয়।

শব্দদ্বারা যাহা অভিপ্রেত হয় তাহার যথার্থ জ্ঞানের করণকে আগম বলে। আগম-দ্বারা জনিত জ্ঞানের প্রামাণ্য হইতেছে উক্ত জ্ঞানের অবাধিতত্ব।

জাগ্রৎ অবস্থায় আমাদের মন অতীত ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিত্তিতে স্মৃতি উৎপন্ন করে। স্বপ্নাবস্থাতেও মন অতীত ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিত্তিতেই ক্রিয়া করে। স্বাপ্নিক বিষয়সকল তদ্রূপে সত্য, কিন্তু উহাদের সত্তা জাগ্রৎ অবস্থায় প্রত্যক্ষোপলব্ধ বিষয় সমূহের সদৃশ নহে। মন ও বহিরিন্দ্রিয় সকল সুষুপ্তিতে ক্রিয়া করে না। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, উহারা আত্মা হইতে ভিন্ন ; কারণ, আত্মা তখনও অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। ইন্দ্রিয় সকল এবং মন দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সর্বদাই কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান এবং এই বিষয় 'সাক্ষী' দ্বারা 'ইদম্' রূপে গৃহীত হয়, কারণ উহা আত্মার বহির্ভূত। সর্ব বিষয়-জ্ঞানেই, মনের একটি 'ইদম্'-আকার বৃত্তি (অবস্থা) থাকে।

সুষুপ্তিতে একমাত্র সাক্ষীই ক্রিয়া করে। তখন উহা সুষুপ্তি-মগ্ন রূপে আত্মাকে এবং সুষুপ্তিজনিত আনন্দকে এবং আনন্দের স্থিতিকালকে জানে। "এখন পর্যন্ত আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম", পরবর্তীকালের এইরূপ স্মৃতি দ্বারা এই কথার সত্যতা স্পষ্ট হয়। "সাক্ষী" জ্ঞান এবং মনের বৃত্তি-জ্ঞান এই দুইয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে।

প্রথমটি বিষয় যেরূপ সেইরূপ ভাবেই উহাকে গ্রহণ করে, কিন্তু দ্বিতীয়টি কোন কোন সময়ে তাহা করে না। 'অহম্'-এর 'অহম্' রূপে জ্ঞান এবং অহং দ্বারা উপভুক্ত সুখের জ্ঞান কখনও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু 'ইহা রজত' এই প্রকার জ্ঞান কোন কোন সময়ে সত্য নাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া, 'সাক্ষী'-জ্ঞান 'বৃত্তি'-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু 'বৃত্তি'-জ্ঞান সর্বদাই 'সাক্ষী'-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। 'অহম্'-এর জ্ঞান আমাদের মন-সাপেক্ষ নহে, কিন্তু 'ইহা রজত' এই প্রকার বিষয়-জ্ঞানের সহিত 'সাক্ষী' গৃহীত সময়ের জ্ঞান অপরিহার্যভাবে জড়িত থাকে। সময়ের জ্ঞান মনের ব্যাপারদ্বারা জনিত হইতে পারে না, কারণ স্বপ্নহীন নিদ্রায় মন ক্রিয়া করে না, তথাপি তখন সময়ের জ্ঞান থাকে। তাহা ছাড়া 'সাক্ষী' হইতেছে স্ব-সংবেদ্য। উহা বিষয়কে প্রকাশ করিবার সময় নিজেকেও প্রকাশ করে, কিন্তু মনের বিকার বা অবস্থা স্ব-সংবেদ্য নহে। তাহা ছাড়া বৃত্তি-জ্ঞানের বিষয় একটি বিশিষ্ট পদার্থ রূপে নিরূপিত

থাকে। কিন্তু বিশিষ্টরূপে নিরূপণ করা মনের কার্য নহে। কারণ বিশিষ্ট পদার্থটি যে বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক্ তাহাই এই বিশেষ নিরূপণ দ্বারা ব্যক্ত হয়। অতএব উহার জন্য বিশ্বের অবশিষ্ট অংশের সাধারণ জ্ঞান পূর্ব হইতেই ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু এইরূপ সাধারণ জ্ঞান মনের বৃত্তি-জ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে, কারণ মন যে বিশিষ্ট বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-দ্বারা সম্বদ্ধ হয়, মনের বৃত্তি সেই বিশিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং এইরূপ সাধারণ জ্ঞান 'সাক্ষী'র কার্য।

পদার্থ সকলের ভেদ উহাদের বাহির হইতে উহাদের উপর আরোপিত নহে। ভেদ পদার্থের স্বরূপকেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। ভেদ অস্বীকার করিলে স্ব-বিরোধ উৎপন্ন হয়। কারণ ভেদের নিষেধ উহার অ-নিষেধ হইতে নিশ্চয়ই ভিন্ন।

জ্ঞান কখনও নির্বিকল্প নহে। উহার প্রথম স্তরে উহা সর্ব নিরূপক ধর্ম-শূন্য বলিয়া উহা নির্বিকল্প এরূপ মনে করা ভুল। প্রত্যক্ষজ্ঞানের সহিত মনের বৃত্তি জড়িত, মনের বৃত্তি 'সাক্ষী'-নিরপেক্ষ নহে, আবার সাক্ষী স্বভাবতঃই উহার বিষয় যেইরূপ সেইভাবে (অর্থাৎ উহার প্রকৃত ধর্মগুলির সহিত যুক্তভাবে) গ্রহণ করে, সুতরাং নির্বিকল্প জ্ঞানের কল্পনা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাহা ছাড়া এইরূপ মত পোষণ করাও সঙ্গত নহে যে চিন্তা ও ধ্যানদ্বারা নির্বিকল্পজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর; কারণ এরূপ জ্ঞানের জন্যও যে মন এবং সাক্ষী'র ক্রিয়া আবশ্যক তাহা কখনও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং নির্বিকল্প জ্ঞান সম্বন্ধীয় মত জ্ঞানের স্বরূপের সহিতই বিসঙ্গত।

নির্বিকল্প জ্ঞান বিষয়ের স্বরূপের সহিতও বিসঙ্গত। প্রত্যেক বিষয়ই তন্মধ্যস্থ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত একটি সুসংবদ্ধ পুঞ্জ। তাহা ছাড়া উহা বহু বিষয় দ্বারা সংগঠিত একটি সুসংবদ্ধ পুঞ্জেরও অন্তর্গত। উহা নিজেও ভেদযুক্ত একটি ঐক্য। আবার, উহা যে সুশৃঙ্খল পুঞ্জের অন্তর্গত তাহার অন্যান্য অংশের অপেক্ষায় উহাকে একটি ঐক্যান্তর্গত বিশেষ বলিতে হইবে। উহা যে সুশৃঙ্খলপুঞ্জের অন্তর্গত উহা হইতে উহাকে কিংবা উহার কোন রূপকে নিষ্কর্ষণ করা সমর্থনীয় নহে। কিন্তু এইরূপ নিষ্কর্ষণ ব্যতীত নির্বিকল্প জ্ঞান অসম্ভব।

মধব আগম সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি আগমকে প্রভুত্বব্যঞ্জক আদেশ বলিয়া মনে করেন না। প্রভুত্ব ও আদেশ জ্ঞানোৎপত্তির পরিপন্থী। উহারা শুধু কোন কার্যের প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। কিন্তু শাস্ত্রবাক্য স্বরূপতঃ জ্ঞানেরই একটি করণ।

মধ্ব শব্দপ্রমাণের প্রকরণে প্রধানতঃ বেদসমূহ এবং উপনিষদ সকলকেই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ, অনুমিতি এবং শাব্দজ্ঞান এই তিনটি একই বোধ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর। তাঁহার মতে সদ্বস্তুর সর্বান্তর্ভাবী এবং স্বতোবোধগম্য জ্ঞান বেদ হইতে লাভ করা যায়।

মধ্ব বলেন যে, বেদকে এইভাবে বুঝার অর্থ হইতেছে উহাকে সর্ব যথার্থ-জ্ঞানের জন্যই অপরিহার্য বলিয়া বুঝা। প্রত্যক্ষ, অনুমান এমন কি শব্দপ্রমাণও আংশিক সত্যের জ্ঞান প্রদান করে। কিন্তু বেদের সাহায্যে উহারা সমগ্র সত্যের জ্ঞান দিতে সমর্থ হয়। সুতরাং বেদ হইতেছে প্রজ্ঞার ভাষা, সমগ্র সত্তা উহার দৃষ্টির বিষয়।

বেদের বিভিন্ন বাক্যসমূহ যে পরস্পরবিরোধী উক্তি বলিয়া মনে হয় তাহার কারণ আমাদের মনের বিক্ষেপ। আংশিক সত্যের প্রতি আকর্ষণ হইতে বিক্ষেপ উৎপন্ন হয়। সর্ব বেদের একই উদ্দেশ্য এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সর্ব প্রমাণের এবং তজ্জন্যই সর্ব জীবনেরও একই উদ্দেশ্য। এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিলে বেদের বিশেষ বিশেষ অংশ হইতে অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক্‌ভাবে বিবেচনা করা অথবা অন্য অংশের তুলনায় অধিক মূল্যবান বলিয়া মনে করা যায় না।

মুণ্ডক-উপনিষদের অনুসরণ করিয়া মধ্ব বৈদিক বাক্যের ব্যাখ্যার জন্য উচ্চ ও নিম্ন এই দুই প্রকার দৃষ্টির পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন। প্রথমটি লৌকিক দৃষ্টিতে বেদবাক্যের ব্যাখ্যা করে, দ্বিতীয় দৃষ্টিতে বেদকে অক্ষর সত্যের প্রকাশক বলিয়া গ্রহণ করা হয়। উচ্চ দৃষ্টি ও নিম্ন দৃষ্টির মধ্যে কোন অপরিহার্য বিরোধ নাই। নিম্ন দৃষ্টির যাহা কিছু তাৎপর্য তাহার সব কিছুই উচ্চ দৃষ্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এই উচ্চ দৃষ্টির অর্থ হইতেছে ক্ষর বস্তুর মধ্যে অ-ক্ষর বস্তুকে দেখা। এই জন্যই মুণ্ডক-উপনিষদে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে "বেদের প্রত্যেক বাক্যই অ-ক্ষর বস্তুর জ্ঞান প্রদান করে।"

অ-ক্ষরের জ্ঞান প্রদান করাই সমগ্র বেদের তাৎপর্য এই কথা বুঝিতে হইলে সমধিক অন্তর্দৃষ্টি এবং গভীর অধ্যয়ন আবশ্যক। এই অন্তর্দৃষ্টি অথবা অধ্যয়ন যে বহু অন্তর্দৃষ্টি অথবা অধ্যয়নের অন্যতম তাহা নহে। সর্ব অন্তর্দৃষ্টি অথবা অধ্যয়নের উৎস ও উদ্দেশ্যই হইতেছে এই একমাত্র অন্তর্দৃষ্টি বা অধ্যয়ন। এই অর্থেই মুণ্ডকে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, "ব্রহ্মবিদ্যা হইতেছে সর্বজ্ঞানের উৎস এবং উদ্দেশ্য।"

অ-ক্ষর বস্তুর জ্ঞান কিভাবে হইতে পারে সমগ্র বেদ যে কেবল এই সত্যেরই

উপদেশ দেয়, তাহা চিন্তার একটি নিয়মিত প্রণালীর ফলে উপলব্ধ হয়—ক্রমান্বয়ে শ্রবণ (বেদবাক্যের যথার্থ অর্থবোধ), মনন (বিচার) এবং নিদিধ্যাসন (সত্যের উপলব্ধি) এই চিন্তাপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র বৈদিক চিন্তার সর্বরূপে যে একটি অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার ইহাই প্রণালী।

সুতরাং মধবের মতানুসারে বেদ প্রভুত্বব্যঞ্জক আদেশ অথবা উপদেশ অথবা প্রত্যাদেশ নহে। ইহা বিভিন্ন ব্যক্তিকর্তৃক নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে সত্যের বিভিন্ন স্তর এবং আকারের ব্যাখ্যা নহে। ইহা বিভিন্ন কবি বা দার্শনিক কর্তৃক নিজ নিজ বিশ্বাসানুযায়ী রচিত শব্দপ্রমাণ নহে। ইহা কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞানরূপ সাধনার বিভিন্ন ভূমি সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় না। ইহা জগতের শাসকরূপে দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস সমর্থন করে না এবং তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে উপদেশ দেয় না। জগৎ এবং তাহার উপাদানসমূহ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতও পোষণ করে না।

কঠোপনিষদকে অনুসরণ করিয়া মধব বলেন যে, বেদের প্রকৃত উপদেশের মর্ম বুঝিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করিতে পারা যায় না। আধ্যাত্মিক পূর্ণতার চরম পরিণতি হইতেছে মোক্ষ। ইহা সম্ভবপর হইলে বেদ অপরিহার্য। সাধারণ-বুদ্ধি বেদ সম্বন্ধে যে সকল ধারণা প্রয়োগ করে, কেবল যে সেগুলিকে বর্জন করিতে হইবে এইরূপ নয়, পরন্তু উচ্চতর-প্রজ্ঞা অর্থাৎ বেদকে অপরিহার্য বলিয়া সজ্ঞানে স্বীকার করিলে তবেই বেদ স্বীকার করা হয়। আরও, বেদকে গ্রহণ করার অর্থ হইতেছে বেদের সর্বত্র যে একটি অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা এবং তদ্বারা সর্বব্যাপী সত্যই যে বেদের লক্ষ্য তাহা উপলব্ধি করা।

৩

মধবের মতে প্রকৃত বেদার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে যাহা আবশ্যক তাহা ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম-মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় দর্শনে আছে। ব্রহ্ম-সূত্র হইতেছে বুদ্ধির ভাষা, ইহা সমগ্র বেদের ঐক্যকে প্রকট করে। বেদের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি হইবে তাহা একমাত্র ইহাই নির্ণয় করে। ইহা ব্যতীত বেদ অবোধ্য।

সুতরাং ব্রহ্মসূত্র এবং বেদ একই বিদ্যা। ইহাদের প্রত্যেকেই অপরটি ব্যতীত অবোধ্য। প্রথমটি দ্বিতীয়টির অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যকে প্রকাশ করে বলিয়া দ্বিতীয়টিতেই লীন হইয়া যায় এবং তাহার পর যাহা থাকে তাহা স্বরূপতঃ বেদ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহা প্রদর্শন করাই মধবের রচনাবলীর উদ্দেশ্য। যে ঐক্যবিধায়ক নীতির প্রয়োগ

ব্যতীত বেদের মন্ত্রগুলির অর্থ ভ্রান্তিজনক এবং স্ব-বিরোধী হইয়া পড়ে সেইরূপ কোন নীতির সাহায্যে কোন সূত্র বিশেষ বিশেষ অংশগুলির অর্থ নির্ণয় করিয়াছে তাহা তিনি প্রত্যেক সূত্রের প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, পুরুষ-সূক্তটির একটি অংশের সাধারণ অর্থ লওয়া যাক্। ইহাতে বলা হইয়াছে—"যিনি পুরুষকে এইভাবে জানেন তিনি অমর হন।" জ্ঞানই অমৃতত্বের কারণ এই সূক্তটি যেন ইহাই বলিতেছে আপাততঃ এইরূপ মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলে সর্ব-কারণ ব্রহ্মকেই অস্বীকার করিতে হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে, "যাহা হইতে সকল জীব জন্মগ্রহণ করে তাহাই ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম যদি সকলের কারণ হন, তাহা হইলে জ্ঞান কি করিয়া অমৃতত্বের কারণ হইতে পারে? অথবা, জ্ঞান যদি অমৃতত্বের কারণ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম কি করিয়া সকলের কারণ হইতে পারেন? সুতরাং জ্ঞান অমৃতত্বের কারণ এই ধারণা ব্রহ্ম আছেন এই সত্যের বিরোধী।

এই বাক্যটিতে যে এই আপাতপ্রতীয়মান অর্থ আরোপ করা হয়, তাহার কারণ লৌকিক ভাষার প্রভাব। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রটি লৌকিক রীতির অপপ্রভাব ব্যর্থ করিবার জন্য সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে একটি অখণ্ড দৃষ্টি লইয়া দেখাইয়াছে যে, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাদ্বারা লব্ধ যথার্থ-জ্ঞান ব্রহ্মের প্রসাদ অথবা স্বাধীন ইচ্ছা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে, সুতরাং অমৃতত্ব এই ইচ্ছার ফল। ব্রহ্মসূত্রে প্রদত্ত এই নিয়ামক বিধি প্রয়োগ করিলে বুঝা যায় যে, আলোচ্যমান বাক্যটির স্বাভাবিক অর্থ হইতেছে, জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বলাভও শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মের প্রসাদেই ঘটিয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে মধব তাঁহার মতের বিরোধী যে সকল মত সম্ভবপর তাহাদিগের সকলকেই সযত্নে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, তাহাদের প্রধান দোষ হইতেছে স্ব-বিরোধিতা। উদাহরণস্বরূপ, যে মতে কর্ম বা ভক্তিকে মুক্তির উপায় বলা হইয়াছে, তিনি তাহার দোষগুলি দেখাইয়াছেন। জ্ঞান কর্মের অপেক্ষিত। সুতরাং কর্ম জ্ঞানের সক্রিয়তার অভিব্যক্তি। ভক্তি হইতেছে জ্ঞানের মধ্যে অনুরক্তিরূপ উপাদান। সুতরাং ইহা জ্ঞানের প্রগাঢ়তার অভিব্যক্তি। কর্মকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিলে জীবই কর্তা ইহা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলে ব্রহ্মই যে সর্ব-কর্তা ইহা অস্বীকার করিতে হয়। ভক্তিকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিলে জীব যে অনাত্মা ইহা সমর্থন করা হয়।

ঈশাবাস্যোপনিষদের ভাষায় অবৈধ পৃথক্-করণ অথবা আংশিক জ্ঞান হইতেছে অবিদ্যা এবং সামগ্রিক জ্ঞানই হইতেছে বিদ্যা। অবিদ্যাকে অবিদ্যা বলিয়া না বুঝিলে জ্ঞানের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেবল একটিতে

মাত্র মনঃসংযোগ করিলে কোনটিরই প্রকৃত তাৎপর্যবোধ হইবে না। ব্রহ্ম (ঈশ) এই দুইয়েরই স্রষ্টা। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনিই অবিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছেন। অবিদ্যা সৃষ্টি করার অর্থই হইতেছে এমন কতকগুলি অবস্থা সৃষ্টি করা যাহার মধ্য দিয়া অবিদ্যা সুষ্ঠুভাবে জ্ঞানের বিরোধিতা করিতে পারে। ইহার ফলে জ্ঞান শেষপর্যন্ত আপন মহিমায় দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া মধব জ্ঞানকে নিষ্ক্রিয় চৈতন্যরূপে নয়, পরন্তু যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনমূলক একটি সক্রিয় ব্যাপার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১) অবিদ্যাকে বর্জন (২) জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব উপপাদন এবং উহার মূল্যোপলব্ধি (৩) এবং যে উপাদানটির উপর জ্ঞান-প্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা নির্ভর করিতেছে তাহার রক্ষণ—এইগুলি হইতেছে এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ। অবিদ্যাকে বর্জন করা হইয়াছে, কারণ যে হেতুর উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত তাহা অযৌক্তিক। জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, কারণ যে নিয়ম ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে তাহা নির্দোষ। অজ্ঞেয়বাদীর বিরুদ্ধে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া মধব দুইটি মান ব্যবহার করিয়াছেন। যে অজ্ঞানকে সমর্থন করে জ্ঞানের সহিত তাহার আদৌ পরিচয় নাই। সুতরাং সে অজ্ঞানকে তাহার নিজ দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই আলোচনা করে। কিন্তু জ্ঞানের নিজেরই মূল্য-নির্ধারক মান আছে। মধব সম্পূর্ণভাবে এই মানানুযায়ী জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে, একবার ইহার মূল্যোপলব্ধি হইলে ইহাকে আর পরিহার করা যায় না। এই তথ্যকে উপলব্ধি করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, অজ্ঞান তাহার নিজের দ্বারাই অর্থাৎ তাহার অন্তর্ভুক্ত স্ব-বিরোধ দ্বারাই খণ্ডিত হয়।

জ্ঞানের প্রকৃতিই এই যে, ইহা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইবার দিকেই ইহার গতি। মধব মনে করেন যে, এই তথ্য উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। তিনি বলেন, "এক মুহূর্তের জন্যও কাহারও জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ব্যতীত থাকা উচিত নয়। যদি নিদ্রা ইত্যাদির জন্য কোনও সময়ে কোন ব্যক্তির এই জ্ঞানের বিরতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে চৈতন্যলাভ করিবার পরক্ষণেই পূর্বের ন্যায় উহার অনুশীলন করিতে থাকা উচিত।" তত্ত্ববিদ্যার সমগ্র প্রক্রিয়া হইতে বুঝা যায় যে, কিরূপে কর্ম এবং ভক্তি স্বরূপতঃ জ্ঞান হইতে পারে। শ্রবণ হইতে মনন এবং মনন হইতে নিদিধ্যাসন পর্যন্ত যে গতি উহারা তাহারই অভিব্যক্তি। এই সত্য উপলব্ধি করিলে সমস্ত বেদ যে একটিমাত্র উদ্দেশ্যদ্বারা অনুপ্রাণিত তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

৪

মধব দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা বেদকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা নিষ্ফল। ব্রহ্ম নির্বিশেষ এই মতবাদ (শংকরের) এবং ব্রহ্ম শরীরী এই মতবাদ (রামানুজের) এই সত্যের উদাহরণ। এই দুইটি মতবাদ বেদের বিশেষ বিশেষ বাক্যের আপাতপ্রতীয়মান অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এগুলিও দ্বৈতবাদের উদাহরণ এবং তাহারা যে সকল সমস্যা সমাধান করিতে পারে তাহাদের অপেক্ষা অধিকসংখ্যক সমস্যা সৃষ্টি করে। নির্গুণ বস্তু সগুণ বস্তুর বিরোধী। নির্গুণ বস্তুকে স্বীকার করার অর্থই হইতেছে উহাকে অস্বীকার করা। আবার, অবিদ্যাও দ্বৈতকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। ব্রহ্ম নির্গুণ হইলে অজ্ঞানের আধার হইতে পারেন না। সুতরাং অবিদ্যা নিরাধার। অবিদ্যা এবং নির্গুণ ব্রহ্মের একত্রাবস্থান সম্ভবপর নহে। অবিদ্যার উপর অধিক গুরুত্ব অর্পণ করিলে ব্রহ্মের বিপরীত দিকে স্ব-তন্ত্র এবং চরম তত্ত্বরূপে অবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

ব্রহ্ম শরীরী এই দ্বিতীয় মতবাদটিও দ্বৈতের অভিব্যক্তি। ইহা হইতেছে দ্রব্য এবং গুণের দ্বৈত। তাহাদিগকে সম্বন্ধ করার চেষ্টা করিলে দ্বৈতবাদই সমর্থিত হয়।

বেদ-ব্যাখ্যায় ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োগ করিলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধারণা পাওয়া যায় ইহা মধব বুঝেন। এই মতকে ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি বৈদান্তিক চিন্তাকে তাহার চরম পরিণতিতে উপনীত করিয়াছেন। তাঁহার মতে কেবলমাত্র বেদে ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মসম্বন্ধে ধারণালাভ করা যায়। সুতরাং ইহা বৈদিক। যাহা নির্গুণ তাহার পক্ষে বৈদিক হওয়া স্ব-বিরোধী। শরীরীরূপে ব্রহ্মের ধারণা দ্রব্য, গুণ এবং তাহাদের সম্বন্ধের ব্যবহারিক ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বেদে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তিনি সকল ব্যবহারিক ভেদের অতীত।

জ্ঞানের করণ হিসাবে বেদের স্থান অন্যান্য করণগুলির উর্ধ্বে। ইহা উহাদিগকে অসার প্রতিপন্ন করে না, কিন্তু উহাদিগকে নূতন তাৎপর্য দান করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সাধারণতঃ মনে করা হয় যে প্রত্যক্ষ একটি বাহ্যবস্তুকে উপস্থাপিত করে। শুদ্ধ তত্ত্ববিদ্যারূপে যদি বেদ দেখায় যে এই বস্তু ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ব্রহ্মের প্রকাশ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ আর বেদ নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় ইহা সাধারণ বস্তুর পরিবর্তে সেই বস্তুর অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে প্রকাশ করে। এই অনুভূতিতে বস্তুর আধার জ্ঞানে নিমজ্জিত হইয়া যায়, এবং বস্তু ইহার আধার ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়।

এইভাবে বেদ জ্ঞানের অন্যান্য করণগুলিকে অস্বীকার না করিয়া তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যায়। ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মও অন্যান্য বস্তুকে অস্বীকার না করিয়া তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যান। সুতরাং জ্ঞানের কোন করণই বেদের আলোকে উদ্ভাসিত না হইয়া থাকে না। ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মের বাহিরে কোন বস্তুও থাকে না। বেদই সকল জ্ঞানের করণের উৎপত্তিস্থল। আবার ব্রহ্মই সকল বস্তুর উদ্দিষ্ট বস্তু। বেদ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ করণ। সেইরূপ ব্রহ্ম চরম সৎবস্তু। সুতরাং বেদ জ্ঞানের চরম উৎপত্তিস্থল, সেইরূপ, ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু।

মধব দেখাইয়াছেন যে, কেবল তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারা যায়। তত্ত্ববিদ্যারূপে ছান্দোগ্য এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় (একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম)। যাঁহারা মনে করেন যে, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বলিয়া জগৎ অসৎ, অথবা ব্রহ্ম এক সুতরাং জগৎ তাঁহার শরীর, তাঁহারা কেবলমাত্র শব্দ প্রমাণ বলিয়া মনে করেন এবং ইহাতে লৌকিক অর্থ আরোপ করেন।

জগৎকে অসৎ বলিয়া মনে করিলে এইরূপ কল্পনাকেই অসম্ভব বলিয়া প্রতিপাদন করা হয়। এই জগৎ ব্রহ্মের শরীর এইরূপ মনে করিলে ব্রহ্মকে কোন বহিস্থ বস্তু দ্বারা সীমিত করা হয়। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার নিকট এই সকল সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোনটি বেদের অভিমত নয়।

ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বেদের এই মত ব্রহ্মবিদ্যার ফল। ইহার নিহিতার্থ এই যে, জগৎ সত্য এবং এইজন্য ইহার প্রকৃত আশ্রয় কি তাহা আবিষ্কার করার সমস্যা উদয় হয়। বেদ জগতের যে সত্যতার নির্দেশ দেয় তাহা এইরূপ যে, উহা ব্রহ্মবিদ্যাকে অপরিহার্য করিয়া তুলে।

৫

"তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর," "শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কর" বেদের এই বাক্যগুলি দ্বারা বেদের যে মত ব্যক্ত হয় তাহা এই যে, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করিবার চেষ্টা করা উচিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার বর্ণনা এইরূপ করা হইয়াছে, "আত্মাকে পাইতে হইলে আত্মাকে শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।" ব্রহ্মসূত্রে জ্ঞানকে যথাক্রমে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন এই তিনটি দ্বারা গঠিত ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়া এই বাক্যগুলির অর্থ পরিস্ফুট করা হইয়াছে। ব্রহ্মকে যে ভাবে বেদে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার অর্থ গ্রহণ

করাই শ্রবণ। সমস্ত ব্যবহারিক ব্যাখ্যাই যে অসম্পূর্ণ ইহা আবিষ্কার করিলেই এই অর্থ গ্রহণ হয়। যাহার অর্থগ্রহণ হইয়াছে তাহাই মননের বিষয়। বেদের সমস্ত অংশগুলি সম্পর্কে আমাদের অর্থবোধকে পরীক্ষা করা এবং সমগ্র বেদের অর্থবোধ হইয়াছে কিনা দেখা ইহাই হইতেছে মনন। যাহার অর্থ বোধ হইয়াছে তাহার প্রয়োগপ্রক্রিয়াই নিদিধ্যাসন। এই প্রক্রিয়াকেই ধ্যান বা উপাসনা বলা হয়। ধ্যান বা উপাসনাকে প্রচলিত অর্থে লইলে, অর্থাৎ ইহা জ্ঞাত বস্তুর প্রতি মনোযোগ এরূপ মনে করিলে, উহা আধ্যাত্মিক উন্নতি রোধ করিবার প্রক্রিয়া হইবে। ব্রহ্মবিদ্যা বাসনাসমূহ হইতে মুক্তির অভিব্যঞ্জক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিই ইহার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তত্ত্ববিদ্যা মানসিক শান্তির জনক। ইহা শিক্ষার্থীকে বেদ যেভাবে ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করিতেছে সেইভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দেয়। মধব তত্ত্ববিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ সাধনা কেন বলিয়াছেন ইহাই তাহার অপর একটি কারণ।

সুতরাং তত্ত্ববিদ্যা হইতেছে ব্রহ্মের ভাষাস্বরূপ বেদের অর্থ গ্রহণের প্রক্রিয়া। কোন একটি উক্তিকে বেদ বলিয়া ধরিয়া লইয়া উহাকে বিচার দ্বারা সমর্থন করা তত্ত্ববিদ্যা নহে। ইহা হইতেছে ব্রহ্মের ভাষাকে বেদ বলিয়া স্বীকার করা। সুতরাং তত্ত্ববিদ্যা এবং বেদ পরমাত্মার প্রকাশ। বুদ্ধির দিক হইতে তত্ত্ববিদ্যা প্রথমে আসে, বেদের আকার ধারণ করে এবং ইহার ভিত্তিতে অবশ্যম্ভাবীরূপে অন্য তত্ত্ববিদ্যা গড়িয়া উঠে। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া মধব নিজেকে ত্যক্ত-বেদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি কেবলমাত্র একজন শাস্ত্রব্যাখ্যাতা নহেন। ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জয়তীর্থ বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-সূত্র বেদকে অনুসরণ করিয়া রচিত হয় নাই, কিন্তু ইহা বেদের অর্থকে প্রকট করিয়াছে অথবা বেদকে আবিষ্কার করিয়াছে।

ইহা কিন্তু বলা যাইতে পারে যে, এ পর্যন্ত যে সকল কথা বলা হইল তদনুযায়ী মধবের চিন্তা অর্থাৎ ব্রহ্ম-মীমাংসার মর্ম অনুধাবন করা কঠিন। কিন্তু মধব বলেন যে ইহা অপরিহার্য। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার অর্থই হইতেছে ব্রহ্মই যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন তাহা উপলব্ধি করা। বৈদিক ভাষা ব্যবহার করিয়া বলিতে হয় যে, পরব্রহ্ম নারায়ণ যেভাবে নিজেকে বাসুদেব অর্থাৎ সর্বান্তর্ভাবী বলিয়া জানেন তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্ম একান্তভাবে সর্বান্তর্ভাবী বলিয়া বেদে বাদরায়ণ, নারায়ণ বা বাসুদেবকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম কর্তৃক নিজেকে বিষ্ণু বলিয়া জানিবার যে প্রক্রিয়া তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। এই পরিকল্পনা অনুসারেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং তত্ত্ববিদ্যা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। এই

সত্য উপলব্ধি করিয়া মধ্ব তত্ত্ববিদ্যাকে বিষ্ণু-শাস্ত্র বলিয়াছেন। এই জন্যই এই শাস্ত্র এত ব্যাপক যে ইহা বিদ্যার সকল শাখা অর্থাৎ শাস্ত্রেরই উৎপত্তিস্থল ও গন্তব্যস্থল। ইহার অধ্যয়ন শ্রেষ্ঠ সাধনা এবং সকল সাধনার গুণই ইহাতে বর্তমান। এই সকল সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার জন্য মধ্ব ব্রহ্ম-বিদ্যার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২। ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় দর্শনের ব্যাখ্যা

বৈদিক উপদেশসমূহের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য আবিষ্কার করা এবং তাহার দ্বারা ব্রহ্মের অনন্ত এবং চরম পূর্ণতা অনুধাবন করাই ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় দর্শন। জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের সংঘর্ষ এবং তৎ-বিরুদ্ধে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা এই ঐশ্বর্যের কারণ। এই ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করিবার জন্য যে 'যুক্তি' প্রয়োগ করা হয় তাহা বিশুদ্ধ বৈদিক যুক্তি। ইহা ব্যবহারিক যুক্তিকে অতিক্রম করে। এমন কিছু নাই যাহা দ্বারা ইহাকে খণ্ডন করা যাইতে পারে। এক অখণ্ড আধ্যাত্মিক দৃষ্টিই ইহার বিশেষত্ব। সুতরাং ইহা স্ব-প্রতিষ্ঠ। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে এইরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিতে গেলে উহাতে স্ব-বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহা নিজেকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; কারণ, ব্যবহারিক স্তরে কিছুই চরম নয়, কিছুই সম্পূর্ণ নয়।

সাধারণভাবে এই সকল ধারণাকে ভিত্তি করিয়া মাধ্ব-দর্শনের মূল বক্তব্যগুলিকে বিবৃত করা যাইতে পারে।

১

অপূর্ণতার বোধ হইতে পূর্ণতার ধারণা আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা হইতে পূর্ণতার অর্থাৎ ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। সন্দেহ হইতে দর্শনের উৎপত্তি। ব্রহ্ম আছেন কিনা, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কোন উপায় আছে কিনা, এইরূপ সন্দেহের উৎপত্তি হইলে শাস্ত্র অপরিহার্য হইয়া উঠে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় নহেন এই অর্থে তাঁহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ এই কথা বলিলে দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়। কিন্তু কোন দার্শনিক মতকে পূর্বে স্বীকার করিয়া লইলে তবেই দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায়। সুতরাং ইহাতে স্ব-বিরোধ ঘটে।

ব্রহ্মের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জগৎকে দেখিলে তবেই তত্ত্ববিদ্যা সম্ভবপর। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে তত্ত্ববিদ্যা ভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

মুক্তির ইচ্ছা হইতে দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হয় না। ইচ্ছাই দুঃখ। মায়া ইহার কারণ। মায়া এবং তত্ত্ববিদ্যা পরস্পরবিরোধী। পূর্ব-সংস্কার হইতে মায়ার উদ্ভব হয়, কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। ইহা আনন্দ হইতে উদ্ভূত এবং আনন্দ-স্বরূপ।

এই আনন্দ সর্বাতীত। ইহা ব্যবহারিক জগতের উপর নির্ভর করে না। ইহা অনাসক্তির অভিব্যক্তি। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই আমাদের প্রিয় হইতে পারে না এই বিশ্বাস হইতেই এই অনাসক্তির উদয় হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত আর সব কিছুই সীমাবদ্ধ এবং দোষযুক্ত।

তত্ত্ববিদ্যা মানুষের উদ্ভাবিত নয়। ইহা মনুষ্যের মধ্যে দৈব উপাদানের প্রকাশ। ইহা ব্রহ্মের করুণার ফল।

জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ এবং জ্ঞানের বিষয় যে চরমতত্ত্ব তাহা আবিষ্কারের প্রক্রিয়াই তত্ত্ববিদ্যা। ব্রহ্ম শব্দটি এই দুইটিকেই নির্দেশ করিয়া থাকে। জ্ঞানের আদিকারণ-রূপে ব্রহ্ম নিত্য, নির্দোষ, স্বতঃপ্রমাণ এবং অ-পৌরুষেয়। এই অর্থে ইহাকে বেদ বলা হয়। সত্তারূপে ব্রহ্ম পূর্ণ। যিনি পূর্ণ তিনি সর্বশক্তিমান, সব কিছুর সত্তা তাঁহা হইতেই আসিয়া থাকে। যাহা সৎ তাহার (১) স্বরূপ (২) প্রমিতি এবং (৩) প্রবৃত্তি আছে। সর্ব-কর্তা এবং সর্ব-দাতারূপে ব্রহ্মকে বিষ্ণু বলা হয়।

সুতরাং ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় দর্শন এবং বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় দর্শন একই। ইহা স্বীকার না করাই বন্ধন। ইহা বুঝিলেই মুক্তি। দুই-ই বিষ্ণুর কার্য। বিষ্ণু সাধন এবং সাধ্য উভয়ই। বেদকে শুদ্ধ তত্ত্ববিদ্যারূপে গণ্য করিলে একমাত্র বেদ হইতেই এই জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক ধারণা এবং প্রত্যেক শব্দ ঐশ্বরিক সত্যের অভিব্যক্তি হইয়া দাঁড়ায় এবং সমগ্র জগৎ বিষ্ণ্বর্পিত হইয়া যায়।

২

পূর্ণ-রূপে ব্রহ্ম (বিষ্ণু) বুদ্ধির অতীত। কিন্তু তিনি নিত্য এবং অপরিহার্য। ব্রহ্মই সব কিছুর কারণ এইভাবে দেখিলে তিনি বুদ্ধিগম্য হন।

চেতন-আত্মা অথবা বিষয়ীসমূহ এবং বস্তুসমূহ লইয়া এই জগৎ গঠিত। জীবাত্মা বহু। ইহারা আটটি অবস্থার মধ্য দিয়া গমন করে—অস্তিত্ব, ধ্বংস, সাপেক্ষ অবস্থিতি, জ্ঞান, অজ্ঞান, বন্ধন ও মুক্তি। বিভিন্ন জীবের পক্ষে এই সকল অবস্থার তারতম্য ঘটে। সকল আত্মাই পরস্পরকে প্রভাবিত করে। সেইজন্য কেহই

সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। যদিও প্রত্যেক জীবের স্বকীয় সত্তা আছে, তাহা হইলেও অন্যদের উপর একের প্রভাব অত্যধিক হইতে পারে। যাহাতে পরিবর্তন ঘটিতে পারে তাহাই অন্যের অধীন। সুতরাং জগতের প্রত্যেক চেতন ও অচেতন দ্রব্যকেই স্বভাবতঃ পরতন্ত্র হইতে দেখা যায়। পরতন্ত্র দ্রব্য যেমন নিজেকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না, তেমনই অপরকেও ব্যাখ্যা করিতে পারে না। সুতরাং পরতন্ত্র দ্রব্য থাকিলেই তাহার পূর্বে স্বতন্ত্র দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

পরতন্ত্র দ্রব্য নাই ইহা বলিলে অথবা ইহাকে মায়া বলিলে ইহার স্থলে অভাব কিংবা মায়াকে স্থাপন করা হয়। কিন্তু অভাব কিংবা মায়া পরতন্ত্র, অন্ততঃ ইহার কারণরূপে স্বতন্ত্রকে থাকিতে হইবে। সুতরাং পরতন্ত্রকে কোন না কোন অর্থে সৎ বলিতে হইবে। অতএব স্ব-তন্ত্র সত্য জগতের সত্য কারণ। ইহা সর্বপ্রকারেই স্ব-প্রতিষ্ঠ। ইহা ইহার কার্যসমূহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং এইগুলি হইতেই ইহাকে জানা যায়। ইহা নিত্য এবং সর্বশক্তিসম্পন্ন। ইহা সকল ক্রিয়ার কর্তা, সকল কর্তার কর্তা। সব-কিছুর কর্তারূপে ইহাই সব। ইহার বিভিন্ন রূপ আছে। প্রত্যেক রূপই স্বতন্ত্র। ইহা সমস্ত স্বগত ভেদ হইতে মুক্ত। কিন্তু ইহাকে পরতন্ত্র হইতে পৃথক্ করা যায়। ইহার বিরুদ্ধে পরতন্ত্রকে স্থাপন করিলে ইহাকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিলে ইহাকে স্বীকারই করা হয়। এই সকল সত্যকে স্বীকার করিয়া বেদে বলা হইয়াছে যে, ইহা পরতন্ত্র হইতে অ-ভিন্ন এবং ভিন্ন। ইহার তাৎপর্য এই যে, অভেদ এবং ভেদকে পরস্পরের বিরোধী মনে করিলে উহারা স্ব-তন্ত্র এবং পরতন্ত্রের পার্থক্যের প্রতি প্রযোজ্য নহে।

দ্রব্যসমূহের বহুত্ব, বৈচিত্র্য, উচ্চ-নীচ ভাব, স্তর-ভেদ, শ্রেণী-ভেদ, ক্রিয়া ইত্যাদি সকলেরই মূলে আছেন স্বতন্ত্র। যিনি স্বতন্ত্র তিনি সকল প্রকারেই পূর্ণ। সুতরাং সর্ব-কর্তৃত্ব হইতে সর্ব-পূর্ণতা প্রমাণিত হয়।

৩

যাহা-কিছু আছে তাহা স্বয়ং-ক্রিয় এই বিশ্বাস ভ্রান্ত। ব্রহ্মই সকল ক্রিয়ার কর্তা এই সত্য এই ভ্রান্তবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক ধারণাসমূহের বিরোধী। সুতরাং তত্ত্ববিদ্যাই এই ভাবের একমাত্র জনক।

চেতন বা অচেতন পরতন্ত্র দ্রব্য সর্ব-ভাবেই পরতন্ত্র। সুতরাং ইহা কোন কিছু ঘটাইতে পারে না। যাহার কিছু করিবার, যাহা করা হইয়াছে তাহা নষ্ট করিবার

এবং অন্য-কিছু করিবার শক্তি আছে, তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে স্বয়ংক্রিয় বলা যায়। এই শক্তি (১) অমঙ্গল পরিহার করিতে এবং উপকার করিতে সক্ষম হইবে, (২) ক্লান্তি, উদ্বেগ, স্মৃতিভ্রংশ, দুঃখ ইত্যাদি হইতে মুক্ত হইবে, (৩) পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইবে, (৪) ইষ্ট সম্পাদনে সক্ষম হইবে, (৫) বুদ্ধিগম্য হইবে, (৬) ক্ষমতার অপচয় করিবে না এবং (৭) স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। জগতের কোন বস্তুরই এইরূপ শক্তি আছে ইহা বলা যায় না, সুতরাং ইহাদের কাহাকেও প্রকৃত কর্তা বলা যায় না।

কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই এইরূপ শক্তি আছে এবং তিনিই সর্ব-কর্তা। কেবল তিনিই স্ব-তন্ত্র। তিনিই জগৎকে করেন, করিতেছেন এবং করিয়াছেন। তাঁহার সৃজনী-শক্তি এই সকল ক্রিয়ার মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং ক্রিয়ার জগৎ সর্ব-কর্তা অর্থাৎ বিষ্ণুর বিরোধী নহে।

সর্ব-কর্তা বস্তু সমূহকে সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের দ্বারা ক্রিয়া করান। এই জগৎ সব-কর্তার ক্রিয়ার ফল, অর্থাৎ তিনি ক্রিয়া করেন এবং অপরকে করান ইহা হইতেই জগতের উৎপত্তি। ইহার অর্থ এই যে, যেহেতু যাহা করা হয় তাহা কর্তা হইতে পারে না, ঠিক সেইহেতু যে কর্তা সে কর্তা নয়। কারণ, কর্তা এবং কৃতকর্ম শেষ পর্যন্ত একই। সুতরাং কোন বস্তু কেবলমাত্র কোন ক্রিয়ার কর্মরূপে অথবা কর্তারূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হউক না কেন, ইহা বিষ্ণুর সৃজনী ক্রিয়ার প্রকাশ। ইহা তাঁহার সর্ব-কর্তৃত্বের অভিব্যক্তি। বেদ এই সত্যকে প্রকাশ করে।

কোন বৈদিক উপদেশের প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মবিত্তাদ্বারাই নির্ণীত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ ছান্দোগ্য-উপনিষদে বর্ণিত সদ্-বিত্তার মধব-প্রদত্ত ব্যাখ্যা লইয়া এই বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

এই অনুচ্ছেদে স্বতন্ত্র বা সৎ-কে সকলের আদি কারণ বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। যাহা সকলকে সত্তা দান করে তাহার ধারণা এবং যাহা সর্ব-সম্পূর্ণ (আত্মা) তাহার ধারণা ইহার শেষে স্থান পাইয়াছে। ইহা ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্বের উপর গুরুত্ব দিয়াছে। এই সত্য উপলব্ধি করিলে ন্যগ্রোধ বৃক্ষের বীজের ন্যায় একটি ক্ষুদ্রতম বস্তুও ব্রহ্মের প্রকাশ বলিয়া স্বীকৃত হয়। "তাহাই তুমি" (তত্ত্বমসি) এই বাক্য এই উপলব্ধির ফলকে প্রকাশ করে। এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, এই সত্যের উপলব্ধি হইবার পূর্বে জীবকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই উপলব্ধি হইবার পর জীব যে সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্ম হইতে জাত এইরূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানই মুক্তি। গুরু উদ্দালক এই জ্ঞানকে সকল জ্ঞানের আশ্রয়, সুতরাং অপরিহার্য বলিয়া প্রশংসা

করিয়াছেন। এই জ্ঞানের উপরেই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। সর্বশেষে, ব্রহ্মকে সকল বস্তুর আদি কারণ বলিয়া মনে করিলে এমন একটি যুক্তি পাওয়া যায়, যাহার দ্বারা সমগ্র অনুচ্ছেদটিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এতদ্‌ব্যতীত নয়টি উদাহরণের সাহায্যেও ব্রহ্ম যে কোন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হন না এই সত্যকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। লবণের উদাহরণ লইলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহা দৃষ্টই হউক আর অদৃষ্টই হউক, লবণ লবণই থাকে। ঠিক সেইরূপ, ব্রহ্ম সৃষ্টি করুন বা নাই করুন, তিনি ব্রহ্মই। সুতরাং তিনি সমস্ত কিছু হইতে ভিন্ন। সুতরাং এই অণুচ্ছেদটির আরম্ভ, সমাপ্তি, ইহাতে যে বিষয়টি বিশেষ জোরের সহিত বলা হইয়াছে, যাহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যে বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, সেই সমস্ত আলোচনা করিয়া ইহাকে ব্যাখ্যা করিবার যে পদ্ধতি, তাহা দ্বারাই ইহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা যায়।

ঐ অনুচ্ছেদ সম্পর্কেই মধব ব্রহ্ম-সত্তার উচ্চতর তাৎপর্যের কথা বলিয়াছেন। এই অনুচ্ছেদে ব্রহ্ম নিজেকে কি ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, "ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন আমি অনন্ত আকার ধারণ করিব, আমি সৃষ্টি করিব।" ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যখনই মধব সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন, তখনই তিনি দুই প্রকার সৃষ্টির কথা ভাবিয়াছেন: বিষ্ণুর অনন্ত আকার সমূহের বিষ্ণু হইতে নির্গত হওয়া এক প্রকার সৃষ্টি, এবং জগতের তদনুরূপ বস্তুসমূহের বিষ্ণু হইতে নির্গত হওয়া আর এক প্রকার সৃষ্টি। প্রথমটির মধ্যে দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উপনিষদের যে কোন সৃষ্টি বিষয়ক অনুচ্ছেদের প্রতি এই ধারণা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। "আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে" এই বাক্যটি লওয়া যাক। প্রথম অর্থানুসারে আত্মাই বিষ্ণু, আকাশও বিষ্ণু। দ্বিতীয় অর্থানুসারে আত্মা বিষ্ণু এবং আকাশ, যে আকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা। ইহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য হইতেছে এই যে, বিষ্ণু হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছিল, যে বিষ্ণু ব্রহ্ম তাঁহা হইতে যে আকাশ পূর্ণ সেই আকাশের উৎপত্তি হইয়াছিল।

বর্তমান সদ্বিদ্যা-বিষয়ক অনুচ্ছেদকেও এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে বুঝা যায় যে, যে সকল শব্দকে জগতের বস্তু সমূহের প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল বস্তুর যে সকল গুণ আছে তদনুযায়ী বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপকে লক্ষ্য করে। বিষ্ণুর এই সকল রূপ সেই সেই বস্তুগুলির অনুস্যূত কারণ। এই সকল রূপ আছে বলিয়াই বস্তুগুলি আছে।

এই অনুচ্ছেদের শেষে 'তত্ত্বমসি' এই যে বাক্যটি আছে, তাহাকেও এই ভাবেই

ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'তৎ'-এর অর্থ বিষ্ণু। 'ত্বম্'-এর অর্থ জীব, অর্থাৎ শ্বেতকেতুর আদি কারণ। 'অসি'-র অর্থ এই দুইয়ের তাদাত্ম্য। সৃষ্টির সর্বত্রই বিষ্ণুর তাদাত্ম্য লক্ষ্য করার ইহাই অর্থ। তাদাত্ম্য হইতেছে বিষ্ণু স্বয়ং। ইহা বুঝিলেই বিষ্ণু যে সর্ব-কর্তা এবং সর্ব-পূর্ণ তাহা বুঝা যায়।

বিষ্ণু বা ব্রহ্মই প্রত্যেক শব্দের মৌলিক অর্থ। কোন শব্দকে অন্য পদার্থের প্রতি প্রয়োগ করিলে ঈশ্বর বা বিষ্ণুকে অস্বীকার করা হয়। এই সত্যকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন শব্দকে কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি প্রয়োগ করা হয় কেন প্রথমে তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ ভাষা-বিজ্ঞান প্রচলিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কোন যুক্তি দেয় না। সুতরাং মধব ভাষাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে তাহা দেখাইয়াছেন।

কোন শব্দ শুনিবামাত্র আমাদের মনে যাহা উদয় হয় তাহাই ইহার স্বাভাবিক অর্থ। সুতরাং ঐ বস্তুর স্বভাবের মধ্যেই এমন কিছু আছে যাহার জন্য ঐ শব্দটিকে ঐ বস্তুতে প্রয়োগ করিতে হয়। কোন বস্তুর স্বকীয় ও অন্তর্নিহিত স্বভাব ও সত্তার জন্যই উহা যাহা, তাহা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চরম বিশ্লেষণে কোন বস্তুর প্রতি কোন শব্দ প্রয়োগ করিলে উহাকে যে সত্তা সেই বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহার প্রতিই প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এই সত্তা ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং প্রত্যেক শব্দের লক্ষ্য তিনিই।

একই নিয়ম অনুচ্চারিত ধ্বনি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। নদীর প্রবাহের ধ্বনি বিস্ময় উদ্রেক করে এবং ইহার আন্তর সত্তাও ভগবান্। সুতরাং ধ্বনি ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করে। এই প্রসঙ্গে মধব ভাষার বিবর্তনের প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বেদ বিষ্ণু সম্বন্ধে উপদেশ দেয় বলিয়া ইহার ভাষাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সেইজন্য তিনি বেদকে সংস্কৃত ভাষা বলিয়াছেন।

৪

ব্রহ্ম চিন্তার অতীত এইরূপ মনে করা ইহাও চিন্তা করা। সুতরাং ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞানের বিষয়। ব্রহ্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এমন কিছুই নাই। ব্রহ্ম আনন্দ। তাঁহার সৃষ্টিও আনন্দ। আনন্দলাভ করাই মুক্তি।

মধবের সিদ্ধান্ত এই যে, "ব্রহ্ম অর্থাৎ বিষ্ণু পূর্ণ, নির্দোষ, জ্ঞানের বিষয় এবং সকলের গম্য।"

৩। ব্রহ্মবিষয়ক দর্শনের তাৎপর্য

মধব ঈশ্বরের দুই প্রকার প্রকাশের কথা বলিয়াছেন—স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্র। প্রথমটি হইতেছে চরম সত্তা এবং দ্বিতীয়টি ইহার ক্রিয়ার ফল। সুতরাং যাহা পরতন্ত্র তাহা স্বতন্ত্রের মহিমাকে ব্যক্ত করে।

পরতন্ত্রের দুইটি অংশ – চিৎ ও অচিৎ। শেষোক্তটি তিন প্রকারের (১) যাহা অবিরাম উৎপন্ন হইতেছে, যথা—বেদ। (২) অবিরাম উৎপাদন এবং সবিরাম উৎপাদনের মিশ্রণের ফলে যাহা উৎপন্ন হয়, যথা জড়দ্রব্য, কাল এবং দেশ এবং (৩) যাহা কখনও কখনও উৎপন্ন হয়, যথা—ঘট ইত্যাদি।

জ্ঞাতা বা চেতন-জীব প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়াতে নিরন্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকল জ্ঞাতার পক্ষে তত্ত্ববিদ্যার প্রয়োগ জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু জীব নানা শ্রেণীর হইয়া থাকে: কেহ কেহ তত্ত্ববিদ্যালাভ করিতে ইচ্ছুক, কেহ কেহ ইহার প্রতি উদাসীন, কেহ কেহ বিরোধী। ভ্রান্ত জ্ঞান যেমন জ্ঞানই নয়, তেমনই শেষোক্ত দুই শ্রেণীর জীব প্রকৃত জ্ঞাতা নয়।

ব্রহ্মবিদ্যা কঠিন। বিষ্ণুর কৃপা হইলে তবেই কোন ব্যক্তি উহা আয়ত্ত করিতে পারে। ইহার জন্যই তত্ত্বজ্ঞানের তারতম্য হইয়া থাকে। তদনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের পরিমাণানুযায়ী পাঁচ শ্রেণীর জ্ঞাতার মধ্যে পার্থক্য হইয়া থাকে। যথা—জগতের নিয়ন্তা (দেব), শিক্ষক (ঋষি), পিতা (পিতৃ), রক্ষক (প) এবং মনুষ্য (নর)। এই স্তর-ভেদের অর্থ হইতেছে এই যে, দেব প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর জ্ঞাতাগণ বিভিন্ন শ্রেণীর তত্ত্ববিৎ। অন্যদের দেব ইত্যাদি বলা ভুল হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানের স্তরভেদ থাকিলে ভ্রমকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া অজ্ঞানেরও স্তরভেদ থাকিবে। মনুষ্যে কর্তৃত্ব আরোপ করিলে ভ্রান্তজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ভ্রান্তজ্ঞান হইতে আসক্তি, ঘৃণা ইত্যাদি, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি অশুভ উৎপন্ন হয়। বিষ্ণু এই সকলের স্রষ্টা এবং ইহারা তাঁহার উপরেই নির্ভরশীল। সর্ব-কর্তা হিসাবে বিষ্ণুই সকল জীবের আন্তর সত্তা। ইহার অর্থ এই যে, কোন জীব নিজের উপর কর্তৃত্ব আরোপ না করিলে নিষ্ক্রিয় বা দায়িত্বহীন হইতে পারে না। বিষ্ণুকে সর্ব-কর্তা রূপে বুঝিলে আমাদের দেহ যে জীবাত্মার বাহক নয় পরন্তু বিষ্ণুর বাহক তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার ফলে জীব বিষ্ণুর সৃষ্ট সংস্কার, জন্ম পরিবেশ ইত্যাদির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করিতে পারে। কর্মই জীবন। ইহা জ্ঞানের অভিব্যক্তি। ইহা যে পরতন্ত্র তাহা উপলব্ধি করাই ইহার স্বভাব। ইহার মধ্য দিয়াই সৃষ্টিকার্যে রত ব্রহ্মকে জানা যায়। ইহাই বিষ্ণুর ব্যবহারিক উপাসনা।

ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিলে এবং শিক্ষা দিলে আত্মা বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। মনে ইহার বিরোধী কোন পক্ষপাতিত্বের সম্পূর্ণ অভাব থাকিলে তবেই ইহা সম্ভবপর হয়। সত্যানুসন্ধিৎসা, তত্ত্ববিদ্যার অধ্যয়ন, সত্যানুরাগ, ভ্রমের অভাব, সত্যের মূল্যবোধ, বাধা অতিক্রম, জ্ঞানে সন্তোষলাভ, সত্যের স্বয়ং-সম্পূর্ণতার উপলব্ধি, ব্যক্তিত্বের পরতন্ত্রতা-বোধ, জগতের মূল উপাদানগুলিতে সার স্থায়িত্বের অভাব-বোধ এবং ব্রহ্মোপলব্ধি বিষয়ে একান্ত অনুরাগ—এইগুলি ক্রমান্বয়ে এই পক্ষপাতিত্বের অভাবের প্রকাশ।

যাহার পূর্ব হইতেই কোন জ্ঞান নাই, তাহার সত্যের জ্ঞানের করণ সম্বন্ধে বৈধ সন্দেহ থাকিতে পারে। সন্দেহের অভাব থাকিলে পূর্বেই জ্ঞান আছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। যাহার মনে সত্যই সন্দেহ আছে, সে যে-জ্ঞান সর্বোচ্চ সত্যের সন্ধান দেয় তাহা লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। এই অনুসন্ধানই তত্ত্ববিদ্যা। যে তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন করে, তাহার পূর্বেকার সদ্‌গুণাবলী প্রকট হইয়া উঠে এবং এইগুলি আবার তত্ত্ববিদ্যালাভে সহায়তা করে।

সুতরাং মধবের মতে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সাধনা এবং ব্রহ্মবিদ্যাকে অপরিহার্য, প্রগাঢ় এবং ব্যাপক করিবার প্রক্রিয়া একই। ইহার ফলে বেদের এবং ইহার লক্ষ্য ব্রহ্মের অর্থ অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অধ্যাপনা দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায়। অধ্যাপনা দ্বারা বিষ্ণু তুষ্ট হন।

সমাজের উপর অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার প্রভাব আছে। কোন ব্যক্তিই যাহাতে তত্ত্ববিদ্যাহীন হইয়া না থাকিতে পারে এমনভাবে সমাজের পুনর্গঠন আবশ্যক, ইহাই মধবের মত। এই সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান ধারণাগুলি এইরূপ: উচ্চ জাতি বা বংশে জন্ম অপেক্ষা তিনি মনুষ্যের সদ্‌গুণকেই ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিক অনুকূল বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে শূদ্রেরাও ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার অধিকারী। এমন কি অন্ত্যজেরাও বিষ্ণুভক্ত হইতে পারে। বিষ্ণুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাই মানব-সমাজের সাধারণ লক্ষ্য।

রাষ্ট্রীয় সংহতি হইতেই সমাজের সৃষ্টি। মধবের মতে শাসনতন্ত্রের কর্তব্য হইতেছে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা, একমাত্র যাহাতেই ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন সম্ভবপর হইতে পারে। যে সকল ধারণা এই বিদ্যাশিক্ষার অনুকূল সেগুলিকে উৎসাহিত করা এবং যেগুলি প্রতিকূল সেগুলিকে নিরস্ত করা উচিত। সুতরাং রাষ্ট্র মূলতঃ জ্ঞানলাভের সহায়ক।

জ্ঞান প্রথমে পরোক্ষ থাকে। ব্যবহারের ফলে ইহা অনাবিল অর্থাৎ অ-পরোক্ষ হইয়া উঠে। ইহা হইলে মনুষ্য তাহার জ্ঞানের প্রগাঢ়তা অনুযায়ী ব্রহ্মজ্ঞানের

রসাস্বাদন করিয়া থাকে। ইহাই জীবন্মুক্তি। বিষ্ণুর প্রসাদেই আমরা বিষ্ণুকে লাভ করিয়া থাকি। ইহাই মুক্তি। ইহাতে বিষ্ণুর মাধুর্যের উপভোগ অর্থাৎ বিষ্ণুকে সর্বাপেক্ষা প্রিয়রূপে উপভোগ হয়।

উপসংহার

সুতরাং মধবের ব্রহ্ম-বিষয়ক দর্শনকে অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আকার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তিনি পরতন্ত্র বস্তু হইতে স্ব-তন্ত্র সৎকে পৃথক্ করিবার ফলে তাঁহার অদ্বৈতবাদ নির্দোষ। স্বতন্ত্র সৎকে কেবলমাত্র দর্শনের সাহায্যেই জানা যায়, তাঁহার এই মত তাঁহার অদ্বৈতবাদকে অন্যপ্রকার অদ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

প্রত্যেক বিষয়েই মধব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য আছে। যুক্তির তেজ, চিন্তার স্বচ্ছতা, সত্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তার ব্যাপকতা, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার—এইগুলি হইতেছে তাঁহার চিন্তার প্রধান গুণ।

যে জ্ঞান সাক্ষী দ্বারা উৎপন্ন তাহাই যে জীবাত্মার স্বরূপকে নির্দেশ করে এবং বেদ যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি এই দুইটি আবিষ্কার মনোবিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার প্রধান দান। ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া তিনি সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় সংহতির পুনর্গঠনের যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রতত্ত্বকে এক নূতন অর্থ দিয়াছে। স্বতন্ত্র (ব্রহ্ম) যে জগৎ ও জীবের স্রষ্টা ; মানুষ যখন সর্ব-কর্তা বিষ্ণুর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে, কেবল তখনই সে জগতের এবং নিজের উপকার করিতে পারে ; যে সকল গুণদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাকে অপরিহার্য বলিয়া বুঝা যায়, সেইগুলিই প্রকৃত নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক গুণ ; দার্শনিকের দৃষ্টিতে বেদ এবং ব্রহ্ম নিত্যই নবরূপ ধারণ করিতেছেন ; বিষ্ণুকে পরম প্রিয় জ্ঞানে তত্ত্ববিদের উপভোগ ইহাই মুক্তি—তাঁহার এই মতবাদ দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার যথার্থ মূল্যবান্ দান। ইহা উপলব্ধি করিলে বিশ্বদর্শনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত হয়।

গ্রন্থবিবরণী

মধব : অনুব্যাখ্যান
জয়তীর্থ : তত্ত্বপ্রকাশিকা
মধব : বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়
জয়তীর্থ : ন্যায়সুধা
মধব : ব্রহ্মসূত্রভাষ্য
ব্যাসরাজ : চন্দ্রিকা
রাঘবেন্দ্রতীর্থ : তত্ত্বমঞ্জরী
মধব : তন্ত্রসার
মধব : তত্ত্বসংখ্যান
মধব : তত্ত্ববিবেক
মধব : সদাচার স্মৃতি
মধব : মহাভারত তাৎপর্যনির্ণয়
মধব : ভাগবত তাৎপর্য
মধব : উপনিষদ্-ভাষ্য

বেদান্ত—বৈষ্ণব (ঈশ্বরবাদী) সম্প্রদায় সমূহ

ই। নিম্বার্ক (দ্বৈতাদ্বৈতবাদ)

১। উপক্রমণিকা

নিম্বার্ক তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। প্রচলিত মতানুসারে, তিনি রামানুজের পরে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতে বিদ্যমান ছিলেন।

অন্যান্য বৈষ্ণব বৈদান্তিকদের ন্যায়, নিম্বার্কও ত্রিতত্ত্ববাদী। তাঁহার মতে, এই তিনটি সমান ভাবে নিত্য ও সত্য তত্ত্ব হইল ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ। সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হইলেন ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই হইলেন কৃষ্ণ বা হরি। "ব্রহ্ম" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "বৃহত্ত্বশালী" (বৃহ্+মন্)। অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্ম যিনি বৃহত্তম; যাঁহার সমকক্ষ অথবা যাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর কেহই নাই, যিনি দেশকালাদিরূপ সীমাবিরহিত, অনাদি অনন্ত অসীম; যাঁহার স্বরূপ, গুণ ও শক্তি অনতিক্রমণীয় ও অতুলনীয় ("স্বাভাবিক-স্বরূপ-গুণ-শক্ত্যাদিভিঃ বৃহত্তমঃ")। ব্রহ্মই এই চিদচিদ্ বিশিষ্ট বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র মূল কারণ। সেইজন্য ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, ব্রহ্মেই তাহার স্থিতি, ব্রহ্মেই তাহার লয় হয়। একমাত্র ব্রহ্মই জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সাধারণতঃ, উপাদান ও নিমিত্ত কারণ পরস্পর ভিন্ন হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, মৃন্ময় ঘটের উপাদান কারণ মৃৎপিণ্ড এবং নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার এক নয়। কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মই একাধারে জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। মৃৎপিণ্ড যেমন মৃন্ময় ঘটে পরিণত হয়, তেমনই ব্রহ্মও জগতে পরিণত হইয়াছেন। সেজন্যই তিনি জগতের উপাদান কারণ। পুনরায়, কুম্ভকার যেমন স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিবলে মৃৎপিণ্ডকে মৃন্ময় ঘটে পরিণত করে, ব্রহ্মও সেইরূপ স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিবলে স্ব-সত্তাকে জগতে পরিণত করেন—সেজন্যই তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ। এইরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পরিণাম বিশেষ মাত্র, অন্য কিছু নয়। বস্তুতঃ, অন্যান্য বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণের ন্যায়, নিম্বার্কও পরিণামবাদী, অর্থাৎ তাঁহার মতে, কারণ যথার্থই কার্যে পরিণত হয়, কার্য সত্যই কারণের একটি বিশেষ রূপ বা অবস্থান্তর।

২। ব্রহ্ম

ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া তিনিই সমগ্র জগতে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত হইয়া আছেন। মৃন্ময় ঘটে যেমন মৃত্তিকা ব্যতীত আর অন্য কিছুই নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের কার্য বা পরিণাম জগতেও ব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য কিছুই নাই, সকলই ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মসত্তাময়। সেই জন্য আপাতদৃষ্টিতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিবিধ ও অসংখ্য জড় ও অজড় বস্তু (জীবাত্মা) সমূহ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহারা সকলেই ব্রহ্মের পরিণামস্বরূপে ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মসত্তাময়। সেই জন্যই উপনিষদ্‌ অতি সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।[১] প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জগদ্‌বহির্ভূত ও জগদতিরিক্ত হইয়াও জগল্লীন। সেজন্য কুম্ভকার যেমন ঘটের বহিঃস্থিত কারণ বা ঘটটিকে বাহির হইতে সৃষ্টি করেন, ব্রহ্ম জগতের সেইরূপ কারণ নহেন। উপরন্তু যদিও ব্রহ্ম জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন নন, যদিও ব্রহ্ম জগতের অপেক্ষা অনন্তগুণ বৃহত্তর ও উচ্চতর, যদিও ব্রহ্মের পূর্ণ বিকাশ একটি মাত্র ক্ষুদ্র জগতে সম্ভবপর নয়, তথাপি ব্রহ্ম জগতের অন্তরাত্মা ও অন্তর্যামীরূপে জগতেই ওতপ্রোতভাবে লীন হইয়া আছেন।

এই ব্রহ্মকারণবাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই হইতে পারে যে, ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন? পৃথিবীর প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রকে প্রারম্ভেই এই মূল সমস্যাটির সমাধান করিতে হয়। যাঁহারা বুদ্ধি-বৃত্তিসম্পন্ন ও স্বাধীন চিন্তাশীল তাঁহাদের প্রত্যেক স্বেচ্ছাকৃত কর্মের পশ্চাতেই একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশাতে ও লক্ষ্য লাভের প্রেরণাতেই সেই কার্যে রত হন। ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টিরূপ কর্মও এইরূপ একটি স্বেচ্ছা-কৃত কর্ম; ব্রহ্মও মহাজ্ঞানী, অশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বাধীন চিন্তাশীল; সেই জন্য তাঁহার কার্যাবলী উদ্দেশ্যহীন বা নিরর্থক হইতে পারে না। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হন? আমরা দোষত্রুটি পূর্ণ, অসম্পূর্ণ জীব; আমাদের অভাব ও প্রয়োজন অসংখ্য, কিন্তু শক্তি ও কৃতিত্ব অল্প। সেই জন্য আমাদের অভাব পূরণের জন্য, অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্য, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার জন্য, অপ্রাপ্ত বস্তু লাভের জন্যই আমরা সদাসর্বদা নানাবিধ কর্মে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু ব্রহ্ম আপ্তকাম—নিত্য পূর্ণ, নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ, নিত্য মুক্ত, নিত্য তৃপ্ত—কোন অসম্পূর্ণতা, অভাব, প্রয়োজন, অতৃপ্ত ইচ্ছা বা অপ্রাপ্ত বস্তু তাঁহার ক্ষেত্রে থাকিতেই পারে না। সেই জন্য যেহেতু তাঁহার অভাব বা প্রয়োজন বিন্দুমাত্রও নাই, সেই জন্য

জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি স্বয়ং কোনদিক হইতে লাভবান হন, কোনরূপ পূর্ণতা, গুণ, শক্তি বা আনন্দলাভ করেন—এই কথা কোনক্রমেই বলা চলে না। সুতরাং জগৎসৃষ্টিরূপ কার্যটি তাঁহার নিজের প্রয়োজন অনুসারে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য একেবারেই নয়। অপরপক্ষে, জগৎ সৃষ্টি যে জীবের মঙ্গলের জন্য এবং এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—সে কথাও কোনক্রমেই বলা যায় না। কারণ, সর্বসম্মতিক্রমে সংসার অশেষ দুঃখক্লেশ পূর্ণ এবং এই সংসার হইতে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভই মোক্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

এই প্রথম আপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি সমভাবে গুরুতর আপত্তিও উত্থাপিত হইতে পারে। সেইটি হইল এই: পরম করুণাময় ব্রহ্ম কেন স্বেচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবদের এই অসীম দুঃখপারাবারে নিমজ্জিত করিয়াছেন? যদি তিনি সংসারের দুঃখ-ক্লেশ দূর করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান নন; পুনরায় যদি তিনি সমর্থ হইয়াও তাহা দূর না করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই পরম করুণাময় নন। এতদ্‌ব্যতীত, ব্রহ্মসৃষ্ট এই জগতে অসংখ্য অবস্থা ও গুণবৈষম্য আছে। কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ মূর্খ ইত্যাদি। কেবল তাহাই নয়, উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ধার্মিকগণ দুঃখভোগী হন, অথচ অধার্মিক-গণ সুখ-সাফল্য লাভ করেন। সেই জন্য যদি ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নির্দয়, বৈষম্যদোষদুষ্ট এবং অন্যায়কারী বলিয়া মনে করিতে হয়।

দর্শনশাস্ত্রের এই মূলীভূত প্রথম সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য বৈদান্তিকগণের ন্যায় নিম্বার্কও ঈশ্বর-লীলাবাদের অবতারণা করিয়াছেন ("লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্")।[২] এই মতানুসারে, ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্যটি তাঁহার স্বকীয় কোন অভাব পূরণের জন্য অথবা প্রয়োজনের অনুরোধে নয়—ইহা কেবলমাত্র তাঁহার লীলা বা ক্রীড়া। কোন সম্রাট যখন নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুকে রত হন, তখন সেই সকল ক্রীড়া বা কার্য তাঁহার কোন অভাব দূর করে না। উপরন্তু নৃপতি রূপে কোন অভাব তাঁহার নাই বলিয়া এবং তাঁহার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই তিনি নিশ্চিন্তে ক্রীড়া ও উৎসবাদিতে রত হইতে পারেন। একই ভাবে ব্রহ্ম কোন অভাব পূরণ বা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন না। উপরন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য তৃপ্ত ও আপ্তকাম বলিয়াই তিনি তাঁহার নিত্য পূর্ণ ও নিত্য উদ্বেলিত আনন্দ হইতে এই জগৎ সৃষ্টি রূপ ক্রীড়ায় লিপ্ত হন। সেই জন্যই উপনিষদ বলিয়াছেন যে, আনন্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি, আনন্দেই তাহার স্থিতি, আনন্দেই তাহার লয়।[৩]

এই লীলাবাদ সত্যই সৃষ্টির উদ্দেশ্য অভিনবভাবে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে পরমেশ্বরের সম্বন্ধে দুইটি প্রধান মতবাদ আছে : স্থিতিবাদ ও গতিবাদ। প্রথমটি অনুসারে, ঈশ্বর এক নিত্য ও পূর্ণ সত্তা (Being) এবং নিত্য অপরিবর্তনীয় ও নিত্য স্থিতিমান্ (Static)। দ্বিতীয়টি অনুসারে, ঈশ্বর বা পরমসত্তা নিত্যপূর্ণ নিত্য অপরিবর্তনীয় ও নিত্য স্থিতিশীল নন ; উপরন্তু পরিবর্তনীয়, গতিশীল ও পরিণামশীল ঘটনশীলতাই তাঁহার স্বরূপ। এইরূপে নিজেকে অবিচ্ছিন্নভাবে জগতে পরিণত বা প্রকাশ করা পরমসত্তার স্বরূপ বা স্বভাব। সেইজন্য অনাদিকাল হইতেই ঈশ্বর ও জগৎ পরস্পর মুখাপেক্ষী। জগতে পরিণত না হইলে পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্বই বৃথা ও অসম্ভব হইবে। কারণ, তাহা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করারই সমতুল্য হইবে। সুতরাং ঘটনশীলতাই পরমসত্তার স্বরূপ। "ঘটনশীলতার" সংজ্ঞা ও অর্থ কি ? ইহার প্রকৃত অর্থ হইল এই যে, পরমেশ্বর অপরিবর্তনীয় সৎও নন, শূন্যগর্ভ অসৎও নন ; কিন্তু সৎ ও অসতের সমন্বয়স্বরূপ, অর্থাৎ ঘটনশীল। বস্তুতঃ, এই ঘটনশীলতায় সত্তা ও অসত্তার আপাতদৃষ্ট পরস্পরবিরোধের অবসান ও সমন্বয় সাধিত হয়, যেহেতু ঘটনশীল বস্তু কেবল সৎও নয়, কেবল অসৎও নয়, কিন্তু উভয়ের সমাহার। যথা, বীজ ঘটনশীল, অর্থাৎ বীজ কেবল বর্তমান বীজই নয় ; কেবল বীজরূপে স্থিতিতে তাহার সমাপ্তি নয় ; কিন্তু তাহার স্বভাব বা স্বরূপের মধ্যেই এইরূপ একটি অদম্য শক্তি বা গতি নিহিত হইয়া আছে যে, তাহার বলে সে অমোঘ ও অবশ্যম্ভাবীরূপেই ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরে পরিণত হয়। ঐরূপে, বর্তমানে সেই বীজটি বীজরূপে সৎ, কিন্তু অঙ্কুররূপে অসৎ হইলেও, বীজ কেবল বীজই নয়, তাহা নিশ্চয়ই অচিরে অঙ্কুরেও পরিণত হইবে। সেইজন্য, বীজ কেবল বর্তমান বীজ নয়, ভবিষ্যৎ অঙ্কুরও ; কেবল সৎ নয়, অসৎও। সুতরাং, বর্তমানের শেষ বর্তমানেই না হইয়া তাহার ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই ঘটনশীলতার মূল কথা। সেইজন্যই ঘটনশীলতা বর্তমান সত্তা এবং অবশ্যম্ভাবী অসত্তার এক অখণ্ড সমাহার। একইভাবে পরমসত্তাও নিত্য ঘটনশীল, নিত্য গতিমান্, নিত্য পরিণামী। সূক্ষ্ম পরমাত্মা স্বভাববশেই স্থূল-জগতে ক্রমান্বয়ে পরিণত অভিব্যক্ত ও প্রপঞ্চিত হইতেছেন। এইরূপ পরিণাম বা অভিব্যক্তিই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া ইহার পশ্চাতে তাঁহার কোনরূপ উদ্দেশ্য বা লাভেচ্ছা নাই এবং ইহা তাঁহার অসম্পূর্ণতাও প্রমাণিত করে না। সেইজন্য, জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যারূপে স্থিতিবাদ অপেক্ষা গতিবাদই শ্রেয়ঃ। পাশ্চাত্য-দর্শনে হেগেল এই গতিবাদ প্রচার করিয়া বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছেন।

অপরপক্ষে, স্থিতিবাদ অনুসারে জগৎসৃষ্টি কার্যটি ব্যাখ্যা করা কঠিন এবং এই

কথাই পূর্বের আপত্তিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু বৈদান্তিকগণ স্থিতিবাদী হইয়াও তাঁহাদের অপূর্ব লীলাবাদের সাহায্যে এই দুরূহ সমস্যারও যুক্তিসঙ্গত সমাধানে সমর্থ হইয়াছেন। এই স্থলে প্রশ্ন এই যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন কি উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য? তিনি যদি শাশ্বতকাল নির্বিকার, নিরঞ্জন, স্বয়ংসিদ্ধ, পরিপূর্ণতম সত্তাই হন, তাহা হইলে তিনি পুনরায় জগৎ সৃষ্টিই বা করিবেন কেন? এই নিগূঢ় প্রশ্নের উত্তরস্বরূপেই বেদান্তের লীলাবাদের অবতারণা। এই মতানুসারে, প্রত্যেকটি কর্মই যে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, অভাব পূরণের জন্য, অথবা দোষ-ত্রুটী, অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্যই করা হয়—তাহা বলা যায় না। কারণ, কোন কোন কর্ম, যথা ক্রীড়া প্রভৃতি, এইরূপ সাধারণ অভাবজনিত কর্ম নয়। ক্রীড়ার পশ্চাতে কোনরূপ লাভের আশা থাকে না—এমন কি সুখলাভের জন্যও আমরা ক্রীড়ায় রত হই না। কারণ, সুখ বা স্ফূর্তির কোনরূপ অভাব থাকিলে আমরা ক্রীড়ায় লিপ্ত হই না; যখন আমাদের হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল এবং সেই হর্ষ অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হইতে চাহে, তখনই কেবল আমরা ক্রীড়ায় লিপ্ত হই। এইরূপ বাহ্যিক প্রকাশই হইল হর্ষের বিশেষ স্বভাব, কারণ, সুখদুঃখপ্রমুখ গভীর মানসিক ভাবসমূহকে আমরা অন্তরের অন্তঃস্তলে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারি না, বাহিরের আচার-ব্যবহারে তাহারা স্বতঃই স্ফুরিত হইয়া উঠে। সেইজন্য আমরা যখন পুলকোদ্বেলিত হৃদয়ে, পরম নিশ্চিন্তে নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত হই, তখন সেই সকল কার্যাদি, আচরণ ও ব্যবহারাদি অভাবজনিত নয়, অপূর্ণতাদ্যোতকও নয়, কিন্তু প্রাচুর্য ও পূর্ণতারই স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত প্রকাশ মাত্র। একইভাবে জগৎ সৃষ্টিও অপূর্ব লীলাময়ের শুধু লীলা মাত্রই। সেইজন্য তাঁহার এই লীলা বা ক্রীড়া তাঁহার শাশ্বত, অনন্ত, অসীম অপরিমেয় আনন্দের সামান্যতম বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র—তাঁহার কোনরূপ অভাব ও অপূর্ণতার সূচক নয়। এইরূপে, স্থিতিবাদ অনুসারে, ব্রহ্মকে নিত্যপূর্ণ ও নিত্য অপরিবর্তনীয় রূপে গ্রহণ করিলে, হয় শংকরের বিবর্তবাদ, নয় লীলাবাদ স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

কিন্তু, আর একটি সমস্যার সমাধান এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন। আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরের দিক হইতে জগৎ সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ বা ক্রীড়ামাত্র, অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু নয়; কিন্তু দীনহীন ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসারী জীবগণের দিক হইতে তাহা এইরূপ নয়। সেইজন্য, এমন কি, স্ব-প্রয়োজনানুরোধেও নয়, কেবলমাত্র সামান্য আনন্দের জন্যই যদি ঈশ্বর অসংখ্য জীবকে এইভাবে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরম করুণাময় বলা যায় কিরূপে? এই আপত্তির উত্তরে বেদান্ত বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি ঈশ্বরের দিক হইতে সেইরূপ প্রয়োজনশূন্য হইলেও,

জীবের দিক হইতে সেইরূপ নয়, কারণ সৃষ্টি জীবের কর্মানুসারী। ভারতীয় দর্শনের প্রাণস্বরূপ কর্মবাদানুসারে, প্রত্যেক সকাম বা ভোগেচ্ছামূলক কর্মেরই একটি বিশেষ ফল থাকে এবং কর্মকর্তা যদি স্বেচ্ছায় ও বুদ্ধি বিচারপূর্বক সেই কর্মে রত হন, তাহা হইলে তাহার ফল তাঁহাকে ভোগ করিতেই হইবে—ইহাই ন্যায়ের অমোঘ বিধান কিন্তু এক জন্মের অসংখ্য কর্মের ফল সেই জন্মেই ভোগ করা সম্ভব নয় বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। সেই নূতন জন্মে তিনি পুনরায় নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং এই কর্মের জন্য তাঁহাকে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, এইভাবে জন্ম ও কর্মের আবর্তে জীব বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। জন্ম ও কর্মের এই চক্রের নাম "সংসার-চক্র"। নিষ্কাম কর্মসাধন এই সংসারচক্র হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। এইরূপ নিষ্কাম বা ভোগেচ্ছাশূন্য কর্মের কোন ফল ভোগ কর্মকর্তাকে করিতে হয় না। সেইজন্য এক নূতন জন্মে, প্রাক্তন সকাম কর্মের ফলভোগ করিবার সময়ে, নূতন কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে করিলে, সেই সকল নূতন কর্মের ফলস্বরূপ, কর্মকর্তাকে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। এইরূপে পরিশেষে দুঃখশোকপূর্ণ সংসার হইতে মুক্তি-লাভই চরম লক্ষ্য হইলেও, প্রারম্ভে সংসারের বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, এই সংসারক্ষেত্রেই বদ্ধজীব পূর্বসঞ্চিত সকামকর্মের ফলভোগ সমাপ্ত করিয়া নিষ্কাম কর্ম ও সাধনমার্গের মাধ্যমে পরিশেষে মুক্তির অধিকারী হয়। সুতরাং, জীবের দিক হইতে সংসার অত্যাবশ্যক। অতএব ঈশ্বর জীবের পূর্ব-কর্মানুসারেই সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুরতা বা বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্ব দোষে অভিযুক্ত করা যায় না। প্রত্যেকের সুখ-দুঃখ, অবস্থা প্রভৃতির জন্য প্রত্যেকে নিজেই দায়ী, ঈশ্বর নন। কারণ, এইগুলি প্রত্যেকের স্বকৃত কর্মেরই অমোঘ ফল।

অদ্বৈত বেদান্তমতে ব্রহ্ম নির্গুণ, কিন্তু নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম সগুণ, অথবা অনন্ত কল্যাণগুণবিমণ্ডিত এবং সকল হেয় গুণ বিবর্জিত। ঈশ্বরের গুণাবলী দুই শ্রেণীর: ভীষণ ও মধুর। প্রথম দিক হইতে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী প্রভৃতি; দ্বিতীয় দিক হহতে তিনি অশেষ সৌন্দর্যশালী, অনন্তানন্দরসঘন, পরমকরুণাময় প্রভৃতি। এইরূপে, ব্রহ্ম জগদতিরিক্ত হইয়াও জগতে অনস্যূত, সর্বশক্তিমান হইয়াও পরমকরুণাময়, সর্বব্যাপী হইয়াও অন্তর্যামী, শাসক হইয়াও সখা। সেইজন্য, তাঁহার নিরতিশয় মহত্ত্ব, ঐশ্বর্য ও শক্তির অপেক্ষা তাঁহার তুল্যভাবে অপরিমেয় করুণা, সৌন্দর্য ও মাধুর্য কোন অংশেই বিন্দুমাত্রও ন্যূন নয়।

ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ সম্বন্ধে আলোচনার পরে, স্বভাবতঃই প্রশ্ন হইতে পারে যে, এইরূপ বৃহত্তম, প্রকৃষ্টতম, পরিপূর্ণতম পরমসত্তাকে জানিবার উপায় কি? উপায়

একমাত্র শাস্ত্র। সেই জন্যই বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে "শাস্ত্রযোনি"[৫]। আপাতদৃষ্টিতে শাস্ত্র বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিলেও, প্রকৃতকল্পে সমগ্র শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু হইলেন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সাধারণ প্রত্যক্ষগম্য নন, অনুমান গম্যও নন। আমাদের কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই আমরা ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। সেইজন্য ব্রহ্ম প্রত্যক্ষযোগ্য নন। একই ভাবে, তাঁহার ক্ষেত্রে অনুমানও অসম্ভব। কারণ, অনুমানের ভিত্তি সাদৃশ্য। আমরা নিম্নলিখিত প্রণালীতে অনুমান করি :—

সকল মানবই মরণধর্মী।
রাম একজন মানব
সুতরাং, রামও মরণধর্মী।

এইক্ষেত্রে রাম অন্যান্য মানবগণের সমধর্মী, এবং সেইজন্যই সে অন্যান্য মানবগণের ন্যায় নিশ্চয়ই মরণধর্মী। অর্থাৎ রাম ও অন্যান্য মানবগণের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, রামও তাহাদের ন্যায় মরণশীল। কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে জাগতিক কোন বস্তুরই সাদৃশ্য নাই—তিনি অসাধারণ ও অতুলনীয়। সেইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার অনুমান সম্ভব নয়।

অতএব বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষগম্যও নন, অনুমানগম্যও নন, শাস্ত্রগম্য।

কিন্তু, শাস্ত্র বা শ্রুতির প্রকৃত অর্থ কি? শাস্ত্র সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের অবিরত চিন্তা ও পরিপক্ব প্রজ্ঞা, মহতী প্রেরণা ও প্রগাঢ় উপলব্ধির মূর্ত ফল ও প্রকাশ মাত্র। এই সকল পরমজ্ঞানী সুধীবৃন্দ সর্বদিক্ হইতেই সাধারণজনের অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, উচ্চতর, বিজ্ঞতর ও পবিত্রতর বলিয়া যে সকল তত্ত্ব সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য, সেই সকল নিগূঢ় তত্ত্বও তাঁহাদের নিকট সুবোধ্য এবং কোন তত্ত্বই তাঁহাদের নিকট অবোধ্য নয়। সেইজন্য জগতের ললামভূত এই সকল ঋষি অলৌকিক, নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ নিজেদের উপলব্ধি-শক্তি বা পূর্ণ-বিকশিত, উচ্চতম বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে দর্শন বা সাক্ষাৎকার করিয়া জগতের হিতার্থে শ্রুতিরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, নিম্বার্কের মত এই নয় যে, ব্রহ্মকে কোন প্রকারেই সাক্ষাৎ ভাবে জানা যায় না। এইক্ষেত্রে তিনি কেবল সাধারণ ও অসাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে ভেদের কথাই বলিয়াছেন। সাধারণ জনের ক্ষেত্রে, স্বভাবতঃই, বিচারশক্তির পূর্ণতা ও পরিপক্বতার অভাব থাকে। এইরূপ, সাধারণ বিচারশক্তিকেই বলা হয় "বুদ্ধি"। এই অপূর্ণ ও অপরিপক্ব বুদ্ধির সাহায্যে ব্রহ্মকে জানা যায় না বলিয়া, এই সকল সাধারণ জনের পক্ষে অসাধারণ ব্যক্তিদের বিরাট্ প্রতিভা ও প্রত্যক্ষলব্ধ উপলব্ধির ফলস্বরূপ শাস্ত্রকেই

আশ্রয় করা প্রয়োজন। কিন্তু এই শেষোক্ত অসাধারণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিচারশক্তির পূর্ণতম বিকাশ সাধন হয়। এইরূপ অসাধারণ বিচারশক্তিকেই বলা হয় "প্রজ্ঞা"। "প্রজ্ঞা" বুদ্ধির চরমোৎকর্ষ, পূর্ণতম বিকাশ, প্রকৃষ্ট রূপ, উচ্চতম অবস্থা ও শ্রেষ্ঠ ফল। সেইজন্য এইরূপ প্রজ্ঞার সাহায্যে সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মকে জানা যায়; অর্থাৎ, ব্রহ্ম অপরিণত ও অপূর্ণ বুদ্ধিগম্য না হইলেও, পরিণত ও পূর্ণবুদ্ধি গম্য। সুতরাং নিম্বার্ক ও অন্যান্য বৈদান্তিকেরা যে শাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাসের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন—এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপেই ভিত্তিহীন। প্রথমতঃ, ভারতীয় দার্শনিকগণ মানববুদ্ধির অবস্থাভেদ—অপূর্ণ ও পরিপূর্ণ অবস্থার ভেদ সহজভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ সাধারণ জীবনেও এইরূপ অবস্থাভেদ স্বীকার না করিয়া আমাদের উপায় নাই। কারণ, পিতার নিকট যাহা সুবোধ্য পুত্রের নিকট তাহা দুর্বোধ হইতে পারে এবং সেইজন্য পুত্রকে পিতার নিকট হইতেই সেই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। বৈজ্ঞানিকের নিকট যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সহজ ও সরল, সাধারণ জনের নিকট তাহা অতি কঠিন, এবং সেইজন্য বৈজ্ঞানিকের সাহায্যেই সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। একই ভাবে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের সহায়তা ব্যতীত অজ্ঞ ও অল্পশক্তিবিশিষ্ট সাধারণ মানুষেরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মানবদের ক্ষেত্রেও, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য, ভারতীয় দার্শনিকগণ বিচারবুদ্ধির অবশ্য প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্র প্রপঞ্চিত তত্ত্বের নির্বিচার, প্রারম্ভিক গ্রহণের নাম "শ্রবণ"। কিন্তু "শ্রবণ" ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম সোপান বা অবস্থাই মাত্র। দ্বিতীয় সোপান "মনন", অথবা গৃহীত তত্ত্বের বুদ্ধিদ্বারা বিচার ও অনুমোদন। তৃতীয় ও চরম সোপান "নিদিধ্যাসন" অথবা বুদ্ধি, অনুমোদিত তত্ত্বের ধ্যানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ, দর্শন ও সাক্ষাৎ উপলব্ধি। ইহার অন্য নাম "প্রজ্ঞা"। এইরূপে, সাধারণ মানব, প্রথমে শাস্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া পরে স্বীয় বুদ্ধির উৎকর্ষ দ্বারা তাহার মর্মার্থ গ্রহণ করিয়া অবশেষে ধ্যানের মাধ্যমে তাহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে পরিণত করিতে পারে। ইহাই ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রণালী।

৩। জীব ও জগৎ

নিম্বার্কের মতে, দ্বিতীয় তত্ত্ব চিৎ বা জীবাত্মা, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। অদ্বৈতবেদান্তমতে, আত্মা এক ও বিভু; কিন্তু নিম্বার্কের মতে, আত্মা বহু

ও অণু। তাঁহার মতানুসারে, জীব পরিমাণে অণু বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, এবং সংখ্যায় বহু বা অসংখ্য। এই সকল জীব পরস্পরভিন্ন ও ব্রহ্মভিন্ন। মুক্ত জীবও ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মেই নিঃশেষে বিলীন হইয়া যান না, উপরন্তু স্বীয় পূর্ণ-বিকশিত, প্রকৃত স্বরূপ বিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপেই বিরাজ করেন। সেইজন্য, নিম্বার্কের মতে, মুক্তি জীবের জীবত্বের বিনাশ নয়, পরিপূর্ণ বিকাশ; তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ও গুণাবলীর নির্বাধ অভিব্যক্তি।

মোক্ষকালে মুক্ত জীব যখন এই ভাবে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখন তিনি একই সঙ্গে ব্রহ্মস্বরূপও উপলব্ধি করেন, অর্থাৎ, ব্রহ্মের স্বরূপ এবং দুইটি গুণ ব্যতীত (জগৎকর্তৃত্ব ও বিভুত্ব) ব্রহ্মের অন্যান্য সকল গুণবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-সদৃশ হন। নিম্বার্কের মতে, এই মুক্তি দেহপাতের পরেই সম্ভবপর, পূর্বে নয়। এইরূপে নিম্বার্ক বিদেহ-মুক্তিবাদী, অদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় জীবন্মুক্তিবাদী নন।

নিম্বার্কের মতে, ধর্মের পথ, নীতির পথ; ন্যায়ের পথই মোক্ষের পথ। নিম্বার্ক এই প্রসঙ্গে পঞ্চসাধনের উল্লেখ করিয়াছেন: কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও উপাসনা, প্রপত্তি বা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও গুরূপসত্তি—গুরুতে আত্মসমর্পণ। অবশ্য, কর্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন নয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও, নিষ্কাম কর্মের যথাযথ সাধনদ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় অসম্ভব, এবং সেই দিক হইতে নিষ্কাম-কর্মসাধন সাধন-মার্গের অত্যাবশ্যক প্রথম সোপান।

এই পঞ্চসাধনের মধ্যে প্রথম তিনটি (কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ) বিশেষভাবে যাঁহারা স্বপ্রচেষ্টা দ্বারা,—নিরন্তর কর্ম-সম্পাদন, কঠোর জ্ঞানানুশীলন ও নিগূঢ় ধ্যানাভ্যাস দ্বারা, মুক্তিলাভে সাহস করিয়া অগ্রণী হইয়াছেন তাঁহাদেরই উপযোগী। কিন্তু শেষের দুইটি: প্রপত্তি ও গুরূপসত্তি, বিশেষভাবে তাঁহাদের জন্যই প্রপঞ্চিত হইয়াছে, যাঁহারা স্বচেষ্টায় বিশ্বাসী নন; সেইজন্য তাঁহারা ঈশ্বরের পাদপদ্মে এবং তাহা সম্ভব না হইলে, ঈশ্বরের মূর্ত প্রতিচ্ছবি গুরুর শ্রীপাদপদ্মেই নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারাই স্বয়ং মুমুক্ষুদের মোক্ষে উপনীত করিতে পারেন।

তৃতীয় তত্ত্ব অচিৎ। নিম্বার্কের মতে, অচিৎ তিনশ্রেণীর: (১) প্রাকৃত অথবা জড়—সত্ত্বরজস্তমোরূপ জগতের আদি ও মূল কারণ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সমস্ত পার্থিব জড়বস্তু; (২) অপ্রাকৃত,—অথবা সত্ত্বরূপা একগুণাত্মিকা অপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মলোক প্রমুখ অপার্থিব জড়বস্তু; (৩) কাল।

৪। নিম্বার্ক-বেদান্তের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ

উপরে নিম্বার্ক-বেদান্তের মূল তত্ত্ব সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল। বেদান্তের পাঁচটি প্রধান সম্প্রদায়। ইহারা "পঞ্চ-বেদান্ত-সম্প্রদায়" নামে খ্যাত। যথা, শংকরের "কেবলাদ্বৈতবাদ," রামানুজের "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ," নিম্বার্কের "স্বাভাবিক-দ্বৈতাদ্বৈতবাদ," মধ্বের "দ্বৈতবাদ" এবং বল্লভের "শুদ্ধাদ্বৈতবাদ"। এইস্থলে প্রধান প্রশ্ন হইল এই যে, ব্রহ্ম এবং জীবজগৎ, এক ও বহুর মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি? ব্রহ্ম ও জীবজগৎ কি সম্পূর্ণ অভিন্ন, অথবা সম্পূর্ণ ভিন্ন, অথবা ভিন্নাভিন্ন? অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে, শংকরের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জীবজগৎ মিথ্যা মায়া মাত্র, সেইজন্য জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। রামানুজের মতে, জীবজগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য, এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ও ভিন্ন উভয়ই, এতৎসত্ত্বেও রামানুজের মতে ব্রহ্ম ও জীবজগতের অভেদের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। নিম্বার্কের মতেও, জীবজগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য, এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই; কিন্তু এইস্থলে ব্রহ্ম ও জীবজগতের অভেদ ও ভেদ উভয়ের উপরই সমান গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মধ্বের মতে, জীবজগৎ ব্রহ্মের ন্যায় সত্য হইলেও, ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বল্লভের মতে, জীবজগৎ ব্রহ্মের ন্যায়ই সত্য, এবং ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

নিম্বার্কের মতবাদ বহুলাংশে রামানুজের মতবাদের তুল্য। তৎসত্ত্বেও, নিম্বার্ক-বেদান্তকে যে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পঞ্চবেদান্ত-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, এই মতবাদে ব্রহ্ম ও জীবজগৎ, এক ও বহুর মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস পাওয়া যায়। নিম্বার্ক বারংবার, আদ্যোপান্ত বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে অভেদ ও ভেদ উভয়ই সমকালে, সমভাবে সত্য। এই মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ-দোষদুষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে, নিম্বার্ক যে সংক্ষিপ্ত অথচ ন্যায়ানুগত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার মতবাদ স্ববিরোধদোষদুষ্ট নয়। তিনি কারণ ও কার্য, অংশী ও অংশের সম্বন্ধ অনুসারেই ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধকে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ ও কার্য সম্পূর্ণ অভিন্নও নয়, সম্পূর্ণ ভিন্নও নয়, কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। কার্যের দিক হইতে প্রথমতঃ কার্য কারণ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্নাভিন্ন। কার্য কারণ হইতে উৎপন্ন, কারণেরই পরিণাম বা অবস্থান্তর মাত্র বলিয়া কার্য কারণাত্মক, কারণস্বরূপ; এবং সেইজন্য কার্য কারণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন। কিন্তু কার্য কার্যই, কারণ নয়। এতৎসত্ত্বেও

কার্যের নিজস্ব, স্বতন্ত্র ও বিশেষ একটি ব্যক্তিসত্তাও আছে ; এবং সেইজন্য কার্য কারণ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, কার্য মৃন্ময় ঘট এবং কারণ মৃৎপিণ্ড উভয়েই মৃত্তিকাস্বরূপ বলিয়া অভিন্ন ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঘট এবং পিণ্ডরূপে ঘটস্বরূপ ও পিণ্ডস্বরূপ নিশ্চয়ই ভিন্নও বটে।

দ্বিতীয়তঃ, কার্য কারণ হইতে ধর্মতঃও ভিন্নাভিন্ন। মৃন্ময় ঘটের ধর্ম (ডিম্বাকৃতি কাঠিন্য প্রভৃতি) এবং কার্য (জলাহরণাদি) মৃৎপিণ্ডের ধর্ম (গোলাকৃতি, কোমলতা প্রভৃতি) ও কার্য (গৃহলেপনাদি) হইতে ভিন্ন। তৎসত্ত্বেও, ঘট ও পিণ্ড ধর্মতঃ অভিন্ন, যেহেতু মৃত্তিকার সাধারণ ধর্ম (যে সকল ধর্ম লৌহ-স্বর্ণাদি অন্যান্য দ্রব্যে থাকে না) উভয়েই বর্তমান। অতএব কার্যের দিক্ হইতে কার্য ও কারণ স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ, উভয়তঃই ভিন্নাভিন্ন।

একই ভাবে, কারণের দিক হইতেও প্রথমতঃ, কারণ কার্য হইতে স্বরূপতঃ ভিন্নাভিন্ন। কারণ কার্যে লীন হইয়া আছে বলিয়া কার্য হইতে অভিন্ন, কিন্তু কার্যাতিরিক্ত বলিয়া কার্য হইতে ভিন্ন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, মৃৎপিণ্ড মৃন্ময় ঘটে নিহিত হইয়া আছে বলিয়া মৃন্ময় ঘট হইতে অভিন্ন। কিন্তু একটি মাত্র ঘটেই তো পিণ্ডের শেষ নয়—পিণ্ড পাত্র প্রমুখ অন্যান্য বস্তুতেও পরিণত হয়, এবং সেইদিক হইতে তাহা ঘটাতিরিক্ত ও ঘট হইতে ভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, কারণ কার্য হইতে ধর্মতঃও ভিন্নাভিন্ন, সেইকথা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে, কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ, উভয়তঃই ভিন্নাভিন্ন। অংশী ও অংশের সম্বন্ধও এই একই সম্বন্ধ।

একই ভাবে, ব্রহ্ম এবং জীবজগৎ ও স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ ভিন্নাভিন্ন। জীবজগৎ ব্রহ্মের কার্য ও পরিণামরূপে ব্রহ্মাত্মক ও ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, জীবের জীবত্ব, জগতের জগত্ব পরস্পর ভিন্ন। ব্রহ্ম ব্রহ্মই, জীব জীবই, জগৎ জগৎই—অন্য কিছু নয়। এরূপে ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন বা ভিন্নাভিন্ন।

পুনরায়, জীবজগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় নিত্য ও সত্য ; জীব ব্রহ্মেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দময় সক্রিয় প্রভৃতি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, ব্রহ্ম জীবজগদতিরিক্ত ; ব্রহ্মের সকল গুণ ও কার্য জীবজগতে নাই, জীবজগতের সকল গুণ ও কার্যও ব্রহ্মে নাই। ব্রহ্ম বিভু, জীব অণু ; ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, জীব তাহা নয় ; ব্রহ্ম অজড়, জগৎ জড়, ইত্যাদি। অতএব, ধর্মতঃও, ব্রহ্ম এবং জীবজগৎ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন।

সেইজন্য, নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে অভেদ ও ভেদ উভয়ই সমভাবে সত্য, নিত্য, স্বাভাবিক ও অবিরুদ্ধ।

এইরূপে, নিম্বার্কের মতে, "অভেদের" অর্থ : (১) কার্যের দিক হইতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অভেদ, কারণাত্মকতা ও কারণাশ্রয়িত্ব ; (২) কারণের দিক্ হইতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অভেদ ও কার্যে বিদ্যমানতা (immanence)। "ভেদের" অর্থ : (১) কার্যের দিক হইতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ ভেদ ; কারণের দিক্ হইতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ ভেদ ও কার্যাতিরিক্ততা (transcendence)।

যদি "অভেদ" ও "ভেদের" উপর্যুক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ "অভেদকে" অন্তর্বিদ্যমানতা (immanence) এবং "ভেদকে" বহির্ভূতত্ব (transcendence) অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের সহাবস্থিতি কোন দিক্ দিয়াই অসমঞ্জস হয় না। এইক্ষেত্রে, "অভেদের" অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্ব স্ব স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দিয়া, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে নিঃশেষে বিলীন হইয়া, সম্পূর্ণরূপে একীভূত হন,—যেমন সমুদ্রে পতিত জলবিন্দু স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তা পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রেই নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়। ইহার অর্থ কেবল এই যে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অভিন্নস্বরূপ ও ব্রহ্ম জীবজগতে অন্তর্লীন। "ভেদের" অর্থও এই নয় যে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ ঘটপটের ন্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। ইহার অর্থ কেবল এই যে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ একই সঙ্গে গুণ, শক্তি ও কার্যের দিক হইতে ভিন্ন, এবং ব্রহ্ম জীব ও জগতের বহির্ভূত।

সেইজন্য নিম্বার্কের মতবাদের নাম "স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ"। এইরূপে ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধরূপ দুরূহতম সমস্যার একটি নূতন সমাধান করিয়া নিম্বার্ক দর্শনের দিক হইতে নিঃসন্দেহে এক নূতন অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও নিম্বার্কের দার্শনিক দান অল্প নয়। তাঁহার অতুলনীয় "শক্তিবাদের" সাহায্যে তিনি বহু কঠিন দার্শনিক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করিয়া জগতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন।

ধর্মের দিক হইতেও নিম্বার্কের দান সামান্য নয়। ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে নিকটতম, নিবিড়তম, মধুরতম, ব্যক্তিগত প্রাণের সম্পর্কের উপরই তিনি বারংবার বিশেষ জোর দিয়াছেন। পরব্রহ্মের নিরতিশয় বৃহত্ব, ঐশ্বর্য, শক্তি, তেজ প্রভৃতির জন্য স্বভাবতঃই সাধকের মনে যে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদয় হয়, তাহা তো কেবল ধর্মের প্রথম সোপান মাত্র। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম ভয় হইতে আনন্দে, শ্রদ্ধা হইতে প্রেমে, সম্ভ্রম হইতে সৌন্দর্যে উন্নীত হইয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এই ক্ষেত্রে সাধকের পক্ষে বাহিরের বাধ্যতামূলক শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন বা অনুশাসন

নিষ্প্রয়োজন, অন্তরের উদ্বেলিত মিলন-কামনাতেই তিনি সেই পরম প্রেমময়ের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেন এবং তখন ভীতিমূলক, অন্ধ অনুসরণের স্থলে প্রীতি-মূলক বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার উদয় হয়। এইরূপে যদিও সাধনমার্গের প্রারম্ভে মুমুক্ষু সাধক পরমেশ্বরের অনন্ত, অচিন্ত্য শক্তি অপার মহিমা নিঃসীম, ধারণাতীত বিরাটত্ব ও গভীরত্বে অভিভূত হইয়া যান, তথাপি, তিনি দীর্ঘদিন সেই পরম-প্রেমের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারেন না; তাঁহার তুল্যভাবে অপরিসীম সৌন্দর্য, মাধুর্য, প্রেম ও সখ্যের দুর্লঙ্ঘ্য আকর্ষণে সেই পরমসুন্দর, পরমসখার ঘনিষ্ঠতম এবং মধুরতম সন্নিধিতে আসিয়া উপনীত হন। এইরূপে রামানুজ ও মধ্বের "ঐশ্বর্য-প্রধানা ভক্তি" বা ভয় ও সম্ভ্রমমিশ্রিত ভক্তির স্থলে, নিম্বার্কই প্রথম "মাধুর্যপ্রধানা ভক্তি" বা প্রীতি ও সখ্যজনিত ভক্তির উপরে জোর দিয়াছেন। নীতি বা সাধনাবলীর দিক হইতেও নিম্বার্কের দান অপরিসীম। অন্তঃসারশূন্য, বাহ্যিক আচারানুষ্ঠানের স্থলে তিনি চিত্তশুদ্ধি, আত্মসংযম, সরলতা, পবিত্রতা, দান, বৈরাগ্য প্রমুখ আন্তর-সাধন ও গুণের অনুশীলনের বিধান দিয়াছেন। তাঁহার মতে, অন্তরের আকুতিই মূল কথা; কর্মের যে মূল প্রবৃত্তি, তাহার বিশুদ্ধতাই মুখ্য বস্তু। সেইজন্য যিনি মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে স্বীয় কর্তব্যপালন করেন, তিনি সন্ন্যাসীই হউন বা গৃহীই হউন মুক্তিলাভে পূর্ণ অধিকারী। এইরূপে, নিম্বার্কের মতে, মোক্ষের জন্য গৃহত্যাগ অত্যাবশ্যক নয়।

বস্তুতঃ, দর্শন, ধর্ম ও নীতি—সকল দিক হইতেই নিম্বার্ক বেদান্তের দান জগতের ইতিহাসে অমূল্য। নিম্বার্ক-বেদান্তের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইহার সমন্বয়-মূলক, সার্বজনীন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী। নিম্বার্ক স্বয়ং স্থির উপলব্ধি করিতে পারিয়া-ছিলেন যে, পরম-সত্য এক হইলেও তাঁহাকে নানা দিক হইতে দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা, নানা মার্গের মাধ্যমে জানা যায়, কারণ সকল মানবের প্রবৃত্তি ও শক্তি সমান নয়। সেইজন্য তিনি সর্বদাই আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতমুখী, চরম মতবাদ বর্জন করিয়া তাহাদের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, মধ্যপন্থী মতবাদ গ্রহণে সমুৎসুক ছিলেন। এই কারণেই দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি অভেদ ও ভেদ, এক ও বহুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি ভেদ ও অভেদ বহু ও এক উভয়কেই সমসত্য ও অবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনরায়, ধর্মের ক্ষেত্রেও, যুক্তি ও অনুভূতি উভয়কেই যথাযথ সমান স্থান ও মর্যাদা দান করিয়া তিনি অদ্বৈতবেদান্তের অত্যুগ্র জ্ঞানবাদ—যাহাতে ঈশ্বর ও মানবের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কোনরূপ স্থান নাই এবং পরবর্তী বৈষ্ণব-বেদান্তের অত্যুচ্ছ্বসিত ভক্তিবাদ—যাহাতে ঈশ্বর ও

মানবের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের উপরই কেবল অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে—এই দুইটি চরমপন্থী মতবাদের মধ্যে সার্থকতম সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। সেইজন্য, তিনি যুক্তি ও অনুভূতি, জ্ঞান ও ভক্তি উভয়কেই সাধনমার্গে সমভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে কোনরূপ উচ্চাবচ ভেদ স্বীকার করেন নাই। একই ভাবে, নীতির ক্ষেত্রেও, নিম্বার্ক তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্থির বুদ্ধি ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। সেইজন্য, তিনি বিভিন্ন সাধকগণের বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি, গুরূপসত্তি প্রমুখ বিভিন্ন সাধন-মার্গের নির্দেশ দান করিয়াছেন। এই সমস্ত সাধনমার্গে জ্ঞানী ও কর্মী, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ, আত্মবিশ্বাসশীল ও আত্মবিশ্বাসহীন সকলেই সমভাবে মুক্তির অধিকারী। এইরূপ মধ্যম পন্থা প্রবর্তনের জন্যই, এইরূপ উদার, সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই, এইরূপ বিরোধ-বিরোধী সামঞ্জস্যসাধনের জন্যই, নিম্বার্ক-বেদান্ত যুগে যুগে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন ও ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ রূপে আদৃত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য

১। ছান্দোগ্য ৩।১৪।১

২। ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩২

৩। তৈত্তিরীয়-উপনিষদ ৩।৬

৪। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, ব্র সূ, ১।১।৩

গ্রন্থবিবরণী

বেদান্তপারিজাতসৌরভ। নিম্বার্ক প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। ধুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা, নং ৯৯, বারাণসী, ১৯৩২

নিম্বার্ক: দশশ্লোকী, পুরুষোত্তমকৃত বেদান্ত-রত্ন-মঞ্জুষা ভাষ্য সমেত, রত্নগোপাল ভট্ট কর্তৃক সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা, নং ১১৩, বারাণসী, ১৯০৭

নিম্বার্ক: সবিশেষ-নির্বিশেষ—শ্রীকৃষ্ণ-স্তব-রাজ, পুরুষোত্তমপ্রসাদ বৈষ্ণব কৃত শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী ভাষ্য সমেত, গোপাল শাস্ত্রী নেনে কর্তৃক সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা নং ৩৫৬,৩৫৭, বারাণসী, ১৯২৭

নিম্বার্ক: মন্ত্ররহস্য ষোড়শী, সুন্দরভট্ট কৃত মন্ত্রার্থরহস্য ভাষ্য সমেত, কলিকাতা, ১৯৩১-৩২

নিম্বার্ক: প্রপন্নকল্পবল্লী, কল্যাণদাস কর্তৃক সম্পাদিত. মথুরা, ১৯২৫

নিম্বার্ক: প্রাতঃস্মরণস্তোত্র, কল্যাণদাস কর্তৃক সম্পাদিত, মথুরা, ১৯২৫

নিম্বার্ক: কৃষ্ণাষ্টক, কিশোরলাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত; বৃন্দাবন, ১৯১৩

নিম্বার্ক: রাধাষ্টক, দুলারপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, মথুরা, ১৯২৫

বেদান্ত-কৌস্তুভ, নিম্বার্কের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীনিবাস কর্তৃক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, ধুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত। কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা, নং ৯৯, বারাণসী, ১৯৩২

চৌধুরী রমা: নিম্বার্ক এবং তাঁহার অনুগামীদের মতবাদ। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল কর্তৃক তিন খণ্ডে প্রকাশিত।

বেদান্ত—(ঈশ্বরবাদী) বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহ

ঈ। বল্লভ (শুদ্ধাদ্বৈত)

জীবনী ও রচনাবলী : দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজের প্রায় পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কঙ্করবদ নামক গ্রামের এক বিদগ্ধ তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ পরিবারে বেদান্তের শুদ্ধাদ্বৈত মতের প্রবক্তা বল্লভ (১৪৭৩-১৫৩১ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। বল্লভের পিতামাতা স্বগৃহ হইতে বারাণসী যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরের সন্নিকটে চম্পারণ্য নামক স্থানে বল্লভের জন্ম হয়। বল্লভ-পরিবার কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্ভূত ছিল। এই পরিবার ভারদ্বাজ গোত্রীয় বলিয়া দাবী করিত এবং বহু সোম যজ্ঞ করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিত। এইজন্যই এই পরিবার 'দীক্ষিত' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিল। বল্লভ-পরিবার একপ্রকারের বৈষ্ণব ধর্ম অনুসরণ করিত এবং গোপাল মূর্তির অর্চনা করিত। বল্লভ এইরূপ আধ্যাত্মিক পরম্পরার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং বারাণসীতে তাঁহার শিক্ষালাভ ঘটে। তিনি তিন-তিনবার সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন করেন, বিজয়নগর রাজসভায় সম্মানিত হন এবং উপদেশের দ্বারা বহুলোককে শিষ্য করেন। তিনি এলাহাবাদ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে আদেল নামক গ্রামে জীবন অতিবাহিত করেন এবং দুই পুত্র রাখিয়া বারাণসীতে দেহরক্ষা করেন। বিষ্ণুস্বামীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।[১] তিনি সংস্কৃতভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহাদের কয়েকটি এখন আর সম্পূর্ণাকারে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মসূত্র, জৈমিনি সূত্র এবং ভাগবতের ভাষ্য এবং তত্ত্বার্থদীপ নিবন্ধ ও অন্যান্য ষোলটি পুস্তক[২] তাঁহার মুখ্য রচনা। বল্লভের আরব্ধকার্যের ধারা তাঁহার বংশধরেরা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারের শাখা অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। বল্লভ-পরিবারে আজও প্রায় আশিজন পুরুষ বর্তমান আছেন। সাধারণতঃ যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট এবং বোম্বাই প্রদেশে বল্লভপন্থীদের দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরে—রাজন্য হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যন্ত অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যেও বল্লভপন্থার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

যথার্থ জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস : দার্শনিক-সমস্যার সমাধানের জন্য বল্লভ (১) উপনিষদসহ বেদ (২) গীতা (৩) ব্রহ্মসূত্র এবং (৪) ভাগবত[৩]—এই চারিটি মৌলিক

গ্রন্থকেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রামাণ্য-যুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জ্ঞানের এই সব বিভিন্ন উৎসগুলি পরস্পর পরিপূরক। এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে উপরি লিখিত গ্রন্থগুলির ক্রমানুসারে উত্তর-গ্রন্থের সাহায্যে পূর্ব-গ্রন্থের প্রামাণ্য নির্ণয় করিতে হইবে। ইহার ফলে, বল্লভ সম্প্রদায়ে ভাগবত একটি অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে বেদ ও ব্রহ্মসূত্র এক বর্গে এবং গীতা ও ভাগবত অন্য বর্গে পড়ে। বস্তুতঃ ভাগবতকে গীতার এক পরিপূর্ণ ভাষ্য হিসাবেই গণ্য করা হইয়া থাকে[৪]; এই মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা যায়। বল্লভের আবির্ভাবের পূর্বে বেদান্ত দর্শনের কয়েকটি বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। এই সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্যেরা নিজ নিজ মতানুসারে শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, শংকরের ব্যাখ্যা তৎকালে বিশেষ সমালোচনার কারণ হইয়াছিল; এবং এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, শাংকরভাষ্যের ফলে দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্যই ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া বল্লভ এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[৫] সেইজন্যই বল্লভ নিজেকে অগ্নির এক বিশেষ রূপ[৬] এবং ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি শাস্ত্রবাক্যের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া, শাংকর মতের সমালোচনা করিয়া এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাহার ঈশ্বরদত্ত কর্ম সমাধান করিয়াছেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত সমস্যাবলীর আলোচনাতে শ্রুতিনিরপেক্ষ তর্কের যে স্থান নাই এবং এই আলোচনা যে শ্রুতির আলোকেই করিতে হইবে, এই কথা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়।[৭] বল্লভ এই নীতি সর্বাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি শুধু যুক্তি কি বলে, ঐদিকে লক্ষ্য না দিয়া, এবং প্রত্যেক শ্রুতিবাক্যের মূল্য সমান, এইরূপ ধরিয়া লইয়া, শ্রুতির শব্দানুযায়ী সরল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।[৮] বৈদিক সাহিত্যের প্রতি শংকর ও বল্লভের দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্যের জন্যই তাঁহাদের দর্শনেও পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। বল্লভ শংকরকে এই বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন যে, শংকর তাত্ত্বিক সমস্যালোচনায় সম্পূর্ণরূপে শুষ্কতর্কের উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং শ্রুতিবাক্য তাঁহার নিজস্ব মতবাদের সহিত মিলাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বল্লভাচার্য এমন পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, শংকর শাস্ত্রবাক্যের বিশ্বস্ত ভাষ্যকার নহেন। বল্লভ সেইজন্যই শংকরের তীব্র সমালোচক হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ভাস্কর, রামানুজ ও অন্য অনেকের মত শংকরকে মাধ্যমিক বৌদ্ধের অবতার ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ[৯] বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন।

ব্রহ্ম : বল্লভের মতে কৃষ্ণই চরমসত্তা। তিনিই উপনিষদে ব্রহ্ম এবং ভাগবতে পরমাত্মা নামে পরিকীর্তিত।[১০] পুরুষোত্তম বা ভগবান কৃষ্ণ বস্তুতঃ পরমেশ্বর এবং তিনি ব্রহ্মের আধিদৈবিক রূপের প্রতিমূর্তি। তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং সমস্ত দৈবগুণের আধার। পরস্পরবিরুদ্ধ গুণও তাঁহাতে বর্তমান এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে জড়গুণ রহিত। তিনি সচ্চিদানন্দ। তিনি রসঘন ও আনন্দঘন। রস ও আনন্দ তাঁহার আকার এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই বল্লভ চরম সত্তাকে সাকার ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নিত্য, অপরিণামী, বিভু, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্। তাঁহার যে কোন সময় যে কোন কিছু হইবার ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতাই সাধারণতঃ তাঁহার মায়া-শক্তি নামে পরিচিত। জ্ঞান, কর্ম, অভিব্যক্তি, অন্তর্লয় প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির তিনি অধিকারী। তিনি সমস্ত রকমের ভেদ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তিনি সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং এই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সমস্ত জীবাত্মা তাঁহার মধ্য হইতেই বহির্গত হইয়াছে; তাই তিনি তাহাদের হইতে ভিন্ন নহেন। তিনি ভোক্তা। ঈশ্বরের সমস্ত গুণই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন।[১১] সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ব্রহ্ম সমস্তগুণের অধিকারী এবং প্রকৃতি ও বুদ্ধি উভয়েরই মূল কারণ। ব্রহ্মে প্রকৃতি ও বুদ্ধির ভেদ লুপ্ত হয়। এই দিক হইতে বল্লভকে জার্মান দার্শনিক শেলিং-এর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। জগৎ ও আত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে স্বরূপতঃ অভিন্ন। সেইজন্যই বল্লভের মতবাদ শংকরের মায়াবাদের তুলনায় শুদ্ধাদ্বৈত নামে পরিচিত।[১২] ব্রহ্ম সম্পূর্ণ শুদ্ধ এবং মায়ার মত কোন কিছুর দ্বারাই (যেমন শাংকর মতে আছে) তিনি আবিষ্ট হন না। অধিকন্তু, কারণ (ব্রহ্ম) এবং কার্য (জগৎ) উভয়ই শুদ্ধ এবং পরস্পর অভিন্ন। সেইজন্যই শুদ্ধাদ্বৈত স্বীকার করিতে হয়। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য একমাত্র ব্রহ্মের বিভিন্ন দিক লইয়াই আলোচনা করে। পূর্বকাণ্ড যজ্ঞাকারে ব্রহ্মের কর্ম-গুণ লইয়া আলোচনা করে এবং উত্তরকাণ্ডের আলোচনার বিষয়—ব্রহ্মের জ্ঞান-গুণ। অন্যদিকে, গীতা ও ভাগবতে ব্রহ্মের একটি সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।[১৩]

অক্ষর ব্রহ্ম : বল্লভ (১) পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম (২) অন্তর্যামী ও (৩) অক্ষরব্রহ্ম নামে ব্রহ্মের ত্রিরূপ স্বীকার করেন।[১৪] কৃষ্ণ বা পুরুষোত্তমই পরমেশ্বরের সর্বোত্তম রূপ। তিনি রসঘন ও আনন্দঘন এবং প্রেম ও পূজার পাত্র। পুরুষোত্তমের আনন্দের কোন অন্ত নাই। বস্তুতঃ তিনি সম্পূর্ণ অবিভক্ত একটি আনন্দপিণ্ড বিশেষ। তিনি অন্তর্যামী রূপে পরিচ্ছিন্ন আনন্দ লইয়া জীবাত্মায় অধিষ্ঠিত আছেন। অক্ষর ব্রহ্মের ক্ষেত্রেও আনন্দ অন্তহীন নয়, সান্ত। পরব্রহ্মের আধ্যাত্মিক রূপ অক্ষর ব্রহ্ম

জ্ঞানীদের ধ্যান-বস্তু এবং জ্ঞানীরা সাধনার শেষ অবস্থায় তাঁহার সহিত একাত্ম হইয়া যান। ভক্তরা এই অক্ষর ব্রহ্মকে কৃষ্ণের চরণ, পরমধাম প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনই অক্ষর ব্রহ্ম হইতেই বিভিন্ন জীবাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন ঈশ্বর জ্ঞানযোগে মুক্তি দিতে চাহেন, তখন তিনি অক্ষর ব্রহ্মকে (১) অক্ষর (২) কাল (৩) কর্ম ও (৪) স্বভাব—এই চতুর্মূর্তিতে আবির্ভূত করান। অক্ষর পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে আবির্ভূত হইয়া সমস্ত বস্তুর কারণ হইয়া থাকেন। উল্লিখিত মূর্তি চতুষ্টয় নিত্য ও ঈশ্বরের সহিত একাত্ম। সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন অক্ষর ব্রহ্মের আনন্দ প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন তাঁহাকে মুখ্যজীব বলা হইয়া থাকে। এই মতবাদ ঔডুলোমির মতবাদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ঔডুলোমির মতে চেতন আত্মা চেতন ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। মুখ্য জীবরূপে অক্ষর জীবাত্মাগণ হইতে উন্নত। বস্তুতঃ, অক্ষর-ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী এবং তিনিই পুরুষের আকারে ভগবানের অবতার রূপগুলি ধারণ করেন। ঈশ্বরের প্রথম ইচ্ছা যখন পূর্ণ হয়, তখন তাহার নাম দেওয়া হয় প্রকৃতি। অক্ষর পুরুষ ও প্রকৃতি উভয় হইতেই উচ্চতর এবং তিনি অসংখ্য জগৎ নিজের মধ্যে ধারণ করেন। উপনিষদ্ এবং গীতায় তাঁহাকেই অব্যক্ত প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[১৫] ব্রহ্মের নেতিবাচক বর্ণনায় সাধারণতঃ অক্ষর ব্রহ্মকেই ইঙ্গিত করা হইয়া থাকে। এই অক্ষর ব্রহ্ম শংকরের পরব্রহ্মের সমতুল্য হইলেও পুরুষোত্তম হইতে নিম্নস্তরের। অক্ষর ব্রহ্মের ধারণা বল্লভের পূর্বে ভারতীয় দর্শনের একটি বিস্মৃত অধ্যায় হইয়া গিয়াছিল। বল্লভ এই ধারণার পুনরুজ্জীবনের জন্য সঙ্গতভাবেই প্রশংসা দাবী করিতে পারেন।

জগৎ: ঈশ্বর সম্পূর্ণ একাকী এবং তিনি বহু হইতে চাহেন। তিনি শুধু আনন্দের জন্যই এই জগৎ সৃষ্টি করিতে চাহেন এবং বস্তুতঃ তিনি উর্ণনাভের জাল সৃষ্টির মত নিজের মধ্য হইতে স্বেচ্ছায় এই জগৎ সৃষ্টি করেন। জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপ হইতেই বহির্গত হয়। শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক এবং অন্যেরা যেমন মনে করেন যে, ব্রহ্মের মায়া অথবা দেহ অথবা শক্তি হইতে জগৎ-সৃষ্টি হয়, তাহা ঠিক নয়। বল্লভ স্বরূপ-পরিণামবাদ স্বীকার করিয়া শাস্ত্র-প্রামাণ্যের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই বটেন। যদিও ঈশ্বর জগতে পরিণত হইয়াছেন, তথাপি তিনি অবিকৃত-পরিণামী। অবশ্য এই ধারণা ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত নয়, তথাপি শ্রুতির বলে এই ধারণা গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই আর বল্লভের মতে শ্রুতিই চরম প্রমাণ। স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বরের পক্ষে

জগৎসৃষ্টি লীলামাত্র। জগৎ ব্রহ্মের সৎ-রূপ। ব্রহ্মের অন্য দুইটি গুণ চিৎ ও আনন্দ ঈশ্বরেচ্ছায় অভিভূত হইয়া থাকে।[১৬] সুতরাং জগৎ ব্রহ্মেরই সত্য অভিব্যক্তি, পরব্রহ্মের আধিভৌতিক রূপ। উহা ভ্রান্তি নয়। জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্ক কারণ ও কার্যের সম্পর্ক। শংকরের মায়ার মত এমন কিছুই নাই, যাহা ব্রহ্ম ও জগতের এই অভেদ সম্বন্ধের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে পারে। তাই ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ শুদ্ধ অদ্বৈত। জগৎ দেখিয়া আমরা ঈশ্বরের মহত্ত্বের ধারণা করিতে পারি, এবং যাহারা এই মহত্ত্ব উপলব্ধি করে, তাহারা তাঁহাকে অর্চনা না করিয়া পারে না।[১৭]

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন গুণের বিকাশ হয় এবং তাহারই ফলে বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু মায়া জীবকুলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া দেয় এবং তাহাদের মনে জগতের সত্য বস্তুর মত অন্য এক মায়িক বস্তু সৃষ্টি করে এবং এই মায়িক বস্তু সত্য বস্তুর উপর অধ্যস্ত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে বস্তু স্বরূপতঃ কখনই প্রত্যক্ষ করা যায় না; ব্যামোহিকা মায়া কর্তৃক অধ্যস্ত মায়িক-গুণ সম্বলিত হইয়াই বস্তু জ্ঞাত হইয়া থাকে। এইরূপে সৃষ্ট মায়িক বস্তুকে পারিভাষিক শব্দে বিষয়তা বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্মের অভিব্যক্তি যে সত্য বস্তু তাহা বিষয় নামে পরিচিত হয়। বিষয়তা দুই প্রকারের হইতে পারে—(১) যাহা বস্তুর সত্যরূপ আবরণ করে এবং (২) যাহা ভ্রান্তি উৎপন্ন করে। যাহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছে তাহারাই জাগতিক বস্তুনিচয়কে ব্রহ্মরূপে দেখিতে পারে এবং সেইজন্যই তাহাদের কাছে ভ্রম বা অখ্যাতি বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু অন্যেরা কেবলমাত্র কাল্পনিক পদার্থ বা বিষয়তাই দেখিতে পায় এবং তাহার ফলে তাহাদের অন্য খ্যাতির উপলব্ধি হয়। যে সমস্ত শাস্ত্র বাক্য জগৎকে মায়া বলিয়া বর্ণনা করে তাহারা বস্তুতঃ বিষয়তার প্রতিই ইঙ্গিত করে, ব্রহ্মের অভিব্যক্তি যে সত্যজগৎ (বিষয়) উহা তাহাদের উদ্দিষ্ট নয়।[১৮]

বল্লভ জীব-মায়া সৃষ্ট সংসার ও সত্য জগতের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন। সংসার 'অহংতা' ও 'মমতা'র ধারণায় গঠিত। জীব যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, তখন এই সংসার বিনষ্ট হয়। ঈশ্বরের মায়াশক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে দুইটি শক্তির সৃষ্টি করে এবং তাহাদের প্রভাব একমাত্র জীবাত্মাতেই বর্তমান দেখা যায়। বিদ্যার পঞ্চরূপ—(১) বৈরাগ্য (২) সংখ্যা বা জ্ঞান (৩) যোগ (৪) তপঃ এবং (৫) কেশবানুরক্তি। অবিদ্যারও পঞ্চ প্রকার—(১) আত্মজ্ঞানের অভাব এবং (২) অন্তরিন্দ্রিয় (৩) প্রাণ (৪) বহিরিন্দ্রিয় ও (৫)

দেহের অধ্যাস। যখন বিদ্যা জীবের অবিদ্যা ধ্বংস করে তখন অবিদ্যা—সৃষ্ট সংসার স্বতঃই ধ্বংস হইয়া যায় এবং জীব পূর্ণমুক্তি লাভ করে। জগৎ বিদ্যা দ্বারা ধ্বংস হয়না, কিন্তু আত্মরতি উপভোগের জন্য যখন ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টি নিজের মধ্যে প্রত্যাহরণ করিতে চান, তখন এই জগৎ ঈশ্বরে লীন হয়।[১৯] জগৎ ও সংসারের পার্থক্য প্রদর্শন বল্লভের এক বিশিষ্ট অবদান। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে তিনি শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায়, জগৎ-সৃষ্টির বহুবিধ প্রক্রিয়া আছে।[২০]

জীবাত্মা: অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয় তেমনই জগৎ-সৃষ্টির সময় অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মাসমূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে। জীবাত্মা অসংখ্য, নিত্য, অণুপরিমাণ এবং ব্রহ্মের অংশ বিশেষ। জীবাত্মারা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মের আনন্দ-গুণ জীবাত্মায় অভিভূত থাকে, কিন্তু ব্রহ্মের সদ্‌গুণ ও চিদ্‌গুণ জীবাত্মায় প্রকটিত। জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং তাহার ফলে বল্লভের অভিপ্রেত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ অক্ষুণ্ণই থাকে। ফুলের গন্ধ যেমন ফুল ছাড়াও অন্যত্র ব্যাপ্ত হয়, ঠিক তেমনি জীবাত্মা অণুপরিমাণ হওয়া সত্ত্বেও চিদ্‌গুণবলে সর্বদেহেই পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। জীবাত্মা পারমার্থিক চেতনসত্তাবিশিষ্ট ও শংকর মতানুযায়ী শুধু ব্যবহারিক সত্তাবিশিষ্ট নয়।[২১] ঈশ্বর যখন কেবলমাত্র আনন্দের জন্য তথাকথিত বিশ্বলীলা করিতে ইচ্ছুক হন (আর বৈচিত্র্য ছাড়া তো আনন্দ সম্ভবও নয়), তখন আনন্দগুণ জীবাত্মায় অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে ঐশ্বর্য প্রভৃতি ষট্ ভগ-ও অভিভূত হয় এবং ইহাতে বিচিত্র প্রকারের জীবাত্মার উদ্ভব হয়। জীব হইতে (১) ঐশ্বর্য (২) বীর্য (৩) যশ (৪) শ্রী (৫) জ্ঞান ও (৬) বৈরাগ্য—এই ষট্ ভগ চলিয়া যাওয়ায় তাহাতে পরনির্ভরতা, ন্যূনতা, জন্মাদি বিপর্যয়, অহং ও ভ্রান্তজ্ঞান এবং সাংসারিক বিষয়ে আসক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে।[২২] অন্যভাবে বলিতে পারা যায় যে, প্রথম চারিটি দৈবগুণের নিগ্রহ জীবাত্মার বন্ধন এবং অন্য দুইগুণের নিগ্রহ ভ্রান্ত জ্ঞান সৃষ্টি করে। জীবাত্মা অণুপরিমাণ; কিন্তু যখন তাহাতে তাহার সুপ্ত আনন্দগুণ প্রকট হয়, তখন জীবাত্মা বিভুত্ব লাভ করে। যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্যে জীবাত্মার বিভুত্বের কথা আছে, তাহারা জীবাত্মা যে অবস্থায় আনন্দের পরিপূর্ণ প্রকাশের ফলে ব্রহ্মপ্রকৃতি লাভ করে, তাহার প্রতিই ইঙ্গিত করে। জীবাত্মার আনন্দ যখন পরিপূর্ণরূপে প্রকট হয়, তখন সেই আত্মায় অসংখ্য জগতের আবির্ভাব ঘটে এবং তাহাতে দৈশিক পরিচ্ছিন্নতা থাকে না। জীবাত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

জগৎ বৈচিত্র্যময় এবং জীবাত্মার মধ্যেও স্তরভেদ আছে। যদিও ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া কাহাকেও সুখী এবং কাহাকেও দুঃখী করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে নির্দয় বা পক্ষপাতদোষদুষ্ট বলা যায় না। কারণ, জগৎ ও জীবাত্মার বর্তমান অবস্থা পূর্ব পূর্ব সৃষ্টিচক্রের জগৎ ও জীবকর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জগৎ ও জীবাত্মা ঈশ্বরের স্বরূপ হইতেই বহির্গত হইয়াছে, নিখিল বিশ্ব ঈশ্বরেরই আত্মসৃষ্টি, সুতরাং এই ক্ষেত্রে সমালোচনার কোন অবকাশ নাই।[২৩]

মুক্তির উপায় : ঈশ্বরপ্রাপ্তির যে বিভিন্ন প্রণালী আছে, তাহার জন্য জীবের প্রকৃতি ও রুচির বৈচিত্র্য দায়ী। শাস্ত্রে মুক্তির উপায় হিসাবে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিন পথেরই উল্লেখ আছে। এই তিন পথের কোন একটির উপর বিশেষ জোর দেওয়ার জন্যই বেদান্তের বিভিন্ন দলের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

বল্লভ জীবাত্মাগুলিকে গুণানুক্রমে (১) পুষ্টি (২) মর্যাদা ও (৩) প্রবাহ[২৪]—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সমস্ত জীবাত্মা উদ্দেশ্যহীনভাবে জগতে ঘুরিয়া বেড়ায়, জগতে সম্পূর্ণ আসক্ত থাকে এবং ঈশ্বরের কথা একবারও চিন্তা করে না, তাহারা প্রবাহ শ্রেণীর অন্তর্গত। অন্যদিকে যে সমস্ত জীবাত্মা শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, ঈশ্বরের স্বরূপ জানিয়া তদনুযায়ী তাঁহার পূজা করে, তাহারা মর্যাদা শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। পুষ্টিশ্রেণীর জীবাত্মাগণ ঈশ্বরের বাছাইকরা আপনার জন। তাহারা ঈশ্বরের কৃপালাভের মত ভাগ্যবান এবং এই কৃপার ফলে তাহারা পরমপুরুষার্থ লাভে সমর্থ ; এই জন্য তাহারা পুষ্টি (ঈশ্বর কৃপা) নামে অভিহিত হয়।

যে সমস্ত ব্যক্তি গর্হিত জীবনযাপন করে, তাহাদের দুঃখভোগ করিতে ও জগৎ-চক্রে আবর্তিত হইতে হয়। যাহারা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করে তাহারা তদনুযায়ী ফল পায়, এবং ইচ্ছা হইলে তাহারা পিতৃযান পথে স্বর্গে যায়। কিন্তু পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা আবার মরজগতে ফিরিয়া আসে। বাসনা বিরহিত হইয়া যখন কেহ বেদনির্দিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তখন সে আত্মসুখ লাভ করে এবং জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাগ্নিতত্ত্ব-নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসারে নবদেহ লাভ করে।[২৫] এই নবজন্মে সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে এবং দেবযান পথের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম সাযুজ্যলাভের অধিকারী হয়। বৈদিক যজ্ঞসমূহে ঈশ্বর অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, পশু, চতুর্মাস্য এবং সোম যজ্ঞের আকারে আবির্ভূত হ'ন। যাহারা এই সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তির ভজনা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করে, তাহারা ঈশ্বরানন্দাকারে মুক্তির স্বাদ লাভ করে।[২৬] যেহেতু

মর্যাদামার্গের মুমুক্ষুকে দেবযান-পথ অতিক্রম করিতে হয়, সেইজন্য মর্যাদা মার্গে মুক্তি ক্রমে ক্রমে লাভ করা যায়। একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই সত্যোমুক্তি সম্ভবপর।

এমন ব্যক্তিও আছে যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, বিশ্বের সর্বত্র ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করে এবং সর্বক্ষণ ব্রহ্ম-ধ্যানে কালাতিপাত করে। এই সকল ব্যক্তি দেবযান পথ অতিক্রম করিয়া অক্ষর ব্রহ্মে লীন হয়। এই অক্ষর ব্রহ্মই তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়। তাহারা অক্ষর ব্রহ্মকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া মনে করে এবং পুরুষোত্তম প্রভৃতি উচ্চতর তত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞেরা যদি কৃষ্ণোপাসকও হয়, তবে কেহই তাহাদের চেয়ে বেশি উন্নত নয়। এই সকল জ্ঞানী ভক্তেরা জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।[২৭]

ঈশ্বরানুরক্তি বিভিন্ন আকার ধারণ করে। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন[২৮] ঈশ্বরানুরক্তির এই নয়টি প্রকার। এইগুলি উৎকর্ষাধিক্যের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত; এবং যে ভক্ত সর্বশেষে ঈশ্বরপ্রেম লাভ করে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির মাত্রা সূচনা করে। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সে ঈশ্বরের মহত্ত্ব অনুভব করে, ঈশ্বরকে নিজেরই আত্মা বলিয়া ভাবে এবং তাহার ফলে অসীম নিবিড় প্রেমে তাঁহাকে বন্দনা করে।[২৯] শাস্ত্রনির্দিষ্ট এই জাতীয় ভক্তি মর্যাদাভক্তি নামে পরিচিত এবং ইহা অন্য বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের বৈধী ভক্তির অনুরূপ। মর্যাদাশ্রেণীর ভক্তেরা সাধারণতঃ পুরুষোত্তমের সাযুজ্য লাভ করে। কখনও কখনও তাহারা ঈশ্বরের সহিত সারূপ্য, কখনও বা তাঁহার সহিত সালোক্য এবং কখনও বা সাযুজ্য উপভোগ করে।

শাস্ত্রে পুরুষার্থপ্রাপ্তির এই সকল পথের উল্লেখ আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলা আছে যে, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত চরমতত্ত্ব কখনই অধিগত হয় না।[৩০] বল্লভ মর্যাদা ও পুষ্টিবাদের দ্বারা শাস্ত্রবাক্যের এই বিরোধ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষ স্বীয় প্রযত্ন দ্বারা শাস্ত্রনির্দিষ্ট যে জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিতে পারে, উহারা মর্যাদামুক্তির সূচনা করে; আর যাহারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে একেবারে অক্ষম, তাহাদিগকে তিনি যে মুক্তি প্রদান করেন, তাহার নাম পুষ্টি। মর্যাদামার্গে জীবাত্মার যোগ্যতানুসারে মুক্তিবিধান করা হইয়া থাকে, কিন্তু পুষ্টি-মার্গে জীবাত্মা শাস্ত্রনির্দিষ্ট মুক্তির কোন পথ অনুবর্তন না করিলেও ঈশ্বর তাহাকে মুক্তি দিতে চাহেন।[৩১]

অগষ্টিনের দর্শনের মত বল্লভের দর্শনেও নির্বাচনবাদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বল্লভের দর্শনে নির্বাচনবাদের আর এক নাম পুষ্টিমার্গ।

ভগবান কৃষ্ণের প্রতি পুষ্টিশ্রেণীর ভক্তদের স্বাভাবিক ভক্তি থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাগানুগাভক্তিতে যেমন, ঠিক তেমনই তাহারাও সব কিছুই ঈশ্বরের প্রতি অপরিসীম ভক্তি হেতুই করিয়া থাকে। তাহারা অত্যন্ত বিনীতভাবে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একমাত্র ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত হইলেই তাহারা স্বর্গীয় আনন্দের অধিকারী হয়। মর্যাদামার্গে ঈশ্বর-প্রেম নবধা ভক্তির ফল। কিন্তু পুষ্টিমার্গে প্রেমই প্রথমাবস্থা, আর নবধা ভক্তি ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক ক্রিয়া এই প্রেমেরই স্বাভাবিক পরিণতি। সুতরাং পুষ্টিকে মর্যাদার বিপরীত বলা যাইতে পারে।

পুষ্টিশ্রেণীর ভক্তেরা স্বীয় বৈশিষ্ট্যানুসারে (১) প্রবাহ (২) মর্যাদা (৩) পুষ্টি (৪) শুদ্ধ—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর ভক্তেরা সর্বদাই ঈশ্বর সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপে ব্যাপৃত থাকে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তগণ ঈশ্বরের গুণাবলী ভাল করিয়া জানে ও তাঁহার ভজনা করে। তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তেরা সর্বজ্ঞ এবং চতুর্থ শ্রেণীর ভক্তবৃন্দ ঈশ্বরের প্রতি অপরিসীম প্রেম পোষণ করে এবং সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হয়। গোপীরা এই চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত। পুষ্টিশ্রেণীর ভক্তেরা সকলেই দেবযান পথের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম না করিয়াই পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলিত হয় এবং ঈশ্বর কেবল করুণাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে নূতন দৈবদেহ প্রদান করেন এবং তাঁহার রাসলীলায় অংশগ্রহণ করিতে অনুমতি দেন।[৩২] গোপীদের মত উচ্চশ্রেণীর ভক্তেরা অবিলম্বে ঈশ্বরের লীলায় অংশ গ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের আনন্দ নিত্যকাল ধরিয়া উপভোগ করে। নিত্যলীলায় ভক্ত ভগবানের সহযোগে নানা রকমের সুখ সম্ভোগ করে এবং ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ভক্তের হাতে ছাড়িয়া দেন। বল্লভের মতে ইহাই মুক্তির চরমাবস্থা ও পরমপুরুষার্থ।

বল্লভ বলেন, কর্ম, জ্ঞান ও মর্যাদাভক্তি অতীতে প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু তাঁহার সময়ে প্রতিকূল অবস্থার জন্য তাহারা নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।[৩৩] তাই এখন মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করা একান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। দেউলিয়া যেমন ঋণদাতাদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য আইন আদালতের শরণাপন্ন হয়, ঠিক তেমনই যে তাহার আধ্যাত্মিক নিঃস্বতা ও অসীম অসহায়তা উপলব্ধি করিতে পারে, সে সাধারণতঃ ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপ পুষ্টিভক্ত সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করে। সে তাহার সমগ্র জীবন ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করে, ভাগবত গ্রন্থে তাঁহার মাহাত্ম্য পাঠ করে এবং সাংসারিক কাজকর্ম সংক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। আত্মসমর্পণে স্বার্থপরতা বা

জাগতিক বস্তুর প্রতি কোন আসক্তির স্থান নাই এবং ভক্তের নিকট সংসার স্বতঃই লুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ ভক্তের গৃহ দেবালয়ে পরিণত হয় এবং এই জগতেই তাহার সমগ্র পরিবারবর্গ স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে পারে।[৩৪] পুষ্টিভক্ত ঈশ্বরকে এমনভাবে ভালবাসে যে, সে তাহার সমস্ত পার্থিব ভালবাসা পরিত্যাগ করে ও বর্ণাশ্রমধর্ম অগ্রাহ্য করে। ভগবান কৃষ্ণ রস, আনন্দ ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ রূপ এবং বল্লভ এক নূতন সৌন্দর্য-দর্শন রচনা করিয়াছেন।[৩৫] কৃষ্ণ সমস্ত রসের, বিশেষ করিয়া শৃঙ্গার-রসের আধার। মিলন ও বিরহ শৃঙ্গার-রসের দুই দিক এবং কৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে তাঁহার আচরণে এই দুইটিই প্রকাশ করেন। ভাগবত বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বাল্য-লীলার বর্ণনা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এবং যে-ই এই বর্ণনা পাঠ করে, সে-ই ভগবৎ-প্রেমে মত্ত হয়। দার্শনিক দ্যোতনায় পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের গোকুল-লীলা তাঁহার কৃপার অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করে এবং এইজন্যই বালকৃষ্ণের পূজার বিধান আছে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়াছিল, তাঁহার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিল এবং প্রেমের বেদীতে সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের নীতি-উপদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাদের একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা নিজেদের গর্বের জন্য কৃষ্ণ-সঙ্গ হারাইয়াছিল, অত্যন্ত কাতরভাবে অনুশোচনা করিয়াছিল এবং প্রভুর আনুকূল্য লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে দৈবসুখ উপভোগ করিয়াছিল।

গোপীরা ঈশ্বরের কৃপাতেই ঈশ্বর-প্রেম এবং পরমপুরুষার্থ লাভ করিয়াছিল। যে কেহ প্রেম, ক্রোধ, ভীতি, বাৎসল্য, ঐক্য ও সখ্যের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতে পারে, সে-ই নিঃসন্দেহে স্বর্গীয় আনন্দ ভোগ করে।[৩৬]

এইগুলি জীবাত্মার ঈশ্বর-প্রাপ্তির বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে অন্যতম বিভিন্ন উপায়। প্রেমিক-প্রেমিকার ঐকান্তিক প্রেমের মধ্য দিয়াই জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিবিড়তম সংযোগ সম্ভব এবং রাধা এই প্রকার প্রেমেরই প্রতিমূর্তি। বল্লভ বলেন, একমাত্র নারীরাই স্বর্গীয় আনন্দলাভের উপযুক্ত এবং এই কথা তো সকলেই স্বীকার করেন যে, নারীসুলভ কমনীয়তা না থাকিলে ভক্তি অসম্ভব।[৩৭] কোন কোন ভক্ত কৃষ্ণকে পুত্র হিসাবে ভজনা করে, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে প্রেমিকরূপে পূজা করে। বস্তুতঃ সমস্ত জীবাত্মাই নারী এবং কৃষ্ণই তাহাদের স্বাভাবিক স্বামী।[৩৮] সুতরাং স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে, তেমনই প্রত্যেক জীবাত্মাই কৃষ্ণকে ভালবাসিবে, এইরূপ আশা করা যায়। এই মতবাদ সুফীবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এইরূপে পুষ্টিমার্গের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

গোপীদের জীবনে রূপায়িত পুষ্টিভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হইলেও বর্তমান অবস্থায়

অসুবিধাজনক। সেইজন্য বল্লভ প্রপত্তিরূপ অন্য আর একটি সুসমাধান প্রদান করিয়াছেন।[৩৯] সমস্ত জীবন প্রপত্তির অনুশীলন ও ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে। এইরূপ মানসিক প্রবণতা লইয়া ভাগবতশাস্ত্র শ্রবণ ও আবৃত্তি করিয়া তাহারা তাহাদের সমস্ত জীবন ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত করিতে পারে।

গোকুলে কৃষ্ণের রাসলীলা নিত্যকালের ব্যাপার এবং এই রাসলীলার ধারণা ঋক্‌বেদেও পাওয়া যায়।[৪০] শুকের সময় হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত রাসলীলার ধারণা বিভিন্ন রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৪১] বল্লভ আক্ষরিক ও আলঙ্কারিক উভয় অর্থেই রাসলীলার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বল্লভ ইহা দেখাইতে উৎসুক যে, ঈশ্বর ও তাঁহার সমস্ত কার্যাবলী লালসামুক্ত এবং রাসলীলার অনুচিন্তন মানুষকে শুধু পবিত্র করে না, তাহার মধ্যে ঈশ্বরানুরক্তিও সঞ্চারিত করে,[৪২] সেইজন্য রাসলীলা যখন আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হয়, তখন তিনি ইহার ইন্দ্রিয়াসক্তিশূন্যতা প্রমাণ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন। রাসলীলার যখন আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তখন রাসলীলার তাৎপর্য ভুল বুঝিবার কোন আশঙ্কাই থাকে না। বল্লভের মতে গোপীরাই বেদ বা শ্রুতি এবং ঈশ্বরই বেদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় বলিয়া তাহারা নিত্যই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। রাসলীলার মধ্যে শ্রুতির সহিত ঈশ্বরের নিত্য-সংযোগই প্রকাশ করা

সিদ্ধান্ত : বল্লভ শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদ এবং সংশয়াতীত শাস্ত্র প্রামাণ্যের উপর নির্ভর করিয়া পুষ্টিধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কতগুলি ধারণা—যেমন, ব্রহ্ম সগুণ, জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি, জগৎ সত্য, জ্ঞান কর্ম সমন্বয় শংকরের পূর্বেও প্রচলিত ছিল। ভক্তি, প্রপত্তি, দৈবকৃপা প্রভৃতির ধারণাও বল্লভের আগেই জানা ছিল। তাহা হইলে ভারতীয় দর্শনে বল্লভের নিজস্ব অবদান কি ?

অদ্বৈতবাদ ঈশ্বর রসঘন ও আনন্দঘন - এই ধারণা, ব্রহ্মে বিপরীত গুণের অবস্থিতি, অক্ষর ব্রহ্মের ধারণা, ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে জগৎ-সৃষ্টির কল্পনা, পরিবর্তন রহিত অবস্থায় ব্রহ্মের জগতে পরিণতি, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, ঈশ্বরের কৃপার উপর প্রাধান্যদান এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাবাবেগপ্রধান ভক্তি প্রভৃতি বল্লভ-দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

বল্লভ শঙ্করকে মায়াবাদের জন্য, ভাস্করকে উপাধিবাদের জন্য, রামানুজকে তিনটি বস্তুর পারমার্থিক সত্তার স্বীকৃতির জন্য, নিম্বার্ককে দ্বৈতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য, মধ্বকে শুদ্ধদ্বৈতবাদের জন্য এবং শাক্তকে শক্তি-নিমিত্ত-কারণ-বাদের জন্য সমালোচনা করিয়াছেন। বল্লভ বলেন, বাস্তবিক অদ্বৈতই শাস্ত্রের

শিক্ষা এবং ইহার সঙ্গে ভক্তির কোন বিরোধ নাই (আধুনিককালে শ্রীঅরবিন্দও এই কথাই বলিয়াছেন), শংকরের অদ্বৈতবাদ অধ্যাত্ম শাস্ত্রাভিপ্রেত নয়। রাধাকৃষ্ণন বলেন, শংকর তাত্ত্বিক গভীরতা ও নৈয়ায়িক-ক্ষমতায় তুলনাহীন এবং দার্শনিক ও দ্বান্দ্বিক হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ।[৪৩] বল্লভ কিন্তু শাস্ত্রচরমপ্রামাণ্যবাদ স্বীকৃতিতে অতুলনীয় এবং সেইজন্যই তাঁহার দর্শন ধর্মমূলক এবং ইহা খ্রীষ্টধর্মদর্শনকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং শংকর ও বল্লভ কখনই একমত হইতে পারেন না।

জনশ্রুতি এই যে, ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা সরাসরি আদিষ্ট হইয়া বল্লভ জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে ঈশ্বর-সেবায় দীক্ষিত করিয়া ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট করিবার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন।[৪৪] বল্লভ প্লোটাইনাসের মতই বলেন, জন্মের পরই পিতামাতা হইতে বিচ্যুত ও বহুদূরে দীর্ঘকাল লালিত পালিত সন্তানেরা যেমন পিতামাতা ও নিজেদের সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়া উঠে, তেমনই পরমাত্মা হইতে বিচ্যুত জীবাত্মা দুঃখ কষ্ট ভোগ করে, এবং যতশীঘ্র সম্ভব তাহারা পরমাত্মার তত্ত্বাবধানে আসে ততই তাহাদের মঙ্গল। বল্লভের শিক্ষা সমাজের সমস্ত স্তরের লোকের জীবনই উন্নীত করিয়াছিল এবং তাহা পূর্ণ গণতান্ত্রিক বলিয়া স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল। বল্লভের চিন্তাধারা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া সংস্কৃত, হিন্দী ও গুজরাটিতে চিত্র, সঙ্গীত ও সাহিত্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে; এবং ঈশ্বর-সাযুজ্যের গভীর অনুভূতিতে যাঁহাদের ব্যক্তি-জীবন লুপ্ত হইয়াছে এমন বহু রহস্য-বাদীর অব্যাহত ধারা বল্লভ-পন্থীদের মধ্যে লক্ষিত হয়।

দ্রষ্টব্য

১। জি, এইচ, ভট্ট: বিষ্ণুস্বামী এবং বল্লভাচার্য (নিখিল ভারত প্রাচ্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনের বিবরণ, ৪৪৯-৬৫ পৃঃ): বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভাচার্য সম্বন্ধে আর একটি টীকা (নিখিল ভারত প্রাচ্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, ৩২২-৮ পৃঃ)

২। তত্ত্বার্থদীপ (ত), ১, ৫, (বারাণসী সংস্করণ)

৩। ত, ১১৭-৮

৪। ত, ২।৬৪, ২১৮, ২১৯

৫। অণুভাষ্য (অ), ২।২, ২৬

৬। ভাগবতের উপর সুবোধিনী টীকা (স) ১।১, ১

৭। ব্রহ্মসূত্র (ব) ১।১।২; ২।১।২৭ প্রভৃতি

৮। অ, ২।১।১৪, ২৭ প্রভৃতি; ত ১।২৪-৭, ৫৭, ৬৪

৯। অ, ১।১।৩, ১২ ; ২।১।১৪, ২৭ ; ২।৩।১৮ ; ত, ১।১।১৭, ১৮, ৮০-২,

১০। ত, ১।৬, ১৪ ; ২।১১৮

১১। ত, ১।২৯-৩১, ৪৬, ৪৭, ৬৭-৭৯ ; ২।৮৪-৬ ; অ ১।১-৩, ৩।২

১২। শুদ্ধাদ্বৈত মার্তণ্ড, ২৬-৯

১৩। ত, ১।১২, ২০ ; ২।৯০

১৪। ত, ২।১১৯

১৫। ত, ২।৯৮-১০৩

১৬। অ, ১।৪।২৬ ; ২।১।৩৩ ; ত ১।২৭, ৩১-৪

১৭। ত, ১।৪৩, ৪৪

১৮। স, ২।৯।৩৩ ; ৩।২৬।৩০

১৯। ত, ১।২৭, ৩৫-৭, ৪৮, ৪৯

২০। ত, ১।৪০-২

২১। অ, ২।৩।১৭-৫৩ ; ত, ১।৩২-৫, ৫৬-৮

২২। অ, ৩।২।৫

২৩। অ, ২।১।৩৪ ; ত, ১।৭৮

২৪। পুষ্টি-প্রবাহ-মর্যাদা (পু)

২৫। অ, ৩।১ , ত, ২।৪-৯, ২৫৪-৬৮

২৬। ত, ২।১-৪

২৭। ত, ২।১০৩ ; অ ৪।৩।১-৭

২৮। ভাগবত (ভ), ৮।৫।২৩, ২৪

২৯। ত, ১।৪৩-৫

৩০। মুণ্ডক উপনিষদ, ৩।২।৩ ; কঠ উপনিষদ ১।২।২২ ; শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৩।২০ প্রভৃতি।

৩১। অ, ৩।৩।২৯, ৪২ , ৪।৪৬ , ৪।১।১৩ , ২।৭ : ৪।৯ ভ, ২।১০।৪ ; সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ১৭।১৮ , পু ; স, ১০।৩৬।৫৫

৩২। অ, ৪।৪১-১২

৩৩। কৃষ্ণাশ্রয় ; ত, ১।৫০-২ : ১।২০৯-১১, ২১৫-১৭, ২১৯-২৪

৩৪। ত, ১।৫৪ ; ২।২৪৯-৫০

৩৫। ত, ২।২২৬-৮

৩৬। ভ, ১০।২৬।১৫ ; ৭।১।৩০ ; স, ১০।৮৪।২৩

৩৭। স, ১০।২৬ (২৯ অধিকতর প্রচলিত) ১ , ৩০।৩১, রাধাকৃষ্ণন, ভগবদ্গীতা, ১৯৪৮, ভূমিকা, ৬১-৬২ পৃঃ

৩৮। স, ভ সম্বন্ধে, ১০।২৬।২৪ , ৪৪।৬০

৩৯। বিবেক ধৈর্যাশ্রয়, ১৬, ১৭, কৃষ্ণাশ্রয়

৪০। ঋক্বেদ, ১।১৫৪।৫, ৬ ; ১৫৬।৩ ; ২২।১৮-২১ ; ৭।১০০।৪ ; ১০।১১৩-১৪ প্রভৃতি ; যজুর্বেদ, ৬।৩ ; তৈঃ সং, ১।৩।৬।১ , অ, ৪।২।১৫।১৬ ; বিদ্বন মণ্ডন ২৭৯-৩৪৯ পৃঃ

৪১। জি, এইচ, ভট্ট : তামস ফল প্রকরণ সুবোধিনীর ভূমিকা।

৪২। ভাগবতের উপর স, ১০।২৬।৪২

৪৩। ভারতীয় দর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৫৭-৮ পৃঃ

৪৪। সিদ্ধান্ত রহস্য।

গ্রন্থবিবরণী

বল্লভ : ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য, ভাগবতের সুবোধিনী টীকা ; তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ (প্রকাশ সহ) : ষড়নিবন্ধ।

বিট্‌ঠল : বিদ্বন মণ্ডন, বোম্বাই, ১৯২৬

পুরুষোত্তম : প্রস্থান-রত্নাকর, বোম্বাই, ১৯০৮

গোপেশ্বর : ভক্তিমার্তণ্ড, বারাণসী।

গিরিধর : শুদ্ধাদ্বৈত মার্তণ্ড (চৌখাম্বা সং সিঃ, ৯৭ নং)

বালকৃষ্ণ : প্রমেয়-রত্নার্ণব (চৌখাম্বা সং সিঃ, ৯৭ নং)

গট্টুলাল : বেদান্ত-চিন্তামণি, বোম্বাই, ১৯১৮

গট্টুলাল : সৎসিদ্ধান্ত মার্তণ্ড, বোম্বাই, ১৯৪২

এম, জি, শাস্ত্রী : শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্তপ্রদীপ, বোম্বাই, ১৯৩৭

বেদান্ত—বৈষ্ণব (ঈশ্বরবাদী) সম্প্রদায়সমূহ

উ। চৈতন্য (অচিন্ত্য ভেদাভেদ)

১। ভূমিকা—অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ

চৈতন্যের দর্শনের নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রধানতঃ 'দশমূল শ্লোক'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এইটিকে স্বয়ং চৈতন্যের রচনা বলিয়া মনে করেন।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, চৈতন্যের আধ্যাত্মিক গুরুগণ (তাঁহার দীক্ষাগুরু এবং সন্ন্যাসগুরু) মাধ্ব সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন এবং চৈতন্য নিজেকে মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতেন এবং লোকের নিকট মাধ্ব দ্বৈতবাদই ব্যাখ্যা করিতেন বলিয়া মনে করিতেন, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তিনি যে দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা হইতেছে এমন একপ্রকার ভেদাভেদবাদ যাহা নিম্বার্কমতের অতিশয় নিকটবর্তী। এই কথার সত্যতা দশমূল শ্লোক হইতে এবং তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার উপদেশাবলীর যে সকল বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে। চৈতন্যের দর্শন আমাদের নিকট যে আকারে আসিয়াছে, তাহা অবিমিশ্র দ্বৈতবাদ নহে; কারণ উহাতে শুধু যে ব্রহ্মসূত্রের মাধ্ব ব্যাখ্যানুযায়ী ঈশ্বর, জীব এবং জড়জগতের নিত্য ভেদের উপর গুরুত্ব অর্পণ করা হইয়াছে তাহা নহে, অধিকন্তু উহাদের মধ্যে এই নিত্য ও সুনির্দিষ্ট ভেদ সত্ত্বেও এমন একটি স্বরূপগত অভেদের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে যাহা বিচারবুদ্ধির নিকট বোধগম্য নহে। সুতরাং এই দর্শনকে মাধ্ব মতের ন্যায় দ্বৈতাত্মক পৌরুষেয় অধ্যাত্মবাদ নাম দেওয়া সঙ্গত হইবে না। কিন্তু যে অচিন্ত্যভেদাভেদ নামে এই দর্শন পরিচিত উহাই উহার যথোপযুক্ত নাম—অর্থাৎ উহা হইতেছে এমন একপ্রকার আধ্যাত্মিক অদ্বয়বাদ যাহাতে সর্বপ্রকার ভেদের এক যুক্ত্যতীত ঐক্য অথবা সমগ্রের মধ্যে সমাধান করা হইয়াছে—এই ঐক্য শুদ্ধ যৌক্তিক বুদ্ধির অগম্য।

সর্ব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধারণ মত এই যে, জগতের সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে এবং শংকরানুমোদিত মায়াবাদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট জগন্মিথ্যাত্বের ধারণা প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। এই ব্যাপারে শুধু যে সর্ব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই একমত ইহা নহে, উপরন্তু সর্ব শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ও; অর্থাৎ যাঁহারা আগমসমূহের প্রামাণ্য স্বীকার করেন এবং ইহা-দিগকে ঈশ্বরোপদিষ্ট শাস্ত্রের স্থান দেন, তাঁহারা সকলেই এই ব্যাপারে একমত। বৈষ্ণব চৈতন্যও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন। তাই যদিও শংকর নির্গুণ ব্রহ্মকে পরম

নিরপেক্ষ তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন এবং তাহার তুলনায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, পালনকর্তা ঈশ্বরকে নিম্নস্থান প্রদান করেন, তথাপি চৈতন্যের অনুগামীগণ জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন বলিয়া এই নির্গুণ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সম্বন্ধটিকে বিপরীতভাবে ধারণা করেন—তাঁহাদের মতে পরম তত্ত্ব হইতেছেন সৃষ্টজীবের সহিত প্রেম ও স্নেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ সৃষ্টজগতের প্রভুরূপে ব্রহ্ম এবং এই সত্যের উপলব্ধির পথে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতেছে এমন একটি ভূমি যাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়।

চৈতন্য মতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, উহাতে ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তিকে কৃষ্ণ ও রাধা বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। এই ধারণা দ্বারা চৈতন্য নিম্বার্ক ও বল্লভের অনুগামীদিগকে রামানুজ ও মধ্বের অনুগামীগণ হইতে পৃথক করা যায়। রামানুজ ও মধ্বের মতে ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তিকে বৈকুণ্ঠনিবাসী বিষ্ণু অথবা নারায়ণ এবং লক্ষ্মীরূপে ধারণা করা হয়। এই বৈকুণ্ঠ খ্রীষ্টীয়দের স্বর্গের সমতুল্য। ঈশ্বরের এই দুই ধারণার মধ্যে মূলগত এবং গভীর প্রভেদ আছে। ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তিকে বৈকুণ্ঠ ও তাহার অধিবাসীদের অধিপতি লক্ষ্মী নারায়ণরূপে ধারণা করার মধ্যে ভগবানের ঐশ্বর্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হইয়াছে—জীব শুধু দূরে থাকিয়াই তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া এবং অন্য প্রকারে তাঁহার অতুলনীয় গরিমা এবং মহিমার জন্য তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারে মাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তাঁহার নিকট-সঙ্গলাভের সাহস করিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তির রাধাকৃষ্ণরূপে যে ধারণা তাহা ভিন্নপ্রকার; এখানে জীব বৃন্দাবন-লীলার মধ্যে সখা, সন্তান অথবা প্রেমিকের মানবীয় ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ভগবৎ সাহচর্যের আস্বাদ লাভ করে। ইহা ভগবানের মাধুর্য রূপ, অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের মধুরতার উপলব্ধি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এবং চৈতন্য বল্লভ প্রভৃতির অনুগামীগণ ঈশ্বরের লক্ষ্মীনারায়ণ রূপ অপেক্ষা এই মধুর রূপের উপলব্ধিকে উচ্চতর ও অধিক আনন্দদায়ক বলিয়া মনে করেন। কারণ, লক্ষ্মীনারায়ণের ধারণায় ভগবানের শুধু গরিমা ও মহিমার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। 'সিদ্ধান্ত-রত্নে' বলা হইয়াছে যে, মাধুর্যরূপে ঈশ্বর অন্যান্য মানবের মধ্যে মানবধর্মের গণ্ডী অতিক্রম না করিয়া (নররূপ-মনতিক্রম্য) মানবরূপে অবতীর্ণ হন। ইহা ভগবানের ঐশ্বর্যরূপ হইতে পৃথক। ঐশ্বর্যরূপে ঈশ্বর তাঁহার বিশ্বাতীত মহিমা ও ক্ষমতায় আবির্ভূত হন (উদাহরণস্বরূপ দ্বারকায় ভগবান্ চতুরানন রূপে আবির্ভূত)। সুতরাং উভয়রূপেই ভক্তির অবকাশ আছে বটে, তথাপি দ্বিতীয় রূপে ভক্তি শুধু ভীতি, আনুগত্য ও শ্রদ্ধার আকারেই সম্ভবপর, কিন্তু ভগবানের প্রথম রূপে ভক্তি ঘনিষ্ঠ, বাৎসল্য, সখ্য ও প্রেমের আকার ধারণ করে।

২। প্রমাণসমূহ

"'দশমূল শ্লোকে' যে দশটি শ্লোক আছে তাহাদের প্রথমটিতে প্রমাণ অথবা সম্যক্ জ্ঞানের করণের কথা বলা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট নয়টি শ্লোকে চৈতন্যের অনুগামীগণ কর্তৃক স্বীকৃত জ্ঞানের প্রধান বিষয়গুলির অর্থাৎ প্রমেয়সমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম শ্লোক অনুসারে বেদ সকলই প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ; এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান ও অন্যান্য প্রমাণ সকল যদি বেদের মূল উপদেশের অনুযায়ী হয় এবং বেদবাক্য অনুসারে বস্তুর স্বরূপ ব্যাখ্যা করে, তাহা হইলেই উহারা সম্যক্ জ্ঞানের করণ। চরম তত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণে একা তর্কশাস্ত্রের সামর্থ্য নাই। যুক্তি যখন বৈদিক উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বেদবাক্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, শুধু তখনই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণে তাহাদের কিছু অধিকার জন্মায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সাধারণ পরোক্ষ বিচারের বহির্ভূত। সাধারণ যুক্তিবিচার ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অনুগামী। সুতরাং উহা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দেশকালে সীমাবদ্ধ বিষয় সকলেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও সাধারণ যৌক্তিক বিচার শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের মধ্যেই স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতে পারে। কিন্তু যে তত্ত্ব আধ্যাত্মিক এবং সাধারণ ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়সমূহের ন্যায় দেশ ও কালে অবচ্ছিন্ন নহে, তাহার স্বরূপ জানিতে হইলে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও সাধারণ বিচার কোন কাজে লাগিবে না। এবং উহাদের পরিবর্তে মুনি ঋষিদের উচ্চতর অনুভূতির সাহায্য লইতে হইবে। অতএব পরম আধ্যাত্মিকতত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণে বেদই আমাদের প্রকৃত পথপ্রদর্শক—কারণ, বেদ হইতেছে মুনি ঋষিদের উচ্চতর অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিসমূহের বিবরণ।

৩। পরমতত্ত্ব

প্রমেয় অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানের চরম বিষয় সম্বন্ধে বেদ সমূহের বক্তব্য কী? চৈতন্য এবং তাঁহার অনুগামীদের মতে চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদের শিক্ষা এইরূপ। পরমতত্ত্ব হইতেছেন হরি অর্থাৎ ভগবান, অর্থাৎ পরমেশ্বর। হরির আধ্যাত্মিক দেহের জ্যোতি (অঙ্গকান্তি) হইতেছে শংকরাচার্যসম্মত নির্বিশেষ ব্রহ্ম, এবং হরির স্বরূপের শুধু একটি অংশমাত্র হইতেছে সৃষ্টিজগতের অভ্যন্তরস্থ পরমাত্মা। হরি হইতেছেন অংশী এবং পরমাত্মা তাঁহার একটি অংশ, এবং হরি হইতেছেন সেই প্রধান তত্ত্ব যাঁহা হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতি হইতেছেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম। হরি হইতেছেন পূর্ণ সৌন্দর্য (শ্রী), পূর্ণ ঐশ্বর্য, পূর্ণ বীর্য, পূর্ণ যশ, পূর্ণ জ্ঞানের এবং পূর্ণ বৈরাগ্যের ঐক্য। তিনি হইতেছেন অচিন্ত্য প্রাচুর্য-সম্পন্ন এই ছয়টি গুণের মূর্ত্য রূপ। এই গুণগুলি সমশ্রেণীর নহে—ইহাদের মধ্যে অঙ্গ

এবং অঙ্গীয় ভাব রহিয়াছে। শ্রী অথবা পূর্ণ সৌন্দর্য ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। ঐশ্বর্য, বীর্য এবং যশ এইগুলি শ্রীর তুলনায় গৌণ। শ্রী হইতেছে অঙ্গী এবং এইগুলি উহার অঙ্গ। ঈশ্বরের জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁহার যশের বিকীরণমাত্র। সুতরাং জ্ঞান ও বৈরাগ্য নামক যে দুইটি গুণের উপর শংকর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন, উহারা হইতেছে ঈশ্বরের একটি গৌণ-ধর্মের ধর্মমাত্র। এই ধর্ম দুইটিকে কেন ঈশ্বরের অঙ্গকান্তি বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা ইহাদ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। যেহেতু এই দুইটি গুণ হইতেছে শংকরসম্মত নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম, অতএব এইরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্ব-তন্ত্র তত্ত্ব নহে কিন্তু সচ্চিদানন্দঘন হরির বিশেষণ মাত্র। প্রজ্জলিত অগ্নির আলোক দেখিয়া যেমন উহার উৎপত্তিস্থল ও অধিষ্ঠানরূপে অগ্নিকে ধরিয়া লইতে হয়, তেমনই পরমেশ্বরের জ্যোতির্বলয়রূপে নির্বিশেষ ব্রহ্মের ক্ষেত্রে উহার উৎপত্তিস্থল ও অধিষ্ঠানরূপে পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক কলেবরকে ধরিয়া লইতে হয়, এবং ভগবান হরি তাঁহার পূর্ণস্বরূপ কৃষ্ণ ও রাধার (ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তির) দ্বৈতাদ্বৈতরূপ—প্রত্যেকেই অপরের সহিত ভক্তি, প্রেম ও স্নেহের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

যাহা পরমাত্মা অথবা জগতের অন্তরাত্মা বলিয়া খ্যাত, তাহা সর্বগুণসম্পন্ন ও পূর্ণ ভগবান হরির আংশিক রূপ মাত্র। ঐশ্বর্য ও বীর্য এই দুই গুণের সাহায্যে হরি মায়া অথবা অজ্ঞানের জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিষ্ণুর আকারে তাঁহার স্বরূপের একাংশ-দ্বারা উহাতে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। যদিও জগদাত্মা বিষ্ণু হরির অংশ মাত্র তথাপি তিনি পূর্ণতা ও গুণপ্রাচুর্যে তাঁহার মূল কারণ ভগবান হরি হইতে ন্যূন নহেন। কারণ অনন্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে এই কথা সত্য যে, উহার আনন্ত্য সর্বগ্রাহী। যে সমগ্ররূপে উহার বাহিরে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, শুধু যে সেই রূপেই উহা পূর্ণ ও অনন্ত তাহা নহে, অধিকন্তু এই অনন্তের একটি অংশও অংশীর আনন্ত্যের অধিকারী হইতে পারে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, পূর্ণ হইতে পূর্ণকে বিয়োগ করিলে পূর্ণতার হ্রাস না হইয়া পূর্ণতাই অবশিষ্ট থকে।

প্রশ্নে উঠে: যে ভগবান হরি হইতেছেন অনন্ত সচ্চিদানন্দঘনরূপ, তাঁহার আবার কি করিয়া দেশাবচ্ছিন্ন কৃষ্ণের রূপ থাকিতে পারে? নির্দিষ্ট মূর্তি অথবা পরিচ্ছিন্ন আকার থাকিলে শুধু যে সর্ব্যবাপিতা অথবা আনন্ত্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয় তাহা নহে, উপরন্তু ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতার ব্যাপারে সীমিত হইতে হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, জড়দেহের ধর্মগুলিকে স্বরূপতঃ আধ্যাত্মিক বস্তুতে ভ্রান্তিবশতঃ আরোপ করিলেই এইরূপ আপত্তির উদ্ভব হয়। জড়বস্তু সম্বন্ধে এই কথা সত্য যে, যেহেতু উহা হইতেছে অসমপরিমাণে সত্ত্ব, রজ ও তমের সমষ্টি সেইজন্য উহার ধর্মসমূহ দেশ ও

কালে পরিচ্ছিন্ন এবং কোন জড়বস্তু যখন কোন এক দেশে থাকে তখন অন্যান্য সর্বদেশে উহার অভাব থাকে। কিন্তু ভগবানের দেহ আধ্যাত্মিক ও শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ; সাধারণ জড়বস্তুসমূহ যেরূপ মিশ্রসত্ত্ব অর্থাৎ তম ও রজের সহিত মিশ্রিত সত্ত্বদ্বারা নির্মিত, ভগবানের দেহ সেইরূপ নহে। অতএব, যদিও জড়দেহের পক্ষে একই সময়ে কোন একস্থলে থাকিয়া আবার অন্য সর্বস্থলে থাকা সম্ভবপর নহে তথাপি ভগবানের শুদ্ধসত্ত্বরূপ আধ্যাত্মিক দেহের পক্ষে ইহা আদৌ অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ ভগবানের ইহা একটি অচিন্ত্য অথবা বুদ্ধির অগম্য ধর্ম যে তিনি সীমিত এবং স্পষ্টভাবে নির্বাচনযোগ্য আকার এবং মূর্তি ধারণ করিলেও তিনি তাঁহার এই সুস্পষ্ট পৃথকরূপেই একই সময়ে সর্বত্র থাকিতে পারেন।

যে সকল অচিন্ত্য ধর্ম ভগবানের মূর্ত আকারের বৈশিষ্ট্য সেইগুলি তাঁহার স্বরূপ এবং তদীয় বিবিধ শক্তিরও ধর্ম। ভগবানের স্বরূপ এবং তদীয় বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহা হইতেছে অচিন্ত্য ভেদাভেদ। তাই একদিকে যেমন তিনি তাঁহার ব্যবহৃত বিভিন্ন শক্তিগুলি হইতে অভিন্ন তেমনই অপরদিকে এমন একটি বিশ্বাতীগ স্বভাবও আছে যাহা তাঁহার স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশগুলির মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায় না। তাহা ছাড়া তিনি তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে যে সকল শক্তি ব্যবহার করেন সেইগুলিও ঠিক ঠিক যুক্তিশাস্ত্রীয় ভাষায় বোধগম্য নহে। উদাহরণস্বরূপ, ভগবান্ যে সকল শক্তি ব্যবহার করেন সেইগুলি বস্তুতঃ তাহার সেই স্বরূপ-শক্তির বিভিন্ন রূপ যাহা হইতেছে পরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ; অথচ তিনি তাঁহার এই স্বরূপ-শক্তি নিম্নলিখিত তিনটি বিভিন্নরূপে ব্যবহার করেন ; (১) চিৎ-শক্তি, অর্থাৎ প্রকাশ ও জ্ঞানের শক্তি ; (২) জীব-শক্তি, অর্থাৎ নিজেকে বিভক্ত ও বহু করিয়া জীব বা সান্ত আত্মা সকলে পরিণত করার ক্ষমতা; এবং (৩) মায়াশক্তি অর্থাৎ, জড় ও অচেতনরূপ ধারণ করিয়া নিষ্প্রাণ জগতের আকারে পরিণত হওয়ার ক্ষমতা। যে স্বরূপ স্বভাবতঃই আধ্যাত্মিক তাহা আবার কি করিয়া জড়জগতের অচেতন রূপ ধারণ করিতে পারে, অথবা অনন্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কি করিয়া স্বীয় অখণ্ড সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজেকে অসংখ্য সান্ত আত্মায় বিভক্ত করিতে পারে তাহা পরম তত্ত্বের একটি তর্কাতীত রহস্য।

চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিন আকারে এই যে স্বরূপশক্তি ক্রিয়া করে বলিয়া ধরা হইয়াছে, ইহা প্রকৃতপক্ষে কি? যেহেতু সৎ, চিৎ ও আনন্দ হইতেছে ভগবানের স্বরূপ অতএব তাঁহার স্বরূপশক্তিও সত্তায় আনন্দ (হ্লাদিনী) হইতে বাধ্য আবার এই আনন্দ হইতেছে সত্তায় আনন্দের অনুভব বা জ্ঞান (চিৎ)। এইভাবে স্বরূপশক্তির এই তিনটি রূপ : (১) হ্লাদিনী—ইহার সহিত আনন্দের সম্বন্ধ (২) সন্ধিনী—ইহার সহিত সৎ-এর সম্বন্ধ এবং (৩) সংবিৎ—ইহার সহিত উহাদের জ্ঞানের সম্বন্ধ।

শংকরের অনুগামীগণ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন—সচ্চিদানন্দ হইতেছে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ; এবং সৃষ্ট জগৎ ও প্রাণীদের সহিত সম্বন্ধ হইতেছে তাঁহার তটস্থ লক্ষণ; অজ্ঞানের আবরণ বশতঃ ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তারূপে ভ্রান্তভাবে প্রতীত হন বলিয়াই এই তটস্থ লক্ষণ সম্ভবপর হয়। অতএব শংকরের অনুগামীগণের মতে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ এই কয়টি ধর্ম ব্রহ্মের স্বরূপকে যথার্থ ভাবে ব্যক্ত করে কিন্তু তাঁহার জগৎ-সাপেক্ষ ধর্মগুলি মিথ্যা অবভাসমাত্র এবং ব্রহ্মের স্বরূপের অন্তর্গত নহে। চৈতন্যের অনুগামীগণের (এবং সর্ব বৈষ্ণবসম্প্রদায়সমূহের) মতে আমাদের অনুভূত জগৎ মিথ্যা অবভাস নহে। তাই ব্রহ্মের স্বরূপধর্ম এবং তটস্থ অথবা সাপেক্ষ-ধর্মের আত্যন্তিক ভেদের প্রশ্ন উঠে না। তটস্থ অথবা সাপেক্ষ ধর্মসকল স্বরূপ-ধর্মেরই প্রকাশের বিভিন্ন রূপ মাত্র। অতএব চৈতন্য এবং তৎসম্প্রদায়ের মতে যাহা চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি বলিয়া কথিত হয় তাহা ব্রহ্মের স্বরূপধর্মের সহিত অসংসৃষ্ট, মিথ্যা অবভাস নহে (অবশ্য শংকরের অনুগামীগণ তাহাই বলিবেন); কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা হইতেছে ভগবানের স্বরূপশক্তিরই বিবিধ প্রকাশ; যথা হ্লাদিনী অর্থাৎ আত্ম-উপভোগের শক্তি, সন্ধিনী অর্থাৎ আত্মাকে বাস্তব অথবা স্থাপনা করিবার শক্তি এবং সংবিৎ অর্থাৎ স্ব-জ্ঞান অথবা স্ব-চেতনার শক্তি।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য চিৎশক্তি পদার্থটি কি? এবং ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের শক্তি-রূপে উহার স্বরূপ কি? চিৎ বা চৈতন্য হইতেছে ভগবানের সেই শক্তি যাহার সাহায্যে তিনি নিজের স্বরূপকে ভগবান্ কৃষ্ণ এবং তাঁহার শক্তি রাধার আধ্যাত্মিক ভেদাভেদ উপলব্ধি করেন প্রত্যেকেই অপর হইতে ভিন্ন আবার অপরের সহিত অভিন্নও। হ্লাদিনী-রূপে এই উপলব্ধি হইতেছে কৃষ্ণ ও রাধার পরস্পরের প্রতি প্রেম; সন্ধিনীরূপে ইহা নিজেকে ভগবানের আধ্যাত্মিক জগৎ (বৃন্দাবন) এবং তাহার আনুষঙ্গিক পদার্থসমূহে প্রকট করে; এবং সংবিৎরূপে উহা নিজেকে এই ভেদাভেদে আনন্দের অনুভব রূপে উপলব্ধি করে। চিৎশক্তিকে অন্তরঙ্গ-শক্তি এই ভিন্ন নামেও অভিহিত করা হয়—ইহা হইতেছে এমন একটি কেন্দ্রানুগ সমাহিত অন্তর্দৃষ্টির শক্তি, যাহা দ্বারা শুধু যে উহার সমগ্র সত্তা অখণ্ডভাবে উহার অবিভাজ্য ঐক্যসহ উপলব্ধ হয় তাহা নহে অধিকন্তু সমগ্রের ন্যায় সমগ্রের প্রত্যেকটি অংশও উহার একটি স্বরূপগত অঙ্গরূপে অনুভূত হয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে, উহা হইতেছে বহুকে এক বলিয়া এবং এককে বহু বলিয়া অনুভব করার ক্ষমতা অর্থাৎ সর্ব অপরিবর্তনীয় ভেদ এবং বাহ্য বিরোধকে বিলুপ্ত করিয়া উহাদিগকে আন্তর আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে উন্নীত করিয়া আত্মাকে একটি প্রকৃত আধ্যাত্মিক ঐক্যরূপে উপলব্ধি করিবার শক্তি।

মায়া-শক্তি চিৎশক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি ইহাও ভগবানের স্বরূপশক্তিরই একটি আকার। চিৎশক্তিরূপে স্বরূপ-শক্তি ভগবানকে সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক একত্বরূপে, চরম আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপে ব্যক্ত করে; আর মায়া-শক্তিরূপে উহা তাঁহাকে অচেতন জড়জগৎরূপে এবং উহার বিবিধ পরস্পর-বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর কামনা ও আকর্ষণের আকারে ব্যক্ত করে। এইজন্য মায়াশক্তির অপর নাম হইতেছে ভগবানের বহিরঙ্গ শক্তি—ইহা হইতেছে ভগবানের এমন একটি আত্মসম্প্রসারণ ও আত্ম-বিচ্যুতির কেন্দ্র-বিমুখ শক্তি যাহার ফলে আধ্যাত্মিকতত্ত্ব শুধু নিষ্প্রাণ জড়তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়, এবং বহু ও বিশেষের খণ্ডদৃষ্টি সমগ্র ও অখণ্ড দৃষ্টির স্থান অধিকার করে। সুতরাং চিৎশক্তিতে ভগবানের স্বরূপ তাঁহার স্বরূপগত আকারেই অভিব্যক্ত হয়—ইহা এমন একটি আধ্যাত্মিক একতা যাহা সর্ব ভেদকে ঐক্যবদ্ধও করে এবং অতিক্রমও করে; কিন্তু মায়াশক্তিতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা লক্ষিত হয়—এইজন্য অংশ ও বিশেষের দৃষ্টি সমগ্রের অখণ্ড দৃষ্টির স্থান অধিকার করে। অতএব চিৎশক্তি আমাদের নিকট সত্যকে বিকৃত না করিয়া উহার পূর্ণরূপে প্রকাশ করে; কিন্তু মায়াশক্তি সত্যের শুধু একটি বিপরীত ছায়া প্রদর্শন করে। এইভাবে মায়াশক্তির বশে বিশিষ্ট খণ্ড পদার্থসমূহ উহাদের প্রকৃতরূপে অর্থাৎ সমগ্রের অধীনস্থ অংশরূপে না দেখাইয়া নিজেরাই অন্য-নিরপেক্ষ মূল্য ও অর্থের অধিকারী সমগ্র বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাহা ছাড়া, চিৎ-শক্তি আত্মতত্ত্বকে চৈতন্যময় আধ্যাত্মিক সত্তারূপে উপলব্ধি করে; কিন্তু মায়া-শক্তি উহাকেই এমন এক নিষ্প্রাণ, অচেতন জড়জগৎরূপে প্রদর্শন করে যেখানে চৈতন্য অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন।

৪। জীব

ভগবানের চিৎ-শক্তি আমাদের নিকট যে পূর্ণ সত্য উপস্থাপিত করে এবং ভগবানের মায়া-শক্তি তাহার যে বিকৃত অনুকরণ আমাদিগকে দেয়, জীব-শক্তি হইতেছে তাহাদের মধ্যবর্তী। ইহাই সীমাবদ্ধ সসীম জীব বা আত্মাসমূহের রূপধারী ভগবানের স্বরূপশক্তি। সত্য এবং তাহার বিকৃত অনুকরণের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া ইহা নিজেকে আধ্যাত্মিক এবং অনাধ্যাত্মিক এই দুইপ্রকার মনোভাব উৎপন্ন করিবার শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাকে তটস্থ শক্তি বলা হয় এবং সসীম জীব একই সময়ে পৃথিবী এবং স্বর্গের অধিবাসী বলিয়া তাহার প্রকৃতিতে যে দ্বৈতভাব আছে ইহা তাহাই নির্দেশ করে। নদীতীর সম্বন্ধে যেমন বলা যায় যে ইহা নদীর অংশও বটে আবার চতুষ্পার্শ্ববর্তী ভূমির অংশও বটে ঠিক সেইরূপ সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপে ভগবানের স্বরূপগত প্রকৃতি এবং অসম্বদ্ধ বিশেষ বস্তুসমূহ বিশিষ্ট অচেতন জড়জগতে তাঁহার যে বহিস্থ বিচ্ছিন্ন

প্রকাশ, এই দুইয়ের মধ্যে জীব যোগসূত্র। অন্যভাবে বলিতে পারা যায় যে, ভগবান যখন নিজেকে এমন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিদাত্মক পরমাণুতে বিভক্ত করেন যাহারা একদিকে ভগবানের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অর্থাৎ স্ব-রূপের সহিত সম্বন্ধ এবং অপরদিকে জড়জগৎরূপী প্রকাশ দ্বারা সীমিত তখন তিনি জীব-শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং ভগবান স্বরূপতঃ তিনি যে অসীম, সর্বব্যাপী পরমাত্মা তাহাই থাকেন, জীবরূপে তিনি সসীম সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন এবং তখন মায়া-শক্তির প্রলোভনে তিনি যেমন বিপথগামী হইতে পারেন, আবার ভগবানের আধ্যাত্মিক সত্তার অধিকারী বলিয়া নিজেকে মায়াজাল হইতে মুক্তও করিতে পারেন।

জীব-শক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তির প্রকাশের একটি রূপ ভিন্ন অন্য কিছু নয় বলিয়া ইহাও অবশ্যই ভগবানের স্বরূপের উপাদান সৎ, চিৎ ও আনন্দকে, সীমাবদ্ধ আকারে হইলেও, প্রকাশ করিবে।

৫। বন্ধন ও মুক্তি

প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সহিত তাহা হইতে বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমূহের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবগণের সম্বন্ধ সেইরূপ বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন আপনার মধ্য হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহ বিচ্ছুরণ করিতে থাকে এবং এই স্ফুলিঙ্গগুলি তাহারা যে আকর হইতে নির্গত হয় ক্ষুদ্রাকারে তাহার স্বভাবের অধিকারী হয় ঠিক সেইরূপ অখণ্ড আধ্যাত্মিক সদ্বস্তুরূপ ভগবান্ তাঁহার অখণ্ড সত্তার স্ফুলিঙ্গরূপে জীবসমূহকে বিচ্ছুরণ করেন। এইজন্য জীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন উভয়ই। ভগবানের সৎ, চিৎ ও আনন্দময় আন্তর সত্তা দ্বারা গঠিত বলিয়া জীব ভগবান হইতে অ-ভিন্ন এবং জীব অণু-পরিমাণ হওয়াতে সেই সত্তার সীমাবদ্ধ রূপ বলিয়া ভগবান হইতে ভিন্ন। সুতরাং সর্বান্তর্ভাবী সদ্বস্তুরূপে ভগবান এই অর্থে মায়াধীশ যে তিনি তাঁহার মায়াশক্তির প্রভু এবং নিয়ন্তা এবং এই মায়া-শক্তি দ্বারা তিনি তাঁহার অখণ্ড আধ্যাত্মিক সত্তায় অচৈতন্য এবং বহুত্ব উদ্ভাবন করেন এবং জীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিদণুরূপে ভগবানের সত্তার অধিকারী হইয়া মায়াধীন হইয়া থাকে। ভগবানের মায়া-শক্তি বস্তুতঃ দুইটি বিভিন্নরূপে কাজ করিয়া থাকে (১) প্রধান-রূপে ইহা অচেতন জড়জগৎকে উদ্ভাবন করে (২) জীবের অবিদ্যা বা অজ্ঞান-শক্তির রূপ ধারণ করিয়া জীব যে স্বরূপে ভগবানের নিত্য অনুগত তাহা তাহাকে ভুলাইয়া দেয় এবং নিজেকে স্বতন্ত্র, স্বয়ংসৎ চরম সদ্বস্তু বলিয়া কল্পনা করিতে প্ররোচিত করে। সসীম জীব যে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ করিয়া নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে তাহার জন্য এই অবিদ্যা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন আত্মবিস্মৃতিই দায়ী এবং অসীম বস্তুকে

কেন অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয় এবং তাহার জন্য কেন দুঃখ এবং নৈরাশ্য উদ্ভূত হয় ইহা হইতেই তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে।

জড়জগৎ মায়া-শক্তি এবং তাহার বিকৃত করিবার ক্ষমতা হইতে উদ্ভূত হইলেও মিথ্যা অবভাসমাত্র নহে। অপরপক্ষে, ভগবানের মায়াশক্তিরূপ স্বরূপ-শক্তির কার্য বলিয়া ইহা ইহার আকরের সত্তার অধিকারী এবং ইহা সসীম অতি ক্ষুদ্র জীবকে বস্তুতঃই বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। যথার্থ জড়জগৎ রূপে ইহা জীবের মনে যথার্থ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ইহা সত্য হইলেও, ইহাও সমানভাবেই সত্য যে ইহা নিজে নিত্য বা চিরস্থায়ী নহে অথবা জীবের উপর ইহার প্রভাবও নিত্য বা চিরস্থায়ী নহে। বস্তুতঃ, জড়জগতের সার্থকতা ইহাই যে ইহা জীবদের শিক্ষার স্থান। যে জীব ভ্রান্ত অহঙ্কারে মত্ত এবং ভগবানকে বিস্মৃত হইয়াছে সে ক্রমাগত নৈরাশ্য এবং অকৃতকার্যতার ভিতর দিয়া তাহার পার্থিব জীবনযাত্রার পদ্ধতি যে ভ্রান্ত ইহাই শিক্ষা করে এবং সর্বশেষে যে ঐশ্বরিক জীবন তাহার যথার্থ আন্তরিক সত্তা তাহা অবলম্বন করে।

অনৈশ্বরিক এবং পার্থিব জীবন হইতে ভিন্ন এই ঐশ্বরিক জীবন কি? চৈতন্যের অনুগামীদের মতে ইহা হইতেছে জীবের স্বরূপানুযায়ী জীবন। ইহা ভক্তি, আত্মোৎসর্গ ও প্রেমের জীবন। ইহাতে জীবের যে যথার্থ-স্বরূপ অর্থাৎ জীব যে পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গ এবং নিত্যই তাঁহার ইচ্ছার অধীন ইহা সে উপলব্ধি করিয়া থাকে। পার্থিব জীবন হইতেছে স্বেচ্ছাচার ও আত্মাভিমানের জীবন। ইহাতে জীব তাহার নিত্য অধীনতা বিস্মৃত হইয়া নিজেকে স্ব-তন্ত্র নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়া মনে করে এবং সকল ব্যাপারেই তাহার নিজের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এই অযথার্থ-দাবী করে। বারবার নৈরাশ্য ও অকৃতকার্যতা ভোগ করিয়া যখন সে তাহার যথার্থ অক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে তখন সে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকে এবং সে যে একটি আধ্যাত্মিক সমগ্র-সত্তার অন্যনির্ভরশীল অংশ তাহা উপলব্ধি করে। ইহার ফলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোকের উদয় হয় এবং ইহাতে দুঃখ এবং নৈরাশ্যের শিক্ষার ভিতর দিয়া জীব সর্বশেষে তাহার জীবনযাপনপদ্ধতির ভ্রম বুঝিতে পারে এবং সে নিজেকে যেরূপ স্বয়ংসৎ স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়া ভুল করিয়াছিল সে তাহা নহে কিন্তু ভগবানের নিত্য অধীন এইভাবে তাহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে। জীবের সীমিত স্বভাব যে সমগ্র-সত্তার পরনির্ভরশীল অংশমাত্র এই বোধ প্রথমে নৈরাশ্য এবং অকৃতকার্যতার আঘাতরূপে আসে এবং পরে ইহার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার ফলে বৌদ্ধিক উপলব্ধিতে পরিণত হয়। এই উপলব্ধি ক্রমশঃ সসীম জীবের সমগ্র সত্তায় ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহার সমস্ত চিন্তা ভাবাবেগ এবং ইচ্ছাশক্তিকে অনুপ্রাণিত করে। এইভাবে যাহা প্রথমে বাস্তবতা-বর্জিত, প্রাণহীন বৌদ্ধিক স্বীকৃতিরূপে প্রতিভাত হয়

তাহাই অবশেষে জীবের বুদ্ধিবৃত্তি, ভাবাবেগ ও ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত সমগ্র সত্তার সম্পূর্ণ আত্মদান ও সর্ত-নিরপেক্ষ আত্মোৎসর্গে পরিণত হয়। চৈতন্যের অনুগামীদের মতে এই স্তরে ভক্তির সর্বোচ্চ অবস্থা দেখা যায়; ইহাতে কেবলমাত্র যে সর্ববিষয়ে ভগবানের ইচ্ছা জীবের নিজ ইচ্ছার স্থান অধিকার করে তাহা নহে আমাদের সসীম যৌথ জীবনে যে সকল সামাজিক এবং নৈতিক ইষ্ট আছে সেইগুলি সমেত যাবতীয় সসীম ইষ্ট পদার্থ এক অখণ্ড পারমার্থিক জীবনে একাকার হইয়া উহার অংশীভূত হইয়া যায়। জীব এই স্তরে পৌছাইলে তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্বে এক অখণ্ড, সমগ্র জীবনের প্রতি আকর্ষণ দেখা দেয়। আত্মার এই আকর্ষণ কেবলমাত্র চিন্তার সাহায্যে আত্মসমর্পণ নহে—এইরূপ আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণাঙ্গ হইলে ইহাকে আত্মাকে শূন্য করিয়া দেওয়া এই নেতিবাচক অর্থে লওয়া যাইতে পারে—কিন্তু ইহা হইতেছে আত্মার ক্ষুধা এবং আত্মার তৃষ্ণারূপ এমন এক তীব্র বাসনা যাহা অখণ্ড সমগ্র জীবন অপেক্ষা অল্প কিছু লইয়া সন্তুষ্ট হইবার নহে। ইহাই রাগাত্মিকা ভক্তি। এই ভক্তি কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে কোনও কিছু অনুসন্ধান করিবার অথবা আবিষ্কার করিবার ইচ্ছা নয় কিন্তু সমগ্রসত্তার অধীন নিত্য অংশরূপে এক অখণ্ড পরম জীবনের জন্য জীবের অন্তরের প্রতিটি তন্ত্রীর ব্যগ্রতা।[১] রাগাত্মিকা ভক্তির পরিণতি মহাভাবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার শক্তি রাধার পরস্পরের প্রতি যে প্রেমের জন্য তাঁহাদের মধ্যে একে অন্যের ভিতর নিজের পূর্ণতা পাইয়া থাকেন এবং অপরের অভাবে নিজেকে অপূর্ণ এবং শূন্য বলিয়া বোধ করেন মহাভাব সেই ঐশ্বরিক প্রেমেরই প্রতিবিম্ব এবং জীবে সসীমাকারে উহারই প্রকাশ।

জীব ভগবানের ঐশ্বর্য এবং পরিপূর্ণ সত্তার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র এবং সেইজন্য নিত্যই ইহার অধীন। যে ভক্তি জীবের আধ্যাত্মিক পরিণতি নির্দেশ করিয়া দেয় তাহা জীবের এই স্বরূপগত প্রকৃতি অনুযায়ী জীবনযাপন মাত্র। ভক্তি এইরূপ বলিয়া জীব স্বভাবতঃই ভক্তিমান এবং নবজীবনপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে কোনও বাহিরের বস্তুপ্রাপ্তি নহে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সকল জীবই সচ্চিদানন্দরূপী ভগবানের স্বরূপের অংশ বলিয়া স্বভাবতঃই তাঁহার ভক্ত অথবা অনুরক্ত দাস। নিত্য মুক্তদের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত ভক্তি অনন্তকালই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই নিত্যমুক্তেরা বৈকুণ্ঠে এবং বৃন্দাবনে ভগবানের নিত্যসহচর, এবং ভগবদ্ধামসমূহের অধিবাসী বলিয়া চিরকালই মায়াশক্তির প্রভাবের বাহিরে এবং ইহার প্রলোভনে মোহিত হন না। বদ্ধজীব অর্থাৎ পার্থিব জীবনের সহিত জড়িত জীবদের সম্বন্ধে ইহা সত্য নয়। তাহারা মায়ার প্রভাবের পরিসীমার মধ্যে বাস করে এবং সেইজন্য তাহাদের ইহার প্রলোভনশক্তিদ্বারা প্রতারিত এবং বিপথচালিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহাদের ক্ষেত্রে, যতদিন পর্যন্ত না জীব

অভিজ্ঞতার কঠোর শিক্ষা পাইয়া পার্থিব জীবনের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে পারে এবং অবশেষে তাহার আধ্যাত্মিক পুরুষার্থলাভের উপায়স্বরূপ ঐশ্বরিক জীবনের সন্ধান পায় ততদিন পর্যন্ত অন্তর্নিহিত ভক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। জীব যখন ঐশ্বরিক জীবের সন্ধান পায় তখন তাহার অন্তর্নিহিত ভক্তি নিদ্রা হইতে উত্থিত হয় এবং জীব যে অনন্তকাল ধরিয়া ভগবানের দাস এবং দাস্য, ভক্তি এবং প্রেমের বন্ধনদ্বারা অনন্তকাল তাঁহার সহিত বদ্ধ তাহার এই যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশিত করে। বদ্ধজীবের অন্তরে ভক্তি ও প্রেমের উদয় পূর্বাবস্থা স্মরণ অথবা আত্ম-আবিষ্কার, ইহা জীবের পক্ষে কোনও নূতন গুণ আহরণ করা নয়।

বদ্ধজীব এবং নিত্য-মুক্তজীব—জীবের এই দুইটি প্রধান শ্রেণী ব্যতীত বদ্ধজীবদের মধ্যেই তাহাদের আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ও প্রগতি অনুসারে কয়েকটি উপ-শ্রেণী আছে। বদ্ধজীবদের মধ্যেই যে কেবল উদ্ভিদ্, পশু এবং মনুষ্য এই তিনটি শ্রেণী আছে তাহা নয় কিন্তু মনুষ্যদের মধ্যেই আধ্যাত্মিক পূর্ণতা এবং প্রগতির বিভিন্ন স্তর আছে। উদাহরণস্বরূপ, কতকগুলি মনুষ্য তাহারা যে ভগবানের নিত্য দাস তাহাদের এই স্বরূপ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া অমিশ্র পার্থিব জীবনযাপন করে, আবার কতকগুলি মনুষ্য পরমাত্মার ক্ষুদ্র অংশ হিসাবে তাহাদের যে গতি তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভক্তি ও প্রেমের আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করাই শ্রেয় মনে করেন। সসীমজীবকে সসীম, সীমাবদ্ধ এবং সেইজন্য সর্বব্যাপী সত্তা পরমাত্মার উপর অনন্তকাল নির্ভরশীল বলিয়া জানাই ভক্তির সূত্রপাত। জ্ঞান উচ্চস্তরে পৌছাইলে যখন ভগবানের অমূর্ত ধারণা ঘনীভূত হইয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে পরিণত হয় তখন শুষ্ক চিন্তা সজীব এবং ঘনিষ্ঠ ভক্তি এবং প্রেমে রূপান্তরিত হয়। মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে বলা যায় যে জ্ঞান ঘনীভূত হইলে এবং সাক্ষাৎ প্রতীতিতে রূপান্তরিত হইলে তাহাই ভক্তি, যে বুদ্ধি, জ্ঞান বা চিন্তা ঘনীভূত এবং কেন্দ্রীভূত হইয়া সজীব বিষয়ানুভবে পরিণত হইয়াছে তাহাই ভক্তি। বিষয়াংশে, ভগবানের নিত্য আনুগত্যের বোধই ভক্তি, আর মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে ইহা এমন একপ্রকার বৌদ্ধিক উপলব্ধি যাহা মানুষের বুদ্ধি, ভাবাবেগ এবং ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট সমগ্র ব্যক্তিত্বকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভগবান্, জীবসমূহ এবং জড় জগতের মধ্যে সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। যুক্তি-শাস্ত্রসম্মত যথাযথ ভাষায় ইহার বর্ণনা দেওয়া যায় না। জীব-শক্তি এবং মায়া-শক্তি ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বিভিন্ন রূপ হইলেও ভগবানের একটি বিশ্বাতীত স্বরূপ আছে এবং তিনি বিভিন্ন শক্তি ব্যবহার করিলেও ইহা পূর্ণ এবং অপরিবর্তিত থাকে। ভগবান্ তাঁহার বিভিন্ন শক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়া

এবং তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া এই সকল শক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার এই ত্রিবিধ শক্তিও—যথা চিৎশক্তি, জীব-শক্তি এবং মায়াশক্তি—পৃথক্‌ভাবে অবোধ্য এবং তাহাদের সম্বন্ধও অবোধ্য।

এইজন্যই চৈতন্যের অনুগামীরা তাঁহাদের মতবাদকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ বলিয়া থাকেন। এই মতবাদ ব্রহ্ম-বিবর্তবাদ এবং ব্রহ্ম-পরিণামবাদ উভয় হইতেই পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিবর্তবাদমতে পরিদৃশ্যমান জগৎ নিত্যসিদ্ধ চরমতত্ত্বে অর্থাৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত, সুতরাং জগৎ মিথ্যা অবভাসমাত্র এবং ব্রহ্ম-সত্তার উপর ইহার কোন ক্রিয়া নাই, কিন্তু চৈতন্যের অনুগামীরা জগৎকে জীবের শিক্ষালাভের স্থান হিসাবে সত্য বলিয়া মনে করেন কিন্তু ইহা ব্রহ্মের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ব্রহ্ম-পরিণাম-বাদে আবার জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করা হইলেও ইহাকে চরম তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মের পরিণাম অথবা বিকার বলিয়া মনে করা হয়। এই মতের বিরোধিতা করিয়া ভেদাভেদবাদীরা শক্তিপরিণামবাদ উপস্থাপন করেন এবং জগৎ এবং সসীম জীবগুলিকে ব্রহ্মের বিকার বলিয়া ব্যাখ্যা না করিয়া ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তির অর্থাৎ ইহার স্বরূপের অচিন্ত্য শক্তিগুলির অর্থাৎ চিৎ-শক্তি, জীব-শক্তি এবং মায়া-শক্তির বিকার বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে জগদতীত তত্ত্বরূপে ব্রহ্মের ঐক্য অক্ষুণ্ন থাকে এবং তাহা সত্ত্বেও ব্রহ্ম তাহার বুদ্ধ্যতীত শক্তিসমূহ দ্বারা জগতের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া ইহার সহিত এক ইহাও প্রতিপন্ন করা যায়।

দ্রষ্টব্য

১। ভগবানের অপ্রাকৃত-জগতে (ব্রজধামে) যে সকল অনুচর অর্থাৎ নিত্যমুক্ত আত্মা সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকেন তাঁহাদের পক্ষেই এরূপ ভক্তি সম্ভব। বদ্ধজীবের পক্ষে কেবলমাত্র রাগানুগাভক্তিরূপ উহার অনুকৃতিই সম্ভব। ভগবানের অপ্রাকৃত জগতে যে মূল বস্তু আছে ইহা তাহারই অনুকারী মাত্র।

গ্রন্থ-বিবরণী

চৈতন্য : দশ-মূল-শ্লোক
কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্য-চরিতামৃত
বৃন্দাবনদাস ঠাকুর : চৈতন্য-ভাগবত
লোচনদাস ঠাকুর : চৈতন্য-মঙ্গল
বলদেব বিদ্যাভূষণ : ব্রহ্ম-সূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্য
বলদেব বিদ্যাভূষণ : সিদ্ধান্ত-রত্ন
জীব গোস্বামী : ষট্‌সন্দর্ভ
রূপ গোস্বামী : লঘু-ভাগবতামৃত
কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ : জৈব-ধর্ম
কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ : চৈতন্য-শিক্ষামৃত

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শৈব সিদ্ধান্ত মতবাদ

শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়

ক। শৈব সিদ্ধান্ত

১। অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত ইহার সম্বন্ধ

শৈব-সিদ্ধান্ত বলিতে তামিল সম্প্রদায়ের শৈব-বাদ বুঝায়। এই উক্তির শব্দগত অর্থ "শৈব মতবাদের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত সকল বা চরম বক্তব্য"; এই সিদ্ধান্ত সকলই উক্ত মতবাদকে অপরাপর অ-শৈব সম্প্রদায় ও অন্যান্য শ্রেণীর শৈব সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিতে সহায়তা করিয়াছে। সিদ্ধান্তের সহিত অপরাপর সম্প্রদায় সকলের সম্বন্ধ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) পুরপ্-পুরচ্ চমযম্ (সম্পূর্ণ বহিরঙ্গ বা বিরোধী) (২) পুরচ্ চমযম্ (বহিরঙ্গ), (৩) অহপ পুরচ চমযম্ (অন্তরঙ্গ), (৪) অহচ্ চমযম্ (একান্ত অন্তরঙ্গ)। লোকায়ত, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিক সম্প্রদায় সকলকে সম্পূর্ণ বহিরঙ্গ বলা হয় এই অর্থে যে ইহাদের সহিত সিদ্ধান্তের বিভিন্নতা সর্বাপেক্ষা অধিক। এই সম্প্রদায় সকল বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বেও অবিশ্বাসী। ইহার পরে ন্যায়, মীমাংসা, একাত্ম-বাদ, সাংখ্যযোগ ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বহিরঙ্গ বলিয়া অভিহিত হয়। পরবর্তী এই সম্প্রদায়সকল বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও শৈবাগমকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করে না। শৈব মতবাদেরই কয়েকটী বিশেষ শ্রেণী যেমন পাশুপত, মহাব্রত, কাল, বাম, ভৈরব ও ঐক্যবাদ প্রভৃতির সহিত ইহার সম্বন্ধ অন্তরঙ্গ—এই সম্প্রদায় সকল শিবকে চরম দেবতা বলিয়া স্বীকার করে কিন্তু সিদ্ধান্তে গৃহীত তত্ত্বের তালিকা সম্পর্কে একমত নহে। একান্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া অভিহিত শেষোক্ত সম্প্রদায় সকল যেমন 'পাষাণ-বাদ শৈব,' 'ভেদ-বাদ শৈব,' 'শিব-সমবাদ,' 'শিব-সংক্রান্তবাদ, 'ঈশ্বর-অধিকারবাদ' ও 'শিবাদ্বৈত'—শৈব মতবাদেরই কতকগুলি বিভিন্ন ধারা, ইহারা সকলেই সিদ্ধান্তে আলোচিত তত্ত্বাবলীকে স্বীকার করে; কিন্তু কতকগুলি তত্ত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ ক্ষেত্রে তাহারা একমত নহে। শৈব সিদ্ধান্তবাদিরা একান্ত বহিরঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া একান্ত অন্তরঙ্গ বিরোধী মতবাদ সকলের সমালোচনা করিয়া প্রচলিত দার্শনিক পদ্ধতি অনুসারে স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টিত হন।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র সিদ্ধান্তের প্রধান তত্ত্ব সকলের ব্যাখ্যা করিব। তৎপূর্বে শৈব-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত মতবাদের প্রামাণ্য শাস্ত্রাদি ও শাস্ত্রাচার্যদিগের আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

২। প্রামাণিক শাস্ত্র সমূহ

শৈব মতবাদের মূল উৎস অষ্টাবিংশতি শৈবাগম, ইহাদের মধ্যে কামিকা সর্বাপেক্ষা প্রধান। বেদের প্রামাণ্যও উক্ত মতবাদে স্বীকৃত হইয়াছে। 'তিরুমন্দিরম' গ্রন্থের প্রণেতা ঋষি তিরুমূলার বলিয়াছেন "আগমশাস্ত্র বেদের মতই যথার্থতঃ ভগবৎসৃষ্ট, প্রথমটি (বেদ) সাধারণ, ও অপরটী (আগম) বিশেষ—কাহারও কাহারও বিবেচনায় ভগবৎ-মুখ নির্গত এই দুইটী বাক্যসমষ্টি অর্থাৎ 'অন্ত' পার্থক্যযুক্ত কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।"

সু-প্রাচীন যুগ হইতে প্রচলিত তামিল সাহিত্যে, যথা সঙ্গম যুগের প্রাচীন পুঁথিতে, শিব সম্পর্কে ও দক্ষিণ ভারতে শিবের নিকট পূজা নিবেদনের বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'নায়নুমার' বা 'অডিয়ার' বলিয়া অভিহিত তেষট্টি জন 'শৈবাচার্য'[১] যখন দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন ও জনসাধারণকে শিবভক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই সময়ই শৈব মতবাদের প্রধান যুগ বলা যায়। তাঁহাদের মধ্যে অপ্‌পর, তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর, সুন্দরমূর্তি ও মানিক বাচকর[২] শৈব ধর্মের প্রধান আচার্য (সময়াচার্য) বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন। প্রথম তিনজন যে সকল স্তোত্র রচনা করিয়াছেন তাহা হইতেই 'তেভারম' এর সৃষ্টি হইয়াছে। মানিক বাচকরের 'তিরুবাচকম্, সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে এই স্তোত্র শ্রবণ করিয়া কোন হৃদয় যদি বিগলিত না হয়, তবে সে হৃদয় পাষাণবৎ[৩]।

পূর্বোল্লিখিত চারিজন প্রধান সময়াচার্য শৈব মতবাদের কোন সুসংবদ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টিত হন নাই। পরবর্তী আচার্যদিগের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল। এই পরবর্তী আচার্যগণ সনাতনাচার্য বলিয়া কথিত হইতেন। এই সনাতনাচার্যদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন ম্যেকণ্ডদেব, অরুণন্দি-শিবাচার্য, মরয়-জ্ঞান-সম্বন্ধ ও উমাপতি—শিবাচার্য। ম্যেকণ্ডদেবের 'শিবজ্ঞান বোধম্' (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) শৈব সিদ্ধান্ত দর্শনের মূলগ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে এইরূপ মতবাদ প্রচলিত আছে যে ম্যেকণ্ডদেব রৌরব আগমের পাপ বিমোচন অধ্যায় তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু অধুনা কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি এই বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে 'শিবজ্ঞান-বোধম্' ম্যেকণ্ডদেবের মৌলিক গ্রন্থ।

'শিবজ্ঞান-বোধম্, এ স্বয়ং গ্রন্থকার রচিত বার্তিকসহ দ্বাদশটী সূত্র আছে। অরুণন্দির 'শিবজ্ঞান সিদ্ধিয়ার' শৈবসিদ্ধান্তের প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে যথার্থ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ইহাতে পরপক্ষ বলিয়া অভিহিত প্রথম খণ্ডে বিরোধী মতবাদ সকলের খণ্ডন করা হইয়াছে। সুপক্ষ (সংস্কৃতে স্ব-পক্ষ) বলিয়া কথিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'শিবজ্ঞান-বোধম্'এর ধারা একান্ত অনুসরণ করিয়া শৈব সিদ্ধান্তের মূল সূত্রাবলী বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। মরয়-জ্ঞান-সম্বন্ধ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না, তবে তাঁহার শিষ্য উমাপতি শিবাচার্য সিদ্ধান্ত মতবাদের বিশদ আলোচনা করিয়া অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে শত সূত্রাবলী বিশিষ্ট 'শিব প্রকাশম্' অন্যতম।

৩। প্রধান তত্ত্বসমূহ

শৈব-সিদ্ধান্তিদের মতে প্রধান তত্ত্ব তিনটি—পতি (ঈশ্বর), পশু (জীবাত্মা) ও পাশ (সংসারবন্ধন)। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর, আত্মা ও জড়প্রকৃতি সবই সৎ, সেই কারণেই ইহাকে বহু-বাদী বস্তুতান্ত্রিক দর্শন (Pluralistic Realism) বলা যায়। সিদ্ধান্ত মতবাদে ঈশ্বর চরম সৎ। তিনি সর্বজীবের আশ্রয়স্থল সুতরাং 'পতি' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। 'শিবজ্ঞান-বোধম্'এর প্রথম সূত্রেই ঈশ্বরের অস্তিত্বপক্ষে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। "তিনি (পুং) তিনি (স্ত্রী) ও ইহা রূপ বিচিত্র জগৎ, এই জগৎ ত্রিবিধ পরিবর্তনের (সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস) নিয়মাধীন, সুতরাং ইহা অবশ্যই সৃষ্ট অর্থাৎ ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন নিমিত্ত কারণ আছে।" আণব-মল বা অজ্ঞানরূপ মলযুক্ত থাকায়, ইহা 'হর' হইতে উদ্ভূত হয় এবং হরের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন যে 'হর'ই উক্ত ত্রিবিধ পরিণামের প্রথম কারণ। শিল্পী ব্যতীত যেমন শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নহে, তদ্রূপ কিয়ৎকালের জন্যও যাহার অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও বিলুপ্তি আছে ও পর মুহূর্তেই নব সৃষ্টির জন্য যাহার প্রস্তুতি চলিতেছে এমন যে বিচিত্র জগৎ ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন আছে—তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর স্বয়ং পরিণামাধীন নহেন। মেকণ্ডদেব বলিয়াছেন কাল যেমন স্বয়ং অপরিণামী থাকিয়াও সকল প্রকার পরিণামের কর্তা, ঈশ্বরও তদ্রূপ, বাহ্যিক করণ ব্যতীত ও স্বেচ্ছায় এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত পরিণামের মধ্যে থাকিয়াও স্বয়ং অপরিণামী। এই জগৎ ঈশ্বর সৃষ্ট।

সিদ্ধান্ত দর্শনে ঈশ্বর 'হর' ও 'শিব' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। আত্মার

সমস্ত পাশকে তিনি বিদূরিত বা হরণ করেন বলিয়া এবং প্রলয়ের পরে সকল কিছুই তাঁহার মধ্যে সংহৃত হয় বলিয়া তিনি 'হর' বলিয়া কথিত হন। তিনি শিব বলিয়া খ্যাত কারণ শিবই পরম ও চরম আনন্দ। বিশ্বের দ্রব্যজাতের আকৃতির অনুরূপ— শিব, শিবা, বা শিবং, স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীব এই ত্রিবিধ লিঙ্গের যে কোন লিঙ্গেই তিনি অভিহিত হইতে পারেন।

শিবের সমস্ত নামগুলিই ত্রিবিধ লিঙ্গে ব্যবহৃত হইতে পারে। মাণিক বাচকর বলিয়াছেন "দেখ, দেখ, তিনি স্ত্রী, তিনি পুরুষ, তিনি ক্লীব।"

শৈব-সিদ্ধান্তিদের মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র অপেক্ষা শিব শ্রেষ্ঠ। এই ক্ষেত্রে ইহা লক্ষণীয় যে প্রচলিত হিন্দুধর্মে ঈশ্বর বা মহেশ্বর বলিতে শিবকেই বুঝায়। সিদ্ধান্তিদের মতে শিবকে ত্রিমূর্তির মধ্যে তৃতীয় দেবতা রুদ্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিলেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ কারণ প্রলয়কালে শিবই একমাত্র অবিচলিত থাকেন পক্ষান্তরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সর্ব সময়েই রুদ্র সক্রিয় থাকেন কিন্তু প্রলয়কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণুর কিছু করণীয় থাকে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষায় "রুদ্র-ই এক মাত্র দেব, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি তাঁহার শাসন ক্ষমতা দ্বারা সমস্ত জগৎকে পরিচালনা করেন। সমস্ত জগৎ ও জীব তিনি সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও প্রলয়কালে তিনি সকলকে একত্র সংহার করেন।[8]

সিদ্ধান্তিদের মতে ঈশ্বর নির্গুণ। নির্গুণ শব্দের অর্থ তাঁহাদের মতে বৈদান্তিকদের ন্যায় গুণের অভাব বা গুণের ঊর্ধ্ব নহে। ইহা বলিতে প্রকৃতিগত সত্ত্ব, রজঃ ও ও তমঃ এই গুণত্রয় দ্বারা শিব অবচ্ছিন্ন নহেন,—ইহাই বুঝায়। এইভাবেই তিরুমুলর 'মুকুণা-নির্গুণম্' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। নির্গুণ বলিতে প্রকৃতিগত ত্রিগুণাতীত বুঝায়। শিবাবস্থা তুরীয় অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত অবস্থা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোতীত।"[৫] ম্যেকণ্ড বলেন ঈশ্বর নির্গুণ, নির্মল, অর্থাৎ মলবিহীন, সদানন্দ, তৎপর (সমস্ত বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) অতুলনীয়, তিনি ব্যোম তত্ত্বেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত, পাশমুক্ত জীবাত্মার নিকটে পরমাশ্চর্য বস্তু হিসাবে জ্ঞান-জ্যোতির ন্যায় আবির্ভূত হইয়া থাকেন নয় কি ?[৬]

সচরাচর শিবের আটটি গুণ আছে বলা হয় যেমন স্বাতন্ত্র্য, পবিত্রতা, আত্মজ্ঞান, মল-নির্মুক্ততা, সর্বজ্ঞতা, অসীম কৃপাপরতা, সর্বশক্তিমত্তা ও আনন্দ। তিরুকুড়ালে ঈশ্বরকে অংগুণত্তান (অষ্ট গুণান্বিত)[৭] বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শিবের মধ্যে সমস্ত প্রকার পূর্ণতা অবশ্যই আছে। 'শিবজ্ঞান বোধ' এর ষষ্ঠ সূত্রে এইরূপ উক্ত আছে যে জ্ঞানীব্যক্তিরা শিবকে শিব-সৎ বা চিৎ-সৎ বলেন। যেহেতু তিনি শুদ্ধ-চৈতন্য বা

শিব সেইহেতু তিনি খণ্ড মানব-বুদ্ধি গ্রাহ্য নহেন। তিনি পরম সৎ ও দিব্যজ্ঞানগম্য। তিনি খণ্ড জ্ঞানের ঊর্ধ্বে হইলেও দিব্যজ্ঞানের অতীত নহেন।

'শিব বিশ্বানুস্যূত ও বিশ্বোত্তীর্ণ। তিনি বিশ্বরূপ, অর্থাৎ এই বিশ্ব তাঁহার আকার তিনি বিশ্বাধিক অর্থাৎ এই বিশ্ব ছাড়াও তাঁহার অস্তিত্ব আছে। প্রায় প্রত্যেক শৈব সন্ন্যাসীই শিবের এই উভয়বিধ অস্তিত্বের স্তুতি গান করিয়াছেন। শিব এই জগৎরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন সত্য—কিন্তু জগতের মধ্যেই তাঁহার সত্তার পরিসমাপ্তি নহে। তিনি সাকার এবং নিরাকার দুইই। স্বরূপতঃ তিনি বিশ্বানুস্যূত, এই বিশ্বানুস্যূত রূপের জন্যই তিনি অষ্ট মূর্তিতে কল্পিত হইয়া থাকেন। মাণিকবাচকর বলিয়াছেন—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, সূর্য, চন্দ্র ও সচেতন মানুষের মধ্যে শিবাংশ অবস্থিত। অপ্‌পর এই অষ্ট মূর্তিকেই যজমান, শুভ, অশুভ, স্ত্রী, পুরুষ, সমস্ত রূপের রূপ, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিয়াছেন। এই সকল বর্ণনার মধ্যে নিহিত মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে, কারণ শিব বা ঈশ্বর বিশ্বোত্তীর্ণ বা এই জগতের উর্দ্ধে। তিনি এই বিশ্বের মূল আধার। ম্যেকণ্ড বলেন যে শিব স্থূল দৃষ্টি ও ব্যবহারিক চিন্তার বাহিরে। মাণিক্ক-বাচকর বলিয়াছেন পরম শিব যদিও স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক, ব্যোম্ অগ্নি, উদ্দেশ্য-কারণ প্রভৃতি বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন—কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি সমস্ত নাম-রূপের উর্দ্ধে।

শৈবসিদ্ধান্ত মতে শিব এই জগতের কর্তা বা নিমিত্ত কারণ। কোন কোন বৈদান্তিক তাঁহাকে এই জগতের উপাদান কারণ বলিয়াও স্বীকার করেন, সিদ্ধান্তিরা তাহা করেন না। সিদ্ধান্তিরা ব্রহ্ম-পরিণামবাদী নহেন তাঁহারা প্রকৃতি-পরিণামবাদী। জগৎ সৃষ্টি ও জগতের বিবর্তনাংশে সিদ্ধান্তিদের সাংখ্য দর্শনের সহিত মিল আছে। মৃত্তিকা যেরূপ ঘটের উপাদান, মায়াও তদ্রূপ এই জগতের উপাদান। কিন্তু নিমিত্ত কারণ ব্যতীত কেবল মাত্র উপাদান-কারণ-রূপ মৃত্তিকার ঘটে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব নহে—এই রূপান্তর ঘটিতে গেলে কুম্ভকার রূপ কর্তার ক্রিয়ার প্রয়োজন আছে। তদ্রূপ মায়া হইতে এই জগৎ সৃষ্টি ক্ষেত্রেও কর্তার ক্রিয়ার প্রয়োজন আছে। এই কর্তাই ঈশ্বর এই ক্ষেত্রে অবশ্য সাংখ্য ও সিদ্ধান্তিদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কুম্ভকার যেরূপ চক্রের সাহায্যে ঘটাদি প্রস্তুত করে, তদরূপ ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ[৮]। তিনি তাঁহার নিজস্ব শক্তির মধ্য দিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং উক্ত শক্তি এই সৃষ্টি ব্যাপারে সহকারী কারণ হিসাবে সক্রিয় থাকে। কুম্ভকারের সহিত ঈশ্বরের উপমা অবশ্য অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেনা, কারণ কুম্ভকারের বুদ্ধি ও কৌশল সীমাবদ্ধ, শক্তি স্বল্প, অধিকন্তু কুম্ভকারের চক্র ঘোরানোর পশ্চাতে তাহার ব্যক্তিগত গ্রাসাচ্ছদনের

প্রশ্ন আছে। কিন্তু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী, তাঁহার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও অসীম। তিনি সত্যসঙ্কল্প ও আপ্তকাম; তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্পই সত্য, তাঁহার সকল ইচ্ছাই নিত্য চরিতার্থ। জগৎ তাঁহার ইচ্ছায় সেই ভাবেই বিবর্তিত হয় যাহাতে জীবাত্মা সকল মলাদি অপসারণের মধ্য দিয়া মুক্ত হইতে পারে। শিবের ক্রিয়া পাঁচটী-তিরোধান, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ও অনুগ্রহ। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটির লক্ষ্য শেষেরটীকে লাভ করা। আত্মার মুক্তির জন্যই এই জগৎ ক্রিয়া চলিতেছে এই বিবর্তন কোন অবস্থায়ই ঈশ্বরের স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারেনা। জগৎ বিবর্তিত হউক বা নাই হউক শিব সবই অবস্থায় একই থাকেন। যেমন সকল ক্ষেত্রেই সূর্য নিরপেক্ষ ও এক; কিন্তু এই সূর্যের জন্যই পদ্মের বিকাশ, উত্তপ্ত কাচের মধ্য দিয়া তাপ নির্গমন ও জলের বাষ্পে পরিণত হওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়া থাকে[৯]। আবার অপরদিকে এই একই সূর্যের জন্য কতকগুলি পদ্ম কুঁড়িতে পরিণত হয়, কতকগুলি পদ্ম বিকশিত হয়, এমন কি কতকগুলি ঝরিয়া পড়ে। তদ্রূপ ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন কোন কিছুই সক্রিয় হইতে পারে না, এবং এই জগৎ সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া পড়ে। তথাপি এই জগৎক্ষেত্রে ও জগৎ অভ্যন্তরে যাহাই ঘটুক না কেন ঈশ্বরের স্বরূপ সর্ব অবস্থায়ই অপরিবর্তিতই থাকেন।

সিদ্ধান্তিরা অবতারবাদের পক্ষপাতী নহেন। 'শিবজ্ঞান সিদ্ধিয়ার[১০] এর প্রণেতা বলিয়াছেন যে অন্যান্য দেবতারা যেমন জন্ম, মৃত্যুও ভোগ-যন্ত্রণার অধীন, উমাপতি শিব এই সকল হইতে মুক্ত। শিবের কোন অবতার নাই, কারণ কর্মছাড়া কোন অবতার হয় না, এবং শিবের কোন কর্ম নাই। যে সকল দেহের জন্ম হয় এবং যাহাদের মৃত্যু হইতে দেখা যায় তাহারা কর্মের ফল হইতে মৃত্যুতে এবং মৃত্যু হইতে জন্মে পরিভ্রমণশীল জীবাত্মা সকল যেই রূপ দেহ ধারণ করে, ঈশ্বর সেইরূপ দেহ ধারণ করেন না। ইহাতে অবশ্য এইরূপ বুঝায় না যে ঈশ্বর দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইতে পারেন না। তিনি তাঁহার ভক্ত কর্তৃক যেভাবে পূজিত হয়েন, সেইরূপেই তিনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন, এবং জীবাত্মার মুক্তির উপযোগী বিভিন্নরূপেও তিনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন[১১]। এই সকল বিভিন্নরূপ জড় সৃষ্টি নহে, এইগুলি তাঁহার করুণার প্রকাশ। তাঁহার বিভিন্ন আবির্ভাবের একটী মূল্যবান বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে তিনি সংগ্রামরত বদ্ধ—জীবের সংসার হইতে মুক্তির জন্য গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। প্রেম ও করুণার অবতার হিসাবে প্রায়ই তিনি শৈব সাধুদের স্তোত্রের বিষয়বস্তু হইয়াছেন। তিরুমূলার তাঁহার স্মরণীয় স্তোত্র সকলের মধ্যে একটী স্তোত্রে বলিয়াছেন যে একমাত্র অজ্ঞ ব্যক্তিরা শিব ও তাঁহার প্রেমের (অনবু) মধ্যে পার্থক্য দেখিয়া থাকেন, ইহাদের একাত্ম অনুভূতিই যথার্থ জ্ঞান।[১২]

শৈব সিদ্ধান্ত মতবাদে স্বীকৃত পতি, পশু ও পাশ এই তিনটী প্রধান তত্ত্বের মধ্যে আমরা প্রথম তত্ত্বটীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। অন্য-নিরপেক্ষ বস্তু হিসাবে, ইহাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক তত্ত্ব। পশু ও পাশ রূপ অন্যান্য দুইটী তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করিবার পূর্বে, আমরা এই জগতের প্রকৃতি ও ইহার বিবর্তন আলোচনা করিব। কারণ, এই জগৎ জীবের আবাস, এবং ইহাই করণাদি ও পরিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার বিষয়সকল দিয়া থাকে।

মায়া এই জগতের উপাদান কারণ। সিদ্ধান্তিরা 'সৎকার্য-বাদ' এর ভিত্তিতে যুক্তি[১৩] প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, জগৎরূপ এই কার্যের নিশ্চয়ই কোন উপাদান কারণ আছে, এবং সেই উপাদান কারণ প্রকৃতির দিক দিয়া ইহা হইতে ভিন্ন নহে। জগৎ জড় বা অ-চিৎ, ঈশ্বর চিৎ, সুতরাং ঈশ্বর এই জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না। সুতরাং অচিদ্রূপী উপাদান কারণের ধারণা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহাই মায়া। ইহা মায়া বলিয়া অভিহিত হয় কারণ এই জগৎ ইহাতেই বিলুপ্ত (মা), হয় এবং ইহা হইতেই উদ্ভূত হয় (য়া)। ইহা সেই প্রাথমিক উৎস যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মায়ার জন্যই জীব সকল দেহ (তনু), ইন্দ্রিয়াদি (করণ) ভুবন ও ভোগ্য বিষয় সকল লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু মায়া স্বয়ং-সক্রিয় হইতে পারে না, কারণ ইহা জড় বা অ-চিৎ। সুতরাং ইহার জন্য চেতন পরিচালনার প্রয়োজন আছে, এবং তাহা শিব হইতে আসিয়া থাকে। শিব সাক্ষাৎভাবে মায়ার উপর ক্রিয়া করেন না, তিনি তাঁহার চিৎ শক্তির মধ্য দিয়া ক্রিয়া করেন। এইভাবে শিব কর্তৃক চালিত হইয়া মায়া নিজ হইতেই তত্ত্ব সকল সৃষ্টি করেন, এবং এই তত্ত্বগুলিই জগৎ সৃষ্টি করে।

সিদ্ধান্তিরা একটি শুদ্ধ ও অপরটি অশুদ্ধ বিবর্তনের দ্বিবিধ ধারার মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন। সেই কারণে মায়াও তাঁহাদের মতে দ্বিবিধ একটি শুদ্ধমায়া ও অপরটি অশুদ্ধমায়া। আণব ও কর্মের[১৪] সহিত সংমিশ্রিত না হইলে ইহা শুদ্ধ মায়া এবং মিশ্রিত হইলে ইহা অশুদ্ধ মায়া বলিয়া অভিহিত হয়।

শুদ্ধমায়া মহামায়া ও 'কুটিলাই' বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে, শিব স্বয়ং তাঁহার ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার মধ্য দিয়া ইহার উপর ক্রিয়া করেন। শুদ্ধমায়া হইতে পাঁচটি তত্ত্ব উদ্ভূত হয়—নাদ, বিন্দু, সদাখ্য, মাহেশ্বরী ও শুদ্ধবিদ্যা। নাদ হইল শিবতত্ত্ব, বিন্দু শক্তিতত্ত্ব। প্রথমটি শুদ্ধ মায়ার উপরে জ্ঞানশক্তির প্রভাবের ফল। ক্রিয়াশক্তি নাদের উপর সক্রিয় হইলে পরবর্তীটি উদ্ভূত হয়। জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি বিন্দুর উপরে সমপরিমাণে সক্রিয় হইলে সাদাখ্য তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। যখন জ্ঞানের সহিত অধিক পরিমাণে ক্রিয়াশক্তি সক্রিয় থাকে ইহা হইতেই মাহেশ্বরী তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। এবং এই মাহেশ্বরী হইতেই শুদ্ধ বিদ্যাতত্ত্ব

উদ্ভূত হয় যখন জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য অধিক সক্রিয় থাকে। শুদ্ধমায়া উদ্ভূত উক্ত পাঁচটি তত্ত্ব একত্রিত বা যুক্তভাবে 'শিবতত্ত্ব' বা 'প্রেরককাণ্ড' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

এই শুদ্ধ মায়া হইতে শব্দ তত্ত্বেরও সৃষ্টি হয়। শব্দ চারি প্রকার, প্রথমটি পরা, ইহা চরম ও সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। দ্বিতীয়টি পশ্যন্তী, ইহা অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং ময়ূরীর ডিম্বাংশে অপৃথক ভাবে অবস্থান করে যেমন ময়ূরের বিভিন্ন রং ইহা তদ্রূপ। তৃতীয়টি মধ্যমা, ইহা অধিকতর স্থূল ও ভেদযুক্ত কিন্তু শ্রুত নহে। চতুর্থটি শ্রুত শব্দ বৈখরী। বর্ণ ও শব্দের মধ্য দিয়া ইহা প্রকাশিত হয় ও শক্তির মধ্য দিয়া ইহার অর্থ পরিজ্ঞাত হয়। বৈয়াকরণরা এই শক্তিকে স্ফোট বলিয়া থাকেন। ইহা শুদ্ধ মায়া উদ্ভূত নাদ তত্ত্বের মধ্যে নিহিত থাকে।

সিদ্ধান্তিদের বিবর্তনের পরিকল্পনায় অবশিষ্ট তত্ত্বসকল অশুদ্ধ মায়া হইতে উদ্ভূত হয়—এই অশুদ্ধ মায়া অধোমায়া (নিম্নগামী মায়া) বা মোহিনী (যাহা মুগ্ধ করে) বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। শিব অশুদ্ধ মায়ার উপরে ক্রিয়া করেন না, কারণ ইহা মলযুক্ত। শুদ্ধ মায়া উদ্ভূত সদাশিব ও রুদ্রের ন্যায় দেবতারাই বিবর্তনের অবশিষ্ট তত্ত্বের উপর কর্তৃত্ব করেন। সদাশিব তাঁহার শক্তির সাহায্যে অশুদ্ধ মায়া হইতে তিনটী তত্ত্বের সৃষ্টি করেন—যেমন কাল, নিয়তি ও কলা (অংশ)। এবং কলা হইতে আরও দুইটী তত্ত্ব বিদ্যা (জ্ঞান), ও রাগ (আসক্ত) উদ্ভূত হয়। এই পাঁচটী তত্ত্ব আত্মার আবরক বা পঞ্চ কঞ্চুকের সৃষ্টি করে। এই সকল কঞ্চুকের দ্বারা বদ্ধ আত্মাই পুরুষ-তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পুরুষের বিপরীতাংশ প্রকৃতি, রুদ্রের সক্রিয়তায় কলার মধ্য দিয়া ইহা উদ্ভূত হয়। পুরুষ ও প্রকৃতিসহ পঞ্চকঞ্চুক বিদ্যাতত্ত্ব বলিয়া পরিচিত, ইহা 'ভোজয়িতৃ' কাণ্ড বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। বিবর্তনের এই অংশ পূর্বোক্ত প্রেরক কাণ্ড হইতে ভিন্ন। প্রেরক কাণ্ড শুদ্ধ মায়া হইতে উদ্ভূত তত্ত্ব সংবলিত সেই অংশ যাহা চালনা করে আর ভোজয়িতৃ কাণ্ড ভোগাদি সৃষ্টি করে।

অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে চিত্ত ও বুদ্ধি উদ্ভূত হয়। বুদ্ধি হইতে অহংকার বা জীবত্বের সৃষ্টি হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের প্রাধান্যের তারতম্য অনুসারে অহংকার তিন প্রকার। এই তিন অবস্থায় অহংকারের নাম এইরূপ হইয়া থাকে, যেমন তৈজস, বৈকৃত[১৫] ও ভূতাদি। তৈজস অহংকার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল ও মন উদ্ভূত হয়, বৈকৃত অহংকার হইতে কর্মেন্দ্রিয়সকল এবং ভূতাদি হইতে তন্মাত্র বলিয়া সূক্ষ্ম ভূত সকলের সৃষ্টি হয়। তন্মাত্রসকল হইতে স্থূল ভূত সকলের সৃষ্টি হয়। সর্বসাকুল্যে এইসকল ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বসহ বিবর্তনের পরিকল্পনা সিদ্ধান্তমতে সম্পূর্ণ হয়।

শৈব সিদ্ধান্ত মতবাদ শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায় : (প্রধান তত্ত্বসমূহ)
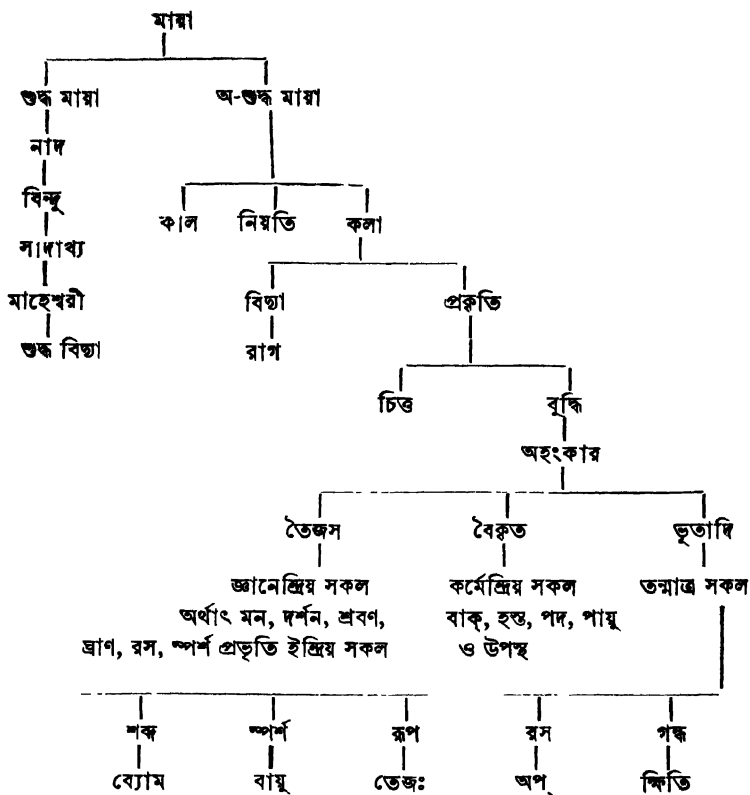
আত্মার বিভিন্ন পাশের মধ্যে মায়া একটি পাশ। ইহা জীবকে ভোগ্যকাণ্ড বলিয়া অভিহিত জীবের আবাসস্থল, করণাদি ও ভোগ্যবস্তু সকল দিয়া থাকে। সাধারণ ভাবে মায়িক জগৎ অসৎ বলিয়া অভিহিত হয়। এই উক্তির অর্থ অবশ্য এইরূপ নহে যে এই জগতের কোন ব্যবহারিক অস্তিত্ব নাই, ইহা বলিতে কেবলমাত্র এই বুঝায় যে, এই জগৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এবং ঈশ্বর সৎ। অ-চিৎ বলিয়াই মায়া অ-সৎ।

জীবাত্মা সকল স্বরূপতঃ অসীম, ব্যাপক ও সর্বজ্ঞ। কিন্তু মল ও পাশ সংস্পর্শ হেতু তাহারা নিজেদের সসীম, বদ্ধ ও অল্পজ্ঞ বলিয়া মনে করে। পাশযুক্ত বলিয়াই তাহারা পশু বলিয়া অভিহিত হয়। আণব, কর্ম ও মায়া[১৩] এই ত্রিবিধ মল জীবাত্মাকে জন্মান্তরাদির

স্তরেও সেবা কর্মাদি বহিরাঙ্গিক, যদিও সাধ্য ও সাধকের মধ্যে এই পরিবর্তিত সম্বন্ধ সাধককে অধ্যাত্মমার্গে অধিকদূর অগ্রসর হইতে সহায়তা করে ও ভগবানের অধিকতর সান্নিধ্যে আনয়ন করে। পরবর্তী মার্গ যোগ-মার্গ, এই স্তরে সাধক ঈশ্বরকে তাঁহার সখা বলিয়া মনে করেন। এই ধ্যানমার্গে সাধকের ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয় ও তাহার মন একাগ্রভাবে দেবতার ধ্যানে নিবিষ্ট হয়। চর্যা, ক্রিয়া ও যোগ বর্তমানে বর্ণিত এই ত্রিবিধ মার্গ শৈব সিদ্ধান্তে অধ্যাত্ম স্তরের ত্রিবিধ মার্গ, এইগুলি ভগবৎ স্বরূপ লাভ করিবার পক্ষে সাধককে যোগ্য করিয়া তোলে। পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে এইগুলি সাধনার বিভিন্ন স্তর। প্রথমটি সালোক্য বলিয়া অভিহিত হয়, অর্থাৎ ভগবৎ আবাসে অবস্থান। এই স্তর চর্যা মার্গের মধ্য দিয়া লাভ করিতে হয়। দ্বিতীয় স্তর সামীপ্য, অর্থাৎ ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভ, ইহা ক্রিয়া মার্গের ফল। তৃতীয় স্তর সারূপ্য অর্থাৎ ভগবৎ রূপ লাভ, ইহা যোগ মার্গের ফল। অবশ্য এই স্তরেও সাধক চরম অবস্থায় যাইয়া পৌঁছায় নাই। চরম সাযুজ্য অর্থাৎ ভগবানের সহিত মিলন, ইহা জ্ঞান বা প্রজ্ঞার মধ্য দিয়া লাভ করিতে হয়। বদ্ধতার মূল আণব বা অবিদ্যা এই ক্ষেত্রে জ্ঞান দ্বারা দূরীভূত করিতে হয়। জ্ঞান-মার্গ বা অন্যভাবে বলিতে গেলে 'সন্মার্গ' ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিবার পক্ষে অধ্যাত্ম সাধনার সর্বশেষ স্তর। এই স্তর অতিক্রম করিলে সাধক সম্পূর্ণ মলমুক্ত হইয়া পরিপূর্ণতা বা মুক্তি লাভ করে।

যে পদ্ধতি অনুসরণ করিলে জীবাত্মা ঈশ্বরের করুণা লাভ করিবার যোগ্য হয় তোলে তাহার বিষয়ে শৈব-সিদ্ধান্ত সাহিত্যে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। জীব প্রথমাবস্থায় ব্যবহারিক ভালমন্দকে সমভাবে দেখিতে শিক্ষা করিবে। ভাল ও মন্দ এই দুই প্রকার কর্মকে সমান মনে করা 'ইরুবিনৈয়োপ্পু' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ পাপের ন্যায় পুণ্যও যে বন্ধন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া সাধক পাপ ও পুণ্য এই উভয়বিধ কর্ম সম্পর্কে উদাসীন হইয়া যায়। এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে মন তখনও জীবের দৃষ্টি ভঙ্গীকে আবৃত করিয়া রাখে তাহা দিব্য অস্ত্রোপচারের যোগ্যতা অর্জন করে। মলের পরিণত অবস্থা 'মল পরিপাক' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সাধকের অশুদ্ধ মায়া-উদ্ভূত তত্ত্বাদি বিষয়ে ও তাহার নিজের দুর্বল ও চঞ্চল বুদ্ধি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই থাকে না। এই অবস্থায় পশু ও পাশ সম্পর্কিত জ্ঞানের কোন প্রয়োজনই থাকে না। সাধকের মন তখন ঈশ্বরের মহিমায় অনুধ্যানে পরিপূর্ণ থাকে এবং ঈশ্বরের করুণা সাধকের উপর বর্ষিত হয়। ইহা শক্তি-নিপাত বা ভাগবতী শক্তির করুণা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দিব্য করুণা বর্ষণের সংগেই জীবের নিকট শিব আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাহাকে মুক্তির জ্ঞান

প্রদান করেন। জ্ঞান-মার্গে প্রতিষ্ঠিত জীবের অবস্থা শুদ্ধ অবস্থা, ইহা অনুগ্রহ প্রাপ্তির অবস্থা বা 'অরুল', ইহা কেবল অবস্থা হইতে ভিন্ন; 'কেবল' অবস্থা তমসার অবস্থা বা 'ইরুল' এবং সকল—অবস্থা হইতেও পৃথক কারণ সকল-অবস্থা মূঢ়াবস্থা বা 'মরুল'। শুদ্ধ অবস্থায় জীব বিজ্ঞান আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। এই স্তরের জীবের নিকট শিব ইহারই নিজের জ্যোতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু প্রলয়াকলের নিকটে তিনি অতি-প্রাকৃত দিব্যরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, এবং সকল অবস্থার জীবের নিকট তিনি মনুষ্য দেহধারী গুরুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। দর্শন, স্পর্শন ও উপদেশাবলীর মধ্য দিয়া ভগবান সাধককে শুদ্ধ করেন এবং মলাদির সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখেন ও নিজেই শিবত্ব উপলব্ধি করিতে সহায়তা করেন। এই শিবত্ব উপলব্ধিই মোক্ষ বা মুক্তি। এমন কি মুক্তির পরেও সাধক তাহার প্রারব্ধ কর্মের অবশিষ্টাংশের জন্য দেহধারণ করিয়া অবস্থান করিতে পারেন। কিন্তু ইহা কোন প্রকারেই সাধকের পরিপূর্ণতার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না।

জীবের শিবত্ব উপলব্ধির অর্থ শিবের মধ্যে জীবের আত্মসত্তার বিলুপ্তি নহে। এমন কি মোক্ষাবস্থায়ও শিব ও জীবের সত্তাগত পার্থক্য থাকে। জীব ঈশ্বরের স্বভাব এবং স্বভাব নিজের স্বভাব এক বলিয়া দাবী করিতে পারে সত্য, কিন্তু জীব স্বয়ং ঈশ্বর নহে। বদ্ধতা ও মুক্তাবস্থার মধ্যে পার্থক্য এইরূপ—বদ্ধাবস্থায় জীবের অভিজ্ঞতা পাশের মধ্য দিয়া ঘটিয়া থাকে, এবং মুক্তাবস্থায় পতির মধ্য দিয়া ঘটিয়া থাকে। মুক্তাবস্থায় জীবের জ্ঞান পতি-জ্ঞান; ইহার অর্থ পতির মাধ্যমে জ্ঞান, কিন্তু পতির জ্ঞান নহে। ঈশ্বর ও মুক্ত আত্মার মধ্যে এই ধরণের পার্থক্য আছে। মুক্তাবস্থায় মল-মুক্ত হন ও শিব-আনন্দ উপভোগ করে সত্য, কিন্তু শিবের ন্যায় সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোধান ও অনুগ্রহ এই পাঁচটী শক্তির অধিকারী হয় না। সুতরাং মোক্ষ কেবলমাত্র ভেদরহিত একত্ব নহে; ইহা দ্বৈতের মধ্যে একের অভিজ্ঞতা। ভগবান শাশ্বত আনন্দ দান করিবার কর্তা, এবং জীবাত্মা সেই আনন্দলাভের প্রার্থী। ভগবানের মধ্যে নিজ সত্তার বিলোপ সাধন না করিয়াও জীব ভগবানের স্বরূপ উপভোগ করিতে পারে। এই মতবাদই সিদ্ধান্তি কর্তৃক প্রকৃত অদ্বৈত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই উক্তির নঞর্থক অংশ (অ—) দ্বারা যাহা অস্বীকৃত হইয়াছে তাহা দ্বয় বা দুইয়ের অস্তিত্ব নহে, দ্বৈত জ্ঞান। সিদ্ধান্তবাদিরা বলেন "তাহারা দুই নহে," এই বলিতে 'সেখানে দুইয়ের অস্তিত্ব নাই' এইরূপ বুঝায় না। উমাপতি তাঁহার 'শিব প্রকাশম্' গ্রন্থে বলিয়াছেন 'আমরা এই স্থানে বেদান্তের সার শৈব সিদ্ধান্তের মহিমা বর্ণনা করিতেছি। যে অদ্বৈতে দেহ ও দেহী চক্ষু ও সূর্য রশ্মি, আত্মা ও চক্ষুর মধ্যে যে

অনন্তত্ব সম্বন্ধ বিদ্যমান জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা করাই ইহার প্রধান গুণ সর্বোচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থে স্বীকৃত ধর্ম কর্তৃক ইহা অনুমোদিত ; আলো ও অন্ধকার, শব্দ ও অর্থ, স্বর্ণ ও অলঙ্কার এইগুলি যথাক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত যে সকল সম্বন্ধের উদাহরণ স্থল—যথা ভেদ, ভেদাভেদ এবং অভেদ সেই সকল সম্বন্ধ হইতে এই অদ্বৈত পৃথক অধিকন্তু ইহা যথাযথ যুক্তিপদ্ধতি দ্বারা অনুমোদিত , ইহা সত্য সন্ধানীর পক্ষে জ্যোতিঃস্বরূপ ও অপরের পক্ষে অন্ধকারতুল্য ।[১৮]

টীকা

১। সেক্কিলারের পেরিয়-পুরাণম্‌এ এই সাধুদের জীবনী আছে।

২। ভক্তির প্রধান চতুর্মার্গের জন্য এই চারিটি আদর্শ—যথা দাস-মার্গ, সৎপুত্র-মার্গ, সখা-মার্গ ও সন্মার্গ।

৩। দ্বাদশ তিরু-মুড়াই নামে নম্বি-আণ্ডার-নম্বি কর্তৃক সঙ্কলিত চারিজন সাধু ও অন্যান্য শৈব কবি ও দ্রষ্টার সঙ্গীতাবলী।

৪। ৩য়, ২

৫। তিরু-মন্দিরম্ ৫ম, ২২৯৬

৬। শিব-জ্ঞান-বোধম্ ৯ম, ২

৭। ১ম ৯

৮। শিব-জ্ঞান-সিদ্ধিয়ার ১, ১ম, ১৮

৯। শিব-জ্ঞান-সিদ্ধিয়ার ১, ২য়, ৩৩

১০। ২, ২য় ২৫

১১। তিন প্রকার রূপের বিভাগ আছে (১) ভোগ-রূপ, আত্মার আনন্দার্থে (২) ঘোর-রূপ, আত্মার কর্ম ক্ষয়ার্থে। ও (৩) যোগ-রূপ, আত্মার মোক্ষার্থে, সিদ্ধিয়ার দ্রষ্টব্য ১, ১ম, ৫০

১২। তিরু-মন্দিরম্ ৫ম ২৭০

১৩। ইহা সাংখ্যের মতের অনুরূপ যেমন কার্য কারণের মধ্যে নিহিত এবং উভয়েরই বস্তু এক।

১৪। আণব, কর্মন্ ও মায়া জীবাত্মার বন্ধনকারী মল।

১৫। সাংখ্যের মতে সাত্ত্বিক অহঙ্কারকে বৈকৃত ও রাজসকে তৈজস বলা হয়।

১৬। কখনো কখনো পঞ্চমলের উল্লেখও পাওয়া যায় : তিনটি তিরোধায়িন্ (শিবের অদৃশ্য হইবার শক্তি) ও মায়েয় (অর্থাৎ মায়া হইতে উৎপন্ন) বা জগৎ।

১৭। ২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

১৮। জে, এম, নল্লস্বামী পিল্লাই এর ; স্টাডিস্ ইন্ শৈবসিদ্ধান্ত ২৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য

পুস্তক-তালিকা

১। পিল্লাই, জে, এম, নল্লস্বামী—শিব-জ্ঞান-বোধম্ টীকা ও ভূমিকা-সহ অনুদিত, ধর্মপুরম্ অধিনাম্, ১৯৪৫

২। পিল্লাই, জে, এম, নল্লস্বামী : অরুণন্দী শিবম্-এর শিব-জ্ঞান-সিদ্ধিয়ার (সুপ্পকম্) সটীক অনুবাদ ধর্মপুরম অধিনাম ১৯৪৮

৩। পিল্লাই, জে, এম, নল্লস্বামী : স্টাডিজ্ ইন্ শৈবসিদ্ধান্ত. মেকান্ত ন্ প্রেস, মাদ্রাজ ১৯১১

৪। শাস্ত্রী, কে, এ, নীলকান্ত : অ্যান্ হিস্টরিক্যাল স্কেচ অব শৈভিস্ম, দি কালচারাল্ হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া ২য় খণ্ড ১৮-৩৪ পৃঃ

৫। শাস্ত্রী, এস্ এস্ সূর্যনারায়ণ : দি ফিলসফি অব শৈভিজম্, দি কাল্চারাল্ হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া ২য় খণ্ড ৩৫-৪৭ পৃঃ

শৈব ও শাক্ত-সম্প্রদায়

খ। কাশ্মীর শৈব দর্শন

১। ভূমিকা

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাশ্মীরে একাত্মবাদী চিন্তাধারা হিসাবে শৈববাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রকৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্ম হইতে ভিন্ন ছিল। ইহার মতবাদ অ-বৈদিক কারণ বেদকে ইহা চরম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেনা। ইহার আবেদন কেবলমাত্র সমাজের তিনটী উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, শূদ্রেরও এই মতবাদ অনুসারে মুক্তির পথ অনুসরণ করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ইহা সকল মানুষের মধ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করে। ইহা একটী আগম-সম্মত পদ্ধতি। ইহার উৎপত্তির সন্ধান চৌষট্টিটি অদ্বৈত[১] শৈবাগমের মধ্যে পাওয়া যায়।

এই মতবাদ 'স্বাতন্ত্র্য-বাদ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, কারণ ইহা স্বাধীন ইচ্ছাকে চরম দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করে। ইহা 'আভাস-বাদ' বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে, কারণ এই মতবাদে সকল প্রকার আভাসই চরম সৎএর স্থূল প্রকাশ। ত্রিত্ববাদের অভিমুখে ইহার প্রবণতা আছে বলিয়া ইহা 'ত্রিক'[২] বলিয়াও পরিচিত। ইহাকে 'কাশ্মীর' শৈববাদ'[৩] ও বলা হইয়া থাকে কারণ একাত্ম-বাদী শৈব-বাদের উপর প্রচলিত সাহিত্যের সকল লেখকই কাশ্মীরবাসী। ইহা কোনপ্রকার যুক্তি-তর্ক বা ধর্মশাস্ত্রের প্রামাণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা যোগ-ক্রিয়া সাপেক্ষ অধ্যাত্ম সাধনাদ্বারা লব্ধ পরম সত্তার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

একাত্ম-বাদী শৈববাদের অভ্যুদয়কালে কাশ্মীর বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার মিলনক্ষেত্র ছিল। অশোকের সময় হইতেই (খৃষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২) কাশ্মীরে বৌদ্ধ মতবাদের বিশেষ প্রভাব ছিল। সম্রাট কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন শ্রেণীর বিরোধী মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার জন্য কাশ্মীরেই বৌদ্ধ ধর্মযাজকদের এক সভার আহ্বান করেন। কণিষ্ক যখন (খৃষ্টীয় ৭৮-১০৯) কাশ্মীর (কণিষ্ক পুরম?) বৌদ্ধ সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন এবং নাগার্জুন যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া বৌদ্ধ মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, শৈবরা তখন বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কহ্লণের[৪] রাজতরঙ্গিণী' ও বরদরাজের 'শিব-সূত্রবার্তিকে'[৫] নাগার্জুনের আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পাণিনির ব্যাকরণ তৎকালে বিশেষভাবে অধীত হইত। কৈয়ট পতঞ্জলির মহাভাষ্যের উপর একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন, অভিনবগুপ্তপাদ পতঞ্জলির অবতার রূপে সম্মানিত হইতেন, তাঁহার আচার্যেরা এই নামে তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অদ্বৈত বৈদান্ত সু-প্রচলিত ছিল। শঙ্করাচার্যের কাশ্মীর আগমনে (৮২০ খৃষ্টাব্দে) পণ্ডিত ব্যক্তিদের আকর্ষণ ইহার প্রতি অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অদ্বৈতবাদী শৈবদেরই একটা বিশেষ সম্প্রদায় শাক্তাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বেদান্তের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সাংখ্যদর্শনও বিশেষ প্রচলিত ছিল।

২। ইতিহাস ও সাহিত্য

'শিব সূত্র' প্রণেতা বসুগুপ্ত (খৃষ্টীয় ৮২৫) সর্বপ্রথম আগমসম্মত শিক্ষাবলীকে দার্শনিক আকারে উপস্থাপিত করেন। তিনি অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের প্রতি কোন-প্রকার দৃষ্টি দেন নাই। কোন যুক্তিসম্মত মতবাদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না, 'চরম তত্ত্বের উপলব্ধির পক্ষে তিনটী উপায় তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার জন্য তিনি কোন যুক্তিসম্মত প্রমাণ দেন নাই বা কোন প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখও করেন নাই। পরম্পরা প্রচলিত একটি মতানুসারে তিনি একটি পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত সূত্র সকলকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

বসুগুপ্তের শিষ্য ভট্ট কল্লট 'স্পন্দকারিকা' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বা তাঁহার আচার্য প্রণীত গ্রন্থ সাধারণের সমক্ষ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম চরম সৎ বিষয়ে অস্পষ্ট যুক্তিসম্মত আলোচনা লক্ষিত হয় এবং অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সোমানন্দ নামে বসুগুপ্তের একজন বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। চরম সৎ সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ স্পষ্টতঃ যুক্তিবাদী ছিল। তিনি স্পষ্টভাবে অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং যুক্তিসম্মতভাবে তাঁহাদের মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার আক্রমণ প্রধানতঃ বৈয়াকরণদের 'শব্দ ব্রহ্ম-বাদ' ও কাশ্মীর 'শৈবদের কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের শক্ত্যদ্বয়বাদের বিরুদ্ধে চালিত হইয়াছিল, পশ্যন্তীই চরম ও পরা, 'বাক্য পদীয়ম্' এ প্রতিষ্ঠিত ভর্তৃহরির (৬৫০ খৃঃ) এই মতবাদকে তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। পরা যে পশ্যন্তী হইতে ভিন্ন ইহাই তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

প্রাচীন বৈয়াকরণগণ পশ্যন্তী ও বৈখরীর মধ্যে মধ্যমা নামে কেবলমাত্র একটি অবস্থান্তর স্বীকার করিয়াছেন কৈয়টের 'প্রদীপে' আমরা ঐসকল বৈদিক অণুচ্ছেদের

(চত্বারি শৃঙ্গা প্রভৃতি) ভিন্ন ব্যাখ্যা দেখিতে পাই ; নাগেশ ভট্ট তাঁহার 'উদ্যোতে' এইগুলিকে পরার অস্তিত্ব সমর্থন করে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শৈবাগমের প্রভাবের জন্যই নাগেশ ভট্ট ও তাঁহার আনুগামিরা পরাকে পশ্যন্তী হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ব্যাকরণ দর্শনে সোমানন্দের অবদান পরার প্রতিষ্ঠা। ইহা পশ্যন্তী হইতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ। শৈবরা যাহাকে স্বাতন্ত্র্য' বা বিমর্শ বলিয়া থাকেন এই 'পরা' তাহার সহিত এক।

সোমানন্দ তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে 'শক্ত্যদ্বয়'বাদের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ষষ্ঠ অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অদ্বৈত বেদান্তের সহিত জৈন, সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংক্ষেপে সমালোচনা করিয়াছেন।

চরম সত্তা সম্পর্কে অন্যান্য মতবাদের একই ধরণের ধারণা হইতে অদ্বৈত শৈব সম্প্রদায় স্বীকৃত চরম সত্তার ধারণার পার্থক্য তিনি স্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

তিনি শৈবাগমের মধ্যে পরা মুক্তির একটি পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বসুগুপ্তের নিকট এই পথ অজ্ঞাত ছিল। এই পথ হইল 'প্রত্যভিজ্ঞা', যে নামে এই সম্প্রদায় পরিচিত এবং মাধব তাঁহার 'সর্ব দর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থে এই সম্প্রদায়কে উক্ত নামে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বসুগুপ্ত মুক্তির কেবলমাত্র তিনটী পথের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। শাম্ভব, শাক্ত ও আণব। এই তিনটী মার্গই যোগ-নিষ্ঠ। সোমানন্দ বসুগুপ্ত হইতে আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি মুক্তির এক নূতন পথ দেখাইলেন। তিনি দেখাইলেন স্বাতন্ত্র্যযুক্ত জীব স্বয়ং তাহার ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যে পরম সংকে উপলব্ধি করিতে পারে। তাঁহার মতে স্বাতন্ত্র্যই জীবের আন্তর সত্তা, ইহা অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকে, স্বাতন্ত্র্য ও জীবের আন্তর সত্তা এক, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইলেই উক্ত অজ্ঞান দূর হয়।

উৎপলাচার্য সোমানন্দের একজন শিষ্য ছিলেন। সোমানন্দ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতবাদের সহিত বৌদ্ধ মতবাদেরও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংক্ষেপে সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধ মতবাদ পূর্ণভাবে জাগ্রত ছিল। সুতরাং অদ্বৈত শৈববাদের প্রতি সমালোচনাও খুব সম্ভবত হইয়াছিল। উৎপলাচার্য ইহার উত্তরে 'ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা কারিকা', ও আরও দুইখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলি প্রধানভাবে অদ্বৈত শৈববাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ প্রতিবাদ সকলের উত্তর।

উৎপলাচার্যের প্রশিষ্য অভিনব গুপ্ত (৯৬০ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন একজন অগাধ চিন্তাশীল

ব্যক্তি ও অতি উচ্চস্তরের একজন অধ্যাত্ম সাধক। তিনি তাঁহার নিজের বিষয়ে প্রায়ই বলিয়াছেন, এবং তাঁহার কতকগুলি গ্রন্থের রচনার স্থান ও তারিখের বিষয়ও তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি অদ্বৈত শৈববাদের সঠিক কোন ইতিহাস রচনা করিতে সমর্থ হই, তাহা প্রধানতঃ অভিনবগুপ্তের গ্রন্থগুলির এই বৈশিষ্ট্যের জন্য।

অভিনব গুপ্তের[৮] একচল্লিশ খানা গ্রন্থের বিষয় আমরা জানি। তিনি যে আরও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহারও যথেষ্ট যুক্তিসম্মত প্রমাণ দেখান যায়। তিনি চৌষট্টিখানা অদ্বৈত শৈবাগমের ভাষ্য রচনা করিয়া তাঁহার কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং 'তন্ত্রালোক' নামক একখানি স্বতন্ত্র মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, এই গ্রন্থে তিনি অদ্বৈত শৈবাগমের রহস্য, ধর্ম, আচার ব্যবহার, জ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়াছেন। পরে তিনি সমালোচনা সাহিত্য ও নাট্যশাস্ত্রের উপর ভাষ্য রচনা করেন। তিনি আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোকের' উপর 'লোচন' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া অধ্যাত্মের দ্যোতক হিসাবে ধ্বনির প্রতিষ্ঠা করেন, এই ধ্বনি অভিধেয়, তাৎপর্য ও লাক্ষণিক এই তিন প্রকার শব্দার্থ হইতে ভিন্ন। তিনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর 'অভিনব ভারতী' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এই গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার এই মতবাদ এই বিষয়ের পরবর্তী সকল লেখকই স্বীকার করিয়াছেন। সর্বশেষে (১) 'প্রত্যভিজ্ঞা কারিকা' (২) ও তাহার টীকা অদ্বৈত শৈববাদের সম্বন্ধে উৎপলাচার্যের এই দুইখানি গ্রন্থের উপর তিনি ভাষ্য রচনা করেন। মূলগ্রন্থ ও ইহার উপর ভাষ্যসকল প্রত্যভিজ্ঞা সম্প্রদায়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

অভিনব গুপ্তের অবদান বিশেষভাবে দুইটি—প্রথমতঃ তিনি আগম শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ করিয়া চৌষট্টিখানা প্রামাণ্য শৈবাগমের সহিত অদ্বৈত শৈববাদের সকল দিকের যোগসূত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অদ্বৈত শৈববাদের ভিত্তির উপর ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পূর্বে কাশ্মীরে প্রাচীন ন্যায়ের দৃষ্টি হইতে শ্রীসংকুক ও অদ্বৈত বেদান্তের দিক দিয়া ভট্টনায়ক রসবোধের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অভিনবগুপ্ত উভয়ের ব্যাখ্যার অযৌক্তিকতা পরিষ্কার প্রমাণ করিয়াছেন।

অভিনবগুপ্তের পরে আমরা এই মতবাদের কতকগুলি সংক্ষিপ্তসার দেখিতে পাই যেমন ক্ষেমরাজ প্রণীত (১০৪০ খৃষ্টাব্দ) 'প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়' ও প্রাচীন আচার্যদিগের

গ্রন্থের উপর যোগরাজকৃত (১০৬০ খৃষ্টাব্দ) অভিনব গুপ্তের পরমার্থসারের টীকা, জয়রথ প্রণীত তন্ত্রালোকের টীকা ও ভাস্কর-কণ্ঠ (১৭০০) প্রণীত ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা বিমর্শিণীর উপর টীকা।[৮]

৩। কাশ্মীর শৈববাদের প্রবণতা সমূহ

কাশ্মীর শৈববাদে একটি রহস্যাভিমুখী প্রবণতা আছে। ইহার মতে 'সৎ' পূর্ণ অদ্বৈত ;ইহা অনির্বচনীয়, সুতরাং কোন বিধেয়ই ইহাতে প্রযোজ্য নহে ; 'সৎ' জীবাত্মার অনুরূপ অনির্বচনীয় স্বরূপের সহিত একাত্ম। জীবের পক্ষে পরমাত্মার সহিত পূর্ণ মিলন স্তরে পৌছান সম্ভব; এবং বিভিন্ন সাধনস্তরের মধ্য দিয়া উক্ত মিলন উপলব্ধির বিভিন্ন উপায়ের বিষয়ও কাশ্মীর শৈববাদে উল্লিখিত আছে। তত্ত্বের দিক দিয়া এই মতবাদ যুক্তিবাদী। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য ইহা ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে এবং এই অভিজ্ঞতা যে একমাত্র স্বীকৃত অধ্যাত্মতত্ত্বের ভিত্তিতেই হওয়া সম্ভব তাহা এই বিশ্লেষণের মধ্যে প্রকাশ পায়। একদিক দিয়া ইহা শব্দ-প্রামাণ্য-বাদী—কারণ ইহার তত্ত্বগুলিকে যুক্তিসিদ্ধ করিবার পরে উক্ত তত্ত্বগুলি যে ধর্মশাস্ত্র অনুমোদিত তাহাও এই মতবাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা স্বাতন্ত্র্যবাদী কারণ এই মতবাদের চরম অধ্যাত্মতত্ত্ব হইল স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন ইচ্ছা।

কাশ্মীর শৈববাদে বিভিন্ন দার্শনিক ভাবধারার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। ইহা বিরোধী মতবাদ সকলকে গ্রহণ করিয়া একটি সুসংবদ্ধ মতবাদে সমন্বয় করিবার জন্য ঐ মতবাদ সকলকে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করে। প্রয়োজনীয় রূপান্তর সাধন করিয়া ইহাতে সাংখ্যের পুরুষ ও চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ও বেদান্তের মায়া স্বীকৃত হইয়াছে ও সেই সংগে আরও দশটি তত্ত্ব যুক্ত করা হইয়াছে। এই দশটি তত্ত্বের মধ্যে পাঁচটি অলৌকিক তত্ত্ব ও অবশিষ্ট পাঁচটি জীবের কঞ্চুক বা আবরক বলিয়া অভিহিত হয়। সকলের উর্দ্ধে ইহা চরম সৎকে সংস্থাপিত করে ও উক্ত তত্ত্বগুলি যে কেবলমাত্র ইহার প্রকাশ তাহাই প্রদর্শন করে।

ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বীকৃত প্রতি ভারতীয় মতবাদের আত্মার ধারণা অনুসারে কাশ্মীর শৈববাদে প্রতিটি মূল্যবান ভারতীয় চিন্তাধারার যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কাশ্মীর শৈবদের মতে নৈয়ায়িক ও অন্যান্য সম্প্রদায় স্বীকৃত জ্ঞান ও সুখ-দুঃখাদির কেবলমাত্র আশ্রয়রূপ আত্মা, এই জগতের স্থিতিকালে বুদ্ধির সহিত এক এবং প্রলয়কালে ইহা শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে। বিজ্ঞানবাদী[৯] বৌদ্ধদের স্বীকৃত ভাবপ্রবাহরূপ আত্মা ধারণা বুদ্ধির রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। উক্ত আত্মা প্রতি পূর্ববর্তী ধারণা হইতে অতীতের

সংস্কার গ্রহণ করে। চিদ্রূপী আত্মা বা বিমর্ষবিহীন শান্ত শুদ্ধ চিৎ বা প্রকাশরূপ বেদান্তের ব্রহ্ম কাশ্মীর শৈবদের তৃতীয় তত্ত্ব সদাশিবের[১০] সহিত এক। হেগেল[১১] যেইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার সহিত ইহাকে অনেকটা এক। হেগেল তাঁহার প্রথম প্রধান দার্শনিক মতবাদের যৌক্তিক তত্ত্ব অন্যান্য সত্তা ; পারমেনাইডিস্ কল্পিত চরম সৎএর সহিত এক হিসাবে দেখিয়াছেন। হেগেলের দ্বিতীয় যৌক্তিক তত্ত্ব 'অ-সৎ', ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 'শূন্য'এর ধারণার সহিত এক হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ইহা সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতবাদ ও বহুবাদকে বর্জন করে, কারণ তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতেছে সাধারণ লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর ন্যায় এবং তাহারা আত্মা এবং অনাত্মার মধ্যে এক অনতি-ক্রমণীয় ব্যবধানের সৃষ্টি করে। বিষয়ী এবং বিষয় যদি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাহারা স্বরূপতঃ ভিন্ন পরস্পর বিরোধী এবং স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে বলা যায় যে বার্কলে তাঁহার মতবাদে ঈশ্বরের যে স্থান স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা বাদ দিলে বার্কলের দর্শন হইতে কাশ্মীর শৈববাদ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কাশ্মীর শৈববাদে ভাবের ক্ষণিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপতঃ বিষয়ীর ক্ষণিকত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। কারণ বিষয়ীর স্বরূপতঃ যদি কোন স্থায়ী সত্তা না থাকিত, ও ইহা যদি বিষয়ি-নিরপেক্ষ ভাবধারা সকলকে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম না হইত এবং প্রতিটি ভাবের উদয় ও বিলয়ের সংগে সংগে যদি বিষীয়র উদয় ও বিলয় ঘটিত, তাহা হইলে একটি সংযুক্ত সমগ্রসত্তার চেতনার পক্ষে অপরিহার্য ধারণা সমূহের একত্রীকরণ অসম্ভব হইয়া পড়িত। বাসনার দিক দিয়া বিজ্ঞানবাদিদের বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা এই মতবাদে অস্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে বাহ্যার্থানুমেয়বাদিদের আভাসবাদও অস্বীকৃত হইয়াছে, বাহ্যার্থানুমেয়বাদিরা কাণ্টের ন্যায় বাহ্যার্থ স্বীকার করে সত্য কিন্তু এই বাহ্যার্থ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের অন্তর্ভূত নহে, ইহা প্রত্যক্ষ-কার্য হইতে কেবলমাত্র অনুমেয়। জ্ঞান ক্ষেত্রে বৈচিত্র ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে ইহা একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা হইতে পারে কিন্তু ইহা বাস্তব জীবন ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কারণ বাস্তব জীবন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভিন্ন কেবলমাত্র অনুমেয় লইয়া চলিতে পারেনা (ন হি নিত্যানুমেয়েন কশ্চিদ্ ব্যবহারঃ)[১২]

কাশ্মীর শৈববাদে বেদান্তের অদ্বৈত ভাববাদ অস্বীকৃত হইয়াছে, বেদান্তমতে মায়া 'সৎ'ও নহে, 'অসৎ'ও নহে, সুতরাং ইহা অনির্বচনীয়। বেদান্তী যখন বলেন যে এই

অনির্বচনীয় মায়াই ব্যবহারিক জগতের কারণ, তখন তাহার উক্তি সবিরোধ মায়া[১৩] সম্পর্কে এই স্পষ্ট উক্তিই কি মায়ার সংজ্ঞা নহে ?

রহস্য-বাদ : রহস্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুত্তরই 'সৎ' হইতে ইহা সকলের উর্দ্ধে। সুতরাং এই এবং অনুত্তর সকল প্রকার সীমাবধারণমুক্ত। ইহা অনির্বচনীয়! কোন প্রকার প্রশ্ন বা উত্তর ইহার সম্পর্কে সম্ভব নহে।[১৪] ইহাকে 'ইদং' বা 'তৎ', 'নেদং বা 'ন তৎ' কিছুই বলা যায় না। বদ্ধ জীব ইহাকে ধারণাই করিতে পারে না, সুতরাং কোন বচন ইহার বিষয়ে সম্ভব নহে। ইহা এমন কোন পদার্থ নহে যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় বা যাহার বিষয়ে কোন ধারণা করা যায়, ইহা বেলমাত্র উপলব্ধিগম্য। যে কোন বাক্য বা বাক্যাবলী-আমরা ইহার সম্পর্কে ব্যবহার করিনা কেন, আমরা ইহার প্রকৃত স্বরূপের ধারণা দিতে অসমর্থ হই।

কেবলমাত্র অধ্যাত্ম-সাধনাদ্বারা উক্ত 'সৎ'কে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এই সাধনা সকল জীবাত্মাকে নানা প্রকার মলমুক্ত করিবার বিভিন্ন উপায়। এই মলগুলিই জীবাত্মার কঞ্চুক বা আবরকএর নির্ম্মায়ক এবং এই গুলিই জীবাত্মা সকলকে বিশ্বাত্মা হইতে পৃথক করিয়া রাখে।

কাশ্মীর শৈববাদে সত্তা ও তাত্ত্বিক[১৫] সত্তা পৃথক নহে, অনুত্তর উভয়ত 'বিশ্বাতীর্ণ' ও 'বিশ্বময়'। এই ক্ষেত্রে কাশ্মীর শৈববাদে তাত্ত্বিক ও রহস্যের ধারণার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য রহস্যবাদিরাও এইরূপ প্রচেষ্টা করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ প্লোটাইনাসের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে, তিনি বলিয়াছেন যে "একম্' এতদূর বিশ্বোত্তীর্ণ যে ইহা বাক্য ও মনের অতীত; এমন কি ইহাকে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বের ভাষায়ও উল্লেখ করা যায় না, ইহা কেবল মাত্র রহস্যের আনন্দের মধ্যে উপলব্ধিগম্য। অন্যদিকে তিনি উক্ত 'একম'কে সকল বস্তুর আধার ও চরম অধিষ্ঠান বলিয়াছেন এই দিক হইতেই সকল প্রকার জাগতিক বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য প্রতিভাত হয়।

বস্তুতান্ত্রিক-ভাব-বাদ : দার্শনিক চিন্তাধারার বিষয়-তন্ত্র ও ভাব-তন্ত্র দুইটী বিরোধী চিন্তাধারা। বিষয়-তন্ত্র মনোনিরপেক্ষ স্বয়ং অস্তিত্বশীল সত্তার বিশ্বাসী, কিন্তু ভাব-তন্ত্রে সকল বস্তুই মনো-নিষ্ঠ এবং কোন কিছুর স্বরূপতঃ মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। কাশ্মীর শৈববাদে উক্ত দ্বিবিধ বিরোধী ভাবধারার সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। সেই কারণেই ইহাকে "বিষয়-তান্ত্রিক ভাববাদ[১৬] বলিয়া অভিহিত করা যায়।

বিষয়িনিষ্ঠ ভাব-তন্ত্রের মতে অভিজ্ঞতার বিষয়ি ব্যক্তি মনঃসৃষ্ট, এবং বাহ্যার্থ-অনুমেয় বাদিদের মতে বাহ্যসত্তা কেবলমাত্র অনুমেয়, এই উভয় মতবাদের বিরুদ্ধে

কাশ্মীর শৈববাদে এইরূপ স্বীকৃত হইয়াছে যে বিষয়-নিষ্ঠ জগতের বিষয়ি নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এবং ইহা অ-ব্যবহারিক জ্ঞানে প্রকাশ্য হইতে পারে। কাশ্মীর শৈবদের মতে বৈষয়িক জগৎ অবশ্যই মনোনিষ্ঠ কিন্তু এই মন ব্যক্তির মন নহে। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় ব্যক্তি-মনের উপর যাহাই সক্রিয় থাকে তাহা কোন জড় বিষয় নহে, ইহা মনেরই প্রকাশ, এই মন কোন ব্যক্তির মন নহে। অস্তিত্ব-শীল জগৎ মহেশ্বরের ইহার অস্তিত্ব ব্যক্তিক বিষয়ের পূর্বে ও পরে অবস্থান করে।

বিষয়ি-নিষ্ঠ-ভাবতন্ত্রে ও বিষয়-স্বতন্ত্র-তন্ত্রে যৌক্তিক বলিয়া যাহা স্বীকৃত হয় বিষয়-তান্ত্রিক ভাববাদেও তাহা স্বীকৃত। বিষয়ি-নিষ্ঠ ভাববাদে জড়বাদ অসম্ভব ও সৎ মনোনিষ্ঠ, বিষয় স্বতন্ত্র তন্ত্রে বৈষয়িক জগতের ব্যক্তি-মনো-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। বিষয়-তান্ত্রিক ভাববাদে উক্ত উভয় মতবাদই স্বীকৃত হইয়াছে, এই মতবাদ অনুসারে যে জগতে আমরা বাস করি তাহা মহেশ্বরের আভাসমাত্র, সুতরাং ইহা মনোনিষ্ঠ। এই জগতের বক্তি মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, সুতরাং ইহা 'সৎ'।

বিশ্বাত্মা বা (মহেশ্বর) : কাশ্মীর শৈববাদে জীবাত্মা ও মহেশ্বর একাত্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এই মতবাদে মহেশ্বরের ধারণা ব্যক্তিক মনের বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিক মন বিশ্লেষণে দুইটী অনস্বীকার্য্য বৈশিষ্ট্য লক্ষিতহয় :—

১। ব্যক্তিক মন বাহ্য-বিষয়ের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে বা বাহ্য-বিষয় কর্তৃক প্রভাবিত হয় সত্য, কিন্তু অতীত সংস্কারের চিহ্নরূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার প্রভাবও কম নহে। এই অংশে মন কতকগুলি প্রতিচ্ছবির আধার বা অধিষ্ঠান, এই প্রতিচ্ছবি সকল মানসিক বৃত্তি, প্রত্যক্ষ কালে এই বৃত্তিসকল বাহ্য বিষয় কর্তৃক সৃষ্ট হয়, স্মরণ, কল্পনা ও স্বপ্নের সময়ে অতীত সংস্কাররূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা দ্বারা প্রভাবিত হয়। মনের উপর বাহ্য প্রভাব মোমের উপর ছাপএর ন্যায় নহে, ইহা স্বচ্ছ দর্পণের উপর বাহ্য বিষয়ের প্রতিবিম্বের ন্যায় বলা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে দর্পণের উপমান প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে যে মনের ক্রিয়া মনের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে, ইহাতে মনের স্বতন্ত্র সত্তা বা শুদ্ধতা নষ্ট হয় না। মন ও দর্পণ উভয়ের মধ্যে এই অংশে পার্থক্য স্বীকার করিতে হইবে যে দর্পণের পক্ষে প্রতিবিম্বনের জন্য বাহিরের আলোর প্রয়োজন আছে। অন্ধকারের দর্পণের কোন প্রতিবিম্বন হয় না। কিন্তু মন স্বয়ং-প্রকাশ। বাহ্য প্রকাশক[১১] ভিন্নও ইহা স্বাধীনভাবে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং মনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহা স্বয়ং প্রকাশসত্তা, ইহা প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে এবং উক্ত প্রতিবিম্ব সকলকে নিজের সহিত একাত্ম হিসাবে প্রকাশ করে। এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে 'প্রকাশ' বলিয়া অবিহিত হইয়া থাকে।

২। মনের অপর বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহা শুদ্ধভাবে নিজে নিজেকেই জানে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যেমন রহস্য ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ; ইহা বিভিন্ন ভাব সকলকে স্বাধীন ভাবে বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করিতে পারে ; এই সকল বাসনা সংস্কার আকারে মনে সঞ্চিত থাকে, এবং স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে স্বেচ্ছাক্রমে পূর্বাবস্থার পুনরাবৃত্তি করিতে পারে যেমন স্মরণ ক্ষেত্রে, ইহা কল্পনায় সম্পূর্ণ নূতন কিছুও সৃষ্টি করিতে পারে। এই বৈশিষ্ট বিশেষভাবে 'বিমর্শ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এই বিমর্শ মনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মানব মন স্বয়ং-প্রকাশ ও স্বয়ং-জ্ঞ। ইহা স্বয়ং-প্রকাশ এবং জানে যে ইহা স্বয়ং প্রকাশ। যে হেতু জীব ও মহেশ্বর একাত্ম, সেই হেতু অনুত্তরও স্বয়ং-প্রকাশ ও স্বয়ং-জ্ঞ।

অনুত্তরেও যে 'বিমর্শ' বা আত্মচেতনা আছে স্বীকৃতি 'চরম সৎ' এর ধারণা শৈবদের এই সম্পর্কে শৈব মতবাদকে অ-দ্বৈত বেদান্ত হইতে পৃথক করিয়াছে। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম বা 'চরম সৎ' শান্ত ও নিষ্ক্রিয়। ইহা স্থিতিশীল, গতিশীল নহে। ইহা স্বয়ং-প্রকাশ কিন্তু স্ব-চেতন নহে, কারণ সকল প্রকার চেতনাই ক্রিয়াত্মক এবং চেতন-ক্রিয়া পূর্ণ স্মৃতি বা পরম শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়। ব্রহ্ম নির্বিকল্পক, সুতরাং স্ব-চেতনার স্বীকৃতি বিকল্পের স্বীকৃতি এইরূপ ভাবনা করিয়াই অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্ম কেবলমাত্র 'চিন্মাত্র',[১৮] বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

অপর দিকে শৈবরা বলিয়া থাকেন যে 'অনুত্তর' কেবল চিন্মাত্র নহে, ইহা স্বয়ং-জ্ঞও বটে, এবং সেই সঙ্গে শৈবরা ইহাও স্বীকার করেন যে ইহা নির্বিকল্পক। শৈবরা নিম্নোক্তভাবে নিজেদের মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

বিকল্প বলিতে বুঝায় (১) বহুকে একত্বে পরিণত করা। কোন ব্যক্তি যখন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষকে জটিল বস্তুতে পরিণত করে তখন এই একত্রীকরণ দেখা যায়। (২) অনিদং হইতে ইদং রূপ জ্ঞেয় বিষয়কে পৃথক করা[১৯], (৩) উদ্দীপকের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা এবং একাটী ব্যাখ্যাকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা ও অপর সকলকে ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করা। সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই বহুকে সংযুক্ত করিবার জন্য অথবা পরস্পর হইতে পৃথক করিবার জন্য বিকল্প বহুর চেতনার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে সকল ক্ষেত্রে একাধিক চেতনার অভাব সেই সকল ক্ষেত্রে বিকল্প সম্ভব নহে। বিশ্বাতীত স্ব-চেতনা তত্ত্বকে স-বিকল্পক বলা যায় না, কারণ এই ক্ষেত্রে আত্মার অতিরিক্ত কিছুই নাই, সত্তা হইতে পৃথক করিবার মত কোন অ-সত্তা এই ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

মধ্য হইতে বিশ্ব মন সব কিছুই নিজের সৃষ্টি করে। ইহা সর্বদাই সক্রিয় এবং কোন

অবস্থাতেই নিষ্ক্রিয় নহে। ইহার ইচ্ছা-রূপ[২০] বৈশিষ্ট্যের স্থূল অভিব্যক্তি এই বিশ্বের প্রকাশ, এই বিশ্ব কেবলমাত্র সীমিত বিষয় নহে, বদ্ধ বিষয়ী সমূহ ইহার অন্তর্ভূক্ত। তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে ইহা হইল স্বয়ং-চেতন ইচ্ছা, উক্ত ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার পারিভাষিক নাম মহেশ্বর।

কাশ্মীর শৈব-বাদ বুঝিতে হইলে প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য ও পরিকল্পনা হইতে অনুমেয় প্রথম কারণ রূপ ঈশ্বরের সাধারণতঃ যে ধারণা পাওয়া যায় সেই ঈশ্বর ও মহেশ্বরের ধারণা যে এক নহে এই সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে। কারণ ইহার মতে বিশ্বমন ইচ্ছা-রূপে মহেশ্বর প্রকৃতির ধারার অন্তর্ভূক্ত। জগৎ কোন পরিনিষ্পন্ন ফল নহে, বাহিরের শিল্পীরূপ ঈশ্বরের উপর যাহা আরোপিত হইতে পারে, প্রকৃতির অগ্রগতি মহেশ্বরেরই[২১] ক্রিয়া।

ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য-বাদ :—তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীর শৈববাদে বিশ্ব-মন হইল সার্বিক স্বতন্ত্র ইচ্ছা[২২]। স্বতন্ত্র ইচ্ছা বিমর্শের সহিত এক, পার্থক্য কেবল মাত্র এই অংশে যে বিমর্শের ক্ষেত্রে বিষয় বিষয়ীর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই, কিন্তু স্বতন্ত্র ইচ্ছা ক্ষেত্রে এই বৈপরীত্য আছে। উক্ত ইচ্ছার বিষয় হইল সার্বিক 'ইদং', ইহা সকল প্রকার বিকল্পমুক্ত, ইহাকে কোন বড় শিল্পীর উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টির পূর্বে তাঁহার মানস পটে উদিত বাসনার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। শান্ত সমুদ্রে তরঙ্গ সৃষ্টির পূর্বে ইহা যেন অব্যক্ত আবেগ[২৩]। ইহা দৈহিক যন্ত্রের ব্যক্ত আলোড়নের পূর্বে অব্যক্ত গুঞ্জন ধ্বনির ন্যায়। ইহা বিশ্ব-মনের সেই অংশ যাহার ক্রিয়ার ফলে যাহা বিশ্বমনের সহিত একাত্ম তাহা বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা কোন অন্ধ আবেগ নহে, ইহা এক সচেতন শক্তি যাহা প্রকৃতির অন্ধ শক্তির মধ্য দিয়া প্রকটিত হয়। ইহা মুক্ত, কারণ অস্তিত্বের জন্য ইহা অপর কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নহে। বস্তুতঃ এমন কোন অস্তিত্বশীল বস্তু নাই যাহা অস্তিত্বের জন্য ইহার উপর নির্ভরশীলনহে। ইহা অপরিণামী, যদিও মনে হয় ইহার যেন পরিবর্তন হয়। ইহা এক মহাসত্তা, কারণ ইহা যাহা হইতে ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করিলে তাহাই হইতে পারে (ভবনে স্বতন্ত্রতা)। ইহা দৈশিক ও কালিক সীমার উর্ধ্বে, কারণ দেশ ও কাল ইহারই প্রকাশ। ইহা কার্য-কারণ সম্বন্ধের অতীত, কারণ কার্য-কারণ তত্ত্ব ব্যবহারিক, ইহা পারমার্থিক নহে। যদি বিশ্বমনের উপর কোন ব্যক্তিত্ব আরোপ করি, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উক্ত স্বতন্ত্র ইচ্ছাই তাহার হৃদয় (হৃদয়ং পরমেষ্ঠিনঃ)।[২৪]

সুতরাং স্বাতন্ত্র্য-বাদ মতে বিশ্ব স্বতন্ত্র ইচ্ছা-রূপ অনুত্তর হইতে, অনুত্তরের মধ্যে, অনুত্তর কর্তৃক সব কিছুই প্রকাশিত হয় বা প্রকাশ পায়। এক বা বহু বা একের মধ্যে

বস্তু, বিষয়ী এবং বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ যাহাই হউক না কেন; সবই চরম সংকল্প উক্ত ইচ্ছার প্রকাশ।

শৈব ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য-বাদের সহিত শোপেন হাওয়ারের ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য বাদের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ (১) ব্যবহারিক স্তরে যাহা জানা যায় তাহা আভাস মাত্র[২৫]। কারণ কান্টের ন্যায় ইহা স্বীকার করে যে ব্যবহারিক স্তরে বিষয়ী যে বিষয় জানে, তাহা স্বরূপে বিষয় নহে, কালাদি অবচ্ছেদের মধ্য-দিয়া প্রকাশিত আভাস মাত্র। (২) স্বয়ং-সৎ বস্তুই ইচ্ছা[২৬] স্বেচ্ছাকৃত কর্ম ও ভাবাবেগের মধ্যে আমরা ইহাকে অনুভব করি। কারণ উক্ত মতে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে গভীর ভাবাবেগের[২৭] মধ্যে মনের সকল প্রকার বাহিরের আকর্ষণ তিরোহিত হয় তাহাতেই ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য সাক্ষাৎ পরে অনুভূত হয়। (৩) দৈহিক কর্ম ও স্থূলদেহ ইচ্ছার সাক্ষাৎ স্থূল প্রকাশ[২৮]। কারণ এই মতে কর্ম বহিঃ প্রকাশিত ইচ্ছা[২৯] ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং এই মতে ইহাও স্বীকৃত যে যোগী ইচ্ছা করিলে জড় পদার্থ ভিন্নও জড় বস্তু প্রকাশ করিতে পারেন। (৪) সুতরাং ইচ্ছাই সব কিছুর অন্তঃপ্রকৃতি[৩০] প্রতি আভাসের সার বস্তু। (৫) তাত্ত্বিক[৩১] জ্ঞান সত্যের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিন্তামূলক বিমূর্ত জ্ঞানের স্তরে 'জগৎ আমারই কল্পনা বা ধারণা' এই সত্যের আবিষ্কারই তাত্ত্বিক জ্ঞান। কারণ শৈব মতবাদ অনুসারে এই জীবনেই জীবের মুক্তি (জীবন মুক্তি) 'সর্ব বিশ্ব আমারই প্রকাশ'[৩২] 'সর্বো মায়ং বিভবঃ' এই উক্তির উপলব্ধি ভিন্ন আর কিছু নহে।

কিন্তু ইহা শোপেন হাওয়ারের ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য-বাদ হইতে এই অংশে পৃথক যে তাঁহার মতে ইচ্ছা অচেতন।[৩৩] তিনি বুদ্ধি হইতে ইচ্ছাকে পৃথক করিয়াছেন, তাঁহার মতে বুদ্ধি কেবল মাত্র মস্তিষ্কের ক্রিয়া এবং যে প্রকৃতি বুদ্ধি নিরপেক্ষ ভাবে সক্রিয় হইতে পারে তাহার সহিত অভিন্ন। শোপেন হাওয়ার এইরূপ অবাস্তবতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রাক্লব্ধ প্রতিজ্ঞা সকলকে এমন কোন কিছুর সহিত এক করিয়া দেখিয়াছিলেন যে ব্যবহারিক স্তরে যাহার বিষয়ে তাহার সাক্ষাৎ প্রতীতি হয়, ইহার আরও কারণ এই যে সম্পূর্ণ বিষয়তা বিবর্জিত শুদ্ধ বিষয়ীর চেতনা[৩৪] অসম্ভব, কান্টের এই মতবাদ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন; অধিকন্তু তাঁহার মতবাদ হেগেলের বিরুদ্ধে গড়িয়া উঠিয়াছিল।[৩৫]

কাশ্মীর শৈববাদ যোগীদের হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের মতে বিষয়-বিবর্জিত আত্মোপলব্ধি সর্বাপেক্ষা সন্দেহাতীত অভিজ্ঞতা, সুতরাং ইচ্ছাকে বুদ্ধি হইতে পৃথক করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন নাই। কাশ্মীর শৈববাদে

ইচ্ছা মনেরই একটি ক্রিয়া বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই মতবাদের সহিত আমাদের ব্যবহারিক স্তরের ইচ্ছার মিল আছে।

আভাস-বাদ :—তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে কাশ্মীর শৈব মতবাদ যেমন স্বাতন্ত্র্য-বাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অভিব্যক্ত বহুর দিক দিয়া ইহাকে আভাস-বাদ বলা যায়। অনুত্তর তত্ত্বে সকল বৈচিত্র্যই সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ, ঠিক যেমন পরিণত বয়স্ক ময়ূরের দেহে যে সকল বিচিত্র বর্ণ দেখা যায়, ময়ূরের অণ্ডের মধ্যে সেই সকল বর্ণই অভিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এই উপমা 'ময়ূরাণ্ডরস-ন্যায়' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

অনুত্তর কর্তৃক বা অনুত্তর হইতে যাহা কিছু অভিব্যক্ত বা নির্গত হয়, তাহাই আভাস বা অভিব্যক্তি বলিয়া কথিত হয়; ইহার সহজ কারণ এই যে, যাহাই অভিব্যক্ত হয় তাহাই সীমাবদ্ধ সুতরাং যাহাই প্রকাশ পায় তাহাই আভাস; যাহা বহিরিন্দ্রিয় বা আন্তর মনের নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়; সুষুপ্তি ও গভীর নিদ্রায় ইন্দ্রিয় ও মন যখন নিষ্ক্রিয় থাকে সেই সময়ে যে সকল বিষয়ে আমরা সচেতন থাকি তাহাই আভাস; অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে যে কোন অস্তিত্ব-শীল বস্তু, বিষয়ীই হউক বা বিষয়ই হউক, জ্ঞানের প্রকরণ বা স্বয়ং জ্ঞান যাহাই হউক না কেন যাহার সম্পর্কে কোন প্রকার ভাষা প্রয়োগ করা সম্ভব তাহাই আভাস।

আভাস-বাদীর মতে যাহাই প্রকাশ পায় তাহাই আভাস বা সীমিত প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বিষয় যেমন আকার বিশিষ্ট বস্তু-সমষ্টি, বিষয়ীও ঠিক সেইরূপ উভয়ই বহুর মধ্যে ঐক্য। যাহা কিছু পৃথক পৃথক ভাবে জ্ঞাত হয় তাহাদের তদনুসারেই কোন আকারের নাম হইয়া থাকে। ঐক্যের অনুভবের পশ্চাতে অবস্থিত থাকে বহুর প্রত্যক্ষ এবং একটি সাধারণ ভিত্তি থাকার জন্য এই অনুভব হইয়া থাকে। যে বিশেষ নির্মায়ক অংশ প্রত্যক্ষকারীর দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া প্রতিভাত হয়।

সুতরাং আভাস-বাদীর মতে সাধারণ জ্ঞেয়-বিষয় একটি সমগ্র বস্তু বিশ্লেষণকারী জীবের সংস্কার, দৃষ্টিভঙ্গী ও জানিবার ক্ষমতা অনুসারে ইহার নির্মায়কগুলি ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আমরা যদি কোন ঘটের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সাধারণভাবে যদিও ইহা একটি সমগ্র বস্তু বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যতগুলি শব্দবিভিন্ন বিশ্লেষণ-কারী প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা কর্তৃক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে উক্ত বস্তু সম্পর্কে ব্যবহৃত হইতে পারে ততগুলি আভাসই ইহাতে বর্তমান। একজন সাধারণ প্রত্যক্ষকারীর নিকটে উক্ত বস্তু গোলকত্ব, জড়ত্ব, বহুত্ব,

রুক্ষত্ব ও স্থায়িত্বরূপ কতকগুলি আভাসের সমষ্টি। কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিকের নিকটে সেই একই ঘট কতকগুলি পরমাণু ও তড়িৎ কণার সমষ্টি।

আভাস-বাদীর মতে সাধারণ প্রত্যক্ষের বিষয় কতকগুলি আভাসের সমষ্টি বা রূপ। ইহার প্রত্যেকটি আভাস জানিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জ্ঞাত স্বরূপতঃ প্রতিটি নির্মায়কই এক একটি আভাস, এই প্রতিটি আভাসই এক একটি সামান্য এবং জ্ঞানের দূরবর্তী সীমার নির্দেশ দিয়া থাকে।

বিষয়ীও একই ধরণের একটি। ইহা কতকগুলি অবচ্ছেদ বা আকার বিশিষ্ট বস্তু জ্ঞান ও ক্রিয়ার আকার, যেমন কালাদি, উদ্দেশ্যপরায়ণতা সংস্কার, যৌক্তিক পটভূমি, দেহ, প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয়াদি ও বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটিই বিষয়ীর স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নহে। প্রতি ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা-ক্ষেত্রে ইহার নির্মায়ক অংশগুলি ভিন্ন। আণবমল অভিহিত মলযুক্ত আন্তর সত্তা, স্বচেতনতা এই পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্থায়ী বৈশিষ্ট্য।

আভাসবাদীর মতে জ্ঞানক্রিয়া দ্বিবিধ—(১) প্রাথমিক, (২) মাধ্যমিক। প্রাথমিক জ্ঞানক্রিয়া বিভিন্ন আভাসের প্রতিবিম্ব গ্রহণ ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে লক্ষিত হয়, ইহাতে আন্তর শব্দের উদয় হয়। সুতরাং প্রাথমিক জ্ঞানের সাধারণ জ্ঞেয় বিষয় একটি সামান্য, বৈয়াকরণেরা যাহাকে কোন শব্দ সমষ্টির প্রকাশের অর্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহার সহিত বহুলাংশে এক। স্বরূপতঃ ইহা দেশ-কালিক বদ্ধতা মুক্ত। পরবর্তী জ্ঞানক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জ্ঞাত বিচ্ছিন্ন আভাস সকলকে সংবদ্ধ করে, কোন একটি রূপ বা অবয়ব সৃষ্টির জন্য ইহা দায়ী।

আভাসবাদের দৃষ্টিতে সুন্দরের অভিজ্ঞতা :—আভাস-বাদীর মতে আভাস একটি সামান্যের ধারণা। প্রমাতার কোন বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যখন এই সামান্য দেশ ও কালের সংস্পর্শে আইসে, ইহা তখন বিশেষ হিসাবে প্রকাশ পায়। সুতরাং প্রমাতার পশ্চাতে যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রমাণ-ক্রিয়া প্রাথমিক স্তরেই শেষ হইয়া যায় এবং দেশ ও কালের অবচ্ছেদের সহিত তাহার প্রমেয় বিষয়কে যুক্ত করিতে হয় না। সুতরাং সৌন্দর্য-রসিকের চেতনায় যে বিষয় উপস্থিত থাকে তাহা একটি সামান্য কারণ সে নিষ্কামভাবে ইহাকে গ্রহণ করে।

আভাস-বাদী ইহাও মনে করেন যে বিষয়ীর কোন নির্দিষ্ট নির্মায়ক বলিয়া কিছু নাই প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ইহার নির্মায়ক সকল বিভিন্ন। সুতরাং

সৌন্দর্য-রসিক ব্যক্তিসত্তা রসিকত্ব, সহৃদয়ত্ব, প্রতিভা, ভাবনা ও তন্ময়ী-ভবন-যোগ্যতা প্রভৃতি নির্মায়ক দ্বারা গঠিত।

রস ও শিল্পানুরাগ নিয়ন্ত্রিত সৌন্দর্যানুভূতির মনোভাব বিষয়ীর একটি মূল্যবান উপাদান। ইহা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই অংশে পৃথক যে এই ক্ষেত্রে কার্য করিবার বাসনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। সুন্দর দৃশ্য ও শব্দের কল্পলোকে কিছুকাল বাস করিবার আকাঙ্খা এই ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে। রসিক ব্যক্তি যখন সুন্দর বিষয়ের ভাবনা করেন তখন তাহার ফলে বিষয়ীর আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়। ইহা দৃশ্যমান ঘটনার সহিত মূল অংশের তন্ময়তার সৃষ্টি করে।

যেমন কোন নাটকীয় দৃশ্য যখন কোন সৌন্দর্যের বিষয় হয়, তখন দ্রষ্টার মনে ব্যক্তিত্বের স্থান পরিস্থিতির কেন্দ্রস্থল কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং এই ভাবেই তিনি উহার সহিত একাত্ম হইয়া পড়েন। সুতরাং ঠিক নাটকের নায়কের ন্যায়ই রসিক-ব্যক্তি নাটকীয় পরিস্থিতিতে অভিভূত হইয়া থাকেন। রস, যৌক্তিক পটভূমি ও প্রতিভার সাহায্যে পরে তিনি দত্ত দৃশ্যাবলীকে সংবদ্ধ ও রূপায়িত করেন ও পরিশেষে অবচেতন স্তর হইতে প্রাপ্ত যথোপযোগী সংস্কার সকলকে সমন্বিত করিয়া কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই স্তরে সহৃদয়তার খেলা আরম্ভ হয়, চিত্তে যথাযোগ্য সাড়া জাগে এবং আবেগময় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এই আবেগময় ভাবস্তর হইতে সৌন্দর্যরসিক ধীরে ধীরে সাধারণী ভাব স্তরে যাইয়া পৌছান। রাজা দুষ্মন্ত অনুসৃত পলায়মান মৃগের যে বর্ণনা কালিদাস ছবির ন্যায় অঙ্কন করিয়াছেন (গ্রীবা-ভঙ্গাভিরামম), অভিনব গুপ্ত[৩৯] সেই দৃশ্যকেই সাধারণী ভাবস্তরের সৌন্দর্য তত্ত্বের সঠিক স্বরূপ ও পদ্ধতি দেখাইবার জন্য বাছিয়া লইয়াছেন। তাহা এইরূপ :—

সৌন্দর্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিভাত পলায়মান ভীত হরিণ দেশ ও কালিক অবচ্ছেদমুক্ত, সুতরাং এই দৃশ্য নৈর্ব্যক্তিক। সেই কারণেই এই ক্ষেত্রে 'ভীত' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা হইতেছে বলা যাইতে পারে। এই 'ভীত' এর পশ্চাতে ভীতির হেতুর নির্দেশ আছে। কিন্তু পূর্বোক্ত দৃশ্যে ইহার সহিত কোন প্রকার বিষয়তার সংস্পর্শ না থাকায় 'ভীতং' 'ভয়ম' এ রূপান্তরিত হইয়াছে। এই নির্বিশেষক 'ভয়ং' সাধারণী ভাবস্তরের বিষয়ের দিক। এই নৈর্ব্যক্তিক চেতনার ক্ষেত্রে দর্শকের হৃদয় বিদীর্ণ-প্রায় বলিয়া অনুভূত হয় এবং তাহার দৃষ্টির সম্মুখে উক্ত দৃশ্য যেন নৃত্যপরা বলিয়া প্রতিভাত হয়।

সুতরাং আভাস-বাদী অভিনব গুপ্ত সামান্যীকরণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিবার জন্য ভট্টনায়ক পরিকল্পিত দ্বৈতশক্তি অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি আভাসবাদের ভাষায় সাধারণী ভাবস্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হেগেলের মতবাদের সহিত উক্ত সাধারণী ভাবস্তরের তুলনা করিলে দেখা যায় যে হেগেলের মতে 'ভয়ং'এর সাধারণী ভাব[৩৭] দর্শকের মানসিক ভীতি সম্পর্কিত বিষয়ের সহিত বিয়োগান্ত ঘটনার ভাবাংশ সম্পর্কিত। 'ভীত' রূপ বিশেষ প্রতিজ্ঞা যতখানি ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিনির্মুক্ত হয় 'ভয়ং'এর সাধারণী ভাব ততখানি শুদ্ধতা লাভ করে। সুতরাং অন্যায়ের শাস্তিপ্রদান রূপ বিশেষ ক্ষেত্র প্রকাশিত কোন বিয়োগান্ত ঘটনা স্বয়ং পরিশুদ্ধ হয় ফলে ন্যায়ের অপ্রতিহত ক্ষমতা, দৈব-বিচারের নিরপেক্ষতা ও নেতির নেতিকে[৩৮] প্রকাশ করে। কিন্তু অভিনব গুপ্তের মতে কোন বিশেষ ভীতির শোধন স্বয়ং ভয়েরই নির্দেশ দিয়া থাকে। কলা-কৌশলের মধ্য দিয়া ইহা যতটা বিষয়তা সম্পর্ক বিনির্মুক্ত হয় ততটা ইহা পরিশুদ্ধতা লাভ করে।

অভিনব গুপ্ত আরও দেখাইয়াছেন যে, সৌন্দর্য অভিজ্ঞতার চরম স্তর আনন্দ নহে, ভট্টনায়ক বেদান্তের ধারা অনুসরণ করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, কারণ আনন্দ স্তরে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। তিনি উক্ত চরম স্তরকে 'বিমর্শ', 'স্পন্দ', 'স্ফুরতা' বা চমৎকার প্রভৃতির সহিত এক বলিয়াছেন।

গ্রন্থবিবরণী

অভিনবগুপ্ত : অভিনব ভারতী

পাণ্ডে কে. সি. : অভিনবগুপ্ত : অ্যান হিষ্টরিক্যাল অ্যাণ্ড ফিলজফিক্যাল ষ্টাডি

ভাস্করকণ্ঠ : ভাস্করী

অভিনবগুপ্ত : ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা বিমর্শিনী

চ্যাটার্জী, জে. সি. : কাশ্মীর শৈবইজম্

ক্ষেমরাজ : প্রত্যভিজ্ঞ হৃদয়

হেগেল : ফিলজফি অব ফাইন আর্ট

হেগেল : ফিলজফি অব রাইট

অভিনবগুপ্ত : পরিত্রিংশিকা বিবরণ

কহ্লণ : রাজতরঙ্গিণী

সোমানন্দ : শিবদৃষ্টি

কল্লট : স্পন্দকারিকা

বরদরাজ : শিব সূত্রবার্তিক

ভর্তৃহরি : বাক্যপদীয়ম্

শোপেন হাওয়ার : ওয়ার্লড্ অ্যাজ উইল্ অ্যাণ্ড আইডিয়া।

দ্রষ্টব্য

১। অভিনবগুপ্ত : অ্যান হিস্টরিক্যাল অ্যাণ্ড ফিলজফিক্যাল স্টাডি পৃঃ ৭৭-৮০
২। ঐ পৃঃ ১৭০
৩। কাশ্মীর শৈবইজম্ পৃঃ ৪১
৪। রাজতরঙ্গিণী ১, ১৭৫
৫। শিবসূত্রবার্তিক, ১
৬। বাক্য পদীয়ম্, comm. ৯৭
৭। ভাস্করী ২০৫-৬
৮। অভিনবগুপ্ত : পৃঃ ২২-২৩
৯। প্রত্যভিজ্ঞ হৃদয় ১৬-১৮
১০। ভাস্করী ১৪
১১। লজিক পৃঃ ১৫৯-৬১
১২। ভাস্করী ২২২
১৩। ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা বিমর্শিনী
১৪। পরত্রিংশিকা বিবরণ
১৫। প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়
১৬। অভিনবগুপ্ত পৃঃ ১৯৪-৬
১৭। ভাস্করী ২৪১-৪
১৮। ভাস্করী ১০
১৯। ভাস্করী ৩০২-৪
২০। ভাস্করী ২২৬-৯
২১। ভাস্করী ৩৩২
২২। শিবদৃষ্টি ১৯
২৩। শিবদৃষ্টি ১২-১৬
২৪। ভাস্করী ২৫৫
২৫। ওয়ার্লড অ্যাজ উইল অ্যাণ্ড আইডিয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ৭-৯
২৬। ঐ ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৯
২৭। শিবদৃষ্টি ২য় ও SK ৩৯
২৮। ওয়ার্ল্ড অ্যাজ উইল অ্যাণ্ড আইডিয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩০
২৯। ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞ বিমর্শিনী ২য় খণ্ড ১৮৩
৩০। ওয়ার্ল্ড অ্যাজ উইল অ্যাণ্ড আইডিয়া ২য় খণ্ড পৃঃ ৪০৭
৩১। ঐ ১ম খণ্ড পৃ ১
৩২। ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা বিমর্শিনী ২য় খণ্ড ২৬৩

৩৩। ওয়ার্ল্ড অ্যাজ উইল অ্যাণ্ড আইডিয়া ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১১

৩৪। ঐ ১ম খণ্ড পৃঃ ৬

৩৫। ঐ ২য় খণ্ড পৃঃ ৩১

৩৬। অভিনবভারতী ১ম খণ্ড পৃঃ ২৮০

৩৭। ফিলজফি অব ফাইন আর্ট ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯২

৩৮। ঐ পৃঃ ৯০-৬

গ। বীর-শৈবদর্শন

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় সম্প্রতি যে সকল বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সিন্ধুনদের উপত্যকায় যে জাতি বাস করিত তাহাদের সভ্যতা অতি উচ্চ-স্তরের ছিল। সেইগুলি হইতে বুঝা যায় যে, সিন্ধু উপত্যকার এই লোকেরা খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত Chalcolitic যুগে বাস করিত এবং তাহারা যে অত্যুন্নত সংস্কৃতির অধিকারী ছিল তাহাতে ইন্দো-আর্য সভ্যতার প্রভাবের লেশমাত্র দেখা যায় না। স্যার জন মার্শাল তাঁহার "মহেঞ্জোদাড়ো ও সিন্ধুসভ্যতা" নামক গ্রন্থে সিন্ধু-উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীদের ধর্মের বিবরণ দিতে গিয়া একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উহারা মাতৃ-দেবতা শক্তি এবং একটি পুরুষ দেবতা শিবের পূজা করিত। এই পুরুষ দেবতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, তাঁহার তিনটি চক্ষু আছে এবং বিভিন্ন মোহরে, মূর্তিতে, ক্ষোদিত লিপিতে এবং বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রতীকে তাঁহাকে মহাযোগী বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। এইজন্য মার্শাল তাঁহাকে শিবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন যে ইহা ব্যতীত তাহারা লিঙ্গ, সূর্য, বিভিন্ন প্রাণী, বৃক্ষ ইত্যাদি পূজা করিত। স্যার জন মার্শাল বলেন—"সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের ধর্মে এমন অনেক কিছু আছে যাহার সমতুল্য ব্যাপার অন্য দেশেও দেখা যায়। প্রত্যেক প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম এবং বহু ঐতিহাসিক ধর্ম সম্বন্ধেও ইহাই সত্য। কিন্তু সমগ্রভাবে লইলে তাহাদের ধর্মের প্রকৃতি এত বিশিষ্টভাবে ভারতীয় যে আধুনিক জীবন্ত হিন্দুধর্মের, অন্তত, হিন্দুধর্মের সেই অংশের যাহা সর্বপ্রাণবাদ এবং শিব এবং মাতৃদেবতার উপাসনা—সাধারণ পূজা পদ্ধতির এই দুইটি প্রভাবশালী শক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহার সহিত উহার পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন।"[১]

সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে স্যার জন মার্শালের এই সকল সিদ্ধান্তকে খুব প্রামাণিক বলিয়া মনে করা হয় না। মাদ্রাজের নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বলেন[২] "মাতৃদেবতা, লিঙ্গপূজা, বৃক্ষ ও প্রাণী পূজা সম্বন্ধে মার্শালের ব্যাখ্যাসমূহ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইলেও যে পুরুষ দেবতাকে তিনি ঐতিহাসিক শিবের আদিম রূপ বলিয়া মনে করেন

তাঁহার সম্বন্ধে মতবাদসমূহ অনেকটা কষ্টকল্পিত এবং এই অধ্যায়ের অন্যান্য অংশে যাহা বলা হইয়াছে নিশ্চয়ই সেগুলির ন্যায় আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করে না। একটিমাত্র অস্পষ্টভাবে ক্ষোদিত মোহরের উপর নির্ভর করিয়া যে সুদূর পুরাতন যুগে ঐ মোহরটি নির্মিত হইয়াছিল সেই যুগে শিবের সমস্ত বিশিষ্ট বিশেষণ যথা মহেশ, মহাযোগী, পশুপতি এবং দক্ষিণা মূর্তি কল্পিত হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করা কঠিন", সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি ক্ষোদিত লিপিগুলির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দ্বারা সমর্থিত হওয়া আবশ্যক। ফাদার হেরাস ঠিক তাহাই করিয়াছেন। তিনি ক্ষোদিত লিপিগুলির যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে নিঃসন্দেহে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের শিব এবং শক্তি এই দুইটি প্রধান উপাস্য দেবতা ছিল।

ফাদার হেরাস তাঁহার দীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে[৩] অতীব সাফল্যের সহিত সিন্ধু-উপত্যকার চিত্রাকার ধ্বনিব্যঞ্জক জটিল ক্ষোদিত লিপি-জালের মর্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন। তিনি সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা কাহারা এ বিষয়ে সমীচীন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। যদিও মার্শাল এবং তাঁহার সহকর্মিগণ কতকগুলি যুক্তি দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে মহেঞ্জোদাড়োর অধিবাসিগণ নিশ্চয়ই আর্যজাতির পূর্ববর্তী তাহা হইলেও তাঁহারা তাহাদের জাতি সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলেন নাই। ফাদার হেরাস ঐ সকল চিত্রাকার ধ্বনিব্যঞ্জক ক্ষোদিত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে মহেঞ্জোদাড়োর অধিবাসিগণ নিশ্চয়ই জাতিতে দ্রাবিড়ীয়। ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে যে কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে দ্রাবিড়রা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী ছিল এবং আদিম মানব-জীবনের সর্বযুগে এবং ক্রম বিকাশের সকল স্তরে ধীরে ধীরে তাহাদের নিজ সভ্যতার বিকাশসাধন করিয়াছিল। গোবিন্দাচার্য স্বামী বলেন, "এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে ভুল করা হইবে না যে বন্যায় যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল দক্ষিণ ভারত তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল। লেমুরিয়ায় যে সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহা লেমুরিয়া জলমগ্ন হইবার পর দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতই বন্যার পরবর্তী মনুষ্যজাতির প্রথম আশ্রয় হইয়াছিল। লোকসংখ্যার ঘনত্ব অনুযায়ী দ্রাবিড়দের ভারকেন্দ্র মহীশূরের নিকটে কোন স্থানে আছে, সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে দক্ষিণ ভারতই এই সকল লোকের আদি নিবাস ছিল এবং ঐ স্থান হইতেই তাহারা উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।"[৪] ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন "মানব-সভ্যতা সুমের দেশ হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল হল' এর এই মতবাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা প্রমাণিত হইবে যে সভ্যতা ভারতবর্ষেই প্রথমে

উদ্ভূত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ আদিম দ্রাবিড় জাতির মধ্যেই ইহা প্রথম দেখা দিয়াছিল। তাহার পর ইহা মেসোপটেমিয়ায় গিয়াছিল, এবং ব্যাবিলন ও প্রাচীন সংস্কৃতি যাহা বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি তাহার জন্ম দিয়াছিল।"[৫]

মহেঞ্জোদাড়োর ক্ষোদিত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিলে আমরা আদিম ভারতীয় অথবা দ্রাবিড়ীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারি। ঈশ্বরের নাম "ইরুবন" অর্থাৎ "এক সদ্বস্তু[৬]" হইতেই বুঝা যায় যে ঈশ্বরকে স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়াই মনে করা হইত। পুরুষ-দেবতা আন অর্থাৎ যোগাসনে উপবিষ্ট শিব মুর্তির প্রতিকৃতিসমূহ হইতে বুঝা যায় যে যোগসাধনা সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কিরূপ ছিল। স্ত্রী দেবতাকে আম্মা অথবা শক্তি বলা হইত। সমস্ত দ্রাবিড় ভাষাতেই আম্মা শব্দ মাতাকেই বুঝাইয়া থাকে এবং মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় এই মাতৃদেবতার বহুসংখ্যক মৃণ্ময়ীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা লিঙ্গকে মিথুনের অর্থাৎ শিবরূপী পুরুষশক্তি এবং শক্তিরূপী স্ত্রীশক্তির মিলনের প্রতীকরূপেই গণ্য করিত। ফাদার হেরাস বলেন "শেষ করিবার পূর্বে মহেঞ্জোদাড়ো এবং কর্ণাটকের মধ্যে যে যোগসূত্র প্রাচীনকাল হইতে এখনও পর্যন্ত বর্তমান তাহার উল্লেখ অবশ্য করিতে হইবে। কান্নাড় দেশের আধুনিক লিঙ্গায়ৎগণ তাহাদের গৃহের প্রাচীরে একটি চিহ্ন অঙ্কিত করে কিন্তু তাহারা উহার অর্থ জানে না বলিয়া মনে হয়। এই প্রতীকটি হইতেছে, X, মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার ক্ষোদিত লিপিসমূহে এই প্রতীকটি প্রায়ই পাওয়া যায়। ইহাকে কুডু বলিয়া পাঠ করিতে হয় এবং ইহার অর্থ 'মিলন'। বীরশৈব সম্প্রদায়ের ধর্মবিষয়ক মতবাদসমূহে[৭] পুরুষ ও স্ত্রী-সত্তার মিথুনের যে ধারণার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতীক সম্ভবতঃ তাহাকেই নির্দেশ করিতেছে।"

শৈব-আগমসমূহে ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক সত্তার মিলনের চিহ্ন হিসাবে লিঙ্গের ধারণা লক্ষণীয় এবং ইহা এত প্রাচীন যে আরণ্যক যুগেও ইহাকে পাওয়া যায়। শক্তিকে স্ত্রী এবং শিবকে পুরুষের সহিত অভিন্ন প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা অপবিত্র ভ্রান্তিমাত্র। বস্তুতঃ ইহারা পুরুষ কিংবা স্ত্রী এমন কি ক্লীবও নয়। শৈব আগমসমূহ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে শিব পরমতত্ত্বের সদ্‌রূপ আর শক্তি ইহার চিদ্‌রূপ। শিব এবং শক্তি যেন পরমতত্ত্বের বিশ্বাতীগ ও বিশ্বানুস্যূত, স্থির এবং চলমান, নির্ব্যক্তিক এবং ব্যক্তিক রূপ। কিন্তু আগমের ঋষিগণ এই দুইটি রূপের চিরন্তন বিরোধিতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী এই দুইটি রূপকে একের পর আর একটি লইয়া নয়, কিন্তু যেখানে তাহারা দ্রবীভূত হইয়া একত্বে পরিণত হয় এবং একটি সম্পূর্ণাঙ্গ সমগ্র সত্তার দুইটি পরস্পর সম্পূরক বিরোধিরূপের আকারে দেখা দেয় সেই অধ্যাত্ম

অনুভূতির শীর্ষে উঠিয়াই তাঁহারা ইহা করিয়াছিলেন। সুতরাং লিঙ্গ শিব এবং শক্তির পরম সত্তার সদরূপ অর্থাৎ শিব এবং চিদরূপ অর্থাৎ শক্তির ঐক্যবিধায়ক সত্তা[৮]।

কামিক হইতে বাতুল পর্যন্ত শৈব আগমগুলির সংখ্যা আটাশ। এই আগমসমূহের শেষাংশগুলিতে বীরশৈব মতবাদ এবং ক্রিয়াকাণ্ড লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশগুলিতেই বিশেষ কিংবা মিশ্রিত বর্ণনা আছে এবং এইগুলিতে বীরশৈব আধ্যাত্মিক সাধনার বৈশিষ্ট্যগুলির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। শৈব আগমসমূহের শেষাংশগুলিতেই বীরশৈব মতবাদের বিবরণ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া এরূপ মনে হইতে পারে যে আগমগুলির যে মূলকাণ্ড হইতে অন্যান্য শৈব মতবাদের জন্ম হইয়াছে, বীরশৈব দর্শন উহারই একটি স্বাভাবিক শাখামাত্র। কিন্তু বহু প্রাচীন আগমযুগে বীরশৈব দর্শন পূর্ণ বিকশিত মতবাদ রূপে বর্তমান ছিল ইহার সম্ভাবনা কম। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান কর্ণাটকের প্রখ্যাত পণ্ডিত বাসবের প্রতিভার ফলেই বীরশৈব দর্শন একটি পূর্ণ বিকশিত মতবাদে পরিণত হইয়াছে, একটি স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং শৈব দর্শন হইতে নির্দিষ্ট-ভাবে পার্থক্য লাভ করিয়াছে।

ঐতিহ্যানুসারে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বর্তমান ছিলেন এমন পাঁচজন বিখ্যাত আচার্য বীরশৈব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই আচার্যগণ সম্পূর্ণভাবে পৌরাণিক ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্যগণের তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের ধর্মকে সুপ্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উৎসাহে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব রহস্যাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য হইতেছে এই যে, কান্নাড় সাহিত্যে তাঁহাদের সম্বন্ধে অতি স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কান্নাড় এবং তেলেগু ভাষায় রচিত কতকগুলি গ্রন্থ তাঁহাদের দ্বারা রচিত বলিয়া মনে করা হয়, তাঁহারা বীরশৈব ধর্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যে সকল মঠ তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয় সেগুলির এখনও অস্তিত্ব আছে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে বীরশৈব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিলে অতিরঞ্জন করা হয়। ঐতিহাসিক গবেষণায় কান্নাড় পণ্ডিতগণের অধ্যাবসায় পূর্ণ এবং পক্ষপাত-হীন চেষ্টা নিঃসন্দেহে ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, এই তথাকথিত আচার্যগণ বীরশৈব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নহেন, কারণ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাসবের সমসাময়িক ছিলেন, এবং কেহ কেহ এমন কি তাঁহার পরেও বর্তমান ছিলেন। অধ্যাপক সখড়ে ঠিকই বলিয়াছেন "বাসবের পরবর্তী আচার্যগণ বাস্তব জগতের লোক ছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্যগণের তাঁহার জীবন হইতে স্বতন্ত্র কোন সত্তা ছিলনা। কোন জৈন রাজার রাজ্যে বাসব ঐ রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়াও বীরশৈব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রায় দশ

বারো বৎসরের মধ্যেই ইহার খ্যাতি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। যে কেহ ধর্মীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধ এবং বিশাল কোষাগার বচনশাস্ত্রের (বাসব এবং তাহার সহকর্মিগণের বচন সমূহের সঙ্কলন) পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া দেখিবেন তিনি নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে ইহা মৌলিক রচনা। ইহার মধ্যে এমন একটি নূতনত্ব এবং তেজস্বিতা আছে যাহা অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহিত্যে থাকিতে পারে না। বাসবের নেতৃত্বে শরণদের জীবন এবং আধ্যাত্মিকতার শক্তিতে ইহা পূর্ণ। ইহা কেবল মাত্র বাসবের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া ছিল।"[১]

ধর্মরূপে বীরশৈববাদের উৎপত্তি হইয়াছে বাসব হইতে। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান 'শিবানুভব মন্তপ' অর্থাৎ ধর্মানুভূতির আবাস হইতেই এই ধর্ম গতিবেগ লাভ করিয়াছে। মানুষ যাহাতে বিশ্বে তাহার স্থান কোথায় তাহা বুঝিতে পারে, তদানীন্তন ক্ষয়িষ্ণু ধর্মে যাহাতে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়, স্ত্রীলোকেরা যাহাতে পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করে এবং স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে, জাতিভেদ বিলুপ্ত হয়, যাহাতে লোকেরা বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা এবং কায়িকশ্রম করিতে উৎসাহিত হয় এবং জীবন-যাত্রার সরলতা এবং ঐকান্তিকতা বৃদ্ধি পায় প্রধানতঃ সেইজন্যই বাসব আনুমানিক ১১৬০ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বাসবের কর্মক্ষেত্র যেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনই বিশাল ছিল এবং এই প্রতিষ্ঠান তাঁহার প্রতিভার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা যে কেবল মাত্র তাঁহার ব্যবহারিক বিজ্ঞতার পরিচয় দেয় তাহা নয়, তাঁহাতে যে বুদ্ধি, হৃদয়াবেগ ও কর্মক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহারও পরিচয় দেয়। কারণ তিনিই শৈব ধর্মকে বর্ণাশ্রমের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং উহাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াছিলেন।

এই বীরশৈব ধর্ম সম্প্রদায়কে লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ও বলা হয়, কারণ ইহার অনুগামীরা তাহাদের শরীরে চরম তত্ত্বের প্রতীক লিঙ্গ চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে। শরীরে লিঙ্গ চিহ্ন ধারণ করা বীরশৈব ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহা যে কেবল লিঙ্গায়ৎ ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য সূচিত করে তাহা নহে, ইহা লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়কে একটি পৃথক ধর্ম-সম্প্রদায় বলিয়াও চিহ্নিত করে। বিশুদ্ধ ধর্মকে কোন কিছু পাইবার চেষ্টা অপেক্ষা একটা বিশেষ মনোভাব বলিয়া মনে করাই ঠিক, অথবা ইহা এমন একপ্রকার মনোভাব যাহার ফলে আমরা যাহা কিছু মহৎ এবং পবিত্র তাহাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। যাহা কিছু মহৎ এবং পবিত্র লিঙ্গ হইতেছে তাহার মূর্ত প্রতীক, এবং লিঙ্গায়ৎ ধর্ম এমন একটি সাধনা যাহার একটি বিশেষ বিশ্বাস, মার্গ এবং দর্শন আছে, জীবনকে দৈবভাবে মণ্ডিত করিতে হইবে, ইহাতেই ইহার বিশ্বাস নিহিত, ষট্‌স্থল অর্থাৎ ছয়টি মানসিক স্তরের বিন্যাস ইহার মার্গের বৈশিষ্ট্য, ইহার দর্শনকে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত বলা হয়।

মানুষ একটি বৈচিত্র্যময় জগতে জন্মগ্রহণ করে এবং সে উহার অংশ। এই জগতের অনির্দিষ্ট সম্ভাবনা কি আছে তাহা জানিবার চেষ্টা করিবার জন্য কোন প্রেরণা অনুভব করিবার পূর্বে সে ইহাকে একটি নির্দিষ্ট বাস্তব তথ্য বলিয়া জানে। কিন্তু মানুষের বিকাশের একটা স্তরে এই প্রেরণা আসে এবং তাহার ফল হইতেছে দর্শন। আমাদের প্রত্যক্ষানুভবের জগৎকে, অর্থাৎ যে জগৎকে আমরা বস্তুতঃ গঠিত হইতে দেখিয়াছি তাহাকে, ইহার সম্ভাবনা অনুযায়ী পুনর্গঠিত করিবার যে সজ্ঞান প্রচেষ্টা দর্শন তাহা হইতেই উদ্ভূত এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই সমস্যার নিশ্চয়ই বিভিন্ন রূপ থাকিবে। এই সকল বিভিন্ন রূপ যেভাবে ক্রমান্বয়ে মানবসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহার ইতিহাসই দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস।

প্রাচীন কালে এই সমস্যার যে রূপটি মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল তাহা হইতেছে সত্তা বা অস্তিত্বের সমস্যা। প্রাচীন কালের ব্যক্তিদের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রতিভাত জগতের পশ্চাতে যে চরম তত্ত্ব আছে তাহা আবিষ্কার করা, পরবর্তী স্তরে এই সমস্যা আরও সূক্ষ্ম আকারে দেখা দিয়াছিল, তখন জগতের চরম উপাদান কি তাহা আর জিজ্ঞাসার বিষয় রহিল না, কিন্তু দার্শনিকদের নিকট জ্ঞানরূপ মানস ব্যাপারই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইয়া উঠিল। এই সময়েই তাঁহারা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন যে প্রত্যক্ষ জগতের সত্তার সমস্যা কি তাহা সমাধান করিতে হইলে এমন কি তাহা স্থির করিতে হইলে জ্ঞানের সম্ভাব্যতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদের এই ধারণা হইল যে দর্শন শাস্ত্রের প্রথম করণীয় হইল এই যে জ্ঞান হইতে গেলে কি কি প্রয়োজন তাহা অনুসন্ধান করা।

অর্থাৎ, তাঁহারা মনে করিলেন যে জ্ঞানের ক্ষমতা পরীক্ষাতেই দার্শনিকদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। ভারতবর্ষে উপনিষদিক ঋষিগণের এবং গ্রীসে প্লেটো এবং আরিষ্টট্‌লের দার্শনিক প্রচেষ্টা এই সমস্যা সমাধানেই ব্যাপৃত ছিল।

মানুষ সচেতন জীব। মানুষের চৈতন্য মূলতঃ স্বয়ং সচেতনতা। মানুষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভবের সরলতম প্রক্রিয়াও কেবলমাত্র পরিবর্তন নয় কিন্তু পরিবর্তনের জ্ঞান। সংক্ষেপত, মানুষের অনুভব কেবলমাত্র মানস জড় ঘটনাবলী দ্বারা গঠিত নয়, কিন্তু এই সকল ঘটনার পরিচিতি দ্বারা গঠিত। সুতরাং আমরা যাহা অনুভব করি তাহা কখনই তথ্যমাত্র নয় উহা পরিচিতি দ্বারা গৃহীত তথ্য। কাশ্মীর শৈবমতানুসারে বস্তুর পরিচিতি বা প্রত্যভিজ্ঞা ঘটার অর্থ হইতেছে যে জ্ঞানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ই আছে তাহাতে কতকগুলি সম্বন্ধের সমন্বয় ঘটিতে হইবে। যে জ্ঞেয়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ তাহা সম্পূর্ণভাবে আমাদের মনের বাহিরের বস্তু নয়, কারণ আমরা উত্তরোত্তর ইহার

সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হই, এবং যতদূর আমরা বুঝিতে পারি এই জ্ঞানের কোন শেষ নাই। সুতরাং জ্ঞান হইতে গেলে যে আত্মা বা বিষয়ী বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব অথবা সম্পূর্ণ সুসংহত জগৎ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগৎকে সাক্ষাৎভাবে অনুভব করে তাহার ক্রিয়া আবশ্যক। যে আধ্যাত্মিক সদ্বস্তুর অস্তিত্বের জন্য সম্বন্ধের অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়, অথচ যাহা নিজে কোন সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে না তাহার সাহায্যেই এরূপ জগতের ব্যাখ্যা হইতে পারে। ইহা এক সর্বনিরপেক্ষ কালাতীত স্বয়ং-সংবিত্ত রূপ সদ্বস্তুই ঈশ্বর। বীরশৈব দর্শনে ইহাকেই স্থল অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ চেতন পুরুষ বলা হয়।

বীর শৈব দার্শনিকেরা[১০] স্থলকে সমগ্র প্রতিভাত জগতের আদিকারণ এবং আধার এবং সমস্ত জাগতিক ক্রমবিকাশের মূল এবং চরমগতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ জগৎ অথবা প্রতিভাত জগৎ শাশ্বত পূর্ণ এবং স্বয়ং-সিদ্ধ সংবিৎ অথবা স্থলের অপূর্ণ কালিক প্রকাশ। স্থল হইতেছে সেই অসীম এবং শাশ্বত স্থিতি যাহাতে সমস্ত গতি এবং বিচার বিলীন হইয়া যায়। এই শাশ্বত সত্তার চরম প্রকাশ হইতেছে স্ব-সংবিৎ যাহা কাণ্ট বর্ণিত জ্ঞানের ঐক্যের সহিত অভিন্ন। এখন প্রশ্ন উঠে—যে জ্ঞানের ঐক্য হইতে কাণ্ট তাঁহার দর্শন আরম্ভ করিয়াছেন তাহাই কি বাস্তবিক চরম তত্ত্ব ? বৌদ্ধিক প্রকারের এই যে চরম আকার তাহার কি স্বয়ং সিদ্ধ সত্তা আছে ? শুদ্ধ চিন্তাই কি বিষয়ী ? জ্ঞান কি যে জানে তাহাকে অপেক্ষা করে না ? আমাদের বিশ্বাস তাহা করে। জ্ঞানের সমন্বয় সাধক ঐক্য একটি যৌক্তিক তত্ত্ব, ইহা অযৌক্তিক তত্ত্ব, অহং অর্থাৎ যাহা এক হইয়াছে তাহার অপেক্ষা করে। এই অহং তাকে নিজ স্বরূপে বিবেচনা করিলে ইহাকে এমন একটি দ্রব্য বলিয়া মনে করিতে হয় চিন্তা বা জ্ঞান যাহার আকার। বহু দার্শনিক এই দ্রব্য রূপ অহং কে অবজ্ঞা করিয়াছেন এবং আকার কে দ্রব্যজ্ঞান করিয়া দ্রব্য এবং আকারের প্রভেদ অতিক্রম করিয়াছেন এরূপ মনে করিয়াছেন। কিন্তু বীর শৈব দার্শনিক ঐক্যবিধায়ক চিন্তারূপ আকার বা প্রজ্ঞাকে চিন্তা হইতে ভিন্ন কোন উপাদান হইতে পৃথক করেন না। তিনি বলেন যে চরম, সর্বানুস্যূত উপাদানাংশই আমাদের নিকট সৎরূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই শিব বা অহং তত্ত্ব, জ্ঞান উহাকে বাস্তব আকার দান করে, জ্ঞানই শক্তি। ইহা অহং নয় কিন্তু নিজ সম্বন্ধে অহংএর জ্ঞান। দর্শন যদি জগতের যৌক্তিক ব্যাখ্যা হয়, এবং স্ব-সংবিৎ যদি ইহার আধার এবং গতি হয় তাহা হইলে স্থল অথবা স্বয়ং সিদ্ধ সংবিৎ সত্তা এবং জ্ঞান, শিব এবং শক্তি, অহং এবং অহং এর নিজের জ্ঞান এই দুইকেই প্রকাশ করে।

দর্শনের সর্বস্বীকৃত মূলমন্ত্র হইতেছে 'নিজেকে প্রথমে জান।' আত্মা নিজেকে কি

বলিয়া জানে? ইহা নিজেকে জ্ঞাতা বলিয়া জানে। আত্মা যে কোন বিষয়কেই জানুক না কেন ইহা তাহার সহিত নিজেকে জ্ঞাতা বলিয়া জানে। যে কোন বিষয় জ্ঞানের সহিত এই আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হউক না কেন এই আত্মজ্ঞানের আকার হইতেছে, "আমি জ্ঞাতা, বিষয় জ্ঞানের পরিবর্তন সমূহের মধ্যে আত্ম-জ্ঞানই একমাত্র সার্বিক তত্ত্ব যাহা অপরিবর্তিত থাকে। ইহাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া কোন কিছুই জ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আত্মজ্ঞানরূপসূত্র দ্বারাই যেন সকল জ্ঞান গ্রথিত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপরেই জগৎ-জ্ঞানের সমগ্র অট্টালিকা দাঁড়াইয়া আছে। সত্তার সমগ্র উপাদানের জ্ঞানরূপ আকারের উদ্‌ঘাটন ভিন্ন জগৎ প্রক্রিয়া আর কি? সুতরাং আমরা বলিব যে আমাদের যে সমগ্র প্রকৃতি সমগ্র জাগতিক প্রক্রিয়ার সহিত একত্রাবস্থান করে তাহার বিকাশের পক্ষে হওয়ার ন্যায় জানারও প্রয়োজন আছে। সেই জন্যই আত্ম-জ্ঞানের মধ্যে উপাদানাংশ এবং আকারাংশের মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে।

আত্ম-জ্ঞানে উপাদান এবং আকারের পার্থক্য বিলুপ্ত হয় এ কথা বীর শৈব দার্শনিক স্বীকার করিতে চান না, কারণ তিনি আত্ম-জ্ঞানের একটি উপাদানগত দিক এবং একটি আকারগত দিক, একটি সম্ভাব্য একটি বাস্তব অংশের মধ্যে পার্থক্য করিয়া থাকেন। চরমতত্ত্বের সম্ভাব্য এবং উপাদান অংশকে তিনি শিব বলিয়া থাকেন, বাস্তব এবং আকারগত অংশকে শক্তি বলিয়া থাকেন। শিব এবং শক্তির, সত্য এবং জ্ঞানের মধ্যে কোন অখণ্ডনীয় বিরোধিতা তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়ে না, পরন্তু তিনি শক্তি শিবেরই আত্মাস্বরূপ, জ্ঞান সত্তার মধ্যেই নিহিত আছে এই কথা বলিয়া উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি শিব এবং শক্তির মধ্যে এক ঐক্যাত্মকসাহচর্য দেখিতে পান এবং ইহাকেই শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈত বলিয়া থাকেন।

বীর শৈব দার্শনিকের মতে, সমস্ত সদ্বস্তুর ঐক্যের মধ্যে উপাদান অপেক্ষা আকারের অংশের গুরুত্ব অধিক। এই দিক হইতে দেখিলে সৃষ্টি অথবা প্রকাশরূপ প্রক্রিয়া যথার্থ ভ্রমাত্মক নয়। তিনি বিশেষ কোন যুক্তি না দেখাইয়া মায়াবাদ অথবা ভ্রমবাদ অস্বীকার করেন এবং শিবের যে বিমর্শশক্তির কোন কিছু করিবার, কোন কিছু নষ্ট করিবার অথবা অন্য কিছু করিবার ক্ষমতা আছে জগৎ সৃষ্টি তাহারই ফল এইরূপ প্রমাণ করেন। জগৎ যে মিথ্যা এই মত তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, জগৎ যদি চৈতন্যসত্তার ভ্রমাত্মক প্রতিভাস হয় তাহা হইলে এই জগৎ শূন্যগর্ভ মিথ্যাবস্তু হইবে। যে জগতের সত্যতা সকল প্রকার প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা কি করিয়া চৈতন্যের মিথ্যা বিবর্ত হইতে পারে? এইভাবে তিনি সাংখ্যসম্মত পরিণাম

বাদও খণ্ডন করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে তিনটি বিভিন্ন গুণদ্বারা গঠিত প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে সমগ্র জগতের বিকাশ এই আদি কারণ হইতেই হইয়া থাকে। কিন্তু খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের ভাষ্যকার মরিতন্তাদার্য এই তিন গুণের এক মৌলিক ব্যাখা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই তিনটি গুণ "সঞ্জাত বস্তু" এবং চরমতত্ত্বের জ্ঞানরূপ আকার এবং ইচ্ছাশক্তিরূপ আকার এই দুইয়ের প্রতীয়মান বিচ্ছেদ হইতেই ইহাদের সৃষ্টি। সুতরাং এই মতানুসারে এই তিনটি গুণকে চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জড়ের মূল আকার বলিয়া মনে করা যায় না, কিন্তু ইহারা প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী অহন্তার প্রতিফলনের বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ মাত্র। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে মরিতন্তাদার্য এই তিনগুণের বীর শৈব দর্শনানুমোদিত ব্যাখ্যা দিয়া সাংখ্য-দর্শনসম্মত প্রকৃতিবাদ এবং অদ্বৈত-বেদান্তসম্মত মায়াবাদ এই দুইটিকেই পরিহার করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ নূতন পথ বাছিয়া লইয়াছেন।

বীর শৈব দার্শনিকেরা স্থলের ধারণা হইতে তাঁহাদের দর্শন আরম্ভ করিয়াছেন। স্বয়ং-সিদ্ধ শাশ্বত আত্ম-সংবিৎই স্থল। আন্তরিক আন্তর্নিরীক্ষণের কঠোর পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা স্ব-চৈতন্যেই একটি উপাদানগত অংশ ও একটি আকারগত অংশের পার্থক্য করিয়া থাকেন এবং ইহার প্রথমটিকে শিব এবং দ্বিতীয়টিকে শক্তি বলিয়া থাকেন। একটি সমগ্র সত্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যেই এই পার্থক্য করা হয়, এবং তাহাদের বিরোধিতার অর্থ হইতেছে কেবলমাত্র এই যে, এই সমগ্র সত্তার স্বরূপের অংশ হিসাবে তাহাদের মধ্যে কেহ আগে এবং কেহ পরে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যভাবে বলিতে পারা যায় যে, তাঁহারা শিব এবং শক্তির মধ্যে ঐক্যমূলক মিলন আছে বলিয়া মনে করেন এবং লিঙ্গই এই ধারণার পরিসমাপ্তি। লিঙ্গ শব্দটির ধাতুগত অর্থ লী ধাতু (দ্রবীভূত হওয়া) এবং গমধাতু (যাওয়া) এই দুইটি হইতে আসিয়াছে, সুতরাং ইহা সেই চরম তত্ত্বকেই নির্দেশ করে যাহাতে জগতের সকল জীবই লয়প্রাপ্ত হয় এবং যাহা হইতে সকলেই আবার উদ্ভূত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লিঙ্গের ধারণা স্থলের ধারণার সহিত সর্বাংশেই মিলিয়া যায়, উহাদের মধ্যে প্রভেদ এইমাত্র যে দার্শনিক বিচারে স্থলের স্থান প্রথমে এবং লিঙ্গের স্থান সর্বশেষে। এই বিচারের আদি এবং অন্তের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয় স্থলেই সত্যের সম্পূর্ণ রূপ প্রকটিত করা হইয়াছে। তবে আদিতে ইহা অবিকশিত বলিয়া সরল এবং অন্তে ইহা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত বলিয়াই সরল। সত্য কিংবা স্থল মধ্যপথে শিব এবং শক্তি এই দুইরূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে এবং লিঙ্গরূপে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া আপনাকেই পুনরায় খুঁজিয়া পায়। সুতরাং বীর শৈবদর্শনে লিঙ্গের ধারণা আধ্যাত্মিক গতিশীল পরিপূর্ণতাকেই নির্দেশ করে।

জগৎ সুসংহত সমগ্র সত্তা হিসাবে কিভাবে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হইয়াছে তাহা জানিবার পর দার্শনিকেরা অনিবার্যভাবে এই জগতের পরিণাম, উদ্দেশ্য অথবা উন্নতির আদর্শের সমস্যা উত্থাপনে প্রবৃত্ত হন। বীর শৈব দর্শনে বলা হয় যে, যথার্থ বলিতে গেলে গতিশীল পরিপূর্ণতার মধ্যে চরম উদ্দেশ্যের ধারণার কোন স্থান নাই। বিশ্বের চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যদি কিছু বলিতেই হয় তাহা হইলে একটিমাত্র বাক্যে উহা এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে যে, জগতের সমগ্র তাৎপর্যকে জ্ঞাত হওয়া বা উপলব্ধি করাই সেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। জগৎ সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ দৃষ্টিলাভ করাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। দার্শনিক বোধ এবং অনুভূতি জগৎকে তাহার পূর্ণ সমগ্রতায় এবং বিশিষ্টতায় আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। ইহা পরিবর্তনকে স্বীকার করে, কিন্তু যেহেতু কালের মাধ্যমে পরিবর্তনকে বুঝিতে হয় সেই হেতু ইহা যাবতীয় পরিবর্তনকে চরমতত্ত্বের সহিত একীভূত করিয়া দেখে।

বীর শৈব দার্শনিকেরা চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের মতবাদ হইতে কালকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেন নাই। তাঁহারা বলেন কালের দুই অর্থ—একটি তাত্ত্বিক এবং অপরটি গাণিতিক। কালকে গাণিতিক কাল হিসাবে দেখিলে উহাতে পরিবর্তন অবশ্যই থাকিবে আর তাত্ত্বিক কাল হিসাবে দেখিলে উহাতে অবিচ্ছিন্নতা থাকিবে। এক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্নতার ধারণা এতই প্রকট যে, জড়জগতে কাল কিভাবে কাজ করে এবং চেতনপুরুষে কাল কিভাবে কাজ করে এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ করা প্রয়োজন। জড়জগতে কাল পরিবর্তন-সাধিকা এবং শক্তিরূপে কাজ করে সৃষ্টি পরিবর্তন ব্যতীত কিছু নয়। অন্যথায় ইহার কোন অর্থ নাই সুতরাং দার্শনিক অর্থে চরমসত্তার ধারণা পরিবর্তনের সহিত নয় পরন্তু সামগ্রিক অবিচ্ছিন্নতার সহিত জড়িত। বীর শৈব দর্শনে চরম সত্তার প্রধান পরিমাপ হইতেছে অবিচ্ছিন্নতা এবং ঐক্যবদ্ধ সমগ্রতা।

দ্রষ্টব্য

১। Mohenjo-Daro and Indus Civilisation, ভূমিকা পৃঃ v—vii

২। Cultural Heritage of India, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১

৩। The Journal of the University of Bombay, জুলাই ১৯৩৬

৪। Indian Antiquity, ১৯১১, পৃঃ ১১৮

৫। Modern Review, ডিসেম্বর, ১৯২৪

৬। Heras: "The Religion of Mohenjo-Daro People according to the inscriptions". Journal of the University of Bombay ৫ম খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩

৭। The Karnatak Historical Review, জুলাই ১৯৩৭, Journal of the University of Bombay. পঞ্চম খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩

৮। "লিঙ্গং শৈবমিদং সাক্ষাৎ শিব শক্ত্যুভয়াত্মকম্"—সূক্ষ্মাগম, ৬।৮

৯। History and Philosophy of Lingayat Religion, পৃঃ ৩২৬-৭

১০। "সর্বেষাং স্থান ভূতত্বাল লয় ভূতত্বতস্তথা
তত্বানাং মহদাদিনাং স্থলমিত্যভিধীয়তে" অনুভব-সূত্র ২।৩

গ্রন্থ-বিবরণী

ইংরাজী

শ্রীকুমার স্বামীজি : The Virashaiva Philosophy and Mysticism, নবকল্যাণমঠ, ধারওয়ার Linga-dharana-Chandrika of Nandikesvara—অধ্যাপক এম্, আর, সথড়ে, এম্. এ, (বেলগাঁও) কর্তৃক ভূমিকাসহ সম্পাদিত ডাঃ এস্, সি, নন্দীমঠ এম্. এ, পি. এচ. ডি : Handbook of Virshaivism এল, ঈ, এশোসিয়েশন, লিটারারী কমিটি, ধারওয়ার কর্তৃক সম্পাদিত।

কন্নাড়

শ্রীকুমারস্বামীজি : বীরশৈবদর্শন, নবকল্যাণমঠ, ধারওয়ার। ধারওয়ার নবকল্যাণমঠের কর্মসচিব ডি, আর, কপপাল এম্. এ, বি. টি কর্তৃক সম্পাদিত।

সংস্কৃত

মরিদেব, মগেগয় : শিবানুভব সূত্র,
মরিতন্তাদার্য : বীরশৈবাণ্ড-চন্দ্রিকা
সিদ্ধান্ত-শিখা-মণি—মরিতন্তাদার্যের টীকা সমেত

শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায় সমূহ

ঘ। শাক্তদর্শন

'শাক্ত-দর্শন' এই শব্দটি কতকগুলি দার্শনিক মতের সম্প্রদায় এইরূপ স্থূল অর্থে ব্যবহৃত হয়; এবং তখন উহা ভারতের সমগ্র শাক্ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রটিকেই নির্দেশ করে। প্রত্যেক সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়েরই তত্ত্ববিষয়ক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। প্রাচীন সংস্কৃতিগুলিকে পর্যালোচনা করিলে পরিলক্ষিত হইবে যে, ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে শক্তি-উপাসনা অতি প্রাচীন এবং খুব সম্ভবতঃ উহা সিন্ধু-উপত্যকা-সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক যুগে শৈব ও পাশুপত উপাসনার সহিত একই সঙ্গে বিদ্যমান ছিল।

শাক্ত উপাসনা ও তাহার দার্শনিক ঐতিহ্যের সুপ্রাচীনতা সত্ত্বেও অতীতযুগে উহাদিগকে সুসংবদ্ধ ও নির্দিষ্ট আকার দেওয়ার জন্য যথাযোগ্যভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।[১] ইহার ফলে, এই সংস্কৃতির মধ্যে কতিপয় যোগ্য ব্যক্তির গুহ্য জ্ঞান নিবদ্ধ আছে বলিয়া উহার প্রতি লোকের খুব শ্রদ্ধা থাকিলেও মাধবাচার্যের সর্বদর্শন-সংগ্রহ সদৃশ ভারতীয় দর্শনের কোন সঙ্কলনগ্রন্থেই উহাকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হয় নাই।[২]

এই মতগুলিকে সুসংবদ্ধ আকার দেওয়ার জন্য কেন যথাযোগ্য চেষ্টা করা হয় নাই তাহার কারণরূপে বলা হয় যে, যে সকল সত্য সাধারণ মানুষের অনুভূতির বাহিরে তাহাদিগকে যুক্তিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের গুরুত্বকে খর্ব করা অসঙ্গত বলিয়া মনে করা হইত অথবা শৈব দার্শনিকদের তৎসদৃশ মতপ্রতিপাদক গ্রন্থসমূহে যেটুকু সুসংবদ্ধতা পাওয়া যায়, জ্ঞানীদের নিকট প্রকাশিত এই সকল সত্যকে অধিক সুসংবদ্ধ আকার দেওয়া সাধারণ পাঠকের জন্য অনাবশ্যক ছিল। কিন্তু এই কারণ যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত নহে—যদি উপনিষদসমূহের ভিত্তিতে একটি দার্শনিক মতবাদ রচনা করা সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা হইলে অনুরূপভাবে শাক্ত আগমগুলির ভিত্তিতেও কেন একটি মতবাদ গঠন করা সম্ভবপর হইল না? Joad ঠিকই বলিয়াছেন, দর্শনের কাজ হইতেছে বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন তাহা গ্রহণ করা এবং তদনন্তর "তাহাদের অর্থ এবং তাৎপর্য নির্ণয় করা।"

পরম চৈতন্য কিভাবে পার্থিব-চৈতন্যের স্তরে অবতীর্ণ হয় তৎসম্বন্ধে আগমগুলির নিজস্ব বিশিষ্ট মত আছে। এই পরমচৈতন্যই আগমসমূহের আদি উৎপত্তিস্থল।[৩]

চৈতন্যের উচ্চতর স্তরের অনুভূতিসমূহ কি করিয়া চিন্তা ও ভাষার আকারে রূপান্তরিত হয়, এবং কি করিয়া লিপিবদ্ধ ও পরের নিকট বোধগম্য করা হয় ব্যাস তাঁহার যোগসূত্র ভাষ্যে (১।৪৩) এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে নির্বিতর্ক সমাধিতে যোগিগণ যে ইন্দ্রিয়াতীত সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করেন তাহা প্রকৃতপক্ষে বিষয়ের অনন্য-সাধারণ ধর্মের (বিশেষের)ই সাক্ষাৎ উপলব্ধি, কিন্তু শব্দের সহিত সম্বন্ধ হইলে উহার অপরোক্ষতা চলিয়া যায় এবং তখন উহা এমন একটি ধারণায় পরিবর্তিত হয় যাহা অন্যের নিকট সংক্রামিত হইতে পারে। তাঁহার মতে এইভাবেই শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়।[৪] পরমচৈতন্য অথবা প্রতিভার স্বরূপ অখণ্ড এবং উহা গুরুর উপদেশ হইতে লাভ করা সম্ভবপর নহে। ইহা স্বয়ম্ভু এবং উহা কোন বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে না।[৫]

শক্তি-উপাসনা সাধারণ ভারতীয় চিন্তার উপরে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের বিভিন্নস্থানের বিবরণী পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে শক্তি সাধনার বহু কেন্দ্র ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে। অতীতকালে ইহা বহু বিস্তৃত ছিল এবং আজ পর্যন্ত ইহার অবিরাম ধারা চলিয়া আসিয়াছে।[৬]

শাক্ত তান্ত্রিক সাধনার ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা যাইতে পারে :—

(ক) প্রাচীন বা প্রাক্ বৌদ্ধ যুগ ; ইহা প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

(খ) মধ্যযুগ, বৌদ্ধোত্তর অথবা খৃষ্টোত্তর যুগ ; ইহা দ্বাদশ খৃষ্টীয় শতক পর্যন্ত চলিয়াছিল।

(গ) আধুনিক যুগ, ১৩০০ খৃষ্টাব্দ হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রচলিত।

প্রাচীন যুগের কোন গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। অধুনা যেসকল প্রামাণিক গ্রন্থাদি পাওয়া যায় তাহারা মধ্যযুগের, কিন্তু সম্ভবতঃ ইহাদের মধ্যেই এমন কতকগুলি ঐতিহ্যমূলক বিবরণ রহিয়াছে অথবা এমন কতকগুলি মূল উপাদানও রহিয়া গিয়াছে যেগুলির উৎপত্তি প্রাচীনযুগেই হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। বস্তুতঃ, সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য বহু শাখার ন্যায় তন্ত্র সাহিত্যের ইতিহাসেও মধ্যযুগেই সর্বাপেক্ষা অধিক রচনাকার্য হইয়াছিল। যে প্রামাণিক গ্রন্থগুলির মধ্যে মৌলিক আগমগুলি তাহাদের ভিত্তিতে লিখিত গ্রন্থসমূহ, এবং তাহাদের উপর পরবর্তী লেখকদের টীকা সমূহ অন্তর্ভুক্ত তাহারা এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। আধুনিক যুগেও বহু গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট ব্যতিক্রম ব্যতীত এই যুগে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই দ্বিতীয় শ্রেণীর, নানাপ্রকার সংগ্রহপুস্তক, ক্রিয়া-পদ্ধতি সম্পর্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক এবং বিবিধ বিষয় সংক্রান্ত কতকগুলি লঘুপুস্তক ইহাদের অন্তর্ভুক্ত।

শাক্ত সাহিত্য বহু বিস্তৃত, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে নানা মতবাদের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিব এবং শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার ফলে, কেবলমাত্র ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে নয় পরন্তু দার্শনিক ধারণাসমূহ সম্বন্ধেও তাহাদের প্রায়ই একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক পটভূমিকা আছে। আগমগুলির মতবাদ প্রায়ই অদ্বৈতাভিমুখী, কিন্তু অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গীরও অভাব নাই। এইরূপ মনে করা হয় যে শিবের যোগিণী মুখ হইতে যে চৌষট্টিটি ভৈরব-আগম নির্গত হইয়াছিল সেগুলি অদ্বৈতপন্থী ছিল, দশটি শৈব-আগম দ্বৈত-পন্থী ছিল এবং আঠারটি রৌদ্র-আগমে বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণ ছিল।[৭] এইগুলি ছাড়া আরও বহু অন্যান্য আগম ছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, কতকগুলি সম্পূর্ণভাবে অথবা বিকৃত আকারে টিকিয়া আছে এবং এমন কতকগুলি আছে যে অন্যান্য পুস্তকে তাহাদের সম্বন্ধে উল্লেখ থাকার জন্য বা সেগুলি হইতে উদ্ধৃতি থাকার জন্য তাহাদের সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। যে সকল গ্রন্থের দার্শনিক তাৎপর্য আছে তাহাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দ, মালিনী-বিজয়, বিজ্ঞান-ভৈরব, ত্রিশিরো-ভৈরব, কুলগহ্বর, পরমানন্দ-তন্ত্র ইত্যাদি এবং আগম-রহস্য, অভেদ-কারিকা আজ্ঞাবতার ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়।

প্রত্যেক আগমের চারিটি পাদ আছে, ইহাদের মধ্যে জ্ঞান-পাদে দার্শনিক সমস্যা-সমূহের আলোচনা থাকে। প্রত্যেক আগমেই যে এই সকল সমস্যাকে একই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করা হইয়াছে অথবা তাহাদের একইভাবে সমাধান করা হইয়াছে এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। ইহাদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভূত মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই আগমগুলির অধিকাংশেরই একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তি আছে। এই দিক্ হইতে দেখিলে বলা যায় যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতবাদগুলিকে ভিত্তি করিয়া একটি যথার্থ শ্রেণী বিভাগ করা সম্ভবপর। ভবিষ্যতে যখন শাক্ত চিন্তাধারার একটি নিয়মিত ইতিহাস লেখা হইবে তখন এইসকল মত-ভেদ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শাক্ত উপাসনা-পদ্ধতির বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, ইহাদের মধ্যে শ্রীবিদ্যা সম্প্রদায়ের সাহিত্য অতি বিস্তীর্ণ। কালী-সম্প্রদায়েরও নিজস্ব সাহিত্য আছে, যদিও উহা তত বিস্তীর্ণ নহে। শ্রীকুলে কতকগুলি শক্তির উল্লেখ আছে এবং কালী কুলে অন্য কতকগুলি শক্তির উল্লেখ আছে। এই দুইটি সম্প্রদায় এবং অন্য সমস্ত উপাসনা পদ্ধতি এক অর্থে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। অগস্ত্য, দুর্বাসা, দত্তাত্রেয় এবং অপর কয়েকজন[৮] শ্রীবিদ্যার অনুরাগী ছিলেন এবং কয়েকটি চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অগস্ত্য একটি শক্তি

সূত্র এবং একটি শক্তি-মহিম্ন স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ বলা হয়।[৯] এই সূত্রের ব্রহ্ম-সূত্র বা শিব-সূত্রের ন্যায় অধিক দার্শনিক মূল্য নাই, কিন্তু ইহার একটি নিজস্ব গুরুত্ব আছে। এইরূপ বলা হয় যে, শ্রীকণ্ঠ (শিব) দুর্বাসাকে আগমসমূহ প্রচার করিতে আদেশ করিলে তিনি তাঁহার মানস-শক্তির সাহায্যে তিনজন ঋষি সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং নানারূপ দার্শনিক চিন্তা প্রচার করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়াছিলেন।[১০] শিব এবং শক্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পর-শম্ভু-স্তোত্র এবং ললিত শিব রত্ন এই যে দুইটি স্তোত্র দুর্বাসার নামে প্রচলিত সে দুইটির রচয়িতা তিনি নিজেই এইরূপ জানা যায়।[১১] পরম্পরানুযায়ী দত্তাত্রেয় আঠারো হাজার শ্লোকবিশিষ্ট দত্তাত্রেয়-সংহিতা[১২] নামক সংহিতা গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। এইরূপ বলা হয় যে, পরশুরাম এই বিপুল গ্রন্থটি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ইহাকে সংক্ষিপ্তাকারে পঞ্চাশটি খণ্ডে বিভক্ত ছয় হাজার সূত্র বিশিষ্ট একটি গ্রন্থে পরিণত করিয়া ইহার বিষয়গুলিকে ছাত্রদের পক্ষে সুগম করিয়া দেন। পরশুরামের এক শিষ্য সুমেধা ঐ সংহিতা এবং সূত্রগুলিকে দত্তাত্রেয় এবং পরশুরামের মধ্যে এক কথোপকথনের আকারে সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থটিকে ত্রিপুরা-রহস্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য-খণ্ডে এই পরম্পরা লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের জ্ঞান-খণ্ড শাক্ত দর্শনের একটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা।[১৩]

যে গৌড়পাদকে শঙ্করাচার্যের পরম-গুরুর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয় তিনি শ্রীবিদ্যা রত্ন-সূত্র নামে একটি সূত্রগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য এই গ্রন্থের একটি ভাষ্য রচনা করেন। শাক্ত সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ কিন্তু ইহার দার্শনিক মূল্য অধিক নয়।[১৪] তাঁহার সুভগোদয়-স্তুতি এবং শঙ্করের সৌন্দর্য লহরীর নামমাত্র উল্লেখই যথেষ্ট হইবে। পদ্ম-পাদের ভাষ্য সমেত শঙ্করের প্রপঞ্চসার এবং প্রয়োগ-ক্রম দীপিকা দুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। রাঘব ভট্ট যাহার ভাষ্য রচনা করিয়া-ছিলেন লক্ষ্মণ দেশিকার সেই শারদাতিলকও এই শ্রেণীর গ্রন্থ। সোমানন্দ তাঁহার শিব-দৃষ্টি নামক গ্রন্থে শাক্ত-সম্প্রদায়কে তাঁহার আগম (শৈব) সম্প্রদায়ের সহিত এক জাতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তাহাদের মতে শক্তিই একমাত্র সদ্বস্তু এবং শিব ইহার নিষ্ক্রিয় অবস্থার নামমাত্র।[১৫] যদিও তিনি শৈব-মতে বিশ্বাসী ছিলেন তাহা হইলেও তিনি বাক্-এর বিশ্লেষণ যেভাবে করিয়াছিলেন তাহা শাক্ত চিন্তাধারায় তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ দান। মহাপুরুষ অভিনব গুপ্ত সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তিনি যথার্থই শাক্ত সংস্কৃতির আত্মা-স্বরূপ ছিলেন। তিনি কৌলশাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শৈব-শাক্ত আগমের ক্ষেত্রে এবং কাব্য-বিচার শাস্ত্রে ও নাট্য-শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন

তাহা ইহাকে এমন এক অনন্যসাধারণ দার্শনিক গুরুত্বমণ্ডিত করিয়াছিল যাহা তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্তিদের মধ্যে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বহু প্রাচীন গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া রচিত তাঁহার তন্ত্রালোক গ্রন্থ শৈব-শাক্ত দর্শন সম্বন্ধীয় একটি বিশ্বকোষস্বরূপ। তাঁহার মালিনী-বিজয়-বার্তিক, পরা-ত্রিংশিকা-বিবরণ, প্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনী এবং প্রত্যভিজ্ঞা-বিবৃতি-বিমর্শিনী অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ গ্রন্থ।

অভিনবের পরে গোরক্ষ, পুণ্যানন্দ, নথনানন্দ, অমৃতানন্দ, স্বতন্ত্রানন্দ এবং ভাস্কর রায় ইঁহাদের নামই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। গোরক্ষ অথবা মহেশ্বরানন্দ মহার্থমঞ্জরী নামক গ্রন্থ এবং পরিমল, সংবিদ্ উল্লাস প্রভৃতি ইহার ভাষ্যের রচয়িতা। তিনি অভিনব গুপ্তের ঘনিষ্ঠ অনুবর্তী ছিলেন। অভিনবের আত্মীয় ক্ষেমরাজ ভাস্কর যাহাকে শক্তি-সূত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১৩] সেই প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয়ের উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। পুণ্যানন্দের কাম-কলাবিলাস কাম-কলা সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহাতে শক্তির সৃষ্টিকারী রূপসম্বন্ধে আলোচনা আছে। নথনানন্দ চিদ্-বল্লী নামে ইহার এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অমৃতানন্দ পুণ্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। বামকেশ্বর তন্ত্রের নিত্যা-ষোড়শিকার্ণবের যোগিনী হৃদয় খণ্ডের উপর তিনি যোগিণী হৃদয় দীপিকা নামে যে ভাষ্য লিখিয়াছিলেন তাহা তান্ত্রিক সংস্কৃতি বিষয়ক বহু মূল্যবান্ গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি। সৌভাগ্য-সুভগোদয় প্রভৃতি অন্যান্য কতকগুলি গ্রন্থও তাঁহার লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। স্বতন্ত্রানন্দ মাতৃকা-চক্রবিবেক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা পাঁচখণ্ডে বিভক্ত এক অসাধারণ গ্রন্থ, ইহাতে রহস্য আগমের অর্থাৎ শাক্ত তন্ত্র-সমূহের গুপ্ত বিদ্যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। ইহার শিবানন্দ মুনিকৃত একটি উৎকৃষ্ট ভাষ্য আছে। শাক্ত আগম সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ গ্রন্থের প্রণেতা ভাস্কর রায় সম্ভবতঃ আধুনিক যুগের (খৃঃ ১৭২৩-১৭৪০) সর্বাপেক্ষা বিদ্বান্ শাক্ত পণ্ডিত। নিত্যাষোড়শিকার্ণবের ভাষ্য সেতুবন্ধ সম্ভবতঃ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কৌল ত্রিপুরা এবং ভাবনা উপনিষদ্ সমূহ, ললিতা-সহস্র নাম (সৌভাগ্য-ভাস্কর) এবং দুর্গা-সপ্ত-শতী (গুপ্তবতী) র উপর লিখিত তাঁহার ভাষ্য সমূহ, যথা শাম্ভবানন্দ-কল্পলতা বরিবস্যা-রহস্য, বরিবস্যা-প্রকাশ যথার্থই বিখ্যাত হইবার উপযুক্ত এবং এইগুলিতে তাঁহার কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ণানন্দের শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, কিন্তু ইহাতে দার্শনিক তথ্য অল্পই আছে।

কালী সম্প্রদায় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—কালজ্ঞান, কালোত্তর, মহাকাল-সংহিতা, ব্যোমকেশ-সংহিতা, জয়দ্রথ-যামল, উত্তর-তন্ত্র, শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্র (কালী-খণ্ড) প্রভৃতি।

চরম সত্তাকে সংবিৎ বলা হয়। ইহা স্বয়ং প্রকাশ শুদ্ধচৈতন্য এবং দেশ কাল ও কারণতার অপূর্ণতা দ্বারা দূষিত নহে। ইহা অসীম আলোক। ইহাকে প্রকাশ বলা হয় এবং কর্ম সম্বন্ধে ইহার অবাধ স্বাধীনতাকে বিমর্শ বা স্বাতন্ত্র্য বলা হয়। এই স্বাধীনতাই ইহার শক্তি। এই শক্তি প্রকৃতপক্ষে ইহার স্বরূপের সহিত অভিন্ন, ইহার মধ্যেই নিহিত থাকে এবং ইহার অবিচ্ছেদ্য গুণরূপে প্রকাশিত হয়। সংবিৎ চৈতন্য-স্বরূপ, বিকল্পসমূহ হইতে মুক্ত এবং জড় হইতে মূলতঃ ভিন্ন। ইহা এক, অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন, নিরবকাশ এবং ইহার গঠন সর্বত্রই একরূপ, ইহার অবিচ্ছিন্নতার কোন বিরামের সম্ভাবনা নাই এবং ইহার স্বরূপে কোন বিজাতীয় পদার্থ থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। স্বাধীন বলিয়া ইহা নিজের প্রকাশ এবং ক্রিয়ার জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না।

শক্তির দুইটি অবস্থা আছে বলা যাইতে পারে, সৃষ্টি, প্রলয় ইত্যাদি বস্তুতঃ এই শক্তির ক্রীড়ার ফল। ইহা সর্বদাই ক্রিয়াশীল, এই ক্রিয়া একদিকে তিরোধানরূপে প্রকাশিত হয় এবং ইহার ফলে যে জগৎ এযাবৎ পরমতত্ত্বের স্বরূপের মধ্যে বিলীন হইয়া উহার সহিত একীভূত হইয়াছিল তাহার আবির্ভাব অর্থাৎ সৃষ্টি হয় অপরদিকে এই ক্রিয়া আত্মপ্রকাশ বা অনুগ্রহের আকার ধারণ করে এবং ইহার ফলে জগতের সংহার হয় এবং ইহা চরমতত্ত্বে বিলীন হইয়া যায়। জগতের স্থিতি সংহার এবং সৃষ্টির মধ্যবর্তী একটি অবস্থা।

সংবিৎ একটি পরিষ্কার দর্পণের ন্যায়। কোন স্বচ্ছ আকারে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির ন্যায় ইহার ভিতরে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। দর্পণ হইতে প্রতিচ্ছবি যেমন পৃথক নয় সেইরূপ জগৎকেও সংবিৎ হইতে পৃথক করা যায় না। কিন্তু এই দুইএর মধ্যে ইহা অপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই। দর্পণে একটি বস্তু প্রতিফলিত হয়, কিন্তু পূর্ণাবস্থায় সংবিতের সৃজনী শক্তি থাকায়, ইহার পক্ষে বাহিরের কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই। বাস্তবরূপ গ্রহণ করিবার এই স্বাধীনতা বা শক্তিই স্বাতন্ত্র্য বা মায়া। চরম তত্ত্বের মধ্যে এইভাবে যে জগৎ প্রকাশিত হয় তাহাতে বহু বৈচিত্র্য আছে কিন্তু সংবিৎ চিরকালই সত্তা এবং জ্ঞানের এক অখণ্ড ঐক্য। দর্শন যেমন এক কিন্তু ইহাতে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবিগুলি অনেক, সেইরূপ সাধারণ সত্তা হিসাবে চরমতত্ত্ব এক কিন্তু ইহার বিশেষ বিশেষ রূপ অনেক। কোন বাহিরের শক্তির প্রভাবে নয় কিন্তু ইহার নিজস্ব গতিশীলতার ফলে এক বহুতে পরিণত হয়। ইহার প্রভাবেই আদিম ঐক্যের ভিতর গতির সঞ্চার হয় এবং বহুর উদ্ভব হয়। এই কারণে এক

সর্বদাই তাহার ঐক্য বজায় রাখে অথচ অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের সৃষ্টি হয়। একের ন্যায় বহুরও চরম সত্তা আছে কারণ তাহারা অভিন্ন।

সুতরাং আমাদিগকে তিনটি বিভিন্ন সম্ভাব্য অবস্থার কথা চিন্তা করিতে হইবে।

(ক) কেবলমাত্র সম্বিৎ আছে কিন্তু তাহার মধ্যে জগৎ উপস্থিত নাই (চিৎ)।

(খ) সংবিৎ আছে এবং ইহার মধ্যে জগৎ দীপ্তি পাইতেছে কিন্তু এই জগৎ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় নাই (আনন্দ)।

(গ) সংবিৎ আছে ইহার মধ্যে জগৎ আছে এবং বাহিরেও জগৎ আছে (ইচ্ছা)।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সংবিৎ স্বরূপতঃ এক এবং অভিন্ন এবং ইহাতে কিছুমাত্র পরিবর্তন নাই। সেইজন্য ইহাকে নির্বিকল্প বলা হয়। ইহার কোন বিকল্প নাই, কোন বিশেষ রূপও নাই। এই তিনটি অবস্থা তুলনা করিলে বুঝা যায় যে প্রথমটি এমন একটি অবস্থা যাহাতে চরমতত্ত্বের ভিতরে কিংবা বাহিরে কোন প্রকাশ নাই, দ্বিতীয় অবস্থায় আভ্যন্তরীণ প্রকাশ আছে কিন্তু বাহিরে প্রকাশ নাই। তৃতীয় অবস্থা ইচ্ছার অবস্থা বলিয়া ইহাতে বহিঃপ্রকাশ আছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সংবিৎ স্বরূপতঃ পূর্ণ হওয়ায় ইহার বাহিরে কিছু থাকিতে পারে না। তথাকথিত বহিঃসত্তা প্রকৃতপক্ষে ইহার বাহিরে নাই।

সংবিৎ যে বিকল্পসমূহ হইতে মুক্ত এবং সৃষ্টি বিকল্প অথবা কল্পনা ইহা শাক্ত আগম এবং বেদান্ত উভয়েরই স্বীকৃত। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে শুদ্ধ এবং বিকল্প মুক্ত সংবিৎ হইতে বিকল্পরূপ সৃষ্টির উদ্ভব কি করিয়া হইতে পারে? বেদান্তে বলা হয় যে ইহা সংবিৎ হইতে উদ্ভূত হয় না কিন্তু জড় বা মায়া জগতে পৌনঃপুনিক আবির্ভাব সত্ত্বেও যে অনাদি প্রক্রিয়া চলিতেছে ইহা তাহারই অংশ। যে সংবিৎ বা ব্রহ্ম ইহাকে প্রকাশ করে ইহা তাহাতে অধ্যস্ত এবং ব্রহ্ম কর্তৃক কোন রূপেই এই প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয় না।

কিন্তু আগমের মত অন্যরূপ। ইহাতে সংবিতের গতি সৃষ্টি করিবার বা স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হইয়াছে, যদিও ইহা আভাষমাত্র এবং জগৎ প্রকৃতপক্ষে সংবিতের বাহিরের বস্তু নয়। জগৎ এই শক্তির ভিতরে আছে এবং এই শক্তি পরমতত্ত্বের ভিতরে আছে। শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তখন বলা হয় যে বিমর্শ প্রকাশে লীন (অন্তর্লীন বিমর্শ) হইয়া গিয়াছে। শক্তি যেন কুণ্ডলিনীরূপে নিদ্রিতা এবং তখন শিব আর শিব থাকেন না, শব হইয়া যান। এই অবস্থা চেতন পুরুষের নয় জড়ের অবস্থা। কিন্তু শক্তি যখন জাগ্রত, এবং ইহা সব সময়েই জাগ্রত, তখন পরম চৈতন্য স্বয়ংচেতন হইয়া থাকেন। পরম তত্ত্বের আত্মজ্ঞান 'অহং' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাকে পূর্ণ বলা হইয়াছে, কারণ এই অহম্‌এর বাহিরে অহম্‌এর প্রতিযোগীরূপে

'ইহা'র আকারে কোন কিছু ক্রিয়া করিতে পারে না। আগমের পরিভাষায় এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরমতত্ত্বের অবস্থাকে 'পূর্ণাহংতা' বলা হয়। অহম্ পূর্ণ বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে সমগ্র বিশ্ব দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির ন্যায় ইহাতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সুতরাং জগৎ অহম্ হইতে অভিন্ন।

সংবিৎ প্রকাশ এবং বিমর্শ উভয়ই। ইহা বিশ্বোত্তীর্ণ হইয়াও বিশ্বানুস্যূত। এই দুইটি আকার মিলিয়া একটি অখণ্ড সত্তা গঠিত হয়। ইহা হইতেছে অহম্ ইহার প্রথম অক্ষর 'অ' প্রকাশকে সূচিত করে, শেষ অক্ষর 'হ' বিমর্শকে সূচিত করে এবং দুইএর ঐক্য যাহা অ হইতে হ পর্যন্ত বর্ণমালার সকল অক্ষরের ঐক্যকে বুঝায় তাহাই বিন্দু (.)র অর্থ। সুতরাং বিন্দু হইতেছে অহম্-এর প্রতীক। চরম শক্তির সৃষ্টি কার্য যেন এই বিন্দুকে বিভক্ত করিয়া দেয় এবং সমস্ত জাগতিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করে।

উপরে যে বহিষ্করণ প্রক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে শুদ্ধ আত্মার প্রকাশমান অহংভাবের অবচ্ছিন্ন অহং-এর নিকট বাহ্য বস্তুরূপে উপস্থিতি। ইহাই বেদান্তের মূলাবিদ্যা। এই অনহং হইতেছে তথাকথিত অব্যক্ত অথবা জড়শক্তি, কিন্তু সংবিতের স্বাতন্ত্র্য অথবা চিৎশক্তি নামে খ্যাত আধ্যাত্মিক শক্তি এই অবিদ্যাকে অতিক্রম করে, কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তকে সাধারণতঃ যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহাতে মনে হয় যে ইহার মধ্যে এই শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে।

যেহেতু অবিদ্যা অর্থাৎ জড়শক্তি সকল পরতন্ত্র বস্তুর চরম উৎস আধ্যাত্মিক শক্তি হইতে উৎপন্ন হয় সেইহেতু শাক্তগ্রন্থগুলিতে (ত্রিপুরা-রহস্য-জ্ঞানখণ্ড) যে প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে শক্তির তিনটি বিভিন্ন অবস্থা আছে তাহার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই।

(ক) মহাপ্রলয়কালে যখন আত্মা সকল বিকল্প হইতে মুক্ত থাকে তখন শক্তি শুদ্ধ চিৎশক্তি অর্থাৎ (গীতার) পরা প্রকৃতিরূপে থাকে। দর্পণ যেমন তাহাতে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির প্রাণস্বরূপ ঠিক সেইরূপ এই শক্তি ও জীব ও জগতের প্রাণ-স্বরূপ এবং ইহাদিগকে ধারণ করিয়া থাকে।

(খ) কিন্তু যখন বিকল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় এবং জড়ভাব প্রবল হইয়া উঠে তখন শক্তি অবিদ্যা জড়শক্তি বা প্রকৃতিরূপে প্রকটিত হয়। যখন মায়া এবং অবিদ্যাকে একই নামে নির্দেশ করা হয় তখন ইহাকে জড় প্রকৃতি (অর্থাৎ গীতার অপরা প্রকৃতি) বলা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টিতে বিশ্বের আবির্ভাব দিব্য-শক্তির আত্ম-সঙ্কোচের ফল এবং প্রলয়কালে বিশ্বের বিলয় ঐ একই শক্তির আত্ম-প্রতিষ্ঠার ফল। বিশ্বের এক

রাত্রি অতীত হইলে পরা শক্তি জীবগণের পরিণত অদৃষ্ট সমূহের সাহায্যে আত্মার স্বরূপকে যেন আংশিকভাবে প্রকাশ করে এবং ইহার ফলে আত্মা সীমাবদ্ধ রূপে প্রতিভাত হয়। আত্মার এই সীমাবদ্ধ রূপে প্রতিভাত হওয়ার অর্থই হইতেছে অবিদ্যা বা জড়শক্তি নামে জ্ঞাত অনাত্মার আবির্ভাব, ইহাকে শূন্য, প্রকৃতি, অত্যন্তাভাব, তমস এবং আকাশ ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। সৃষ্টির ক্রমের ইহাই প্রথম অবস্থা এবং ইহা অসীমের উপর সীমার প্রথম আরোপ কে নির্দেশ করে। আত্মার স্বাতন্ত্র্য হইতে জাত এক ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মে যে অহম্ ঐকদেশিক, পূর্ণ নয়। এই অন্য বস্তু যাহা আত্মার অংশমাত্র হইয়াও ইহার বাহিরে, যাহার আত্ম-সংবিৎ নাই এবং যাহাকে অনাত্মা কিংবা উপরে প্রদত্ত অন্য কোন নামে বর্ণনা করা হয় তাহার আবির্ভাবের জন্য এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই দায়ী।

সুতরাং চরম তত্ত্ব যেন স্বতঃই নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত করে; ইহাদের মধ্যে একটি বিষয়ী এবং অপর একটি বিষয়রূপে প্রতীয়মান হয়। পরম তত্ত্বের স্বরূপ যে পূর্ণাহংতা তাহা এই বিভাগের পর তিরোহিত হয়: যে অংশ সীমাবদ্ধ অহংরূপে প্রতীয়মান হয় তাহাই বিষয়ী এবং যে অংশ অহংতা হইতে মুক্ত তাহাই বিষয়। যে বিষয় এই ভাবে আবির্ভূত হয় তাহাই অব্যক্ত জড় প্রকৃতি। ইহা হইতেই সমগ্র সৃষ্টি নিঃসৃত হয় এবং ইহাকেই বিষয়ী নিজ হইতে পৃথক বলিয়া অনুভব করে।

চৈতন্য স্বয়ং-প্রকাশ আলোক (স্ফুরৎ)-স্বভাব। যখন ইহা নিজেকে প্রকাশিত করে তখন ইহা অহং-তা বলিয়া জ্ঞাত হয়। যখন ইহা অনাত্মাকে বিষয় করে তখন ইহা ইদন্তা বলিয়া জ্ঞাত হয়। চৈতন্যের স্বরূপই হইতেছে এই যে ইহা সর্বদাই নিজের নিকট প্রকাশিত থাকে। সমস্ত দ্বৈতভাবের পশ্চাতে এই সার্বিক অহং বর্তমান। এই পরম অহং সার্বিক, কারণ ইহাকে পরিচ্ছিন্ন বা ব্যাবৃত্ত করিতে পারে এমন কিছুই নাই এবং সমগ্র দৃশ্যমান জগৎ ইহার সহিত একীভূত হইয়া আছে। কিন্তু জড় স্ব-প্রকাশ নয় বলিয়া এই ধর্ম ইহাতে বর্তমান নাই। আলোক এবং তাপ যেমন একই সঙ্গে অগ্নিতে থাকে তেমনই সার্বিক অহংতা এবং স্বাতন্ত্র্য বা শক্তি একই সঙ্গে চৈতন্যে থাকে। এই স্বাতন্ত্র্যই মায়া। ইহা চিদেকরূপ হইলেও অসংখ্য নানারূপ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে, কিন্তু এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিলেও ইহা ইহার স্বরূপ হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হয় না।

বিশুদ্ধ চৈতন্যে জগতের আবির্ভাবের তিনটি বিভিন্ন ক্রমিক অবস্থা আছে।

(ক) প্রথমটি হইতেছে বীজাবস্থা। এই অবস্থায় জড়শক্তি তখনও তাহার প্রকাশের সর্বপ্রথম অবস্থায় থাকে এবং তখন ইহা বিশুদ্ধ। এই অবস্থায় জড় তাহার

নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে না এবং সেই জন্য অনুভবের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য থাকে না। অন্য ভাবে বলিতে গেলে, ইহার অস্তিত্ব অন্তর্নিহিত হইলেও ইহা চৈতন্য হইতে পৃথক্‌ভাবে আবির্ভূত হয় না। পাঁচটি বিশুদ্ধ তত্ত্ব যথা—শিব, শক্তি, সদাশিব, শুদ্ধবিদ্যা এবং ঈশ্বর এই অবস্থার দ্যোতক।

(i) যে অবিদ্যাকে বিষয়ীর বাহিরে অবস্থিত বিষয়রূপে চৈতন্যের সীমাবদ্ধ প্রকাশ বলিয়া পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকেই শিব বলা হয়। শুদ্ধ চৈতন্যে উহার নিজ ইচ্ছা শক্তির ক্রিয়া বশতঃ অসংখ্য সীমাবদ্ধ রূপের (স্বাংশের) উদ্ভব হয়। ইহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন। এই দিক হইতে দেখিলে চিৎ এর প্রত্যেক অবচ্ছিন্ন আকারের অনুরূপ একটি বাহ্য বস্তু আছে কিন্তু পূর্ণ আত্মার (=পরা-শিব) পক্ষে কোন বহিঃসত্তা নাই। চিৎ এর পূর্ববর্ণিত সমস্ত শুদ্ধ এবং পরিচ্ছিন্ন আকারের মধ্যে যাহা সামান্য তাহাকেই শিবতত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্ব একটি সামান্য এবং ইহার মধ্যে সমস্ত বিশেষ গুলিই বর্তমান কিন্তু পর—শিব বা শুদ্ধ আত্মা বিশ্বাতীত এবং ইহাতে সামান্য এবং বিশেষ সমূহ বিধৃত হইয়া আছে। সুতরাং শিব-তত্ত্বকে সমস্ত বিকল্প হইতে মুক্ত শুদ্ধ চৈতন্যের সাধারণ অথচ পরিচ্ছিন্ন আকার বলিয়া বর্ণনা করাই অধিক সঙ্গত হইবে এবং পরম তত্ত্ব হইতে ইহাকে পৃথক বলিয়া মনে করিতে হইবে।

(ii) শিবের (পরিচ্ছিন্ন নির্বিকল্প চিৎ এর) অহং রূপকেই শক্তি বলা হয়। যদিও এই অহং-ভাষণ চিৎ এর স্বরূপ এবং বস্তুতঃ শিব এবং শক্তির মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নাই, তথাপি চিৎকে সমস্ত বিশেষণ হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করিলে উহাকে শিব আখ্যা দেওয়া হয় এবং ইহার বৈশিষ্ট্য যে আত্ম-জ্ঞান তাহার জন্য ইহাকে শক্তি আখ্যা দেওয়া হওয়া হয়।

(iii) অহং-ভাষণ যখন আত্মাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনা পরন্তু অনাত্মা অথবা আত্মার বহিঃস্থ বিষয়ের (মহাশূণ্যের) প্রতিও প্রযুক্ত হয় তখন ইহা সদাশিব নামে জ্ঞাত হয়। এই অবস্থায়, আমি ইহা, এইরূপ জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মা অনাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায় এবং ইহাতে জড়ের উপর আত্মার প্রাধান্য সূচিত হয়।

(iv) কিন্তু যখন জড়ের প্রাধান্য হয় এবং জ্ঞান 'ইহাই আমি' এইরূপ আকার ধারণ করে তখন সেই অবস্থার পারিভাষিক নাম ঈশ্বর।

(v) যে অবস্থায় জ্ঞানে বিষয়ী এবং বিষয় রূপ উপাদান সমানভাবে প্রকাশিত হয় তাহাকে বুঝাইতে 'শুদ্ধ বিদ্যা' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(খ) অবিদ্যার পরিণামের দ্বিতীয়াবস্থায় ভেদ বা জড়ভাবের অধিক বিকাশ ঘটিয়া থাকে এবং তখন জড় এবং চৈতন্যের সূক্ষ্ম বিকারগুলির আবির্ভাব হয়। এই মিশ্র

অবস্থায় মিশ্র তত্ত্বগুলি যথা মায়া, কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল এবং নিয়তি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(i) দ্বিতীয় অবস্থার বিশেষত্ব এই যে চরম তত্ত্বের স্বাধীন ইচ্ছা ভেদকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাহার ফলে চৈতন্য এবং জড়ের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাহা অন্যরূপ হইয়া যায়। উপরে বর্ণিত প্রথম অবস্থায় চিৎশক্তি চৈতন্যে বিলীন প্রাথমিক অবস্থায় অবস্থিত জড় শক্তির উপর প্রাধান্য করে। দ্বিতীয় অবস্থায় চৈতন্যের উপর জড়ের প্রাধান্য দেখা যায়। চৈতন্যের প্রধান্য নষ্ট হইয়া যায় এবং ইহা জড় বিষয়ীর অন্তর্নিহিত একটি গুণে পরিণত হয়। চৈতন্যে ভেদের উদ্ভব এবং বিকাশের জন্যই ইহা সম্ভবপর হয়। এই জড় বিষয়ী হইতেছে চৈতন্যের উপর প্রাধান্য বিশিষ্ট জড় এবং চৈতন্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ হইতেছে গুণের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধের ন্যায়। ইহাকে মায়া বলা হয়।

(ii—vi) মায়ার পাঁচটি রূপ হইতেছে তথাকথিত পঞ্চ কঞ্চুক অথবা আবরণী। এইগুলি পর-শিবের পাঁচটি অবচ্ছিন্ন অনন্ত শক্তি। মায়ার বিক্ষেপ শক্তি পরমাত্মার সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞতা, আত্ম-সন্তোষ, অনন্ততা, এবং স্বাতন্ত্র্যের উপর আবরণের ন্যায় কাজ করে এবং তখন ইহা ক্রমান্বয়ে কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল এবং নিয়তি নামে জ্ঞাত হয়।

(vii) মায়া এবং ইহার পাঁচটি ক্রিয়াদ্বারা অবৃত হইলে শুদ্ধচিৎ পুরুষ রূপ ধারণ করে। এই পুরুষের ক্রিয়া, জ্ঞান, সন্তোষ, অনন্ততা এবং স্বাতন্ত্র্য সমস্তই সীবাবদ্ধ।

(গ) অবিদ্যার পরিণামের তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা অভিব্যক্ত অবস্থায় মিশ্র তত্ত্বগুলির স্থূল বিকারগুলি দেখা দেয়। এই অবস্থায় জড়েরই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য। আদি প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের যে সমষ্টি লইয়া জড়জগৎ গঠিত তাহাই এই তৃতীয়াবস্থা।

যাহাকে লইয়া নিম্নস্তরের সৃষ্টি আরম্ভ হয় সেই প্রকৃতি হইতেছে নানাবিধ অনাদি কর্মযুক্ত জীবগণের প্রকৃতি এবং বাসনা সমূহের সমষ্টি। ইহাকে জীবগণের চিৎশক্তি বা আত্মায় নিহিত কর্ম প্রবৃত্তি সমূহের শরীর বলিয়া উপযুক্ত ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই কর্ম বাসনা বা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যে অনুভব তাহা সুখদায়ক হইতে পারে, অথবা যাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই হয় না এমন মূর্চ্ছার অবস্থা হইতে পারে, তদনুসারে ইহার তিনটি রূপ হইয়া থাকে।

প্রবৃত্তি সমূহ দুইটি অবস্থায় থাকে। যখন তাহারা অপ্রকাশিত থাকে, যেমন স্বপ্নবিহীন সুষুপ্তিতে, তখন তাহাদের অব্যক্তাবস্থা, আর যখন তাহারা স্বপ্ন এবং জাগ্রদবস্থায় প্রকাশিত হয় তখন তাহারা চিত্তরূপে ব্যক্ত হয়। নিঃস্বপ্ন সুষুপ্তিতে সুখ

দুঃখের ভোগ হইতে পারে না, কারণ কেবলমাত্র পরিণত কর্ম সমূহই ভোগের মধ্য দিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং যেগুলি যথেষ্টমাত্রায় পরিণত নয় তাহাদের ফলোৎপাদনের যোগ্যতা নাই। বস্তুতঃ কর্মসমূহ যখন পরিণতি প্রাপ্ত হয় তখন তাহারা চৈতন্যময় আত্মার জ্ঞান শক্তিকে বহির্দেশে গমন করিতে এবং প্রকৃতির বাস্তব বিকার বহির্জগতের সহিত সংস্পর্শে আসিতে প্রবৃত্ত করে। নিদ্রাবস্থায় স্বভাবতঃই এইরূপ গতির অভাব থাকে ; কিন্তু যে কালে নিদ্রা হইতে থাকে সেই কাল কর্মসমূহের উপর ক্রিয়া করে এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে পরিপক্ক করিয়া তুলে এবং তাহার ফলে উপরে বর্ণিত শক্তি বাহ্য জগতের বস্তু সমূহ অথবা তাহাদের অবভাস সমূহের সংস্পর্শে আসিতে সক্ষম হয় এবং নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। যে শক্তি এইভাবে কর্মপ্রবৃত্তির সমষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসে এবং তাহার ফলে ভোগের উৎপত্তি হয় তাহা চিত্ত বলিয়া জ্ঞাত।

পুরুষবিশেষে চিত্ত বিভিন্ন কিন্তু নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় ইহা প্রকৃতির সহিত একীভূত হয়। ইহাতে চৈতন্য-উপাদানের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে ইহাকে পুরুষ এবং অব্যক্ত উপাদানের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে ইহাকে প্রকৃতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং ইহা একটি পৃথক্ তত্ত্ব নয় পরন্তু পুরুষ বা প্রকৃতির অন্তর্গত।[১৭] বস্তুতঃ চিত্ত ও অন্তঃকরণ অভিন্ন। ইহার ত্রিবিধ ক্রিয়া অনুসারে ইহা তিনটি বিভিন্ন নামে জ্ঞাত। ইহা যখন অহং-ভাব অনুভব করে তখন ইহা অহঙ্কার, যখন সঙ্কল্প করে তখন ইহা বুদ্ধি এবং যখন ইহা অন্তরে অন্তরে চিন্তা করে তখন ইহা মন।

এস্থলে মন সম্বন্ধে শাক্ত মতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পরম সংবিতের ন্যায় মনেরও প্রকাশ ও বিমর্শ এই দুইটি রূপ আছে। মন যখন বাহ্য বস্তু সমূহের সহিত সংস্পর্শে আসে এবং ঐগুলিকে বিষয় করে তখন তাহার যে রূপ তাহাই প্রকাশ এবং এইরূপ কোন বস্তু যখন অন্তরে প্রতিফলিত হয় এবং পূর্বসঞ্চিত মানস প্রতিচ্ছবিগুলির সহিত সংযুক্ত হইয়া 'ইহা এইরূপ' ইত্যাকার চিন্তার মধ্যদিয়া প্রকাশিত হয় তখন তাহার সম্বন্ধে মনে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহাই বিমর্শ। যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মন যখন প্রথমে ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে কোন বিষয়বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন ঐ বস্তুটি শব্দোল্লেখ হইতে মুক্ত থাকায় ভেদরহিত আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাই নির্বিকল্পক জ্ঞান এবং যাঁহারা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের মতে ইহা সর্বদাই অনুমেয়। শক্তি আগমানুসারে কিন্তু ইহা বিষয়বস্তুর প্রকাশ (দর্শন) অর্থাৎ কেবল জ্ঞানমাত্র। পরমুহূর্তে বাহ্য বস্তু মনে প্রতিফলিত হইয়া উহার আকারকে মনের উপর নিক্ষেপ করে এবং এই

নিক্ষেপ "ইহা এইরূপ" এই অবধারণরূপে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের এই অবস্থাকে বিচার বলে। ইহাতে একটি বিশেষ বস্তুকে অন্য বস্তু সকল হইতে পৃথক্ করা হয় এবং ধারণামূলক চিন্তার সহিত মিশ্রিত করা হয়। ইহাই বিমর্শ বা সবিকল্পক জ্ঞান। সুতরাং উপরে প্রদত্ত বর্ণনানুসারে মনের দুইটি অবস্থা আছে। বিমর্শ অনবগত বস্তু সম্বন্ধে হইতে পারে —যেমন অনুভবের ক্ষেত্রে—আবার পূর্বানুভূত বস্তু সম্বন্ধে হইতে পারে—যেমন স্মৃতি ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে। শেষোক্ত উভয় প্রকার অবস্থাই অনুভবমূলক মানস-সংস্কার জন্য।

চৈতন্যের বিভিন্ন অবস্থা কি কি এখন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সুষুপ্তিকে প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ নিদ্রার প্রকাশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহা নির্বিকল্পক জ্ঞানের একটি আকার। ইহা কিয়ৎকাল স্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী নয় এবং বিমর্শের অভাবজনিত মূঢ় দশার একটি অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহা বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং ইহা মূঢ় দশারই নামান্তর। অপর পক্ষে জাগ্রদবস্থা (জাগর) প্রায়ই বিমর্শের অবস্থা এবং মূঢ়দশার অবস্থা নয়। এইভাবে নিঃস্বপ্ন সুষুপ্তিকে বিকল্পরহিত চৈতন্যের অবস্থা সমূহের অবিরাম প্রবাহের পর জাগ্রদবস্থায় মানস প্রতিচ্ছবির ধারা আরম্ভ হয়।

কিন্তু সুষুপ্তিকালে যে নিদ্রা প্রকাশিত হয় তাহার স্বরূপ কি ? ইহার উত্তরে বলা হয় যে ইতঃপূর্বে যে মহাশূন্যকে আমরা তথাকথিত আকাশের সহিত অভিন্ন বলিয়াছি এবং ঈশ্বরাত্মা প্রথমে নিজেকে সীমাবদ্ধ করিবার পর যাহা তাঁহার আদিমতম বাহ্য প্রকাশ ইহা তাহাকেই নির্দেশ করিতেছে। ইহা নিরাকার এবং অব্যক্ত এবং নিদ্রায় যখন আর কিছুই থাকেনা তখনই ইহা প্রকাশিত হয়। ইহা হইতেছে সর্ব-সাধারণ পটভূমিকারূপে কল্পিত সমস্ত দৃশ্য আকারের অভাব। সুষুপ্তিতে ইহারই প্রকাশ হয় বলিয়া মানুষ জাগিয়া উঠিয়া অনুভব করে যে সেই অবস্থায় তাহার কোন বিষয়েরই জ্ঞান ছিল না।

শাক্ত দার্শনিকেরা এই সুবিদিত ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন যে জাগ্রদবস্থাতেও কোন বস্তু দেখিবার সময় মন নিদ্রার সময়ে তেমনই মূঢ় দশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই মূঢ় দশা অনুভূত হয় না। জাগ্রদবস্থায় নির্বিকল্পক জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় যে মানস প্রতিচ্ছবিগুলি অতিক্রুত একের পর আরেকটি আবির্ভূত হয় তাহাদের চাপে এই মূঢ় দশা তিরোহিত হইয়া যায়।

নিদ্রাকালে মনের প্রকাশ রূপ আকার থাকে কিন্তু বিমর্শ অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই জন্যই সাধারণতঃ এই অবস্থায় মন বিলীন হইয়া যায় এইরূপ বলা হয়। সেইরূপ কোন বাহ্যবস্তু প্রথম দৃষ্ট হইবার সময়েও মন বিলীন অবস্থায় থাকে।

চিত্ত প্রকৃতপক্ষে জ্ঞেয় পদার্থের অভিমুখী আত্মা। নিদ্রায় মন মানস প্রতিচ্ছবি হইতে মুক্ত থাকায় শান্ত এবং গতিহীন থাকে। ইহার ক্ষণস্থায়ী বিকারগুলি না থাকায় ইহা বিলীন হইয়া গিয়াছে এইরূপ বলা হয়। মনের এই ভাব নিম্নলিখিত তিনটি অবস্থার প্রত্যেকটিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) নির্বিকল্প সমাধি—এই সময়ে শুদ্ধ আত্মা নিজের স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

(খ) নিদ্রা-এই সময়ে অব্যক্ত অথবা মহাশূন্য প্রকাশিত হয়।

(গ) যখন স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় সংস্পর্শের ক্ষেত্রে কোন বাহ্য বস্তুর প্রকাশ হয় তখন সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ।

এই বিভিন্ন অবস্থায় "ইহা এইরূপ" ইত্যাকার বিমর্শ অপ্রকাশিত থাকায় সর্বক্ষেত্রেই একই প্রকারের ঘনীভূত প্রকাশ বর্তমান বলিয়া মনে হয়। এই সকল অবস্থার আশ্রয় রূপে একই প্রকাশ বর্তমান বলিয়া মনে হয়। এই সকল অবস্থার আশ্রয় রূপে একই প্রকাশ বর্তমান থাকিলেও এই অবস্থাগুলি অভিন্ন নয়, কারণ, মানসিক ঐক্য সম্পাদন (অনুসন্ধান) ক্রিয়া রূপে পরবর্তী সময়ে যে বিমর্শ দেখা দেয় তাহা প্রত্যেকক্ষেত্রেই বিভিন্ন। সমাধির পর বিমর্শ এইরূপ আকার ধারণ করে "এই সময়ে আমি নীরব ছিলাম," নিদ্রার পর ইহা এইভাবে প্রকাশিত হয় "এই সময়ে আমি কিছুই জানি নাই," কিন্তু বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষের সময় ইহা এইরূপ আকার ধারণ করে "উহা এইরূপ বস্তু।" সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলির মধ্যে কোন না কোন বিভিন্নতা আছে ইহা ধরিয়া না লইলে বিমর্শের এই বিভিন্নতা ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এই তিন অবস্থাতেই ইহা মানস—প্রতিচ্ছবি এবং শব্দানুষঙ্গ হইতে মুক্ত থাকে বলিয়া ইহার স্বরূপের যে ঐক্য তাহা নষ্ট হয় না। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা এইপ্রকার। সমাধিতে বিষয়বস্তু হইতেছে বাহিরের নিরাকার বস্তু—অব্যক্ত। প্রত্যক্ষে বিষয়বস্তু হইতেছে কতকগুলি বিশেষ গুণযুক্ত এবং অন্যান্য দ্রব্য হইতে যাহাকে পৃথক্ করা যায় এমন একটি বাহিরের দ্রব্য।

সুতরাং, যদিও ভাস্য (বিষয় বস্তু) সমূহ বিভিন্ন, শুদ্ধজ্ঞান (ভাস) বা চৈতন্য যাহা সকলের পক্ষেই সাধারণ তাহা এক এবং অবিভক্ত। অন্যভাবে বলিলে, যদিও সমাধি, নিদ্রা এবং বাহ্যবস্তু পরস্পর হইতে ভিন্ন, যে জ্ঞানে তাহারা প্রকাশিত হয় উহা এক। ইহা হইতে বুঝা যায় বিষয়ের ভেদ জ্ঞান অথবা তাহার স্বরূপে অনুরূপ ভেদ উৎপাদন করিতে পারে না। জ্ঞানের ভেদ কেবলমাত্র চিন্তার সাহায্যেই হইতে পারে কিন্তু এই তিনটি অবস্থা সমভাবেই শুদ্ধ-জ্ঞান (প্রকাশ) স্বরূপ বলিয়া উহাদের কোনটিতেই চিন্তা বর্তমান নাই।

সমাধি এবং নিদ্রা অধিকক্ষণস্থায়ী বলিয়া পরিবর্তী সময়ে বিমর্শের বিষয় (বিমৃষ্ট) হইতে পারে, কিন্তু কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া ইহা অন্যপ্রকার। ঠিক্ সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী সমাধি অথবা নিদ্রা বিমর্শের উপযুক্ত বিষয় হইতে পারে না। জাগ্রৎ কালেও মাঝে মাঝে ক্ষণস্থায়ী সমাধি এবং সুষুপ্তি হইয়া থাকে কিন্তু এগুলিকে সাধারণতঃ লক্ষ্য করা হয় না।

৩

শারদা তিলকে (১।৭-৮) ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে ইহার অভিব্যক্তির ক্রমকে এইভাবে দেখান হইয়াছে—

(i) পরমেশ্বর—'সকল' এবং 'সচ্চিদানন্দ-বিভব, বলিয়া বর্ণিত।

(ii) শক্তি

(iii) নাদ (পর)

(iv) বিন্দু (পর)

(v) বিন্দু (অপর)   বীজ

(vi) নাদ (অপর)

এই প্রসঙ্গে 'পরমেশ্বর' বলিতে স্পষ্টতঃই সেই পরম দেবকে বুঝায় যাঁহার সহিত শক্তি বা কলা[১৯] চিরকাল ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছেন। এস্থলে পরমদেবকে স্বরূপতঃ শাশ্বত, স্বয়ং-সৎ, স্বয়ং-চেতন এবং আত্মানন্দ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সৃষ্টিকালে যে শক্তি একদিন সত্তার অতলগর্ভে নিমজ্জিত ছিল তাহার প্রকাশ হয় এবং ইহাই প্রথম ঘটনা। নিঃসন্দেহে এই শক্তির প্রথম বিকার ইচ্ছা হইতেছে ইহার বৈশিষ্ট্য।

শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতায়) বলা হইয়াছে যে তৈল-বীজ হইতে যেমন তৈল নিষ্ক্রান্ত হয় তেমনই সৃষ্টির প্রারম্ভে শক্তির আবির্ভাব হয়। ইহা দৈব ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া। অর্থাৎ, যে পরম শক্তি দৈব ইচ্ছার সহিত অভিন্ন এবং যাহা দৈবসত্তার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে তাহা দৈব ইচ্ছার প্রভাবে সৃষ্টিকালে আত্মপ্রকাশ করে।[২০]

জাগতিক মহারাত্রির পর শক্তির আবির্ভাব নিদ্রার অচেতনতার পর জাগ্রত ব্যক্তির স্মৃতির পুনরাবির্ভাবের ন্যায়। বিলুপ্ত জগৎ পুনর্দর্শনের ইচ্ছা শূন্যের অনুভূতির সহিত

জড়িত থাকে, এবং ইহাই মায়া। পরবর্তী সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় মায়ার স্থান প্রথমে, এবং যে জৈবসত্তা ইহার জনক তাহাই ইহার প্রভু এবং নিয়ন্তা। শূন্যের বোধের সহিত পরনাদ নামক সমগ্র দেশ-ব্যাপী একটি অস্ফুট শব্দ থাকে। নাদ এবং আলোকের একই স্বরূপ। শব্দ এবং আলোক যে একই সঙ্গে থাকে এবং একই ব্যাপারের দুইটি রূপ বলিয়া পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ তাহা তন্ত্রসমূহে স্বীকৃত হইয়াছে। পরম ইচ্ছার প্রথম অভিব্যক্তি হইল শূন্যের এবং যে শব্দ এবং আলো এই শূন্যকে অধিকার করে তাহাদের সৃষ্টি। এই সমস্তই ইচ্ছা-শক্তির অন্তর্ভুক্ত। এই প্রক্রিয়ার পরবর্তীস্তরে এই বিকীর্ণ আলোক-শব্দ (ইচ্ছা-শক্তির গূঢ় প্রভাবে) একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়। ঐ কেন্দ্রকে বিন্দু বলা হয়। এই অবস্থায় ক্রিয়া-শক্তি স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই পর-বিন্দু হইতে তত্ত্ব সমূহ উদ্ভূত হয়। পরে বিন্দু আবার নিজেকে তিনভাগে বিভক্ত করে। এই তিনটি অংশ যথাক্রমে বিন্দু, বীজ এবং নাদ বলিয়া জ্ঞাত। বিন্দু হইতেছে সেই অংশ যাহাতে শিব-রূপই প্রধান আর বীজে শক্তিরই প্রাধান্য। কিন্তু নাদে শিব এবং শক্তি উপাদানের সমান ক্ষমতা।

বিন্দুর সাম্যভাবকে কে নষ্ট করে ? শারদা তিলকে এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। প্রপঞ্চসারে (১।৪২-৪৩) বলা হইয়াছে যে, কালই বিন্দুর সাম্যভাব নষ্ট করিয়া দেয়। এই মতে কাল শাশ্বত পুরুষের একটি শাশ্বত রূপ। ইহার মাধ্যমেই তাঁহার পরা প্রকৃতির জ্ঞান হইয়া থাকে এইরূপ বলা হয়।[২১]

শারদা তিলকে (১।১১-১২) এবং প্রপঞ্চসারে (১।৪৪) বলা হইয়াছে যে, বিন্দু যখন বিভক্ত হয় তখন যে মহা-শব্দের সৃষ্টি হয় তাহা শব্দ-ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত।

ইহা সুবিদিত যে মস্তকের উর্ধ্বাংশের মধ্যে অবস্থিত সহস্র দল পদ্মের বীজাধার রূপে যাহাকে কল্পনা করা হয় তাহাই তথাকথিত ব্রহ্ম-রন্ধ্র। ইহাকে প্রায়ই 'শূন্য' বলা হয়। ইহা সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মন যদি এই শূন্যে অবস্থান করিতে পারে তাহা হইলে ইহার অশান্ত প্রকৃতি স্তব্ধ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে জীব নিজেকে গুণসমূহের উর্ধ্বে বলিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে পারে। ইচ্ছা-শক্তির এবং পর নাদের ইহাই উৎপত্তি স্থান।[২২]

ব্রহ্মের মহাকারণরূপ অবস্থা বিসর্গ-মণ্ডল বলিয়া খ্যাত। পর-নাদ বলিতে ইহাকেই বুঝায়। পরা শক্তিকে যদি কুল বলা হয় এবং পরম শিবকে অকুল বলা হয় তাহা হইলে বিসর্গের স্থান তাহাদের উভয়েরই নীচে এরূপ বলা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাকে ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরেরর স্তরের নীচে স্থান দেওয়া হয় এবং ইহার নীচে যথাক্রমে সূর্য, চন্দ্র এবং মহাবায়ুর তথাকথিত মণ্ডলসমূহ সমস্তই সহস্রদল পদ্মের মধ্যে অবস্থিত।

ব্রহ্মের কারণাবস্থার প্রতীক হইতেছে শব্দ-ব্রহ্ম অথবা কুলকুণ্ডলিনী। পরবিন্দুর বিভাগ হইতে উদ্ভূত তিনটি তত্ত্ব—যথা বিন্দু, বীজ এবং নাদ—এই তিনটি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজরূপে ইহাকে কল্পনা করা হয়। সুতরাং পর-নাদ এবং পর-বিন্দু যে আত্মা শক্তিকে বুঝাইতেছে ত্রিভুজাকার কুণ্ডলিনী তাহারই প্রকাশ বলিয়া মনে হয়।

কুণ্ডলিনী হইতে জগতের সূক্ষ্ম উপাদানগুলি নির্গত হয় এবং তাহারা ললাটের বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং স্নায়ুমণ্ডলীর নিম্নাংশে অবস্থান করিতে আরম্ভ করে। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, (অ-পর) বিন্দু হইতেছে শিব, বীজ শক্তি এবং (অ-পর) নাদ উভয়ের মিলনের ফল। প্রকৃতপক্ষে বীজ বা শক্তি হইতেছে সমুদায় বর্ণমালা। ইহার অক্ষর সমূহ ত্রিভুজাকারে বিন্যস্ত হইয়াছে। তন্ত্রে ইহাকে অ-ক-থ ত্রিভুজ বলা হইয়াছে। ইহা একটি সমবাহু ত্রিভুজ, ইহার তিনটি বাহুর একেকটি যথাক্রমে অ, ক ও থ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬টি অক্ষর দ্বারা নির্মিত। এইরূপে ৪৮টি অক্ষর এই ত্রিভুজের তিনটি সমান বাহু হইয়াছে। এই ত্রিভুজ কাম-কলার মূল সূত্রগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। যে বিন্দুগুলি কাম-কলার অঙ্গ তাহারা সংখ্যায় তিনটি—দুইটি কারণ এবং তৃতীয়টি কার্য।

(অ-পর) বিন্দু এবং বীজের পারস্পরিক ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত নাদ এবং যে শব্দ-ব্রহ্ম পর বিন্দুর বিভাগ কালে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল তাহারা পৃথক্। শেষোক্তটিকে মহা-নাদ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। সূর্যালোক যেমন আমাদের পরিচিত সমস্ত রঙীণ আলোকদ্বারা গঠিত তেমনই নাদের অভ্যন্তরে বর্ণমালার অন্তর্গত সমস্ত অক্ষরেরই অব্যক্ত ধ্বনি বর্তমান। বস্তুতঃ কুণ্ডলিনী রূপে প্রকাশিত মহানাদ বা শব্দ-ব্রহ্ম মানুষের শরীরে অবস্থিত এবং ইহা শব্দোচ্চারণের যন্ত্ররূপে কাজ করে।

কোন মন্ত্রকে অবিরাম আবৃত্তি করিলে সুষুম্নানাড়ীতে তাহা অব্যক্তভাবে ধ্বনিত হয়। এই ধ্বনি প্রসারিত হইতে থাকে এবং অ-পর নাদের সহিত মিশ্রিত হয়—কিন্তু ইহা উপরে স্থিত মহানাদের নিকট পৌঁছায় না বা পৌঁছাইতে পারে না। সাধারণ বায়ু মহানাদ পর্যন্ত পোঁছাইতে পারে না, সুতরাং মহানাদের কেন্দ্র এই বায়ুর প্রভাব হইতে মুক্ত। ইহা উল্লেখ করিলে কিছু আগ্রহের সঞ্চার হইতে পারে যে মহানাদ একদিকে ইহার উপরস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত পর-নাদের সহিত এবং অপরদিকে অপর নাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। অ-পর নাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ভ্রূ-মধ্য অতিক্রম করিয়া সুষুম্না নাড়ী দিয়া নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়। সর্ব-নিম্ন স্থলে নাদ কুণ্ডলিনীতে পরিণত হয়। বীজের যে সমস্ত ক্ষমতা কুণ্ডলিনীতে ব্যক্তরূপ ধারণ করে তাহারা সকলেই অ-পর নাদের অন্তর্ভুক্ত।

পর-বিন্দু যেস্থানে বর্তমান ধ্যানের পক্ষে তাহার বিশেষ মূল্য আছে। কারণ, ইহা একদিকে দৈবস্তর এবং অপর দিকে জাগতিক এবং পর-জাগতিক অঞ্চলের মধ্যে সংযোগস্থল। এই স্থানে নাদ মহানাদ অথবা শব্দ-ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার পর অনন্তসত্তার অন্তর্গত দৈব নাদ আছে, তাহার উপরে পর-নাদ, ইহা উন্মনী দৈব চৈতন্য এবং আলোক, আর নিম্নের মহানাদ জগৎ-সৃষ্টির আদি কারণ। এই দুইয়ের মধ্যে পর-বিন্দু আছে। এই জন্যই ইহাকে গুরুর ধ্যান করিবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলিয়া মনে করা হয়।

ইহা বলা যাইতে পারে যে বীজের মধ্যে বর্ণসমূহ আছে এবং যখনই মহানাদের নিম্ন-গামী ক্রিয়া-শক্তি ভ্রূ-মধ্য দিয়া মেরুদণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে তখনই এইগুলি নিম্নেকার ছয়টি কেন্দ্রে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে যাইতে বাধ্য হয়। মহানাদের বিকর এই বর্ণগুলি নাদ এবং বীজের মিশ্রণ বলিয়া বিশেষভাবে সক্রিয় শক্তির অধিকারী পর-বিন্দু হইতে জাত বিভিন্ন ক্রিয়া। মহানাদ বিন্দু-রূপ অবস্থার মধ্য দিয়া গমন না করিলে বিভিন্ন সৃজনী শক্তিগুলির জন্ম দিতে পারে না।

সৃষ্টির ক্রমিক অবস্থাসমূহ বর্ণনা করিতে আর বেশীদূর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। লক্ষণদেশিকা, শঙ্করাচার্য এবং অন্যান্য আচার্যকর্তৃক প্রবর্তিত ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া উপরে যে বিশ্লেষণমূলক বিবরণ দেওয়া হইল তাহাতে দেখা যায় যে, তিনটি নাদ আছে, যথা পর-বিন্দুর পূর্বগামী পর-নাদ, শব্দ-ব্রহ্ম নামে অভিহিত মহা-নাদ—ইহা পরবিন্দুর বিভাগের পর আবির্ভূত হয় এবং বিন্দু এবং বীজের মিলন হইতে জাত নাদ। সেইরূপভাবে দুইটি বিন্দু আছে—পর-নাদের কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে উৎপন্ন এবং সৃজনী-শক্তি সমূহের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ শব্দ-ব্রহ্মের উৎপাদক পর-বিন্দু এবং যাহা পর-বিন্দু হইতে উৎপন্ন এবং যাহাতে শিব-উপাদানের প্রাধান্য সেই অপর বিন্দু। কলা সম্বন্ধে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যে পরা-শক্তি দৈব সত্তার শাশ্বত সঙ্গিনী এবং যাহা হয় ইহাতে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হইয়া এবং ইহা হইতে পার্থক্যরহিত হইয়া নতুবা অংশতঃ আবির্ভূত হইয়া সর্বদাই ইহাতে থাকে তাহাই শ্রেষ্ঠ কলা। নিকৃষ্ট অর্থে লইলে কলা নামটি পূর্বোল্লিখিত বীজকেই বুঝায়। অর্থাৎ, বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে যাহাদের প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং যাহাদিগকে অপর-নাদের মূল উপাদান অথবা অনাহত ধ্বনি বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে তাহারাই এই অর্থে কলা। এই দৃষ্টি হইতে অ-ক-থ ত্রিভুজ যাহাকে কুণ্ডলিনী বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাই কলা।

৪

প্রাচীন আগমগুলিও সাধারণতঃ এইরূপ মত সমর্থন করে। বিশ্বাতীত শিবের সমস্ত ক্রিয়ার সহায়িকা পরা-শক্তি যাবতীয় তত্ত্বের সংগ্রহ।[২৩] ইহার মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব বিলীন থাকে। ইহা হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রের অন্তর্গত মহাশূন্য বা ব্যাপিনী পর্যন্ত কতকগুলি নির্দিষ্ট-সংখ্যক শক্তি আছে। এইগুলি ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর চৈতন্ত এবং শক্তিকে নির্দেশ করে (যথা অনাশ্রিতা, অনাথা, অনন্ত এবং ব্যোম-রূপা)। এইগুলি সবই অতিসূক্ষ্ম এবং যোগিগণ ইহদিগকে নেতিবাচক শব্দদ্বারা বর্ণনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রের পরবর্তী কোন একটি শক্তিকেই সদর্থক শব্দদ্বারা বর্ণনা করা যায় না। যে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া নাদ উপরে প্রবাহিত হয় তাহা ব্রহ্ম-রন্ধ্রে শেষ হইয়াছে।[২৪]

পরাশক্তিকে কখনও কখনও অমা-কলা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তখন ইহার উদ্দিষ্ট অর্থ হইতেছে এই যে, ইহা শাশ্বত, নিত্য-উদ্ভূত এবং অবিমিশ্র আনন্দ-স্বরূপ, অন্যান্য যে সকল কলা হইতে জগৎ নির্মিত হইয়াছে ইহা তাহাদিগকে পুষ্ট করে এবং তাহাদের সহায়তা করে। যখন ইহা বিসর্গ হইতে মুক্ত হয় তখন ইহা বাহ্য ব্যাপারে নিবিষ্ট হয় না এবং আপনাতেই অবস্থান করে। এই অবস্থায় ইহাকে শক্তি-কুণ্ডলিনী বা পরাসংবিৎ বলা হয় এবং যে নিজ দেহকে আশ্রয় করিয়া বিশ্রাম করিতেছে এমন একটি ঘুমন্ত সর্পের সহিত ইহার তুলনা করা হয়। কিন্তু যখন ইহা আলোড়িত হয় তখন ইহা বিসর্গে পরিণত হয়। এই বিসর্গ দুই প্রকার। সৃষ্টির পূর্বেকার যে আলোড়নকে আনন্দ বলে এবং যাহার প্রতীক হইতেছে 'অ' তাহা প্রথম প্রকারের এবং সৃষ্টির যে শেষ প্রচেষ্টা প্রাণের জন্ম দেয় এবং যাহার প্রতীক 'হ' তাহা দ্বিতীয় প্রকারের আলোড়ন। 'প্রাণ' অথবা 'হ' কে কখনও কখনও 'হংস' বা 'শূন্য' বলিয়াও বর্ণনা করা হয়। এই দুই প্রকার বিসর্গ পর এবং অপর বলিয়া জ্ঞাত। নাগরী লিপিতে ইহাদিগকে বিসর্জনীয়ের (ঃ) দুইটি বিন্দুরূপে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে। অমা-কলা এই দুইটি বিন্দুকে প্রকাশ করে এবং বস্তুসমূহের রূপ প্রকটিত করিবার জন্য বাহিরে প্রবাহিত হয়। জগতে যত রূপ আছে, তাহা জ্ঞাতারই হউক্, জ্ঞেয় বস্তুরই হউক্ বা জ্ঞানের করণেরই হউক্, তাহা অমা-কলার সহিত অ-ভিন্ন, যদিও তাহা উহা হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক রূপে যে বিশেষ প্রকাশ দৃষ্ট হয় তাহাই এই ভেদকে সূচিত করে। সুতরাং যে কুল-কুণ্ডলিনী বিসর্গে প্রকাশিত তাহাই আবার সংবিৎ-রূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত এবং গতি হইতে মুক্ত। প্রাণ কুণ্ডলিনী হইতেছে অপর প্রান্ত যেস্থলে সংবিৎ পূর্ণ এবং আত্মাশ্রয়ী। ইহার চরম সৃজন-ক্রিয়াকে পরবর্তী সৃষ্টি-প্রক্রিয়াসমূহ হইতে পৃথক করিতে হইবে, কারণ

ইহা আত্মার পক্ষে নিজেকে নিজের মধ্যেই বাহিরে বিক্ষেপ করা রূপ ক্রিয়া। সৃষ্টির আদি কারণ যেহেতু আত্মার বাহিরের কোন বস্তু নয় সেই হেতু আত্মাই জগৎরূপ কার্যের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ উভয়ই। সৃষ্টি-ক্রিয়া আত্মার মধ্যেই ঘটিয়া থাকে, উহা হইতে ভিন্ন দেশ-কালের ভিতরে নয়। যাহা বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ সৃষ্ট হয় তাহাও আত্মা হইতে পৃথক্ অন্য কিছু নয়। সুতরাং এই জগতের সব কিছু—ভিতরের হউক অথবা বাহিরে হউক—আত্মার প্রকারভেদ মাত্র। যাহা নিক্ষিপ্ত হয় তাহা ভিতরের এবং বাহিরের বস্তুরূপে প্রকাশিত বহুসংখ্যক আভাস। এইভাবে সংবিৎ জড়জগতে পরিণত হইবার সময়ে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন আক্ষরিক ধ্বনিরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। এইগুলি হইতেছে বিসর্গ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আকার এবং তাহাদের মধ্যে যেটি শেষ প্রান্তে অবস্থিত তাহা হইতেছে 'হ'। যে বিসর্গ কেবলমাত্র অপ্রকাশিত 'হ' তাহাকে কোন কোন গ্রন্থে (যথা কুল-গহ্বরে) কামশক্তি অর্থাৎ অবাধ ইচ্ছা-শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিসর্গ এবং বাস্তব জগতের মধ্যে কোন যথার্থ প্রভেদ না থাকায়, তাহাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে করা সম্ভব নয়। বিসর্গ নিজেই বাচ্য এবং বাচক এই উভয়রূপেই প্রকাশিত হয়। অসংখ্য রূপে প্রকাশিত হওয়াই বিসর্গের স্বভাব কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে বহু বস্তু উৎপন্ন করে না। যে পরা শক্তি আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া এই নানারূপে প্রকাশিত হয় তাহাই বিসর্গের অন্তর্নিহিত কারণ।[২৫]

সূক্ষ্ম বিসর্গ নিজেকে অবিরামভাবে প্রকাশিত করে এবং প্রত্যেক জীবের অন্তরে অবস্থিত নাদ (পর-বীজ) রূপে ইহা প্রাণের দ্যোতক এবং সকলেই অন্তরে ইহার অবস্থিতি অনুভব করিয়া থাকে, যদিও কেবল-মাত্র কোন কোন সময়ে ইহার বিশেষ আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। বিসর্গ পরম দেবতার সেই গুণ যাহা নিত্যমুক্ত এবং যাহার পঞ্চবিধ দৈবক্রিয়া আছে, যথা—সৃষ্টি, রক্ষা, সংহার অথবা বিলয়, করুণা এবং আপনাকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করা।

যাহা বিশ্বাতীত অর্থাৎ অনুত্তর (অ) তাহা ('হ' বা প্রাণ পর্যন্ত) বিসর্গ দ্বারা শক্তি (হ) রূপে আবির্ভূত হয় এবং তাহার পর আপনাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অদৃশ্য প্রকাশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ইহার নিজের শাশ্বত আত্মা এবং ইহাকে শিব-বিন্দু (ম)—অ-হ-ম্ বলা হয়। এইভাবে যে বিশ্বচৈতন্য কেবল চৈতন্যমাত্র তাহাতে 'অহং'-বোধ জন্মায়। দেহ প্রভৃতি অনাত্মার সহিত ইহার সম্বন্ধ একটি কালিক ঘটনা এবং মনস্তত্ত্বের সাহায্যে ইহাকে ব্যাখ্যা করা যায়। শুদ্ধ-চৈতন্যে অবস্থিত অহং-বোধ ইহাকে জীবের নিজ আত্মা (স্বাত্মন্) রূপে প্রকাশ করে। এই অহং-বোধ শিব এবং শক্তি উভয় কেই

নির্দেশ করে বলিয়া ইহার অখণ্ডতা বা ঐক্য হইতে শিব এবং শক্তির ঐক্য যৌক্তিকতার সহিত নিঃসৃত হয়। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত পূর্ণাহং-তার ইহাই গোপন তথ্য।

প্রকাশ এবং বিমর্শের ঐক্য হইতেছে কাম বা রবি (সূর্য) নামে অভিহিত বিন্দু। এই আদি বিন্দু হইতে দুইটি বিন্দুর উদ্ভব হইতেছে বিসর্গের অবস্থা। এই দুইটি বিন্দু চিৎ-কলা রূপে কল্পিত অগ্নি এবং সোম (চন্দ্র)। ইহা দ্বৈতাবস্থা নহে কিন্তু একটি অখণ্ড সমগ্র বস্তুর দুইটি অবিচ্ছেদ্য অংশের ঐক্য। বিন্দু এবং বিসর্গ এই দুইটি রূপের সম্মিলিত আকার দিব্য ঐক্যের অর্থযুক্ত প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ইহাও সত্য যে চরম অবস্থায় এই দুইটি অংশের জ্যোতিও ম্লান হইয়া যায়। এই বিন্দুগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া হইতে সুধা অর্থাৎ সৃজনী শক্তি বিশিষ্ট তরল পদার্থ প্রবাহিত হয়। ইহাই আনন্দ-স্বরূপ তথা-কথিত হার্ধকলা। অগ্নির তাপ যেমন মাখনের উপর ক্রিয়া করিয়া ইহাকে গলাইয়া দেয় ও প্রবাহিত করে এই পারস্পরিক ক্রিয়াও সেই প্রকার। এক হইতেছে সৎ, দুই হইতেছে স্বয়ং-চেতনরূপে সৎ অর্থাৎ চিৎ-কলা এবং এই দুইয়ের মধ্য হইতে প্রবাহিত হার্ধকলা আনন্দরূপে অনুভূত স্বয়ং-চৈতন্যের ফল। সুতরাং কাম-কলা রূপ সমগ্র বিদ্যা নিত্য সৃজন-ক্রিয়ার নির্দেশক সচ্চিদানন্দ বিদ্যা এবং ব্রহ্ম-বিদ্যা। যে আনন্দ প্রবাহিত হয় তাহার উপাদান সমস্ত সৃজনীশক্তির মূল-বস্তু।

প্রকাশ এবং বিমর্শ অভিন্ন হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকাশ সর্বদাই নিরংশ এবং অবিচ্ছিন্ন আর বিমর্শ নিরংশ এবং অংশ-সমূহে বিভাজ্য উভয়ই। সুতরাং যখনই প্রকাশকে বিচ্ছিন্ন বলা হয় তখনই বুঝিতে হইবে যে ইহা গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তিনটি বিন্দু একটি সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজ করে বলিয়া ইহারা যেন একটি ত্রিভুজ গঠন করে।

বিমর্শের অভ্যন্তরে প্রকাশ একটি শ্বেত বিন্দুর আকার ধারণ করে, এবং প্রকাশের অভ্যন্তরে বিমর্শ নাদ বলিয়া অভিহিত রক্ত বিন্দুর আকার ধারণ করে। এই দুইটি বিন্দু মিলিত হইয়া কাম নামে অভিহিত আদিম বিন্দু গঠন করে এবং এইগুলি তাহার কলা। এই তিনের ঐক্য হইতেছে কাম-কলা নামক বস্তু এবং ইহা হইতে শব্দ-সমূহ এবং তাহাদের উদ্দিষ্ট বস্তুসমূহ দ্বারা গঠিত সমগ্র জগতের উৎপত্তি হয়।

ভাস্কর-রায় তাঁহার বরিবস্যা-রহস্য নামক গ্রন্থে কাম-কলা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময়ে তিন বিন্দু এবং হার্ধকলার উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলির প্রকৃতি অত্যন্ত গূঢ় বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহার মতে শ্বেত এবং রক্ত বিন্দু দুইটি পুরুষ এবং স্ত্রী শক্তিকে নির্দেশ করে।

অমৃতানন্দ বলেন যে হার্ধকলা দুইটি বিন্দুর মধ্য হইতে প্রবাহিত হয় এবং ইহা বিমর্শ

বা স্ফুরত্তার লহরী। প্রকাশ অগ্নির সহিত এবং বিমর্শ উহার তাপে গলিত মাখনের সহিত তুলনীয়। এই প্রবাহ উপরে লিখিত তথাকথিত হার্ধকলা। তিন মাতৃকাদ্বারা গঠিত বৈন্দব-চক্র হার্ধকলা ও মাতৃকলার মিলিত প্রবাহ, এবং ইহা হইতেই ছত্রিশটি সৃজনকারী তত্ত্বের উদ্ভব হয়।[২৬]

৫

শক্তি যখন পরা কুণ্ডলিনী হইতে প্রাণ কুণ্ডলিনীতে পরিণত হয় তখন ঐশ্বরিক ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য তাহার আত্ম-নির্মিত আবরণের পিছনে অন্তর্হিত হয় এবং আত্মা তখন চিদণুরূপে প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। একটি ক্রম-যুক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া এই পরিণাম ঘটিয়া থাকে এবং ইহাতে শক্তিকুণ্ডলিনী মাতৃকা এবং বর্ণসমূহের আবির্ভাবের মধ্য দিয়া নিজেকে অধিক হইতে অধিকতর দৃঢ়ভাবে কুণ্ডলীকৃত করিয়া থাকে এবং প্রাণ অথবা শূন্যের স্তরে পৌঁছাইয়া থাকে। ইহা সুবিদিত যে সংবিৎ প্রথমে প্রাণে পরিণত হইলে তবেই যাহাতে তত্ত্বসমূহের উদ্ভব হইয়া থাকে সেই পরবর্তী নিয়মিত সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হইতে পারে।

প্রত্যক্ষজগৎ তত্ত্বসমূহ দ্বারা নির্মিত কতকগুলি ভুবন অর্থাৎ জীবন এবং চৈতন্যের স্তর দ্বারা নির্মিত। শাক্ত-শৈব আগমগুলিতে ছত্রিশটি তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিম্ন হইতে গণনা করিয়া চব্বিশটিকে অশুদ্ধ বলিয়া, তাহাদের পরের সাতটিকে মিশ্র বলিয়া এবং বাকী পাঁচটিকে শুদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই পরিকল্পনায় প্রকৃতি অশুদ্ধ তত্ত্বের শেষ তত্ত্ব, মায়া মিশ্র তত্ত্বগুলির শেষ তত্ত্ব এবং শিব শুদ্ধ তত্ত্বগুলির শেষ তত্ত্ব। প্রত্যেক তত্ত্বের সহিত সংযুক্ত কতকগুলি ভুবন আছে।[২৭] ভুবনগুলির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব-সমূহের গুণগুলিরই প্রাধান্য, কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনের ন্যায় এখানেও স্বীকৃত হইয়াছে যে সকল স্থানেই সকল বস্তু আছে (সর্বং সর্বাত্মকম)।[২৮] ভুবনসমূহ হইতেছে চেতন জীবদের আবাসস্থল। এই জীবগুলির যে সকল শরীর এবং ইন্দ্রিয় আছে তাহারা এমন বস্তু দিয়া গঠিত যাহার জড়ত্ব তাহাদের কার্য অথবা জ্ঞান এবং তাহাদের পূর্ণতার মাত্রানুসারে হইয়া থাকে। পৃথিবীতত্ত্বের ভুবনগুলি ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া পরিচিত অঞ্চলকে নির্দেশ করে। প্রকৃতি পর্যন্ত তত্ত্বসমূহের ভুবনগুলি দ্বারা প্রকৃত্যাণ্ড গঠিত। মায়া পর্যন্ত তত্ত্বসমূহের ভুবনগুলি দ্বারা মায়াণ্ড গঠিত এবং তাহার পরবর্তী শক্তি পর্যন্ত তত্ত্ব-সমূহের ভুবনগুলিদ্বারা বৃহত্তম অঞ্চল শক্ত্যাণ্ড গঠিত।[২৯] শক্তি-তত্ত্বের পরে সীমাবদ্ধ কোন কিছু নাই, সুতরাং অঞ্চলও নাই, কিন্তু যে শিব-তত্ত্ব বিন্দু এবং শান্ত্যতীতা কলার সহিত অভিন্ন তাহাতেই ভুবনসমূহ আছে এইরূপ বলা হইয়াছে।

তত্ত্বগুলিকে সাধারণতঃ চরম বস্তু বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা উহা নহে; কারণ, যে কলা এবং শক্তি সমূহ সমগ্র সৃষ্টির নিম্নে অবস্থিত, বিভিন্ন শক্তির এককগুলির সহিত অভিন্ন এবং যেগুলি সমগ্রভাবে বিশ্বাতীত শিবের আত্ম-প্রকাশের ভূমি তাহাদের দ্বারাই এইগুলি গঠিত। সুতরাং বিশ্বের মূল বস্তু হইতেছে শক্তি এবং পূর্বে যে প্রকারের বর্ণনা করা হইয়াছে সেই প্রকারে প্রকাশ এবং হার্ধকলা যাহা হইতে তত্ত্বগুলি উদ্ভূত হইয়াছে সেই বস্তুকে গঠন করে।

আত্মা যখন অণুভাব প্রাপ্ত হয়, চিৎ যখন চিত্তের আকার ধারণ করে তখন তাহার ঐশ্বরিক গুণসমূহও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তিনটি সুবিদিত অশুদ্ধতা বা মলের মধ্যে ইহাই প্রথম এবং ইহাকে আণব বলা হয়। ইহা পশুর অবস্থা এবং এই অবস্থায় সসীমতার বোধ প্রথমে আবির্ভূত হয়। এই সসীমতার জন্য বাসনাসমূহের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় এবং তাহার ফলে ভোগের দ্বারা এই বাসনাসমূহ ক্ষয় করিবার জন্য কিছুকাল জড়দেহ ধারণের প্রয়োজন হয়। এই সকল বাসনাই হইতেছে কর্ম-মল। (i) কার্যরূপ শরীর অর্থাৎ কলা-শরীর, (ii) সূক্ষ্ম অথবা পুর্যষ্টক শরীর অর্থাৎ তত্ত্ব-শরীর এবং (iii) স্থূল জড় শরীর অর্থাৎ ভুবনজ শরীর এই ত্রিবিধ শরীরের যাহা কারণ তাহাকে মায়ীয় মল বলা হয়। বস্তুতঃ আমাদের জ্ঞানে যাহা কিছু জ্ঞেয় এবং বাহ্য বলিয়া প্রকাশিত হয় তাহাকেই মায়ীয় মল বলা যাইতে পারে। কোন বস্তুকে বিষয়ী হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখানই এই মলের কার্য। কলা হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত তত্ত্বগুলিই মায়ার শৃঙ্খল অথবা পাশ। ইহারা জীবাত্মার ভোগ সাধনের জন্য শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ, ভুবন, ভাব ইত্যাদি গঠন করে।[৩৩] সুতরাং সাধারণতঃ যাহা সংসার নামে বিদিত তাহা পৃথিবী হইতে কলা পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু উহাকে অতিক্রম করে না। সংসারী জীবের মধ্যে এই তিনটি মল সর্বদাই বর্তমান।

সংসারী জীবকে দার্শনিক পরিভাষায় স-কল বলা হয়। কোন জীব যে তত্ত্ব বা ভুবনভুক্ত সে তাহার অনুরূপ শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহ লাভ করে। এই সকল জীব সর্বনিম্নভূমি হইতে কলা-ভূমিতে পর্যন্ত বর্তমান এবং তাহাদের কর্মানুসারে একভূমি হইতে অন্যভূমিতে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। জীবের অপর একটি অবস্থা আছে যাহাতে উপরে বর্ণিত মায়ীয় মল অনুপস্থিত থাকে কিন্তু অন্য দুইটি মল পূর্বেকার মতই থাকিয়া যায়। ইহা হইতেছে প্রলয়ের অবস্থা। ইহাতে জীব সমস্ত সৃষ্টিকারী তত্ত্ব হইতে মুক্ত থাকে, তাহার কোন শরীর থাকে না এবং মায়াতে নিমগ্ন হইয়া থাকে। এই সকল জীবকে প্রলয়াকল অথবা প্রলয়-কেবলী বলা হইয়া থাকে। ইহারা কর্মসংস্কার এবং মূলাবিদ্যার সহিত জড়িত অশরীরী এবং ইন্দ্রিয়বিহীন অণু। কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান,

বৈরাগ্য বা ঐরূপ অন্য কোন উপায়ে জীব কর্ম হইতে মুক্তিলাভ করে তখন ইহা আণবিক অবস্থায় থাকিলেও মায়াকে অতিক্রম করিয়া যায়। ইহা তখন মায়াকে অতিক্রম করে বটে কিন্তু মহামায়ার গণ্ডীর মধ্যেই থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বরের চরম করুণা তাহার উপর ক্রিয়া করে এবং যে মৌলিক অজ্ঞান ইহার আণবিকতা উৎপন্ন করিয়াছে এবং অনন্ত ক্ষমতাসমূহকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে তাহাকে দূর করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। আত্মার এই অবস্থা পশুর সর্বোচ্চ অবস্থা এবং ইহা বিজ্ঞানাকল অথবা বিজ্ঞানকেবলী বলিয়া বিদিত। ইহাই কৈবল্য। এই জীবগুলির মধ্যে যাহাদের কলুষ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তাহারা পরবর্তী কল্পের প্রথমে ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করিবার উপযুক্ত হয়। জীবের প্রতি ঈশ্বরানুগ্রহের ফলে যে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার উদ্ভব হয় তাহাই তথাকথিত শুদ্ধ বিদ্যার উৎস।[৩১]

ইহার পর জীবের যে সকল অবস্থার আবির্ভাব হয় তাহারা পশুর নয় স্বয়ং শিবের, কিন্তু কতকগুলি ন্যূনতা থাকিয়া যায়। দ্বৈতবাদিদের মতে এইগুলি হইতেছে অধিকার, ভোগ এবং লয়।[৩২] যথাকালে শুদ্ধ অবস্থায় জীবের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত এইগুলি দূর হইয়া যায়।[৩৩]

প্রজ্ঞার আবির্ভাবের পর আধ্যাত্মিক পূর্ণতার যে সকল অবস্থা ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হয় জীবসমূহ যে সকল তত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট সেইগুলিই তাহাদিগকে নির্দেশ করে। সর্বাপেক্ষা নিম্ন অবস্থা হইতেছে মন্ত্র, ইহা শুদ্ধ বিদ্যার অনুযায়ী। মন্ত্রেশ্বরদের অবস্থা হইতেছে উচ্চতর অবস্থা, ইহা ঈশ্বর-তত্ত্বের অনুযায়ী। তদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা হইতেছে মন্ত্রমহেশ্বরদের অবস্থা, ইহা সদা-শিবের অনুযায়ী এবং তদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা হইতেছে শিবাবস্থা, ইহা শিব-তত্ত্বের অনুযায়ী। শিবাবস্থা শুদ্ধ, পূর্ণ চৈতন্য বলিয়া বিশ্বাতীত, কিন্তু বস্তুতঃ চরম-তত্ত্ব হইতেছেন পরম-শিব যাঁহাতে সমস্ত তত্ত্বের সহিত ঐক্যভাব এবং সমস্ত তত্ত্বাতীত ভাব একই সঙ্গে বর্তমান।[৩৪]

আত্মার ক্ষমতাসমূহের ন্যূনতা আছে বলিয়া আত্মা বদ্ধ। শাক্তদের মতে চিদাকাশে মাতৃকা (জগতের মাতৃসমূহ) বলিয়া কতকগুলি গুপ্তশক্তি নিহিত আছে এবং উপরে বর্ণিত মলসমূহ এবং কলা সকল অর্থাৎ ভাষার অক্ষর-ধ্বনি সকল ইহাদের অধীন। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান মাতৃকা হইতেছেন অম্বিকা। তাঁহার তিনটি রূপ আছে যথা—জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী এবং বামা, এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ ক্রিয়া আছে। কলাগুলি হইতেছে মানব-বাণীর সেই সকল চরম একক যাহাদের সহিত চিন্তা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই মাতৃকাগুলি প্রত্যেক জীবের সবিকল্পক অথবা নির্বিকল্পক প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়াকালে একটি আভ্যন্তরীণ জ্ঞান (অন্তঃপরামর্শ) উৎপন্ন

করে এবং এই জ্ঞান শব্দের সহিত মিলিত হওয়ার ফলে একপ্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই সকল শক্তির প্রভাবে জ্ঞান এইভাবে সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, অহঙ্কার, ভয়, আশা ইত্যাদি রূপ ধারণ করে। এইরূপে ভাবসমূহ জন্মগ্রহণ করে এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবাত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই মাতৃকা-গুলি হইতেছে গুপ্তবন্ধন। ইহারা জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু যখন তাহারা যথার্থভাবে জ্ঞাত হয় এবং তাহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় তখন তাহারা উহাকে সিদ্ধি অর্থাৎ অলৌকিক মানস ক্ষমতা সমূহ লাভ করিতে সহায়তা করে।

তথাকথিত ব্রহ্ম-গ্রন্থি যতক্ষণ না ছিন্ন হয় ততদিন পর্যন্ত চিদাকাশে এই শক্তি-গুলি সক্রিয় থাকে। স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই গ্রন্থি চৈতন্য এবং জড় বস্তুর মধ্যে ঐক্য-গ্রন্থি এবং মনুষ্যের মধ্যে অহং-বোধের উৎস। ইহা হইতেই কুণ্ডলিনীর নৈতিক ক্রিয়া যে কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহা বলা হইয়াছে যে মাতৃকাকে যদি তুষ্ট করা না হয় এবং গ্রন্থিকে যদি দূর না করা হয় তাহা হইলে তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের পরেও জীব প্রমাদ বশতঃ ইহার পাশে বদ্ধ হইতে পারে এবং শব্দের জালে জড়িত হইয়া পড়িতে পারে এবং পুনরায় তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়া বিপথগামী হইতে পারে।

ঐশ্বরিক ইচ্ছা এক এবং অবিভক্ত, কিন্তু যখন এই ইচ্ছার ন্যায়ই নিত্য নাদ হইতে মাতৃকা সমূহের উদ্ভব হয় তখন এই ইচ্ছা বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্যের এই বিভাগ ইহার উপাদান স্বরূপ জ্ঞানও ক্রিয়ার মধ্যে ভেদ উৎপন্ন করে। পরমাত্মা যখন আণবিক অবস্থা ধারণ করেন তখন ইহার স্বাতন্ত্র্য এবং বোধ বা বিমর্শের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহার সহিত বস্তুতঃ এই ভেদ অভিন্ন। এই অবস্থায় জ্ঞান তিনটি অন্তরিন্দ্রিয় এবং পাঁচটি বহিরিন্দ্রয়ে পরিণত হয় এবং ক্রিয়া পঞ্চপ্রাণ এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়। ইহারা যথাক্রমে দেহের জৈবক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াসমূহের সহিত সংযুক্ত।

এখন দ্বৈতবাদী আগমগুলির দৃষ্টিভঙ্গী সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই-গুলিতে ঈশ্বর-সত্তা বা শিবকে এমন একটি শক্তির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ বলিয়া মনে করা হইয়াছে যাহা সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক এবং ঈশ্বর-সত্তার সহিত অভিন্ন। সত্তা এবং শক্তি এই দুইটিই চিৎ বা শুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ, ইহারা একই ঈশ্বর-সত্তার দুইটি বিভিন্ন প্রকার। শিব হইতেছেন সর্বাতীত ঐক্য। শক্তিও বস্তুতঃ একই, যদিও ইহা যে সকল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে ইহা জ্ঞান এবং ক্রিয়ারূপে প্রতিভাত হয়। ইহা শিবের ইচ্ছা এবং স্বরূপতঃ তাঁহা হইতে অভিন্ন। বিন্দু হইতেছে

শক্তির বাহিরে নিত্য জড়-বস্তু কিন্তু ইহার ক্রিয়ার অধীন। ইহা শিব এবং শক্তির মতই নিত্য, এবং এই তিনটি তত্ত্বকে সাধারণতঃ শৈব ধর্মের তিনটি রত্ন এবং ইহার পবিত্র ত্রিমূর্তি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সৃষ্টিবিষয়ে (শুদ্ধ সৃষ্টিতে সাক্ষাৎ ভাবে এবং অশুদ্ধ সৃষ্টিতে পরোক্ষভাবে) শিব হইতেছেন কর্তা, শক্তি তাঁহার যন্ত্র এবং বিন্দু জড় উপাদান। শক্তি জড়-স্বভাব নয় বলিয়া ক্রিয়ার সময়ে ইহাতে কোন পরিবর্তন হয় না কিন্তু বিন্দুতে হইয়া থাকে। প্রলয়ের শেষে ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে বিন্দুতে ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে তাহাতে যে পরিবর্তন হয় তাহা হইতে পাঁচটি কলার সৃষ্টি হয়। ইহারা অধিক হইতে অধিকতর বিস্তারবিশিষ্ট পাঁচটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তরূপে দেখা দেয়। এই কলাগুলি তত্ত্ব এবং ভুবন নামে অভিহিত পরবর্তী অধিকতর উন্নতশ্রেণীর বিকারের উদ্ভব হইবার আগেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের নাম যথাক্রমে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি এবং শান্ত্যতীতা। বাস্তব জগতের (অর্থের) দিক্ হইতে দেখিলে ইহা বিন্দুর পরিণামের একটি দিক। শব্দের পরিণাম হইতেছে আর একটি দিক্। এই দিক্ হইতে নাদ, বিন্দু এবং বর্ণকে বিন্দুর ত্রিবিধ প্রকাশ বলা যাইতে পারে। ইহারা ক্রমবর্ধমান বহির্মুখিতা অনুসারে বিন্যস্ত।

এই মতবাদে বিন্দু, মহামায়া এবং কুণ্ডলিনী একার্থক। বিন্দু বিশুদ্ধ জড়-শক্তি এবং ইহা অবিশুদ্ধ মায়া ও প্রকৃতি হইতে পৃথক।[৩৫] ইহা বিশুদ্ধ সৃষ্টির উৎস এবং ইহাদের বিবর্তনের দুইটি সমান্তরাল ধারা, শব্দ ও অর্থ, ইহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহার স্বভাবের দুইটি দিক্ আছে বলিতে হইবে। পৌষ্কর আগমে বলা হইয়াছে—

শব্দবস্তুভয়াত্মাসৌ বিন্দুর্নান্য-তরাত্মকঃ

মহামায়ার ক্ষোভ হইতে উৎপন্ন শাব্দ সৃষ্টির ক্রম এইভাবে দেওয়া হইয়াছে

(i) মহামায়া
(ii) নাদ
(iii) বিন্দু
(iv) সাদাখ্য
(v) ঈশ
(vi) বিদ্যা

এই পরিকল্পনাতে মহামায়া অ-বিক্ষুব্ধ অবস্থায় পর-বিন্দুকে নির্দেশ করে এবং নাদ ঐ বিন্দুর উপরেই যখন চিৎ-শক্তি ক্রিয়া করিয়াছে তখন তাহাকে নির্দেশ করে। বিন্দুর উপর শক্তি এক অর্থে অবিরাম ক্রিয়া করে বলিয়া ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে (i) এবং (ii) বস্তুতঃ একই তত্ত্বের দুইটি আকার (ইহাদের মধ্যে একটি যৌক্তিক দৃষ্টিতে অপরের পরবর্তী হইলেও বস্তুতঃ ইহারা সমকালীন), নাদ মহামায়ার বিক্ষুব্ধ অংশকে নির্দেশ করে। মহামায়া স্বরূপতঃ কুণ্ডলিনী হইলে সেই একই কুণ্ডলিনীর জাগ্রত এবং সক্রিয় অবস্থাই নাদ। মহামায়ারূপে মহামায়ার সহিত পুরুষ অর্থাৎ

মানবাত্মার কোন সম্বন্ধ নাই কিন্তু নাদ বা কুণ্ডলিনীরূপে ইনি সাধারণ অথবা অসাধারণ পুরুষের অন্তরে বাস করেন।[৩৬] বস্তুতঃ মহামায়ার পরা অথবা সূক্ষ্মা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী—এই চতুর্বিধ বাক্‌রূপে বিবর্তন এবং অনাদিকাল হইতে আদিম মলের প্রভাবে প্রত্যেক মানবাত্মার অন্তর্নিহিত শিবত্বের নিষ্প্রভ হইয়া যাওয়া—এই দুইটিই সমানভাবে শাশ্বত ব্যাপার। পরা-বাক্‌কে অতিক্রম করিয়া যাওয়া এবং এই মালিন্যের আবরণ অপসারিত হওয়া একই ক্রিয়াকে নির্দেশ করে। ইহা মানবাত্মার ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হওয়ার সমাপ্তির একটি নাম মাত্র এবং ইহাকে এই সম্প্রদায়ের দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মানবাত্মা কর্তৃক অবলুপ্ত বিশুদ্ধতার পুনঃপ্রাপ্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। এখন আমরা বুঝিতে পারি, যে কখনও কখনও মহামায়াকে এবং অন্য সময়ে নাদকে শিব-তত্ত্বের সহিত অভিন্ন বলিয়া কেন বর্ণনা করা হইয়াছে। এইভাবে ব্যাখ্যাত হইলে বিন্দু (iii) অপর-বিন্দুকে বুঝাইবে এবং শক্তি-তত্ত্বের একটি নাম হইবে। পরবর্তী বিকার সাদাখ্য (iv), মানব সদাশিবসমূহ, অণু-সদাশিবসমূহ, পঞ্চ ব্রহ্মা, দশ অণু (প্রণব ইত্যাদি) এবং ছয় অঙ্গ সংবলিত সদাশিবতত্ত্ব ইহার অন্তর্গত। ইহাই অক্ষর বিন্দু[৩৭] এবং ইহা স্থূল অথচ অবিভক্ত ধ্বনিরূপ নাদকে নির্দেশ করে। ঈশ নামে কথিত অবস্থা (v) উপরে বর্ণিত অক্ষর-বিন্দু এবং বৈখরী বাক্-এর মধ্যবর্তী অবস্থা, ইহা বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিন্যস্ত বর্ণমালার অন্তর্গত যাবতীয় অক্ষরের সমবায়রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।[৩৮] আট মন্ত্রেশ্বর এবং তাহাদের শক্তি সমূহ (সংখ্যায় আট, বামা ইত্যাদি) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শব্দ ক্রমবিকাশের শেষ স্তর হইল বিদ্যা (vi)। যাবতীয় মন্ত্র এবং বিদ্যা, সমস্ত আগম এবং তথাকথিত বিদ্যা-রাজ্ঞীগণ (বিদ্যাসমূহের রাণীরা, সংখ্যায় সাত)—বস্তুতঃ আমাদের পরিচিত সমস্ত শ্রাব্য এবং অনুভব-গম্য শব্দসমূহ ইহার অন্তর্গত।

ইহা লক্ষণীয় যে উপরে বর্ণিত মহামায়াকে পরা-শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং জগতের পরম-কারণ বলা হইয়াছে। ইহা নাদেরও স্বভাব বিশিষ্ট এবং সূক্ষ্মনাদরূপে অপর-নাদ হইতে ইহাকে পৃথক করা যায়।[৩৯]

দ্বৈতবাদীরা শাব্দজ্ঞান সম্পর্কে স্ফোটবাদ এবং সমশ্রেণীর অন্যান্য মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া নাদ-মতবাদ সমর্থন করেন এবং এই মতবাদের ভিত্তিতে শাব্দ-বোধের উৎপত্তিরূপ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। রামকণ্ঠ তাঁহার কারিকাগুলিতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে স্ফোটবাদ শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। একটি শব্দও তাহার অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ সাধারণতঃ বাচ্য-বাচক ভাব বলিয়া জ্ঞাত—যাহা নির্দেশ বা প্রকাশ করে (বাচক) এবং যাহা ইহার দ্বারা নির্দিষ্ট বা প্রকাশিত হয়

(বাচ্য) তাহাদের সম্বন্ধ। কিন্তু আলোচ্য শব্দের বাচকতা কি করিয়া থাকে ? শব্দ যে বস্তুকে নির্দেশ করে তাহা বাহিরের, কিন্তু যে শব্দ উহাকে নির্দেশ করে তাহা মানস (বুদ্ধ্যারূঢ়)—এই দুইটি পৃথক এবং অ-সম। কোন শব্দই আপন স্বাভাবিক শক্তিতে ইহার অর্থের নির্দেশ করিতে পারে না, কিন্তু ইহা যখন বাহিরে অবস্থিত কোন বাচ্যের একটি মানস প্রতিচ্ছবি (পরামর্শ) গঠন করে কেবলমাত্র তখনই ইহার নির্দেশ করিবার শক্তি প্রকাশিত হয়। পরামর্শ-জ্ঞান নামে অভিহিত এই প্রতিচ্ছবি যাহাকে চিন্তার আকার বলা হয় তাহার স্বভাব-বিশিষ্ট এবং ইহা বিষয়কে প্রকাশিত করে। এই পরামর্শ-জ্ঞান সংশ্লিষ্ট বস্তুকে প্রকাশ করে বলিয়া কোন কোন দার্শনিক ইহারই নির্দেশ করিবার ক্ষমতা আছে এইরূপ বলিতে চাহেন, কিন্তু তান্ত্রিক দার্শনিকদের মত এই যে যদিও বুদ্ধির ক্রিয়ারূপে পরামর্শ-জ্ঞান বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর না করিয়াই বর্তমান থাকে তাহা হইলেও ইহা পর-নির্ভরশীল বস্তু এবং ইহার পিছনে কতকগুলি কারণের ক্রিয়ার ফলে ইহা উদ্ভূত হয়। যে সকল বাহ্য বস্তু পূর্বে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত হয় নাই তাহাদের ক্ষেত্রে এরূপ ক্রিয়া হয় না। রূপ, রস ইত্যাদি বক্তার মানস পরামর্শের বিষয় হইয়া থাকে। যাহার মধ্য দিয়া এইরূপ পরামর্শের উৎপত্তি সম্ভব হইয়া থাকে তাহাকে নাদ বলা হয়। জড় শব্দ নয় পরন্তু যে নাদ পরামর্শ-জ্ঞান (অন্তঃ সংকল্প) উৎপন্ন করে তাহারই বাচকতা আছে। বক্তার বাগ্‌যন্ত্র যে জড় শব্দকে প্রকট করে তাহা নাদকে প্রকাশ করে। এইরূপ ভাবে প্রকাশিত হইলে নাদ শ্রোতার মনে উদ্দিষ্ট বস্তুর বোধ উৎপন্ন করে। নাদ সকল শব্দ এবং অর্থকে প্রকাশ করে। সুতরাং চিন্তামূলক জ্ঞানের প্রত্যেক ক্রিয়াই শব্দগর্ভ।

নাদ বহুসংখ্যক, প্রত্যেক ব্যক্তিতে ইহা অসাধারণ এবং ইহা কারণ হইতে জাত। প্রত্যেক পশু-আত্মার একটি নিজস্ব প্রকৃতি আছে এবং ইহা অনাহত বিন্দু হইতে উৎপন্ন নিজের নাদকে অনুভব করিয়া থাকে।

শাক্তেরা মোক্ষের উপায় হিসাবে আত্ম-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করেন। ইহা একটি নির্দিষ্ট স্বভাব-বিশিষ্ট এইরূপ বলা হয় এবং ইহা প্রত্যভিজ্ঞার আকারে নিজেকে প্রকাশ করে। ইহার প্রথম অবস্থার বিভিন্ন ক্রম এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :—

(i) যে ব্যক্তির বৈরাগ্য প্রভৃতি জ্ঞানলাভের উপযোগী যোগ্যতা আছে সে আগমসমূহের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আত্মা সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে।

(ii) যুক্তিযুক্ত বিচারের সাহায্যে সন্দেহ দূর হয়।

(iii) আত্মা এবং দেহ প্রভৃতি এক এই ভ্রান্ত ধারণা যাহা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে তাহা দূর হইবার পর জীবাত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান বা অনুভূতি হয়।

(iv) সর্বশেষে প্রত্যভিজ্ঞার উদয় হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে একান্ত ঐক্য শাস্ত্রের সাহায্যে জানা যায় তাহাই ইহার বিষয়। এইভাবে যে প্রত্যভিজ্ঞার উদয় হয় তাহা সংসার-দশার মূল যে অজ্ঞান তাহা নাশ করে।

এই প্রত্যভিজ্ঞা ভ্রান্ত নয়, ইহা অন্যান্য সবিকল্পক জ্ঞানের ন্যায় একপ্রকার বিকল্প।

সমাধি হইতে উৎপন্ন নির্বিকল্প জ্ঞান এবং পূর্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় একই, কিন্তু কারণ-ঘটিত উপাদানের পার্থক্যের জন্যই তাহাদের প্রভেদ। প্রত্যভিজ্ঞার ক্ষেত্রে যে মন আত্মা ভিন্ন অন্যান্য সকল বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং 'আমি এবং তিনি' এই অবধারণের 'আমি' এবং 'তিনি' এই দুই শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুদ্বয়ের জ্ঞানে উপস্থিতির সাহায্য পাইয়াছে সেই মনই জ্ঞানের করণ। সমাধিজ জ্ঞানে এইরূপ বস্তুর উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নাই। 'ইহা সেই ঘটই' এই রূপ প্রত্যভিজ্ঞায় একটি অখণ্ড দ্রব্য বিষয় হইয়া থাকে। সাধারণ সবিকল্প জ্ঞান যাহার বিষয় ঘট এবং 'ইহা একই ঘট' এই প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় অভিন্ন কিন্তু কারণঘটিত উপাদানের প্রভেদের জন্য ফল বিভিন্ন হয়। নির্বিকল্প জ্ঞান শুদ্ধ, সমস্ত বিকল্পের আশ্রয় এবং কোন বিকল্পের সহিত ইহার বিরোধ নাই, সেইজন্য ইহা অজ্ঞানের ন্যায় বিকল্পকে ধ্বংস করিতে অসমর্থ।

নির্বিকল্পজ্ঞান বিচার হইতে মুক্ত বলিয়া শুদ্ধ। নির্মল দর্পণে যেমন কোন বস্তুর সান্নিধ্য হেতু উহা তাহাতে প্রতিফলিত হয় সেইরূপ সংকল্পের সময় নানারূপ আকারের আবির্ভাবের জন্য এই শুদ্ধজ্ঞানের পটভূমিতে সকলপ্রকার সম্ভাব্য বিকল্পের উদয় হয়।

বৈশেষিকেরা যেমন অজ্ঞানকে কেবলমাত্র জ্ঞানের অভাব বলিয়া মনে করেন কিংবা বেদান্তী যেমন অজ্ঞানকে অনির্বচনীয় বলিয়া মনে করেন শাক্তেরা তাহা করেন না; তাঁহারা অজ্ঞানকে একপ্রকার সবিকল্পক জ্ঞান বলিয়া মনে করেন। আগমসমূহের মতে পরমাত্মা শুদ্ধ চৈতন্য বলিয়া যাহা জড় হইতে ইহাকে পৃথক্ করে তাহা ইহার স্ফুরক্রপতা (আত্ম-জ্ঞান)। ইহাই হইতেছে স্বাতন্ত্র্য। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে ইহার মাধ্যমে অবিদ্যা প্রকাশিত হয় এবং অবিদ্যার মাধ্যমে জগৎ প্রকাশিত হয়।

অজ্ঞানের দুইটি রূপ—ইহাকে কারণরূপে দেখা যাইতে পারে অথবা কার্যরূপে দেখা যাইতে পারে। কারণ-রূপে ইহা কাহারও নিজের আত্মার পরিপূর্ণতার প্রকাশাভাব। দেশ, কাল ও আকারের সীমাবদ্ধতা হইতে মুক্ততা এই পরিপূর্ণতার বৈশিষ্ট্য, কিন্তু ইহাও

সত্য যে এই সকল পদার্থও আত্মার আলোকেই প্রকাশিত হয় এবং উহাকে সীমিত করিতে পারে না। যে আত্মা কাল কর্তৃক সীমিত নয় তাহা যদি নিজেকে এইরূপভাবে সীমিত বলিয়া প্রকাশ করে তাহা হইলে ইহাকে পূর্ণত্বের অ-প্রকাশই বলিতে হইবে। পূর্বেই যেমন বলা হইয়াছে ইহাই মূল অজ্ঞান সম্বন্ধে শাক্ত মত। কার্য হিসাবে অজ্ঞান হইতেছে যাহা আত্মা নয়, যেমন দেহ ইত্যাদি, তাহার আত্মা-রূপে প্রকাশ। অজ্ঞান-বৃক্ষের ইহা একটি পল্লব মাত্র।

গুরু কর্তৃক ব্যাখ্যাত আগম শ্রবণ করিয়া যখন কেহ অখণ্ড আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে তখন তাহা পরোক্ষজ্ঞান, আর যখন ইহা সাক্ষাৎভাবে সমাধি হইতে উৎপন্ন হয় তখন ইহা অপরোক্ষ। যে অপরোক্ষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হয় একমাত্র তাহাই সংসারের মূলকে বিনষ্ট করিতে পারে। দেহের সহিত একাত্মবোধ হইতে বাসনার জন্ম হয়। ইহা বহু কাল ব্যাপিয়া থাকিলে দৃঢ় হইয়া যায় এবং অশুদ্ধ মনে অপরোক্ষ জ্ঞানের চমক মুহূর্তের জন্য দেখা দিলেও সেইরূপ জ্ঞানকে দৃঢ় সঙ্কল্প উৎপন্ন করিতে দেয় না। সমাধির চরমাবস্থা হইতে যখন ইহা উদ্ভূত হয় তখন প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা আসে এবং ঐ বাসনাকে ধ্বংস করে। দেহের সহিত একাত্মবোধ প্রবল থাকায় শুদ্ধ আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞানও সংশয় এবং ভ্রম দ্বারা দূষিত হইলে অজ্ঞান দূর করিতে এবং মোক্ষ উৎপাদন করিতে অক্ষম হয়।

অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের পূর্বে পরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়। সমাধির স্থান এই দুইয়ের মধ্যে। ইহা বলা হয় যে পরোক্ষ জ্ঞানেরও প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ সমাধি ঈপ্সিত ফল, অর্থাৎ যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তির অপরোক্ষ জ্ঞান হয় নাই তাহাদের মনে প্রত্যভিজ্ঞারূপ অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি কখনও মণির কথা শুনে নাই এবং ইহাকে বর্ণনার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানে না সে ইহাকে মণিকারের দোকানে দেখিলেও মণি বলিয়া চিনিতে পারিবে না। যে ইহা দেখিয়াছে মনোযোগ দিলে কেবলমাত্র সেই ইহা চিনিতে পারে। সুতরাং যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শুনে নাই স্বাভাবিক সমাধিও তাহাতে ব্রহ্ম-জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না।

অদ্বৈত-জ্ঞান অতি দুর্লভ। ধ্যান বা উপাসনা দ্বারা আপনার ঐশ্বরিক আত্মার তুষ্টিসাধন করিয়া মন যতক্ষণ পর্যন্ত না মায়ার মোহিনী শক্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা আবির্ভূত হয় না বা হইতে পারে না। জীবের উপর ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হওয়া এবং ইহাকে পবিত্র করা যে কত প্রয়োজন তাহা বাড়াইয়া বলা ভব।

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অগ্রগতির একটা ক্রম আছে। স্বতন্ত্রানন্দ তাঁহার মাতৃকা-

চক্র-বিবেকে বলিয়াছেন যে শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলে জ্ঞেয় বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়-সমূহের সহিত এক হইয়া যায় এবং ইহার ফলে বিষয়গুলি বিষয়রূপে লুপ্ত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু জগৎ তখনও চলিতে থাকায় জ্ঞাতার বাহিরের 'কিছু' রূপে ইদন্তার বোধ একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তাহার পরের অবস্থা হইতেছে ঈশ্বরের অবস্থা। এই অবস্থায় গতিশীল বস্তুগুলি অনুরূপভাবে কর্মেন্দ্রিয় সমূহের সহিত একীভূত হইয়া যায় এবং এই কর্মেন্দ্রিয়গুলি কর্তারূপ বিষয়ী যে বিশ্ব দেহের সহিত একীভূত হইয়াছে তাহার সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় যোগী কেবলমাত্র ব্যক্তিগত দেহের সহিত নয় পরন্তু সমগ্র বিশ্বের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। ইহার পর যে সদা-শিবের অবস্থার আবির্ভাব হয় তাহাতে যে সকল ইন্দ্রিয়ে বিষয়গুলি বিলীন হইয়া গিয়াছে তাহারা প্রকৃত বিষয়ী অর্থাৎ আত্মার সহিত এক হইয়া যায়। ইহা হইতেছে সর্বজ্ঞতার অবস্থা। শক্তি-অবস্থায় বিশ্ব-দেহ এবং সর্বজ্ঞ আত্মা এক হইয়া যায়। এই অবস্থাই চিৎ এবং অ-চিৎ-এর অনুপক্রুত সাম্যাবস্থা।

দ্রষ্টব্য

১। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন ব্রহ্ম-সূত্র এবং ঈশোপনিষদের উপর শক্তি-ভাষ্যে (বারাণসীতে ১৮৫৯-৬১ শকাব্দে প্রকাশিত) ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তিনি যাহাকে শাক্ত দৃষ্টি ভঙ্গী বলিয়া মনে করিতেন তাহাকে প্রকট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা প্রশংসনীয়, কিন্তু শাক্ত সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী সমূহের কোনটিই ইহাতে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয় নাই।

২। সর্ব-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ, শঙ্করাচার্যকে যাহার প্রণেতা বলিয়া মনে করা হয়, হরিভদ্র এবং রাজশেখর প্রণীত ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়, জিনদত্ত প্রণীত বিবেক-বিলাস একই শ্রেণীর গ্রন্থ, কিন্তু ইহাদের কোনটিতেই শাক্ত মতবাদ বিবৃত হয় নাই অথবা এমন কি ইহার নামও উল্লেখ করা হয় নাই।

৩। এই অবতরণ হইয়াছে পরা-বাক্ হইতে পশ্যন্তী এবং মধ্যমার মধ্য দিয়া বৈখরীর স্তরে (জয়রথের তন্ত্রালোক ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪ এবং জে, সি, চ্যাটার্জ্জীর "কাশ্মীর শৈব মত-বাদ" পৃঃ ৪-৬ দেখুন)। এই অবতরণের ক্রম সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ আছে কিন্তু উহাদের মূল ধারণা একই। পরশুরাম-কল্পসূত্র ১।২, ভাস্কর রায় প্রণীত সেতু বন্ধ ৭, ৪৭ চিদ্‌বল্লী সমেত কামকলা-বিলাস, ৫০-৩; যোগিনী-হৃদয়-দীপিকা পৃঃ :-৩ সৌভাগ্য সুভগোদয় (দীপিকায় উদ্ধৃত পৃঃ ৭৯-৮২) ইত্যাদি তুলনীয়।

৪। অপরোক্ষ জ্ঞান কি উপায়ে চিন্তায় পরিণত হয় সে সম্বন্ধে পতঞ্জলির মত এই

যে ইহা শব্দের সহিত সম্বন্ধের জন্যই হইয়া থাকে। নির্বিতর্ক সমাধিদ্বারা কোন বস্তু সম্বন্ধে যোগীর যে অতীন্দ্রিয় অনুভব লাভ হয় তাহা এক অসাধারণ প্রকৃতির সাক্ষাৎ জ্ঞান উৎপন্ন করে, কিন্তু ইহা অন্যদের জানাইতে হইলে ইহাকে শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত হইতে হইবে এবং তখন ভাষার মাধ্যমে সেই চিন্তা অন্যের নিকট চালিত হইবে।

৫। Annals of the Bhandarkar Institue, ১৯২৩-২৪, ৫ম খণ্ডে প্রকাশিত গোপীনাথ কবিরাজের The Doctrine of Pratibha in Indian Philosophy পৃঃ ১-১৮, ২২৩-৩২ দেখুন।

৬। Sir John Woodroffe—Shakti and Shakta, পৃঃ ১৫৫-৫৭, কল্যাণ, শক্তি-সংখ্যা পৃঃ ৬৩৭-৯৩

৭। জয়রথ তন্ত্রালোক ১।১৮। শঙ্করের সৌন্দর্য লহরী (৫।৩৭) তে চৌষট্টিটি তন্ত্রের উল্লেখ আছে। লক্ষ্মীধরের ভাষ্যে উহাদের নামের তালিকা দেওয়া আছে। সর্বোল্লাস এবং বামহেশ্বরতন্ত্রে অন্যান্য তালিকা দেখা যায়।

৮। নাগানন্দকে একটি শক্তিসূত্রের প্রণেতা বলিয়া মনে করা হয়। ভরদ্বাজকে অপর একটি শক্তি-সূত্রের প্রণেতা বলিয়া মনে করা হয় (কল্যাণ পৃঃ ৬২৪) এই সকল গ্রন্থের প্রণেতা কাঁহারা সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই।

৯। অগস্ত্যকে শ্রীবিদ্যা-দীপিকা নামক একটি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া মনে করা হয়। ইহাতে হয়গ্রীবের নিকট হইতে প্রাপ্ত পঞ্চদশী-মন্ত্রের একটি ব্যাখ্যা আছে।

১০। জে, সি চ্যাটার্জী—কাশ্মীর শৈব মত-বাদ পৃঃ ২৩-২৪ কে, সি, পাণ্ডে—অভিনবগুপ্ত পৃঃ ৭২ (পৃঃ ৫৫ তুঃ। ইহাতে দুর্বাসা কৃষ্ণকে একটি অদ্বৈতবাদী আগম শিখাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে)

১১। ললিত-বিস্তর রত্নের গ্রন্থকার-পরিচয়ে দুর্বাসাকে সকলাগমাচার্যচক্রবর্তী বলা হইয়াছে। নিত্যানন্দ তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, দুর্বাসা, যাঁহার অপর নাম ক্রোধ-ভট্টারক, প্রকৃতপক্ষে অনুরূপার গর্ভে জাত আগমশিক্ষকদের যিনি শিক্ষক সেই শিব স্বয়ং। শক্তি-স্তোত্র বোম্বাই হইতে (নিঃ সাগর) প্রকাশিত হইয়াছে। যে পরশম্ভু-স্তোত্রের একটি পুঁথি আমি পরীক্ষা করিয়াছিলাম তাহা নানা খণ্ডে বিভক্ত এবং এই-গুলিতে ক্রিয়া-শক্তি, কুণ্ডলিনী, মাতৃকা প্রভৃতির আলোচনা আছে। ইহাতে পরম-শিবকে জগৎগুরু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা তাঁহারই প্রকাশ এবং যাহা এতদিন তাঁহার হৃদয়ে গুপ্ত ছিল সেই ব্রহ্ম তত্ত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি মহা-মাতৃকা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই স্তোত্রেও দুর্বাসাকে ক্রোধ ভট্টারক বলা হইয়াছে। কাশ্মীরের বিখ্যাত শৈব গুরু সোমানন্দ দুর্বাসার বংশে জাত এইরূপ বলা হয়।

১২। সৌভাগ্য-ভাস্করে দত্তসংহিতার উল্লেখ আছে।

১৩। ইহা সুস্পষ্ট যে (হারীত বংশের এবং হারীতায়ন নামে খ্যাত) সুমেধার গ্রন্থকে প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরা-রহস্যের সঙ্গেই অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে হইবে, পরশুরামের কল্পসূত্রের সহিত নয়, যেমন কেহ কেহ মনে করেন, কারণ কল্পসূত্র দত্তাত্রেয় এবং পরশুরামের মধ্যে কথোপকথনের আকারে লিখিত নয় এবং সুমেধাকে ইহার প্রণেতা বলিয়া উল্লেখও করা হয় না, কিন্তু ত্রিপুরা-রহস্য ঐরূপ কথোপকথনের আকারে লিখিত এবং হারীতায়ন সুমেধাকে ইহার প্রণেতা বলা হয়।

১৪। ম. ম. পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী খিস্তে সম্পাদিত শঙ্করারণ্যের ভাষ্য সমেত শ্রী-বিদ্যা-রত্ন-সূত্র (সরস্বতী ভবন গ্রন্থমালা, বারাণসী) দেখুন।

১৫। শিব-দৃষ্টি পৃঃ ৯৪

১৬। সৌভাগ্য-ভাস্কর—পৃঃ ৯৬, ৯৭ ইত্যাদি

১৭। ত্রিপুরা-রহস্য, জ্ঞান-খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৩৩-৩৭

১৮। ঐ, ষোড়শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৬৪-৯৪ এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১৯। এই প্রসঙ্গে 'কলা' শব্দটির অর্থ ঈশ্বরের বিশ্বাতিক্রমী, সর্বাতীত শক্তি এবং বিশ্বের জড় উপাদান এবং শক্তি রূপে কল্পিত এবং বিশ্বব্যাপী তত্ত্ব এবং ভুবনসমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিন্দু হইতে শক্তি রূপে উৎপন্ন পঞ্চ কলা হইতে ইহার প্রভেদ করিতে হইবে।

২০। শিবেচ্ছয়া পরাশক্তিঃ শিব-তত্ত্বৈকতাং গতা
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলাদিব

২১। প্রপঞ্চ-সার ১।৪৬। কালের যে ক্রিয়া-শক্তি আছে তাহা অন্যত্র ব্যবহৃত কাল-প্রেরিতয়া শব্দ হইতে বুঝা যায়। প্রয়োগ ক্রম-দীপিকায় (পৃঃ ৪১২) এই শব্দটির এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে: প্রকৃতেরের প্রলয়াবস্থাতো যৎ পরিপকদশাঽনন্তরম্ স্রষ্টুমুখৈঃ কর্মভিরুদ্ভিন্নং রূপং যোঽসৌ বিন্দুঃ।

২২। স্বচ্ছন্দতন্ত্রের মতে প্রণবের ব্যাপিনী-কলার সহিত মহাশূন্য অভিন্ন। কিন্তু কোন কোন লেখক মহাশূন্যকে প্রাথমিক নাদের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। পূর্ণানন্দের শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি দ্রষ্টব্য। চন্দ্রের ষোড়শীকলা এবং সপ্তদশী কলা এই দুইটি শব্দ বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যখন পরম নাদকে (iii) ষোড়শী কলা অথবা অমা-কলা বলা হয় তখন 'সপ্তদশী কলা' শব্দটি পরাশক্তি অথবা সমনা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় (ii) কিন্তু অন্য সময়ে উন্মনী শব্দটি সপ্তদশী কলা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় এবং শক্তি এবং শূন্য এই দুইটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২৩। এই অবস্থা যাহাতে কালকে সাম্য বলা হয় তাহা সমনার একটি কলা এবং নিত্য (যেহেতু ইহা মহা-প্রলয় দ্বারা কোনরূপে ক্ষুব্ধ হয় না) এবং উহা তথাকথিত পরব্রহ্মের অবস্থা মাত্র। ইহা শিবের অবস্থা নয়। এখানে পরমাণুসমূহ মহাপ্রলয়ে অবস্থান করে কারণ ইহারা এখনও শিবের স্বরূপে রূপান্তরিত হয় নাই। পশুর গতি এই স্থানে আরম্ভ হয়। তন্ত্রালোক, ষষ্ঠ অধ্যায় পৃঃ ১৩৮-১৬৭ দ্রষ্টব্য।

২৪। তন্ত্রালোক ৮ম অধ্যায় ৫।৪০০-৫

২৫। তন্ত্রালোক ৩য় অধ্যায় পৃঃ ১৩৬-৪৮

২৬। ভাষ্যসমেত কাম-কলা-বিলাস-শ্লোক ৩-৮ দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪-৯, যোগিনী হৃদয়-দীপিকা, পৃঃ ৮-১২ বরিবস্যা রহস্য পৃঃ ৪৮-৬০

২৬ক। তত্ত্বসমূহ এবং তাহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভুবনসমূহের জন্য মৃগেন্দ্র-আগম বিদ্যা-পাদ পৃঃ ৩৪৪-৪৫৬ (কৃষ্ণশাস্ত্রী এবং সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী সম্পাদিত) দ্রষ্টব্য। সদ্যজ্যোতি প্রণীত ভোগকারিকা শ্লোক ১০৯-১১৩ ; রত্ন-ত্রয় শ্লোক ৮৯-১১৮ টি, এ, গোপীনাথ রাও, এলিমেণ্টস্ অফ্ হিন্দু আইকনোগ্রাফি, ২য় খণ্ড (২য় ভাগ) পৃঃ ২৯২-৭ ; মাতৃকা চক্র-বিবেক চতুর্থ অধ্যায় পৃঃ-৮৬-৯৩।

২৭। যোগসূত্র ৩।১৪ র ব্যাস-ভাষ্য তুঃ।

২৮। চার অণ্ডের জন্য তন্ত্রসার (পৃঃ ৬৪-৬৫) দ্রষ্টব্য। বিভিন্ন অণ্ডগুলি বিভিন্ন শক্তি কর্তৃক উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মাণ্ড কালাগ্নিদ্বারা বিনষ্ট এবং ব্রহ্মা বা শ্রীকণ্ঠদ্বারা সৃষ্ট হয়। প্রকৃত্যণ্ড এবং মায়াণ্ড কাল-তত্ত্বের প্রভু শ্রীকণ্ঠ কর্তৃক বিনষ্ট এবং সৃষ্ট হয়। শক্তির শ্রেষ্ঠ অণ্ড অঘোরেশ কর্তৃক বিনষ্ট এবং সৃষ্ট হয়। তন্ত্রালোক, ষষ্ঠ অধ্যায় পৃঃ ১৭০-৮২ দ্রষ্টব্য।

২৯। তিনটি মল সম্বন্ধে প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয় পৃঃ ২১-২২ দ্রঃ ; সৌভাগ্যভাস্কর পৃঃ ৯৫ ; শিব-সূত্র-বার্তিক (১ম অধ্যায়, ২-৩); শিবসূত্র বিমর্শিনী (১ম অধ্যায় ২-৩) আণব দুইপ্রকার—আত্মায় শুদ্ধ অহন্তার বিলোপরূপে ইহা একপ্রকার এবং অনাত্মায় অশুদ্ধ অহন্তার আবির্ভাব রূপে ইহা দ্বিতীয় প্রকার। আত্মা হইতে স্বাতন্ত্র্য চলিয়া যায় এবং বোধ থাকে অথবা বোধ চলিয়া যায় এবং স্বাতন্ত্র্য থাকে। মায়ীয় মলকে কখনও কখনও ভেদ বলা হইয়াছে, এই ভেদের অর্থ একের মধ্যে বহুর আবির্ভাব। ইহা মায়া এবং তৎপ্রসূত একত্রিশটি তত্ত্ব দ্বারা গঠিত। কার্ম-মল হইতেছে অদৃষ্ট এবং ইহা পুণ্য ও পাপের কোন একটি হইতে পারে। বিভিন্ন গ্রন্থে এই মলগুলির অর্থ-সম্বন্ধে কিছু প্রভেদ আছে।

৩০। পরিণত বিজ্ঞানাকলের প্রজ্ঞা যে আদিম কলুষ আত্মায় লিপ্ত ছিল তাহা

সমাপ্ত হইয়েছে কি না তদনুসারে তীক্ষ্ণ অথবা মৃদু হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর আত্মাগুলি বিদ্যেশ্বরের পদবীতে উন্নীত হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মারা মগ্ন হয়। যে সমস্ত সকল এবং প্রলয়াকল আত্মা দিগের মল সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহারা ঈশ্বরের কৃপার অধিকারী হয় এবং (i) মন্ত্রেশ্বর (এবং আচার্য) দের পদে উন্নীত হয় এবং বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের অংশসমূহ অর্থাৎ পৃথিবী-তত্ত্বের অধিকারে অবস্থিত বিভিন্ন তলের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হয় এবং পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া যে সকল উচ্চতর তত্ত্ব আছে তাহাদের অধিকারে অবস্থিত তলসমূহের উপর ক্ষমতাবিশিষ্ট (ii) ভুবনেশ্বর বা লোকেশ্বরে পরিণত হয়। যে সকল প্রলয়াকলে মল অসমাপ্ত রহিয়াছে কিন্তু কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে তাহারা পরবর্তী কল্পে পুর্যষ্টক নামে সূক্ষ্ম শরীরের সহিত মিলিত হয়, জড়দেহ ধারণ করিতে এবং জন্ম হইতে জন্মান্তরগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই ভাবে ভোগের মধ্য দিয়া তাহাদের মল শেষ হইয়া যায়। শাক্ত কিংবা শৈবদের আত্মার এই ত্রিবিধ স্বভাবে বিশ্বাসকে পাশ্চাত্যের Orphite এবং তাহাদের পূর্ববর্তী Orphiciদের বিশ্বাসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে—ইহা এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে এই বিভাগ ভগবৎকৃপার বিভিন্ন মাত্রার অনুরূপ এবং কোন মৌলিক বিভেদ নয়। ইহা কিন্তু সত্য যে দ্বৈত-বাদিদের মতানুসারে শিব এবং পরম-শিবের মধ্যে কিছু ভেদ আছে। মানবাত্মাদের মধ্যে মৌলিক ভেদ আছে এই ড্যালেনশিয় মতবাদের অনুরূপ মতবাদ ভারতবর্ষেও আছে। কোন কোন জৈন, বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লেখকদের মতবাদ হইতে ইহা বুঝা যায় কিন্তু আগমসমূহে এই মত গৃহীত হয় নাই।

৩১। শ্রী কণ্ঠের রত্ন-ত্রয়, শ্লোক ২৭৬-৯৫

৩২। শুদ্ধ শ্রেণী বা শুদ্ধ অদ্ধা হইতেছে মায়ার প্রভাবের বাহিরে শুদ্ধ জড় বস্তুর উচ্চস্তরের জগৎ।

৩৩। প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় পৃঃ ৮

৩৪। যে সকল শৈব সপ্রদায় ৩৬টি তত্ত্ব স্বীকার করে তাহাদের সকল আগমেই মায়া এবং প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তাহাদিগকে অভিন্ন বলা হইয়াছে (৪।১০) "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্"। আগমসমূহে সাধরাণতঃ মায়া নিত্য কিন্তু প্রকৃতি নিত্য নহে ; কারণ প্রকৃতি কলা হইতে উৎপন্ন আবার এই কলাই মায়া হইতে উৎপন্ন। কিন্তু তন্ত্রসমূহের কোন কোন স্থানে তাহাদিগকে অন্যভাবে চিন্তা করা হইয়াছে। প্রকৃতি সাধারণভাবে জড় তত্ত্বকে বুঝাইয়া থাকে এবং মায়া এই তত্ত্বের অধীনে বিকল্পসমূহের মধ্যে একটি।

৩৫। উমাপতি স্বতন্ত্র-তন্ত্রের একটি কারিকার (তাঁহার সঙ্কলনের চতুর্বিংশতি কারিকা) ভাষ্যে যে টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে :

কুণ্ডলিনী-শব্দ বাচ্যস্ত ভুজঙ্গ-কুটিলাকারেণ নাদাত্মনা স্বকার্যেণ প্রতিপুরুষং ভেদেনাহ-বস্থিতো ন তু স্বরূপেণ প্রতিপুরুষমবস্থিতঃ। মূল শ্লোকটি এইরূপ

যথা কুণ্ডলিনী শক্তির্মায়া কর্মানুসারিণী
নাদ বিন্দ্বাদিকং কার্যং তস্যা ইতি জগৎ-স্থিতিঃ।

৩৫ অঘোর শিবাচার্য শ্রীকণ্ঠের রত্ন-ত্রয়ের (শ্লোক ৭৪) উল্লেখিনী নামক তাঁহার ভাষ্যে অক্ষর বিন্দুকে পশ্যন্তী বাক্ এর সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন।

৩৭। ঈশ অবস্থাকে মধ্যমা বাক্-এর অনুরূপ বলা যাইতে পারে। ইহা অন্তঃ সঞ্জল্পরূপ এবং ইহার অংশ সমূহে একটি আদর্শ বিন্যাস আছে।

৩৮। কখনও কখনও সূক্ষ্ম-নাদ বিন্দুকেও বুঝাইয়া থাকে। ভোজের তত্ত্ব প্রকাশের ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে সূক্ষ্ম নাদ শক্তি-তত্ত্বের অংশ। এই মত সর্বজ্ঞ শম্ভু কর্তৃক সিদ্ধান্ত-দীপিকায় সমর্থিত হইয়াছে। অঘোর শিবাচার্য তাঁহার রত্ন-ত্রয়ের ভাষ্যে সূক্ষ্ম নাদকে বিন্দুর প্রথম প্রকাশ (কেবলমাত্র নাদ বলিয়া অভিহিত) এর সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। ইহা পর নাদের সহিত একার্থ বোধক (রত্নত্রয়, কারিকা ২২)

গ্রন্থবিবরণী

কাম-কলা-বিলাস, চিদ্‌বল্লীসমেত। সদাশিব মিশ্রসম্পাদিত। জ্ঞানানন্দ, অবধুতঃ মন্ত্রযোগ (বাঙ্গলা,) কলিকাতা।

মাতৃকা-চক্র-বিবেক—সম্পাদক ললিতাপ্রসাদ দত্রল, বারাণসী। প্রপঞ্চসার, পদ্মপাদের ভাষ্যসমেত। সম্পাদক এ এ্যাভালন। শারদা-তিলক—রাঘব ভট্টের ভাষ্যসমেত। সম্পাদক মুকুন্দ ঝা বক্‌শি, বারাণসী।

রায় ভাস্কর: সেতুবন্ধ (আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালা, পুণা) উড্রফ, স্যার জন: শক্তি ও শাক্ত।

অভিনব: তন্ত্র-সার। সম্পাদক, মুকুন্দরাম শাস্ত্রী, শ্রীনগর। জ্ঞান-খণ্ড: ত্রিপুরা রহস্য। সম্পাদক গোপীনাথ কবিরাজ, বারাণসী। বরিবস্যা রহস্য—সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, কলিকাতা যোগিনী হৃদয়-দীপিকা—সম্পাদক, গোপীনাথ কবিরাজ বারাণসী।

তৃতীয় খণ্ড

ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যান্য কয়েকটি উদ্ভাবনা

প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা

ক। গণিত

লেখক : এ. এন. সিংহ ডি. এস্-সি

অধ্যাপক এবং গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ
লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌ

পরিশিষ্ট : ভারতীয় গণিতের কয়েকটি অসাধারণ সম্পাদন

লেখক : আর. শুক্ল, এম. এ. পি-এইচ. ডি (লণ্ডন)

সহকারী অধ্যাপক, গণিত, পাটনা কলেজ, পাটনা

খ। অন্যান্য বিজ্ঞান

লেখক : বি. বি. দে, ডি. এস-সি (লণ্ডন), এফ. আর. আই. সি (লণ্ডন),
এফ. এন. আই.

শিক্ষাবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা, মাদ্রাজ

ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব

লেখক : কে. সি. পাণ্ডে

ভারতে ঐস্লামিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ

লেখক : ডাঃ তারাচাঁদ, এম্. এ., ডি. ফিল্. (অক্সন)

ভারত সরকারের শিক্ষাসম্পর্কে পরামর্শদাতা

সহায়ক। এস, কামিল হুসেন, এম্ এ, উকিল, ঘোসিপুর, গোরক্ষপুর, উত্তর প্রদেশ

শিখ দর্শন

লেখক : ভাই যোধ সিং, এম্. এ.

অধ্যক্ষ, খালসা কলেজ, অমৃতসর

সমসাময়িক ভারতীয় চিন্তাধারা

ক। লেখক : ডাঃ পি. টি. রাজু

খ। ,, ডাঃ কে, এ. হাকিম

হায়দ্রাবাদের ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা

অ। গণিত

১। উপক্রমণিকা

প্রাচীন ভারতের গণিতশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, প্রাচীন ভারতীয়েরাই পাটীগণিত, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি—গণিতশাস্ত্রের এই বিভিন্ন শাখার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। দেড় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতে প্রতিষ্ঠিত এই বনিয়াদের উপরই বর্তমানকালে গণিতশাস্ত্রের এই বিভিন্ন শাখার জ্ঞানসৌধগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতেই এই গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা আরববাসীরা গ্রহণ করে, এবং পরে সেখান হইতেই ইতালী ও স্পেনের অধিবাসীদের মাধ্যমে উহা নবজাগ্রত ইউরোপে প্রসারলাভ করে। দীর্ঘকাল ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আরব দেশকেই উক্ত বিভিন্ন বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থল বলিয়া মনে করিতেন। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা "লীলাবতী" ও "দ্বিতীয় ভাস্কর" রচিত বীজগণিত (১১৫০ খ্রীঃ) প্রমুখ ভারতীয় গণিত গ্রন্থসমূহের সন্ধানলাভ করেন এবং তাহার ফলেই উক্ত বিজ্ঞানগুলি যে ভারতেই উদ্ভূত তাহা আবিষ্কৃত হয়। আরববাসীরা যে ভারতবর্ষ ও গ্রীস হইতেই গণিতসংক্রান্ত এই জ্ঞান প্রথমে অর্জন করে এবং পাঁচশত বৎসর তাহাদের নিকট রক্ষিত হওয়ার পর সেখান হইতেই যে পরে উহা ইউরোপে প্রচারিত হয়, এ সম্বন্ধে আজ আর কোনও মতভেদের অবকাশ নাই।[১]

প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষ ও গ্রীসের অধিবাসীদের দ্বারা গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছিল, তবে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মূলতঃ পৃথক। গ্রীকগণ গণিতের অন্যান্য শাখা পরিহার করিয়া জ্যামিতিশাস্ত্রের উৎকর্ষের দিকেই মনোনিয়োগ করে। তাহাদের পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর জ্যামিতির আধিপত্যই সর্বাধিক। তাহারা পরিমাণকে (magnitude) সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়া দৈর্ঘ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছিল। সমানুপাত সংক্রান্ত জ্যামিতিক তত্ত্বের উদ্ভাবন এবং বীজগণিত সংক্রান্ত বিভিন্ন

তথ্যের সমাধান কল্পে জ্যামিতির প্রয়োগ—এই সকলও তাহাদেরই কীর্তি। পক্ষান্তরে ভারতীয় গণিত সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত; এমন কি তাহাদের জ্যামিতিও সংখ্যা-মূলক ও ব্যবহারিক। কঠোর যুক্তিনিষ্ঠতা ও প্রণালীবদ্ধ আলোচনা-পদ্ধতিই গ্রীক জ্যামিতিশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ধারণার স্পষ্টতা, সারনিষ্কাসন, প্রতীকি-করণ ও উদ্ভাবনার অপূর্বতা ও অভিনবত্ব অপরপক্ষে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ। ভারতীয় গণিত তাহার দর্শন ও জীবনবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। আবার ভারতীয় গাণিতিক আবিষ্কার ও ভারতীয়দের চিন্তা ও দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতীয়দের শূন্য-সংখ্যা (Zero) ভারতীয় পাটীগণিতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গৃহীত হওয়ার পূর্বেও হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে শূন্য সংক্রান্ত ধারণা বর্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়। পাটীগণিতে শূন্য-সংখ্যার ব্যবহার হইতেই ভারতীয় চিন্তানায়কগণ প্রতীকের শক্তি ও উপযোগিতা উপলব্ধি করেন। শূন্য কথাটির অর্থ অভাব বা অবিদ্যমানতা। এই ধারণাকে রূপ, আকার ও প্রতীক দান করার প্রয়াস মানুষের চিন্তা ও প্রগতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনারূপে গণ্য হইতে বাধ্য।

গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয়দের অর্জিত সাফল্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। উক্ত সাফল্যই পরবর্তী চিন্তাধারাকে প্রভাবিত ও মানব প্রগতিকে প্রেরণা দান করিয়াছে।

২। পাটীগণিত

শূন্য চিহ্ন এবং স্থানীয় মান নির্দেশক অঙ্ক-পাতন (Place value Notation)—নয়টি সংখ্যা ও একটি শূন্য চিহ্নের দ্বারা অঙ্ক লিখনের যে প্রণালী আমরা আজ অনুসরণ করি তাহা ভারতীয়েরাই আবিষ্কার করিয়াছিল। ইউরোপ অঙ্কপাতনের এই প্রণালী আরবদের নিকট হইতে গ্রহণ করে। সম্ভবতঃ সেই জন্যই দীর্ঘকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে, উক্ত সংখ্যা-পাতন প্রণালী আরবভূমিতে উদ্ভূত এবং সে কারণ তাঁহারা সংখ্যাগুলিকে আরবীয়-সংখ্যা বলিয়াই অভিহিত করিতেন। হজরত মহম্মদের সময় হইতে আরব সভ্যতার সূত্রপাত ঘটে, অথচ মহম্মদের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে উক্ত সংখ্যা-পাতন প্রণালীর প্রচলন ছিল। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগুলির আরবীয় উৎপত্তির ধারণা পরিত্যক্ত হয়। ভারতবর্ষে, এমন কি দূর প্রাচ্য ইন্দো-চীনে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর সংস্কৃত শিলালিপিগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতেও

স্থানীয় মান নির্দেশক সংখ্যা-পাতন প্রণালী (Place value System of Notation) বৃহত্তর ভারতে বহুল প্রচলিত ছিল।[২] খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতেই[৩] ভারতীয় সংখ্যা-পাতন পদ্ধতির (System of Numeration) খ্যাতি সিরিয়ার মত সুদূর পশ্চিম দেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, পঞ্চম শতাব্দীতেই ভারতবর্ষে শূন্য চিহ্ন (Zero Symbol) ও আধুনিক সংখ্যা-পাতনের বহুল প্রচলন ছিল। সুতরাং বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয়-যুগের প্রারম্ভেই কোনও সময়ে উক্ত প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। 'পিঙ্গলের ছন্দসূত্রে'[৪] শূন্য চিহ্ন ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, কিন্তু অত প্রাচীন-কালেই স্থানীয়মান নির্দেশক অঙ্ক-পাতন প্রণালীর প্রচলনের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে অবশ্য 'ছন্দসূত্র' প্রণয়নের সেই সুপ্রাচীন যুগেই অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতেই যে ভারতীয় গণিতবিদেরা স্থানীয় মান নির্দেশক অঙ্ক-পাতনের ব্যবহার সুরু করিয়াছিলেন—ইহা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। হয়ত সেই প্রাচীনকালে উক্ত প্রণালী অল্প কয়েকজনের নিকটেই পরিচিত ছিল, বহুলভাবে প্রচলিত হয় নাই।

সমস্ত প্রাচীন জাতিরই—যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ পাটীগণিতের এই মৌলিক নিয়মাবলী (Fundamental operations of Arithmetic) এবং মূল নির্ণয় প্রণালী (Extraction of roots) ও সমানুপাত সংক্রান্ত নিয়ম (The laws of proportion) প্রভৃতির সহিত পরিচিত ছিল। অন্যান্য সংখ্যাগুলিকে প্রকাশ করিবার উপযোগী প্রতীক তাহাদের জানা ছিল, কিন্তু শূন্য চিহ্নের ব্যবহার তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। ১০, ২০, ৩০, ১০০, ২০০, ১০০০, ২০০০, প্রভৃতি শূন্য-পৃষ্ঠ সংখ্যাগুলিকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহারা পৃথক প্রতীক ব্যবহার করিত। উক্ত পৃথক প্রতীকে প্রকাশিত শূন্য-পৃষ্ঠ সংখ্যাগুলির গুণ ও ভাগ সম্পাদন এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। ইহাই পাটীগণিতে বড় সংখ্যা ব্যবহারের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে এবং কার্যতঃ সেই জন্যই উক্ত বিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব হয় নাই। খ্রীঃ দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত পুরাতন অঙ্ক-পাতন প্রণালীর ব্যবহারসম্বলিত পাটীগণিতের বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথি ইউরোপ ও আরবদেশে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে পুরাতন সংখ্যা-পাতন পদ্ধতিতে রচিত কোনও পাটীগণিতই পাওয়া যায় নাই। খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত "বক্ষালী পুঁথিই" ভারতবর্ষীয় পাটীগণিত গ্রন্থের প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহাতে সংখ্যা-পাতনের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিককালে উচ্চ-বিদ্যালয় সমূহে পাটীগণিতের যে বিভিন্ন প্রশ্ন শিক্ষা

দেওয়া হয়, কার্যতঃ তাহা সামগ্রিক ভাবেই ৪৯৯ খ্রীঃ রচিত "আর্যভট্টীয়" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খ্রীঃ), শ্রীধর (৭৫০ খ্রীঃ), মহাবীর (৮৫০ খ্রীঃ), দ্বিতীয় আর্যভট্ট (৯৫০ খ্রীঃ) প্রভৃতি গণিতবিদগণ রচিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত গ্রন্থ সমূহে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ও ভগ্নাংশ প্রয়োগ পদ্ধতির (operation with fractions) উল্লেখ পাওয়া যায়। আধুনিক পাটীগণিতে উক্ত পদ্ধতিগুলিই পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে।

পাটীগণিতের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের প্রধান অবদান সমূহ—

(১) শূন্য প্রতীক।

(২) স্থানীয়-মান নির্দেশক সংখ্যাপাতন প্রণালী

(৩) স্থানীয়-মান নির্দেশক সংখ্যা প্রণালীর দ্বারা পাটীগাণিতিক যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ ও ঘনমূল নির্ণয় প্রভৃতি প্রক্রিয়া সম্পাদন পদ্ধতি।

(৪) ভগ্নাংশ লিখন-প্রণালী।

(৫) সমসূত্র অনুযায়ী (According to association) ভগ্নাংশের শ্রেণীবিভাগ, ভগ্নাংশকে সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তরকরণ এবং ভগ্নাংশের দ্বারা যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি পাটীগণিতীয় প্রক্রিয়া সম্পাদন পদ্ধতি।

(৬) সমানুপাত সংক্রান্ত নিয়মাবলী (The rules of proportion) ত্রৈরাশিক ও পঞ্চরাশিক প্রণালী ইত্যাদি এবং ব্যস্ত সমানুপাত (Inverse proportion) অর্থাৎ ব্যস্ত ত্রৈরাশিক (Inverse Rule of three).

(৭) কুশীদ, জটিল কুশীদ, কিস্তি, লাভ ক্ষতি, ক্ষেত্রফল, ঘনফল সমান্তর ও গুণোত্তর প্রগতি (Arithmetical & geometrical progressions) ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী।

পূর্ববর্তী উল্লেখ অনুযায়ী উপর্যুক্ত বিষয়গুলি "আর্যভট্টীয় (৪৯৯ খ্রীঃ)" ও তৎপরবর্তী গণিত গ্রন্থসমূহে আলোচিত প্রসঙ্গগুলির মধ্যে কয়েকটি। দশম শতাব্দীর পূর্বে ভারতবর্ষের বাহিরে আরব, ইউরোপ অথবা চীন দেশে কোথাও আধুনিক পাটীগণিতীয় প্রয়োগ প্রণালীর চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং এই উদ্ভবের প্রাথমিকতা হইতেই বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষই পাটীগণিতের আদি উৎপত্তিস্থল।[৫]

৩। বীজগণিত

সকলেই জানে—অজ্ঞাত রাশিকে (unknown) লইয়াই বীজগণিতের কাজ। প্রাচীন জাতি মাত্রেই গণিত সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্ণেয় প্রশ্নের সমাধানে

অগ্রসর হইয়াছে এবং সাধারণতঃ তাহাদের ফলাফল পাটীগণিতের সাহায্যেই লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পাইয়াছে। সেগুলিকে হয়ত বীজগণিতের সাহায্যেও প্রকাশ করা যাইত; কিন্তু উপযুক্ত প্রতীক চিহ্নের উদ্ভাবনের পূর্বে বীজগণিতের সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি সম্ভব হয় নাই। ইহার জন্য অবশ্য ভারতীয় গণিতবিদেরাই প্রশংসা পাইবার যোগ্য, কারণ তাঁহারাই সর্বপ্রথম বর্ণমালার অক্ষরের সাহায্যে অজ্ঞাত রাশিকে প্রকাশ করেন। বর্ণমালার অক্ষর প্রতীক গ্রহণ করিয়াও যে পাটীগণিতের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পাদন সম্ভব এবং পাটীগণিতে ব্যবহৃত যোগ, বিয়োগ (+, −) ইত্যাদি প্রক্রিয়াসূচক চিহ্নসমূহ যে উক্ত বীজগণিতীয় প্রতীকগুলির সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে—এ কথা ভারতীয় গণিতবিদেরা যেদিন বুঝিলেন, সেইদিন হইতেই বীজগণিতের প্রকৃত অগ্রগতি সূচিত হইল।

সূক্ষ্ম-চিন্তায় অভ্যস্ত পণ্ডিতগণের পক্ষেই যোগ ও বিয়োগ ইত্যাদি প্রক্রিয়াসূচক প্রতীক ব্যবহার করিয়াও গুণ, ভাগ ইত্যাদি সম্পাদন প্রণালী আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছিল। উক্ত প্রক্রিয়াসূচক প্রতীকগুলি যে সংখ্যা নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মগুপ্তের মতে—

ধনরাশি ও ঋণরাশির (Positive and Negative) গুণফল ঋণরাশি, দুইটি ঋণরাশির গুণফল ধনরাশি। ধনরাশিকে ধনরাশি দ্বারা গুণ করিলে গুণফল ধনরাশি হইবে। ধনরাশিকে ধনরাশি দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল ধনরাশি হইবে, আবার ঋণরাশিকে ঋণরাশি দ্বারা ভাগ করিলেও ভাগফল ধনরাশিই হইবে। কিন্তু ধনরাশিকে ঋণরাশি দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল হিসাবে পাওয়া যায় ঋণরাশি এবং ঋণরাশিকে ধনরাশি দ্বারা ভাগ করিলেও ভাগফল ঐ ঋণরাশিই হইবে।*

ভারতীয় গণিতবিদেরাই ঘাত-প্রকাশক প্রতীক (Symbolism for powers) বর্গ, ঘন ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। অধুনা প্রচলিত সাংখ্য-সহগের (Numerical co-efficients) ব্যবহারও তাঁহাদের কীর্তি। বীজগাণিতিক সমাকরণ (Equations) ও তৎসংক্রান্ত পদপক্ষান্তর প্রণালীর (Transposition of terms) উদ্ভবও তাঁহাদের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতেই উল্লিখিত বিষয়গুলি ভারতীয়দের নিকট পরিচিত ছিল। এ ক্ষেত্রেও উদ্ভবের প্রাথমিকতার জন্য ভারতবর্ষকেই বীজগণিত, তাহার মৌলিক প্রণালী ও প্রতীক চিহ্নগুলির উৎপত্তিস্থল বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

ভারতীয় গণিতবিদেরা ব্যবহারিক দিক হইতে বীজগণিত অধ্যয়ন করেন নাই। মানানুযায়ী (According to degree) তাঁহারা সমীকরণের শ্রেণীবিভাগ

করিয়াছিলেন এবং নির্ণেয় (Determinate) ও অনির্ণেয় (Indeterminate) সমীকরণ সমূহকে পৃথকভাবে বিবেচনা করিয়াছিলেন। ভারতীয় গণিতবিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বীজগণিত সম্পর্কিত পরবর্তী যাবতীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে ভারতীয় বীজগাণিতিক প্রতীকগুলির যে কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আধুনিক কালের ব্যবহৃত বীজগণিতের প্রতীকগুলি মূলতঃ ভারতীয়।

উপযুক্ত প্রতীক-চিহ্ন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে বীজগণিতের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল। ভারতীয়েরা দ্বিঘাত-সমীকরণের (Quadratic equation) ব্যাপক সমাধান দান করিয়াছিলেন। আধুনিক পাঠ্যপুস্তক সমূহে সচরাচর দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের যে প্রণালীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর[৭] গণিতবিদ শ্রীধরেরই দান। ভারতীয় গণিতবিদেরা অনির্ণেয় (Indeterminate) সমীকরণ সংক্রান্ত যে তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, বীজগণিতের ক্ষেত্রে তাহাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ অবদান। দ্বিঘাত-সমীকরণের মূলদ-সমাধান (Rational Solution) দানে তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় এবং তাহারই ফলে অনির্দিষ্ট-মান দ্বিঘাত-সমীকরণ (General indeterminate equation of second degree) সমাধানে[৮] তাঁহারা সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। উপর্যুক্ত বীজগণিতীয় মীমাংসা সমূহ ইউরোপের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; খ্রীঃ সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহারা উহা নূতন করিয়া আবিষ্কার করে। খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথম দিকে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া গ্রীক গণিতবিদগণ অনির্ণেয় (Indeterminate) সমীকরণ সমূহ অধ্যয়ন করে, কিন্তু জ্যামিতির দৃষ্টিভঙ্গীতে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাওয়ার ফলে এবং উপযুক্ত প্রতীক-চিহ্নের অভাবে তাহারা সে ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই।

৪। জ্যামিতি

জ্যামিতিতে সচরাচর ব্যবহৃত ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বিষম চতুর্ভুজ, আয়তক্ষেত্র, সামান্তরিক, বৃত্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি কোন প্রাচীন জাতিরই অবিদিত ছিল না। বৈদিক আর্যেরা উপবৃত্তের ব্যবহার জানিতেন। তবে আধুনিক জ্যামিতি গ্রীক জাতিরই সৃষ্টি। কেবলমাত্র ক্ষেত্রমিতি (Mensuration) সম্বন্ধেই ভারতীয়দের আগ্রহ দেখা যায়। বৈদিক আর্যেরা, ত্রিভুজ, সামান্তরিক, আয়তক্ষেত্র এবং আয়তনের পরিমিতি নির্ণয় করিতে জানিতেন। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাস-এর অনুপাত

যে একটি ধ্রুবক (constant) তাহাও তাঁহারা জানিতেন এবং তাঁহারা এই ধ্রুবকের মান নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরবর্তী ভারতীয় গণিতবিদেরা বৃত্ত, শঙ্কু (cone) গোলক (sphere) এবং শিখরীর (Pyramid) ক্ষেত্রমিতি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন। গ্রীক গণিতবিদদের নিকট অজ্ঞাত প্রণালীর দ্বারাই যে ভারতীয়রা তাঁহাদের উক্ত গবেষণার ফলাফল নির্ণয় করিয়াছিলেন উপযুক্ত নিদর্শনের সাহায্যে তাহা প্রমাণ করা যায়। ক্ষেত্রমিতি সম্পর্কে ভারতীয় গণিত-বিদদের ব্যবহৃত সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রণালী বিকৃত-করণ তত্ত্বরূপে (Theory of deformation) পরিচিত। এই বিকৃত-করণ সত্ত্বেও ক্ষেত্রফল ও ঘনফল অপরিবর্তিতই থাকে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা দেখাইযাছেন যে—

(১) একটি আয়তক্ষেত্রের যে কোন একটি বাহুকে সমান্তরালভাবে ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরিত করিয়া তাহাকে সমক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি সামন্তরিকে বিকৃত (Deform) করা যাইতে পারে।

(২) কোন ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুকে ভূমির সমান্তরাল সরলরেখার উপর যে কোন স্থানে সরাইলেও ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত (Invariant) থাকিবে।

(৩) কোন বৃত্তকলার (Sector of a circle) চাপকে সরলরেখায় পরিণত করিয়া, উক্তরেখাকে ভূমি ও বৃত্তকলার ব্যাসার্ধকে উচ্চতা ধরিয়া, তাহাকে একটি ত্রিভুজে পরিণত করিলেও উক্ত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলের সমান হইবে।

উপরে উল্লিখিত ফলাফলগুলি ঘন পদার্থের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে প্রযোজ্য। উক্ত ফলাফলগুলি জানা থাকিলে গ্রীকদের ক্ষেত্রমিতি সংক্রান্ত সূত্রগুলি সহজেই পাওয়া যায়। শঙ্কুর ঘনফল নির্ণযকল্পেও ভারতে উদ্ভূত উক্ত প্রণালীই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ষট্-খণ্ডাগন্থম' নামক জৈন গ্রন্থের খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে রচিত টীকা 'ধবলা'তে উক্ত প্রণালীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গণিতবিদ ভাস্করও এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অসংখ্য খণ্ডে (Infinite number of parts) কোন সমতল ক্ষেত্র অথবা ঘনবস্তুর বিভাগ-কৌশল এবং উক্ত খণ্ডগুলির ক্ষেত্রফল অথবা ঘনফলের সমষ্টি দ্বারা উল্লিখিত সমতল ক্ষেত্রফল বা ঘনফল নির্ণয়ের প্রণালীও অসম শ্রেণীর যোগফল নির্ণয় প্রণালীও (Infinite series) ভারতীয় গণিতবিদেরাই ব্যবহার করেন। ক্ষেত্রমিতি বিষয়ে ভারতীয় গণিতবিদদের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হিসাবে, বৃত্ত-অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত সূত্রাবলীর উল্লেখ করা

যাইতে পারে। 'ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' (খ্রীঃ ৬২৮) গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদি কোন বৃত্ত-অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের—যাহার বাহুগুলির দৈর্ঘ্যের পরিমাণ যথাক্রমে, $a, b, c, d,$— ক্ষেত্রফলের পরিমাণ A এবং তাহার কর্ণের (Diagonal) দৈর্ঘ্যের পরিমাণ m ও n হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ফলগুলি পাওয়া যাইবে:

(১) $$A = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

যখন $2s = a+b+c+d$

(২) $$m = \sqrt{\frac{(ac+bd)\,(ab+cd)}{ad+bc}}$$

$$n = \sqrt{\frac{(ac+bd)\,(ad+bc)}{ab+cd}}$$

πএর মান—যদিও গ্রীকেরা জ্যামিতিবিদ হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তথাপি তাহারা πএর যথাযথ মান নির্ণয় করিতে পারে নাই। তাহারা $\pi = 22/7$, এই মান লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে πএর অধিকতর আসন্ন মান নির্ণীত হইয়াছিল। এমন কি ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দেই 'আর্যভট' নিম্নলিখিতভাবে উক্ত মান নির্দেশ করিয়াছিলেন—

$$\pi = \frac{62832}{20000} = 3\cdot1416$$

যদি উল্লিখিত ভগ্নাংশকে অবিরত ভগ্নাংশে (Continued fraction) পরিণত করা হয়, তাহা হইলে (Successive Convergent) গুলি যথাক্রমে—

$3, \frac{22}{7}$ এবং $\frac{355}{113}$ হইবে।

ভারতীয় গণিতবিদেরা 22/7 এবং 355/113 ভগ্নাংশদ্বয়কে π এর মান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার বহুল প্রচলন হয় নাই। ব্যবহারের সুবিধার জন্য কোন কোন গণিতবিদ $\pi = \sqrt{10}$, এই মান ব্যবহার করিয়াছিলেন।

'ধবলা' টীকাতে π এর মান হিসাবে 355/113 এই ভগ্নাংশের উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ ভারতীয় প্রভাবের ফলেই চৈনিক গণিতবিদেরা উক্ত মানটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী ভারতীয় গ্রন্থসমূহে, ৯ অথবা ততোধিক দশমিক পর্যন্ত πএর আসন্ন মানের (Approximation) উল্লেখ পাওয়া যায়। গোড়ার দিকে ভারতীয় গণিতবিদেরা বৃত্ত-অন্তর্লিখিত সুগম বহুভুজের (Inscribed regular polygon) বাহু-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, π এর অধিকতর আসন্ন মান নির্ণয় করিতেন। পরে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অসীম শ্রেণীর (Infinite Series)

সাহায্যে উক্ত কার্য সম্পাদিত হয়। উপর্যুক্ত উভয় প্রণালীই ভারতে ব্যবহৃত হইবার বহু পরবর্তীকালে ইউরোপীয় গণিতবিদ্‌গণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মূলদ চিত্রাঙ্কণ প্রণালী (Construction of Rational Figures)

ভারতীয়েরা সমতল ক্ষেত্রের বাহু ও ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের প্রস্তাবনা ও সমাধান কল্পে অনির্ণেয় সমীকরণ সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপে জ্যামিতির ক্ষেত্রে তাঁহারা বীজগণিত সম্পর্কীয় জ্ঞানকে কাজে লাগাইয়াছিলেন।

কোন একটি বাহু দেওয়া থাকিলে, তাহার সাহায্যে সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কনের প্রথম প্রয়াস দেখা যায় 'সুল্‌ব' গ্রন্থে। উহাতে বিশেষভাবে (a, $3a/4$, $5a/4$) এবং (a, $5a/12$, $13a/12$) বাহুবিশিষ্ট দুইটি সমকোণী ত্রিভুজের উল্লেখ পাওয়া যায়। a পরিমাণ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি প্রদত্ত বাহু, ও মূলদ রাশি (Rational) সূচিত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অপর দুইটি বাহুর সাহায্যে ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খ্রীঃ) বিভিন্ন সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কনের প্রতিজ্ঞা উপস্থিত করেন। তাঁহার প্রদত্ত সমাধান নিম্নরূপ—

$$a,\ \tfrac{1}{2}\left(\frac{a^2}{n}-n\right),\quad \tfrac{1}{2}\left(\frac{a^2}{n}+n\right)$$

শ্রীধর (৭৫০ খ্রীঃ) এবং মহাবীরও (৮৫৯ খ্রীঃ) উল্লিখিত সমাধানে উপনীত হন।

দ্বিতীয় ভাস্কর অপর একটি সমাধান বাহির করেন—

$$a,\ \frac{2na}{n^2-1},\ n\left(\frac{2na}{n^2-1}\right)-a$$

প্রদত্ত অতিভুজের সাহায্যে যে কোন সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কিত করিলেই সদৃশ ফল পাওয়া যাইবে।

মহাবীর সমাধানসহ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উপস্থিত করিয়াছেন—

(১) যদি একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সাংখ্যমান উহার পরিসীমার সমান হয় এবং আরেকটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সাংখ্যমান উহার কর্ণের দৈর্ঘ্যের সমান হয়, তাহা হইলে উক্ত আয়তক্ষেত্রদ্বয়ের বাহুগুলির দৈর্ঘ্যের পরিমাণ কত ?

(২) এমন একটি আয়তক্ষেত্র নির্ণয় কর যাহার কর্ণের দ্বিগুণ, ভূমির তিনগুণ, প্রস্থের (upright-এর) চারগুণ এবং পরিসীমার দ্বিগুণ একত্রে উক্ত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সাংখ্যমানের সমান।

(৩) কোন আযতক্ষেত্রের পরিসীমা একক হইলে উহার ভূমি ও প্রস্থের (upright) পরিমাণ কত ?

(৪) এমন একটি আয়তক্ষেত্র নির্ণয় কর যাহার কর্ণের দ্বিগুণ, ভূমির তিনগুণ, প্রস্থের (upright) চারগুণ এবং পরিসীমার সমষ্টি এককের (unity) সমান হইবে।

(৫) পূর্ণসংখ্যা-সূচিত বাহু (Rational integral) ও ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বিভিন্ন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ নির্ণয় কর।

(৬) এমন দুইটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ নির্ণয় কর যাহাদের পরিসীমাদ্বয় ও ক্ষেত্রফলদ্বয় পরস্পর সমান হইবে; অথবা যাহাদের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল সমানুপাত (In a given proportion) অনুযায়ী সম্পর্কিত হইবে।

(৭) বিভিন্ন মূলদ বিষমভুজ (Rational & scalene) ত্রিভুজ নির্ণয় কর।

(৮) কোন প্রদত্ত ক্ষেত্রফলের সাহায্যে একটি মূলদ (Rational) ত্রিভুজ নির্ণয় কর।

ব্রহ্মগুপ্ত প্রমাণ করিয়াছেন সমদ্বিবাহু ট্র্যাপিজিয়ামের বাহু, কর্ণ, উচ্চতা, বাহুর অংশ (Segments) ও ক্ষেত্রফলকে মূলদ রাশির সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। তিনি নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য প্রতিজ্ঞাটিও প্রতিপন্ন করিযাছেন :—

বৃত্তে অন্তর্লিখনযোগ্য এমন চতুর্ভুজগুলি অঙ্কিত কর যাহাদের বাহু, কর্ণ, লম্ব, খণ্ডবাহু, ক্ষেত্রফল এবং চতুর্ভুজগুলি বহির্লিখিত বৃত্তের ব্যাসকে অখণ্ডরাশির দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

মহাবীর, শ্রীপতি, দ্বিতীয় ভাস্কর প্রমুখ গণিতবিদ্‌গণ উল্লিখিত প্রতিজ্ঞার সমাধানও দিয়াছিলেন। পরিশেষে মহাবীর নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য প্রশ্নটিরও মীমাংসা দান করিয়াছেন :—

প্রদত্ত ব্যাসবিশিষ্ট কোন বৃত্তে অন্তর্লিখনযোগ্য বিভিন্ন মূলদ ত্রিভুজ (Rational Triangle) ও চতুর্ভুজ নির্ণয় কর।

(৫) ত্রিকোণমিতি (Trigonometry)

ত্রিকোণমিতি শব্দটী হইতেই বুঝা যায়, ইহা গণিতশাস্ত্রের (জ্যামিতি) এমনই একটী শাখা—ত্রিভুজ অর্থাৎ ত্রিকোণের পরিমিতি নির্ণয়ই যাহার কাজ। নিম্নলিখিত ABC সমকোণী ত্রিভুজটীকে (B সমকোণ) লওয়া যাক্

ভারতীয় গণিতবিদ্‌দের মতে CB ও AB যথাক্রমে CD চাপের জ্যা ও কোটি-জ্যা। আধুনিক ত্রিকোণমিতিক প্রতীকে (Trigonometrical notation) উহা এইভাবে প্রকাশ করা যায় :—

CD $= r\theta$, Jyā CD $=$ CB $= r. \sin \theta$, Koti-jyā CD $=$ AB $= r. \cos \theta$; সুতরাং যদি $r = 1$ হয় তাহা হইলে ভারতীয় আপেক্ষক (function) Jyā θ

$=\sin\theta$ এবং Koti-Jyā $\theta=\cos\theta$ ভারতীয়েরা উৎক্রম জ্যা (versed sine) আপেক্ষকের (function) ব্যবহার ও দেখাইয়াছে। বৃত্তচাপের পূরক ও সম্পূরক

complements & supplements) বলিয়া তাহারা উল্লিখিত আপেক্ষকদ্বয়ের (functions) মান নির্ণয় করিয়াছে।

আদ্যরেখার (Prime line) পাদস্থিত জ্যা ধনরাশি Positive এবং নিম্ন-পাদস্থিত জ্যা ঋণরাশি Negative দ্বারা সূচিত হয়। আবার কোটি-জ্যা, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে Quadrant যথাক্রমে ধনরাশি, ঋণরাশি, ঋণরাশি ও ধনরাশির দ্বারা সূচিত হইবে।

নিম্নলিখিত সূত্রগুলির অনুরূপ সূত্রাবলী তাঁহাদের জানা ছিল :—

(১) $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$,

(২) $\sin(\theta/2)=\sqrt{(1-\cos\theta)/2}$,

(৩) $\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$,

(৪) $\sin^2+2\theta+\text{versin}^2 2\theta=4\sin^2\theta$,

(৫) $\sin(\pi/4\pm\theta)=\sqrt{(1\pm\sin 2\theta)/2}$,

(৬) $\sin\frac{\alpha-\beta}{2}=\frac{1}{2}\{(\sin\alpha-\sin\beta)^2+(\cos\alpha-\text{sos}\,\beta)^2\}^{\frac{1}{2}}$

উল্লিখিত সূত্রগুলির প্রথম তিনটী গ্রাকদের জানা ছিল। চতুর্থ সূত্রটি বরাহমিহির (৫০৫ খ্রী:) প্রতিপাদন করিয়াছেন। অবশিষ্ট সূত্র দুইটি দ্বিতীয় ভাস্করের দান।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ গোলক সম্বন্ধীয় ত্রিকোণমিতির (Spherical Trigonometry) নিম্নলিখিত সূত্রাবলীর সহিতও পরিচিত ছিলেন :—

$\cos c=\cos a\cos b+\sin a\sin b\cos C$;

(৪) এমন একটি আয়তক্ষেত্র নির্ণয় কর যাহার কর্ণের দ্বিগুণ, ভুমির তিনগুণ, প্রস্থের (upright) চারগুণ এবং পরিসীমার সমষ্টি এককের (unity) সমান হইবে।

(৫) পূর্ণসংখ্যা-সূচিত বাহু (Rational integral) ও ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বিভিন্ন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ নির্ণয় কর।

(৬) এমন দুইটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ নির্ণয় কর যাহাদের পরিসীমাদ্বয় ও ক্ষেত্রফলদ্বয় পরস্পর সমান হইবে; অথবা যাহাদের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল সমানুপাত (In a given proportion) অনুযায়ী সম্পর্কিত হইবে।

(৭) বিভিন্ন মূলদ বিষমভুজ (Rational & scalene) ত্রিভুজ নির্ণয় কর।

(৮) কোন প্রদত্ত ক্ষেত্রফলের সাহায্যে একটি মূলদ (Rational) ত্রিভুজ নির্ণয় কর।

ব্রহ্মগুপ্ত প্রমাণ করিয়াছেন সমদ্বিবাহু ট্র্যাপিজিয়ামের বাহু, কর্ণ, উচ্চতা, বাহুর অংশ (Segments) ও ক্ষেত্রফলকে মূলদ রাশির সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। তিনি নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য প্রতিজ্ঞাটিও প্রতিপন্ন করিয়াছেন :—

বৃত্তে অন্তর্লিখনযোগ্য এমন চতুর্ভুজগুলি অঙ্কিত কর যাহাদের বাহু, কর্ণ, লম্ব, খণ্ডবাহু, ক্ষেত্রফল এবং চতুর্ভুজগুলি বহির্লিখিত বৃত্তের ব্যাসকে অখণ্ডরাশির দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

মহাবীর, শ্রীপতি, দ্বিতীয় ভাস্কর প্রমুখ গণিতবিদ্‌গণ উল্লিখিত প্রতিজ্ঞার সমাধানও দিয়াছিলেন। পরিশেষে মহাবীর নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য প্রশ্নটিরও মীমাংসা দান করিয়াছেন :—

প্রদত্ত ব্যাসবিশিষ্ট কোন বৃত্তে অন্তর্লিখনযোগ্য বিভিন্ন মূলদ ত্রিভুজ (Rational Triangle) ও চতুর্ভুজ নির্ণয় কর।

(৫) ত্রিকোণমিতি (Trigonometry)

ত্রিকোণমিতি শব্দটী হইতেই বুঝা যায়, ইহা গণিতশাস্ত্রের (জ্যামিতি) এমনই একটী শাখা—ত্রিভুজ অর্থাৎ ত্রিকোণের পরিমিতি নির্ণয়ই যাহার কাজ। নিম্নলিখিত ABC সমকোণী ত্রিভুজটীকে (B সমকোণ) লওয়া যাক্

ভারতীয় গণিতবিদ্‌দের মতে CB ও AB যথাক্রমে CD চাপের জ্যা ও কোটি-জ্যা। আধুনিক ত্রিকোণমিতিক প্রতীকে (Trigonometrical notation) উহা এইভাবে প্রকাশ করা যায় :—

$CD = r\theta$, Jyā $CD = CB = r.\sin\theta$, Koti-jyā $CD = AB = r.\cos\theta$; সুতরাং যদি $r = 1$ হয় তাহা হইলে ভারতীয় আপেক্ষক (function) Jyā θ

$= \sin\theta$ এবং Koti-Jyā $\theta = \cos\theta$ ভারতীয়েরা উৎক্রম জ্যা (versed sine) আপেক্ষকের (function) ব্যবহার ও দেখাইয়াছে। বৃত্তচাপের পূরক ও সম্পূরক

complements & supplements) বলিয়া তাহারা উল্লিখিত আপেক্ষকদ্বয়ের (functions) মান নির্ণয় করিয়াছে।

আদ্যরেখার (Prime line) পাদস্থিত জ্যা ধনরাশি Positive এবং নিম্ন-পাদস্থিত জ্যা ঋণরাশি Negative দ্বারা সূচিত হয়। আবার কোটি-জ্যা, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে Quadrant যথাক্রমে ধনরাশি, ঋণরাশি, ঋণরাশি ও ধনরাশির দ্বারা সূচিত হইবে।

নিম্নলিখিত সূত্রগুলির অনুরূপ সূত্রাবলী তাঁহাদের জানা ছিল :—

(১) $\text{Sin}^2\theta + \cos^2\theta = 1,$

(২) $\text{Sin}\,(\theta/2) = \sqrt{(1-\cos\theta)/2},$

(৩) $\text{Sin}\,(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta,$

(৪) $\text{Sin}^2 + 2\theta + \text{versin}^2 2\theta = 4\sin^2\theta,$

(৫) $\text{Sin}\,(\pi/4 \pm \theta) = \sqrt{(1 \pm \sin 2\theta)/2},$

(৬) $\text{Sin}\,\frac{\alpha-\beta}{2} = \frac{1}{2}\{(\sin\alpha - \sin\beta)^2 + (\cos\alpha - \text{sos}\,\beta)^2\}^{\frac{1}{2}}$

উল্লিখিত সূত্রগুলির প্রথম তিনটী গ্রীকদের জানা ছিল। চতুর্থ সূত্রটি বরাহমিহির (৫০৫ খ্রী:) প্রতিপাদন করিয়াছেন। অবশিষ্ট সূত্র দুইটি দ্বিতীয় ভাস্করের দান।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ গোলক সম্বন্ধীয় ত্রিকোণমিতির (Spherical Trigonometry) নিম্নলিখিত সূত্রাবলীর সহিতও পরিচিত ছিলেন :—

$\text{Cos}\,c = \cos a\cos b + \sin a\sin b\cos C\,;$

$$\cos A \sin c = \cos a \sin b - \sin a \cos b \cos C$$

এবং $$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$$

Spherical ত্রিভুজের পরিমিতি নির্ণয়ে তাঁহারা উক্ত সূত্রগুলি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রত্যেক ভারতীয় গ্রন্থেই sine ও versine এবং তাহাদের বিয়োগফলের তালিকা দেওয়া হইয়াছে এবং ৩$\frac{3}{4}$° বিশিষ্ট কোণ ও গুণিতকগুলির sine ও versine গত হিসাব নিরূপণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'সূর্য-সিদ্ধান্ত' (চতুর্থ শতাব্দী) বর্ণিত নিম্নলিখিত সূত্রটীর উল্লেখ পাওয়া যায়—

$$\text{Sin}\ (n+1)\theta - \sin n\,\theta = \sin n\theta - \sin (n-1)\theta - \frac{\sin n\,\theta}{225}$$

উক্ত সূত্রটীর সাহায্যেই sineএর তালিকা নির্ণীত হইয়া থাকে। সূত্রটী sinesএর দ্বিতীয় অন্তরফল (second differences) সাপেক্ষ। Delambre সূত্রটীকে অদ্ভুত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—"গণিতবিদ্ Briggs ব্যতীত আর কেহই এপর্য্যন্ত উক্ত অন্তর পদ্ধতি (Differential process) ব্যবহার করেন নাই। তাহা ছাড়া তিনিও—জ্যা অথবা অন্তরফলের বর্গ যে একটী ধ্রুবকরাশি (Constant factor)—ইহা জানিতেন না। অন্য উপায়ে প্রাপ্ত দ্বিতীয় অন্তরফলের সহিত তুলনার সাহায্যে মাত্র তিনি উক্ত সূত্রটীর সত্যতা প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলেন……। তাহা হইলে এক্ষেত্রেও দেখা গেল যে উক্ত পদ্ধতিটি হিন্দুরাই অবগত ছিল ; গ্রীক অথবা আরবদের মধ্যে উহার প্রচলন ছিল না।

ত্রিকোণমিতিক আপেক্ষকসমূহের অসীম শ্রেণী

Infinite Series for Trigonometrical Functions

পুথুমন সোমযাজী (১৪৩১ খ্রী:) বৃত্তচাপের অসীম শ্রেণী (Infinite Series) আবিষ্কার করেন। এই শ্রেণীকে তিনি বৃত্তের কেন্দ্রে উক্ত চাপ নির্মিত কোণের Sine ও Cosine, এবং বৃত্তের ব্যাসার্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদি বৃত্তের ব্যাসার্ধ, তাহার একটি চাপ, এবং ঐ চাপ দ্বারা কেন্দ্রে নির্মিত কোণটি যথাক্রমে r, a, ও θ দ্বারা সূচিত হয়, তাহা হইলে

$$(১)\quad a = r\,\theta - \frac{r.\sin\theta}{1.\cos\theta} - \frac{r\sin^3\theta}{3.\cos^3\theta} + \frac{r.\sin^5\theta}{5.\cos^5\theta} - \frac{r.\sin^7\theta}{7.\cos^7\theta} + \cdots\cdots$$

যখন $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$; এবং

(২) $\frac{r\pi}{2} - \alpha = \frac{r \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{1. \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} - \frac{r \sin^3\left(\frac{}{2} - \theta\right)}{3. \cos^3\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} + \frac{r \sin^5\left(\frac{\pi}{2} - 8\right)}{5. \cos^5\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} - \cdots$

যখন $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$,

(৩) Jyā $\alpha = r. \sin\theta = \alpha - \frac{\ }{3!\, r^2} + \frac{\ }{5!\, r^4} - \cdots\cdots\cdots$,

ইহাকে আধুনিক প্রতীকে (Modern notations) নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায় :—

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!}$$

এবং Koti-jyā $\alpha = r. \cos\theta = r - \frac{\alpha^2}{2!r} + \frac{\alpha^4}{4!\, r^3}$

ইহাকে নিম্নলিখিতভাবে লেখা যায় :—

$$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdot$$

উক্ত ফলগুলি নীলকণ্ঠ (১৫০০ খ্রী:) ও শঙ্কর বর্মণের গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়।

(৬) কলন, Calculus

ভারতীয় গণিতবিদেরা সূক্ষ্মতম বৃদ্ধির (Infinitesimal Increment) প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। ইহার অর্থ, প্রদত্ত আপেক্ষকসমূহের অন্তর্কলন (Differential of given functions). তাঁহারা ইহার নাম দিয়াছেন—'তাৎকালিক গতি'। 'মঞ্জুল' (৯৩২ খ্রী:) প্রদত্ত অন্তর্কলন সূত্রটি (Differential formula) এইরূপ—

$$\delta u = \delta v \pm e \cos\theta\delta\theta$$

অর্থাৎ উহা নিম্নলিখিত সমীকরণের অনুরূপ :—

$$u = v \pm e \sin\theta$$

গ্রহের প্রকৃত গতি (True motion) নিরূপণ কল্পে তিনি উক্ত সূত্রটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, "কেন্দ্রীয় সম্যক কোণের Cosineকে (Cosine of the mean anomaly) কেন্দ্রীয় সম্যক কোণদ্বয়ের অন্তরফল দিয়া (Difference of the mean anomalis) গুণ করিয়া গুণফলকে ছেদ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, উহাকে সম্যক গতির (Mean motion) সহিত

যোগ বা বিয়োগ করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাই প্রকৃত গতির মিনিটে (True motion in minutes)" প্রকাশিত মানের সমান হইবে।

sin θর অন্তর্কলন (Differential) দ্বিতীয় ভাস্কর কর্তৃক 'তাৎকালিক-ভোগ্য-খণ্ড' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অন্তর্কলন সূত্রটি (Differential formula) যথা :— $\delta(\sin\theta)=\cos\theta\delta\theta$ তাহাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি 'অয়ণবলন' (angle of position) নিরূপণ কল্পে উক্ত সূত্রটি কাজে লাগাইয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত উপপাদ্যগুলিরও প্রয়োগ ঘটাইয়াছেন :—

(১) যখন কোনও চলরাশি (Variable) সর্বোচ্চ মান প্রাপ্ত হয়, তখন অন্তর্কলন (Differential) শূন্য হইবে।

(২) যখন কোনও গ্রহ অপভূ (Apogee) বা অনুভূতে (Perigee) অবস্থান করে, তখন কেন্দ্র-সমীকরণ (Equation of the centre) শূন্য হয়। সুতরাং উক্ত গ্রহের কোনও মধ্যবর্তী অবস্থানের বেলাতে কেন্দ্র-সমীকরণের বৃদ্ধিও (Increment of the equation of centre) শূন্য হইবে।

বিপরীত (Inverse) sine আপেক্ষক, (function) ও দুই আপেক্ষকের (functions) (যাহাদের একটি করণ্যাত্মক চিহ্ন (Radical sign) চিহ্নিত) ভাগফল সংক্রান্ত অপর একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র নিম্নে বর্ণিত হইল :—

$$\delta\left\{\sin^{-1}+X\left(\frac{a\sin\theta}{\sqrt{b^2+2ab\cos\theta+a^2}}\right)\right\}$$

$$=\left(\sqrt{b^2+2ab\cos\theta+a^2}-\frac{b(b+a\cos\theta)}{\sqrt{b^2+2ab\cos\theta+a^2}}\right)\times\frac{\delta\theta}{\sqrt{b^2+2ab\cos\theta+a^2}}.$$

উক্ত সূত্রটি দ্বিতীয় আর্যভট (৯৫০ খ্রীঃ) ও দ্বিতীয় ভাস্করের (১১৫০ খ্রীঃ) গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

(৭) শূন্যরাশি ও অনন্ত (Zero and Infinity)

শূন্যরাশি :—খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর ন্যায় প্রাচীন কালেই যে ভারতীয়েরা শূন্যসূচক একটি প্রতীক ব্যবহার করিয়াছিল একথা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। কথিত আছে যে ব্যাবিলন ও মধ্য আমেরিকার ময় অঞ্চলের অধিবাসীরাও নাকি খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতেই সংখ্যা মানের অভাবসূচক একটি প্রতীক ব্যবহার করিত। কিন্তু শূন্য প্রতীক আবিষ্কারের জন্য গৌরব প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়েরাই

দাবী করিতে পারে ; কারণ তাহারাই স্থানীয়মানসূচক সংখ্যা-লিখনপদ্ধতিসূত্রে উক্ত প্রতীকটী ব্যবহার করিয়াছিল এবং সেই পদ্ধতিসম্মত পাটীগণিত সৃষ্টি করিয়াছিল। শূন্যকে সংখ্যা হিসাবেই গণ্য করিয়া তাহারা তাহার দ্বারা বিভিন্ন পাটীগাণিতিক প্রক্রিয়া (Arithmetical operations) সম্পাদন করিয়াছিল। শূন্য শব্দটি অত্যন্ত প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যেই উহার উল্লেখ রহিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে অভাব, তুচ্ছ, অসম্পূর্ণ, উণ প্রভৃতি অর্থে শূন্য শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সমমান বিশিষ্ট অথচ বিপরীতধর্মী দুই সংখ্যার যোগফল শূন্য'[৯]—অধিকাংশ প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদই শূন্যের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপেও Martin Ohm, W. Bolyai De Bolya শূন্যের অনুরূপ সংজ্ঞা দান করেন। এই সংজ্ঞা অনুসারে শূন্যের পূর্বে বা পরে কোন রাশি রাখিয়া পাটীগণিতীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যায় এবং সমস্ত প্রক্রিয়াতেই রাশিটীর অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। ভাস্করের টীকাকার কৃষ্ণ (১৫৭৫ খৃঃ) শূন্যের সাহায্যে গুণন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত আলোচনাকালে বলিয়াছেন—'বস্তুতঃ গুণ পুনরাবৃত্তির নামান্তর ; যদি পুনরাবর্তন যোগ্য কোন সংখ্যা না থাকে তাহা হইলে গুণকরাশি যত বড়ই হউক না কেন তাহা দ্বারা কোন কিছুর পুনরাবৃত্তি ঘটানই সম্ভব নহে।'[১০]

এই বাধা অপসারণকল্পে কৃষ্ণ ও গণেশ (১৫৪৫ খৃঃ) বলিয়াছেন—'কোন সংখ্যাকে চরমভাবে হ্রাস করা, উক্ত সংখ্যাকে শূন্যে পরিণত করার সামিল। মহাবীরাচার্য ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত এই নয়টী সংখ্যার মত শূন্যকেও একটী সংখ্যা বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে কৃষ্ণ আরো বলেন যে 'শূন্য ধনরাশিও নয়, ঋণরাশিও নয়। সেইজন্য ইহাকে কোন চিহ্ন দ্বারাই (+ −) চিহ্নিত করা যায় না।

প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন পাটীগণিত ও বীজগণিত গ্রন্থে সংখ্যার সহিত শূন্যের অথবা শূন্যের সহিত সংখ্যার যোগফল তথা সংখ্যা হইতে শূন্যের অথবা শূন্য হইতে সংখ্যার বিয়োগফল বর্ণিত হইতে দেখা যায়।

<u>অত্যণু হিসাবে শূন্যরাশির ব্যবহার :—</u>(Zero as an Infinitesimal) ভারতীয় গণিতবিদেরা যখন হইতে শূন্যের সাহায্যে গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন তখন হইতেই অত্যণু হিসাবে শূন্যরাশির ব্যবহারের ধারণা জন্মে। ব্রহ্মগুপ্ত, (৬২৮ খৃষ্টাব্দ) শূন্যকে, অথবা শূন্যের দ্বারা গুণনের গুণফল এইরূপ নিভু‍র্লভাবে লিখিয়াছিলেন :—

$$0\times(\pm a)=0\,;\;(\pm a)\times 0=0\,;\;0\times 0=0$$

ভাস্কর রচিত লীলাবতী গ্রন্থের টীকায় টীকাকার গণেশ (১৫৪৫ খৃঃ) ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এইরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন—"গুণক হইতে যতবারই ১ কমাইয়া লওয়া হইবে, ততবারই গুণফল হইতে গুণ্য সংখ্যাটি বিযুক্ত হইবে। এইরূপে শেষ পর্যন্ত যখন শূন্যের দ্বারা কোন সংখ্যাকে গুণ করা হয়, তখন শূন্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী গুণক অর্থাৎ একের দ্বারা উক্ত সংখ্যার গুণনের গুণফল হইতে গুণ্যই বিযুক্ত হইবে; অর্থাৎ গুণফল শূন্যে পরিণত হইবে। এখানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে গণেশ গুণককে অখণ্ডরাশি হিসাবে গণ্য করিয়াছিলেন, এবং সেইজন্যই তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ ১ বাদ দেওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত গুণক শূন্যরাশিতে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু কৃষ্ণ (১৫৭৫ খৃঃ) অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেন নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে—"গুণ্য সংখ্যাটিকে যত হ্রাস করা হইবে, গুণফলও ক্রমান্বয়ে তত হ্রাস পাইবে। গুণ্য যেখানে হ্রস্বতম অর্থাৎ শূন্য গুণফলও সেখানে তদনুরূপ। কোন সংখ্যার চরমতম হ্রস্বতার অর্থ উহার শূন্যে পরিণতি। সুতরাং গুণক যদি শূন্য হয় তাহা হইলে গুণফলও শূন্যই হইবে। গুণকের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে গুণফলও হ্রাস পাইয়া থাকে। গুণক যেখানে শূন্য গুণফলও সেখানে তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে।"[১১]

অসীম :—(Infinite) অশূন্য সংখ্যাকে শূন্যের দ্বারা ভাগ করা হইতেই পাটীগণিতে অনন্তের ধারণার (Idea of the infinite) উদ্ভব। ব্রহ্মগুপ্তই (৬২৮ খৃঃ) সর্বপ্রথম শূন্যের দ্বারা সংখ্যার ভাগের কথা বলেন। শ্রীধর (৭৫০ খৃঃ) এবং দ্বিতীয় আর্যভট্ট (৯৫০ খ্রীঃ) শূন্যের দ্বারা ভাগের কথা উল্লেখ করেন নাই। কোন সংখ্যাকে শূন্যের দ্বারা ভাগ করিলেও সংখ্যাটি অপরিবর্তিতই থাকিবে—মহাবীর (৮৫০ খৃঃ) এই অশুদ্ধ ফল নির্দেশ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মগুপ্তের মতে—ধন বা ঋণরাশিকে শূন্যের দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল হইবে—ভাজ্যরাশি বিভক্ত শূন্য। ইহাকেই "তচ্ছেদ" বলা হইয়াছে। সুতরাং :—

$$a \div 0 = \frac{a}{0}$$

ভাস্করের (১১৫০ খৃঃ) মতে—সসীম রাশিকে শূন্যের দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল 'খহর' হইবে; কিন্তু তিনি অসীম বা অনন্তরাশির[১২] দ্বারাই 'খহর' এর মান নির্দেশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের মতে ভাজক যত হ্রাস পাইবে ভাগফল তত বর্ধিত হইবে। ভাজক নিম্নতম হইলে ভাগফল হইবে উচ্চতম। কিন্তু

ভাগফলের মান যদি কোন বিশেষ সংখ্যায় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উক্ত সংখ্যাই যে বৃহত্তম একথা বলা চলিবে না; কারণ তদপেক্ষা বৃহত্তর সংখ্যাও সম্ভব। ভাগফল যেখানে অনির্দিষ্টভাবে বৃহৎ সেইখানেই তাহাকে অনন্ত বলা সঙ্গত।

উল্লিখিত মতামতের সহিত গণিতবিদ Martin Ohm এর (১৮২৮ খৃঃ) অভিমতের তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে যদি a ও b যথাক্রমে অশূন্য ও শূন্যরাশি হয় তাহা হইলে ভাগফল হিসাবে $\frac{a}{b}$ অর্থহীন।[১৩] ভাস্করের (১১৫০ খৃঃ) অভিমত এই যে—অনন্তের সহিত অথবা তাহা হইতে কোন সসীমরাশি যোগ বা বিয়োগ করিলে তাহার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না যেমন :— $\frac{a}{0} \pm b = \frac{a}{0}$ এখানে a, b দুইটি সসীম রাশি। তাঁহার বক্তব্য এই যে—জগৎ ধ্বংস অথবা সৃষ্টির কালে অসংখ্য বস্তু নিঃশেষিত অথবা উদ্ভূত হইলেও যেমন অনন্ত ও অপরিবর্তনীয় স্রষ্টার কোনও পরিবর্তন ঘটে না সেইরূপ শূন্য ভাজক বিশিষ্ট এই অনন্ত রাশির (Infinite) সহিত অথবা উহা হইতে যত কিছু যুক্ত বা বিযুক্ত হউক না কেন, উহা অপরিবর্তিতই থাকিবে।[১৪]

কৃষ্ণের অভিমতও অনুরূপ। অসীম রাশি সূচক (Infinite quantity) ভগ্নাংশের (খহর) সহিত অথবা উহা হইতে কোন সসীমরাশি যুক্ত অথবা বিযুক্ত হইলেও উহার কোন পরিবর্তন ঘটে না। কারণ, কতকগুলি ভগ্নাংশকে সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিণত করার সময় যদি কোন সসীম ভগ্নাংশের লব ও হর উভয়কেই শূন্যের দ্বারা গুণ করা হয় তাহা হইলে উভয়ই শূন্য হইবে। এবং কোন সসীম সংখ্যার সহিত, অথবা উহা হইতে, শূন্য যোগ বা বিয়োগ করিলে উক্ত সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিবে। যদি কোন অসীম ভগ্নাংশের লবের সহিত, অথবা উহা হইতে, কোন সসীম সংখ্যা যোগ অথবা বিয়োগ করা হয় তাহা হইলে উক্ত লব অবশ্যই পরিবর্তিত হইবে ফলেই উহা অপর একটি অসীম ভগ্নাংশের লব হিসাবে পরিবর্তিত হইবে। তবে শূন্য হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের লবটি, ছোট অথবা বড়, একটি সসীমরাশি হইলেও উক্ত ভগ্নাংশটি একটি অসীমরাশি (Infinite) হইবে যেমন :—

$$\frac{a}{o} \pm \frac{b}{c} = \frac{a}{o} \pm \frac{b \times o}{c \times o}. \quad a \pm o \quad . \frac{a}{o}$$

এখানে $\frac{b}{c}$ একটি সসীম রাশি, আবার :—

$$\frac{a}{o} \pm \frac{b}{o} = \frac{a \pm b}{o} = \text{অসীম}$$

সংস্কৃত অনন্ত শব্দটির অর্থ সীমাহীন। এই শব্দটি বেদের সুপ্রাচীন গ্রন্থেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু যে সময় হইতে গণিতবিদেরা শব্দটির প্রয়োগ সুরু করেন সম্ভবতঃ সেই সময় হইতেই ইহার প্রকৃত তাৎপর্যের বিকাশ ঘটে। ভারতীয় গণিতবিদেরা 'অনন্ত' অর্থে 'খচ্ছেদ' বা 'খহর' (শূন্য হরবিশিষ্ট) শব্দ দুইটি নিয়মিতভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্য শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত, "ষটখণ্ডাগম" নামক জৈন গ্রন্থের টীকা 'ধবলা'তে উক্ত বিভিন্ন অর্থের শ্রেণী বিভাগ ও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। টীকাকারের মতে অনন্ত শব্দটি নিম্নলিখিত একাদশ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে :—

(১) নামানন্ত :—নামেই অনন্ত (Infinite in name)। কতকগুলি বস্তুর সমষ্টিকে—প্রকৃতপক্ষে সেইগুলি অন্তহীন হউক বা নাই হউক—অজ্ঞলোকের সাধারণ কথোপকথনে অথবা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বুঝাইতে, অনন্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়। উক্ত প্রসঙ্গে অনন্ত শব্দটি নামেই অনন্ত অর্থাৎ নামানন্ত।

(২) স্থাপনানন্ত :—আরোপিত বা সংযুক্ত অনন্ত। এখানেও শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য নাই। কোন বস্তুতে আরোপিত অথবা কোন বস্তুর সহিত সংযুক্ত অনন্তকে বুঝাইতে শব্দটির ব্যবহার।

(৩) দ্রব্যানন্ত :—অব্যবহৃত জ্ঞানের তুলনায় যাহা অনন্ত। অনন্ত সম্পর্কে যাহারা জ্ঞানী অথচ সাময়িকভাবে সেই জ্ঞানের প্রয়োগ করেন না—এইরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।

(৪) গণনানন্ত :—সংখ্যা সম্বন্ধীয় অনন্ত (Numerical Infinite)। গণিত শাস্ত্র সম্মত প্রকৃত অনন্ত অর্থেই এই শব্দটির প্রয়োগ।

(৫) অপ্রাদেশিকানন্ত :—যাহা মাত্রাহীন (Dimensionless) অর্থাৎ অপরিমেয়ভাবে ক্ষুদ্র তাহাই।

(৬) একানন্ত :—একদেশীয় অনন্ত (One directional Infinite) কোন অনন্তবিস্তৃত সরলরেখার এক-প্রান্তে তাকাইলে যে অনন্ত আভাষিত হয় ইহা তাহাই।

(৭) উভয়ানন্ত :—দ্বি-দেশীয় অনন্ত (Two directional Infinite) উভয় দিকে অনন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সরলরেখাই উহার উদাহরণ।

(৮) বিস্তারানন্ত :—দ্বি-মাত্রা বিশিষ্ট তল সম্বন্ধীয় (Two-dimensional Infinity or Superficial Infinity) অনন্ত ; ইহার অর্থ অনন্ত সমতল ক্ষেত্র।

(৯) সর্বানন্ত :—দেশানন্ত (Spacial Infinity) অর্থাৎ ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট অনন্ত (Three-dimensional Infinity) অথবা অনন্ত দেশ (Infinite space)।

(১০) ভাবানন্ত :—সচরাচর ব্যবহৃত জ্ঞানের তুলনায় যাহা অনন্ত। অনন্ত সম্পর্কীয় যাঁহার জ্ঞান আছে এবং যিনি উক্ত জ্ঞানের প্রয়োগ করেন তাঁহার সম্পর্কেই উক্ত শব্দটির প্রয়োগ।

(১১) শাশ্বতানন্ত :—নিত্য ও অবিনশ্বর অর্থে ইহার প্রয়োগ।

উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ হইতে বুঝা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তানায়কগণ অনন্ত (Infinite) শব্দটির অর্থ নির্ণয় করিতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এমন কি আধুনিক বিচারেও তাঁহাদের অনন্ত সম্বন্ধীয় এই ধারণা প্রায় অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

৮। জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy)

প্রাচীন পুঁথিপত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে ক্যালডিয়া, সিরিয়া, মিশর ও ময়ের অধিবাসীরা ও অন্যান্য কোন কোন জাতি জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল এবং উহার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। পুরাকালে সাধারণতঃ গোষ্ঠীপতি অথবা পুরোহিতেরা ছিলেন জ্যোতির্বিদ। ফসল উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত কাল নির্ধারণ ছিল তাঁহাদের অন্যতম কর্তব্য, ইহার জন্য Tropical year ও সূর্যের বার্ষিক গতি সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রয়োজন হইত তখন সাধারণতঃ চান্দ্র মাসের (Lunar year) প্রচলন ছিল এবং সৌর বৎসরের (Solar year) সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চান্দ্র বৎসর গণনা করার প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতীয়েরা, 'বেদ' ও 'বেদাংগ-জ্যোতিষে' তাঁহাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞানের সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থগুলি খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার হইতে খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের মধ্যেই রচিত হইয়া থাকিবে। ঋকৃবেদে (খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার) সূর্যের বর্ষপথের দ্বাদশ বিভাগ[১৫] এবং উক্ত বৃত্ত পথের ৩৬০ বিভাগেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে ক্যালডিয়া ও ব্যাবিলনের অধিবাসীরাই নাকি যথাক্রমে সূর্যের বর্ষপথের এই দ্বাদশ ও ৩৬০ বিভাগের কথা প্রথম জানিতে পারে। উক্ত তথ্যের প্রথম আবিষ্কারক কাহারা—এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজসাধ্য নহে তবে মনে হয় ক্যালডিয়া ও ব্যাবিলনের অধিবাসীরা সূর্যের বৃত্তপথের এই বিভাগের কথা ভারতীয় আর্যদের নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছিল।

ঋগ্বেদে সূর্যের বর্ষপথকে দ্বাদশ-অর-বিশিষ্ট চক্ররূপে (12 spoked wheel) বর্ণনা করা হইয়াছে। টীকাকার সায়নের মতে উক্ত অর-দ্বাদশ দ্বাদশ রাশি (Zodiac) ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেইরূপ বেদোক্ত দ্বাদশাদিত্য উক্ত দ্বাদশ বিভাগেই অবস্থিত দ্বাদশ সূর্য। বৈদিক ভারতীয়েরাই ক্রান্তিপাত (Equinoctial) ও অয়নপাত (Solstitial) নির্ধারণ করিয়া উহাদের বিন্দু চতুষ্টয়কে অগ্নি, ইন্দ্র এবং মিত্র ও বরুণ এই নামে অভিহিত করে। অনুরূপভাবে তাহারা চন্দ্রের গতিপথকেও সাতাশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল; ইহারাই নক্ষত্র নামে পরিচিত। এক পূর্ণিমা হইতে অপর পূর্ণিমা অথবা এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত কালকেই তাহারা এক মাস বলিয়া গণ্য করিত। সৌর বৎসরের সহিত চান্দ্র মাস গণনার সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই যে ভারতীয়েরা ৬২ চান্দ্রমাস বিশিষ্ট ৫ বৎসর কালকে একটি যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল—ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধর্মগ্রন্থ বলিয়াই হয়তো বেদগুলি কালের করাল গ্রাস উপেক্ষা করিয়া আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান অথবা অন্যান্য বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থও হয়তো সে যুগে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি আজ লুপ্ত। অদ্যাবধি তাই যে সংস্কৃত সাহিত্য টিকিয়া রহিয়াছে তাহার মধ্যে এক বিরাট ফাঁক লক্ষ্য করা যায়। একদিকে আমাদের বৈদিক সাহিত্য অন্যদিকে খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতে রচিত অপরাপর গ্রন্থ; কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যবর্তী প্রায় দুই হাজার বৎসরের মধ্যে রচিত কোন বিজ্ঞান গ্রন্থই পাওয়া যায় নাই।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত "আর্য ভটীয়" নামক গ্রন্থই হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের প্রাচীনতম নিদর্শন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থে, গ্রন্থকার বরাহমিহিরের নিকট পরিচিত পাঁচখানি প্রসিদ্ধ জোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থের নাম ও সারাংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থগুলি 'আর্য ভটীয়' গ্রন্থের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল এবং ইহাদের কয়েকখানি খৃষ্ট যুগের পূর্বে রচিত হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু বর্তমানে সেগুলি লুপ্ত। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে স্থানীয় মান নির্দেশক অঙ্কপাতন প্রণালী সার্বজনীন ভাবে গৃহীত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থগুলিতে সেই প্রণালীর ব্যবহার ছিল না বলিয়াই সম্ভবতঃ সেগুলি বাতিল করা হইয়াছিল। অথবা হয়তো উক্ত বিষয়ের উন্নততর গ্রন্থ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যে প্রাচীন গ্রন্থগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয়েরা

উক্ত বিদ্যায় উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল ; এমন কি এই বিষয়ে তাহারা পৃথিবীর সকল জাতিকেই ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ভারতীয়েরা গ্রীকদের নিকট হইতেই জ্যোতির্বিদ্যাসংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছিল—এইরূপ একটি মতবাদ প্রচলিত আছে ; কিন্তু ইহা নিছক কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। তাহারা যে গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, এবং ফলে উভয়জাতির মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে ভারতীয় ও গ্রীকদের রীতি, বিষয়বস্তু ও তত্ত্বসমূহ এত স্বতন্ত্র—যে এ ব্যাপারে ভারতীয় ও গ্রীকেরা কে কাহার কাছে কতখানি ঋণী—বর্তমান জ্ঞানে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে এমন কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ রহিয়াছে—যেগুলি মূলতঃ গ্রীক ; পক্ষান্তরে সংস্কৃত মূলোদ্ভূত কতকগুলি শব্দ গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানে পাওয়া যায়। তাই এইরূপ সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঙ্গত নহে। অথচ কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহাই করিয়াছেন।

"বেদাংগজ্যোতিষ" জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে প্রাচীনতম ভারতীয় গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে কেবলমাত্র জ্যোতির্বিদ্যাই আলোচিত হইয়াছে। খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ববর্তী ভারতীয় আদিম জ্যোতির্বিদ্যা উক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতীয়েরা সেই সুপ্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদ্যাকে জ্ঞানের একটি বিশিষ্ট শাখা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহার উপযোগিতা সম্বন্ধেও তাঁহারা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। উক্ত গ্রন্থের তিনটি বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদীয় পাঠে চান্দ্রতিথি (Lunar dates) গণনা, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, অয়নসমূহ (Equinoxes) এবং সাতাশটি নক্ষত্রের তুলনায় চন্দ্র ও সূর্যের অবস্থান নির্ণয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। মাস, বৎসর, মুহূর্ত, লগ্ন, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা, তিথি, ঋতু এবং পঞ্চ সৌর বৎসর কালের মধ্যবর্তী বিষুবসমূহের আলোচনা যজুর্বেদীয় পাঠের অন্তর্ভুক্ত। উহাতেই—কাল নির্ধারণের যন্ত্র হিসাবে—জল-ঘড়ির (Water clock) উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদীয় পাঠে মুহূর্ত, চান্দ্র-তিথি, করণ, যোগ প্রভৃতির আলোচনা এবং সাপ্তাহিক দিনগুলির উল্লেখ রহিয়াছে।

বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থে,—'সূর্য-সিদ্ধান্ত', 'পিতামহ-সিদ্ধান্ত', 'রোমক-সিদ্ধান্ত', 'পুলিশ-সিদ্ধান্ত' এবং 'বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত' প্রভৃতির উল্লেখ ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে। স্বীকৃত মূল্যবিশিষ্ট উক্ত সিদ্ধান্তগুলি

পুরাতন পদ্ধতিতে লিখিত ছিল। পরবর্তীকালে ঐগুলি বিভিন্ন নূতন রীতিতে পুনর্লিখিত হইয়াছিল। ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খৃঃ) 'বশিষ্ঠ সিদ্ধান্তে', বিজয়নন্দিন ও বিষ্ণুচন্দ্র লিখিত দুইটি ভিন্ন সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীষেন সম্পাদিত 'রোমক সিদ্ধান্তে'র নূতন সংস্করণ ও প্রথম আর্য ভটের শিষ্য লাটদেব বিরচিত 'সূর্য সিদ্ধান্তে'র একটি সংস্করণের কথাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলির কোনখানিই দীর্ঘকাল টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। নূতন গ্রন্থের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন গ্রন্থ বাতিল হইয়া গিয়াছে। খৃঃ পঞ্চম হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এই সময়টিকে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশিষ্ট সাধনা ও অগ্রগতির কাল হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। কেননা ঐ সময়েই গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

খৃঃ ৪৯৯ অব্দে প্রথম আর্য ভট অশ্মক নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। পাটলিপুত্র অর্থাৎ বর্তমান পাটনাতেই তাঁহার জ্ঞান সাধনা ও গবেষণার কাজ সম্পাদিত হইয়াছিল। তাঁহার ২৩ বৎসর মাত্র বয়সেই ১১৮টি শ্লোকবিশিষ্ট আর্যভটীয় নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হয়। উক্ত গ্রন্থে গণিত ও জ্যোতিষের মূল তত্ত্বগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। আর্যভটীয় নামক গ্রন্থে বিবৃত ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার সহিত গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় দেশীয় জ্যোতিষ পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। জ্যোতিষ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর গাণিতিক ব্যাখ্যাদানই ছিল উভয় দেশীয় পদ্ধতির উদ্দেশ্য কিন্তু তাহাদের অনুসৃত পন্থা ও তত্ত্বগুলি ভিন্ন। ভারতীয়দের বিশ্বাস ছিল, (১) প্রত্যেক জ্যোতিষিয় ঘটনাই একটি নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে সংঘটিত হয়; (২) সৃষ্টির, তথা প্রতি যুগের, প্রারম্ভে সমস্ত গ্রহগুলি একই রেখা অর্থাৎ 0° দেশান্তরে (Zero longitude) অবস্থান করে; (৩) সৃষ্টির অথবা যুগের প্রারম্ভ কালই জ্যোতিষিয় ঘটনাবলীর গাণিতিক ব্যাখ্যাদানের উপযুক্ত কাল হিসাবে গণ্য; (৪) সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র একইরূপ রৈখিক গতিবিশিষ্ট (Linear motion); (৫) তাহাদের অসম দূরত্বের জন্য কৌণিক গতির (Angular motion) হার বিভিন্ন এবং (৬) শূন্যস্থিত চলমান বিন্দুসমূহের (মন্দোচ্চ, শীঘ্রোচ্চ এবং পাত) প্রতি আকর্ষণের জন্যই গ্রহগুলির গতি অনিয়মিত।

পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং তাহাকে ঘিরিয়াই সমগ্র গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরিতেছে—সাধারণতঃ ইহাই ছিল পণ্ডিতদের ধারণা। কিন্তু প্রথম আর্যভট অন্যান্য ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সহিত এ বিষয়ে একমত হইতে পারেন

নাই। তাঁহার মতে পৃথিবী আপন অক্ষের (Axis) উপরে এবং সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। তবে জ্যোতিষিক গণনার সুবিধার জন্য অন্যান্য ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতই তিনি পৃথিবীকে গতিহীন বা স্থির ধরিয়া লইয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন। পৃথিবীর আকার গোল—ইহা সুবিদিত ছিল। চুম্বক পরিবৃত লৌহ-গোলকের মতই পৃথিবী যে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র পরিবৃত হইয়া শূন্যে অবস্থান করিতেছে ইহাও অবিদিত ছিল না। বিষুব-বৃত্তস্থিত (Equator) কোন নির্দিষ্ট বিন্দুর সম্যক স্থিতি (Mean position) নির্ণয়ের সাহায্যেই গ্রহের অবস্থান নিরূপণ করা হইত। গ্রহটির প্রকৃত ভূকেন্দ্রিক অবস্থান (True geocentric position) নির্ণয় করার জন্য অবশ্য পরে বহুবিধ সংশোধন বা সংস্কারের সাহায্য লওয়া হইত। সূর্য ও চন্দ্রের ক্ষেত্রে উক্ত উদ্দেশ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'দেশান্তর সংস্কার' (Longitude correction), 'মন্দফল সংস্কার' (Equation of the centre), 'ভুজাবিবর সংস্কার' (Correction for the equation of time due to eccentricity of the object) ও 'চর-সংস্কারে'র (Correction for the latitude difference) প্রয়োগ করেন এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের বেলায় উক্ত সংস্কারগুলির সহিত 'শীঘ্র-ফল সংস্কার'টির প্রয়োগও দেখা যায়। তবে সূর্য চন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের ক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োগের একই পদ্ধতি সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানী অনুসরণ করেন নাই। পরবর্তী কালে শ্রীপতি 'উদয়ান্তর' (Correction for the equation of time due to obliquity of the ecliptic) নামক আরেকটি নূতন সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত আরও দুইটি 'চান্দ্র-সংস্কার' (Lunar correction) যথা The Evection ও 'বিকার-সংস্কার' (The Variation), পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রথম আর্যভটই সর্বপ্রথম Evection-এর কথা প্রকাশ করেন কিন্তু বটেশ্বর প্রথম গণনা-কার্যের জন্য ইহার সাহায্য লইয়াছিলেন। গণনা ও পর্যবেক্ষণ-কার্য—এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পরেও সময়ে সময়ে অন্যান্য সংস্কারের উদ্ভব ঘটে।

গ্রহের সম্যক অবস্থান (Mean position) অবগত হইতে হইলে তাহাদের দৈনিক সম্যক গতি জানার প্রয়োজন। ৪৩২০০০০ বৎসরে কোন গ্রহের পরিক্রমা-সংখ্যা কত তাহা নির্ণয় করিয়া তাহার মাধ্যমেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা উক্ত গ্রহের গতিবেগ বিবৃত করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে উক্ত কালের অবসানে

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার সমস্ত চলমান গ্রহ-নক্ষত্র লইয়া পুনরায় তাহার প্রথম অবস্থানে ফিরিয়া আসিবে। সেইজন্য গ্রহ-নক্ষত্রের পরিক্রমা-সংখ্যা (Revolution numbers) (ভগণ) পূর্ণসংখ্যার দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছিল। বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী উক্ত পরিক্রমা-সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গ্রহ	৪৩২০০০০ সৌর বৎসরে পরিক্রমা-সংখ্যা			
	প্রাচীন সূর্য্য-সিদ্ধান্ত	আর্য্যভটীয়	আধুনিক সূর্য্য-সিদ্ধান্ত	ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত
সূর্য	৪৩২০০০০	৪৩২০০০০	৪৩২০০০০	৪৩২০০০০
চন্দ্র	৫৭৭৫৩৩৩৬	৫৭৭৫৩৩৩৬	৫৭৭৫৩৩৩৬	৫৭৭৫৩৩০০
মঙ্গল	২২৯৬৮২৪	২২৯৬৮২৪	২২৯৬৮৩২	২২৯৬৮২৮'৫২২
বুধ	১৭৯৩৭০০০	১৭৯৩৭০২০	১৭৯৩৭০৬০	১৭৯৩৬৯৯৮'৯৮৪
বৃহস্পতি	৩৬৪২২০	৩৬৪২২৪	৩৬৪২২০	৩৬৪২২৬'৪৫৫
শুক্র	৭০২২৩৮৮	৭০২২৩৮৮	৭০২২৩৭৬	৭০২২৩৮৯'৪৯২
শনি	১৪৬৫৬৪	১৪৬৫৬৪	১৪৬৫৬৮	১৪৬৫৬৭'২৯৮

উক্ত তালিকা হইতে বুঝা যায় যে পরিক্রমা-সংখ্যাগুলি সংস্কারসাপেক্ষ। ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের ফলেই বিভিন্ন সময়ে এই সংস্কারগুলির প্রচলন ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক যুগ-প্রারম্ভেই যে গ্রহগুলি শূন্য দেশান্তরে অবস্থিত ছিল—এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অন্য যে কোন সময়েই গ্রহের সম্যক দেশান্তর নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হইত :—

সম্যক দেশান্তর (Mean Longitude)

$$= \frac{\text{পরিক্রমণ-সংখ্যা} \times \text{অহর্গণ (Revolution number)}}{\text{২৪ ঘণ্টা কাল পরিমাণ বিশিষ্ট দিনের সংখ্যা (Number of civil days)}}$$

যুগের আরম্ভ নির্দিষ্ট থাকায়, civil days এর সংখ্যা গণনার উপযোগী তথ্যগুলি পরবর্তী যে কোন বিশেষ দিনেই অদৃশ্য হইত।

প্রকৃত ভূকেন্দ্রীয় দেশান্তর (True Geometric Longitude) নির্ণয়ার্থ, সম্যক দেশান্তরের (Mean Longitude) ক্ষেত্রে প্রযুক্ত সংস্কারগুলি তথাকথিত 'নীচোচ্চবৃত্ত' (Epicyclic) সম্বন্ধীয় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথম আর্য ভটের 'নীচোচ্চবৃত্ত' সম্বন্ধীয় তত্ত্বের (Epicyclic theory) সহিত গ্রীকদের উক্ত তত্ত্বের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিস্ময়কর পার্থক্য চোখে পড়ে। বিভিন্ন

পদে (Odd and Even quadrants) প্রথম আর্য ভট ও অন্যান্য হিন্দু জ্যোতি-বিজ্ঞানীদের, 'নীচোচ্চ বৃত্ত'গুলির আয়তনগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবং স্থানানুযায়ী উহাদের আয়তনের পরিবর্তন ঘটে। পক্ষান্তরে গ্রীকদের 'নীচোচ্চ বৃত্ত'গুলির আয়তন সর্বদা অপরিবর্তিত।

হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী তিথি, নক্ষত্র, করণ, যোগ, এবং গ্রহণের কাল নির্ণয়ের জন্য সূর্য ও চন্দ্রের দেশান্তরের হিসাব প্রয়োজন হইত। হিন্দুদের ধর্মাচরণের সহিত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় গ্রহণের কাল ও তাহার প্রলম্বন (Projection) নির্ণয়ে হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রথম আর্যভটের লম্বন (Parallax) নিরূপণ প্রণালী 'দেশজ্যা-বিধান' নামে পরিচিত। ইহা মূলতঃ ভারতীয় পদ্ধতি। পুরাকালে অবশ্য লোকের ধারণা ছিল যে রাহুর জন্যই গ্রহণ সংঘটিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মগুপ্ত ও লল্ল কঠোরভাবে এই মিথ্যা জ্ঞান বা ধারণা খণ্ডন করেন। জ্যোতিষীয় গ্রন্থ সমূহে, চন্দ্রের আরোহ-পাত (ascending node) অর্থেই রাহু শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়।

বৈদিক আমল হইতে চন্দ্র ও নক্ষত্রদের তুলনায় চন্দ্রের গতি গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল। আর্যভটীয় এবং পরবর্তী জ্যোতিষ-গ্রন্থ সমূহে, চন্দ্রের উদয়াস্ত চন্দ্রকলা (The phases) চন্দ্রের শৃঙ্গগুলির উচ্চতা (Elevation of the horns) ও নক্ষত্রদের সংযোজক তারকাবলী (Junction stars) সহিত চন্দ্রের সমসূত্রে অবস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হইতে দেখা যায়। ঐ গ্রন্থগুলিতে আলোচিত অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে কুণ্ডলাকারে বিভিন্ন গ্রহের আবির্ভাব (Helical rising of the planets) ও নক্ষত্রগুলির সংযোজক তারকাসমূহের সহিত গ্রহগুলির সমসূত্রে অবস্থান প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভারতীয় অবদান নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১। সৌর রাশিচক্র (The Solar zodiac)

২। চন্দ্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নক্ষত্রাবলী (The Lunar mansions)

৩। অয়ন-চলন ও উহার হার নির্ণয় (Precession of the Equinoxes)

৪। চন্দ্র ও সৌর বৎসর প্রতিপাদন (Luni-Solar Year)

৫। সাপ্তাহিক দিনগুলির নামকরণ

৬। ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের ফলে গ্রহসমূহের গতির সম্যক হার নির্ণয় (ভগণ)

৭। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জ্যোতিষীয় পঞ্জিকা প্রণয়ন

৮। পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, অন্যান্য গ্রহের গোলাকৃতি নিরূপণ

৯। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের ব্যাসমান নির্ণয়

১০। সম-রৈখিক গতি (Equal linear motion) তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব নির্ণয়

১১। আপন অক্ষেই পৃথিবীর আবর্তন

১২। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর আবর্তন (প্রথম আর্যভট)

১৩। গ্রহ সমূহের সাম্যাবস্থা নির্ধারণ কল্পে গ্রহগুলির পারস্পরিক আকর্ষণের স্বীকৃতি (Inter planetary attraction)

১৪। জল-ঘড়ি (Water clock)

১৫। সূর্য ঘড়ির কাঁটার সাহায্যে সূর্যের অবস্থান নিরূপণ ও পর্যবেক্ষণ স্থানের অক্ষাংশ ও কাল প্রভৃতি নির্ণয়।

খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উক্ত বিষয়গুলি ভারতীয়েরা জানিত। প্রায় সেই সময়ে উত্তর ভারতে মুসলমান আক্রমণ ঘটে। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য কয়েকটি হিন্দু রাজত্ব টিকিয়াছিল; ফলে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তরিত হয়। খ্রীঃ ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। বর্তমানে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে দক্ষিণ ভারতীয় জ্যোতর্বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফলেই জ্যোতিষের পূর্বপ্রচলিত মূল সূত্রগুলি সংশোধিত হয়। তাঁহারা জ্যোতিষগণনা ও আসন্ন মান নির্ণয়ের উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তন করেন জ্যোতিষ গণনার ক্ষেত্রে তাঁহারা অন্তকলণ ও সমকলণ (Differential and Integral Calculus) সদৃশ প্রণালীর প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অসীম শ্রেণীরূপে (Infinite Series) ত্রিকোণমিতিক আপেক্ষিক সমূহের (Functions) বিস্তার (Expansion) তাঁহাদের দ্বারাই সম্ভব হইরাছিল এবং তাঁহারাই আসন্নমান নির্ণয়কল্পে উক্ত শ্রেণীর প্রয়োগ ঘটাইয়াছিলেন।

ভারতীয়েরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার জানিতেন না। খালি চোখেই তাঁহাদের পর্যবেক্ষণের কার্য সম্পাদিত হইত এবং কোণের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য তাঁহারা সুবিধামত ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞান, চন্দ্র, সূর্য, ও গ্রহ নক্ষত্রের গতি বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল।

অতি অল্পসংখ্যক ভারতীয় জ্যোতিষ-গ্রন্থই ইংরাজীতে অনুদিত হইয়াছে।

সেইজন্যই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এককালে যে কতখানি উন্নতিলাভ করিয়াছিল—পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বহুপূর্বেই যে সকল তথ্য জানিতে পারিয়াছিল, পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহাই নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলেন।

দ্রষ্টব্য

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য—Dutt & Singh, History of Hindu Mathematics প্রথম খণ্ড পৃঃ ৮৮ দেখুন।

২। সঙ্খেদ হইতে প্রাপ্ত গুর্জর দানপত্রে উল্লিখিত শ্লোকে দশমিক স্থানীয় মান নির্দেশক অঙ্কপাতন প্রণালী ব্যবহারের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। Epigraphia Indica II পৃঃ ১৯। G. Coedes (Bulletin, School of Oriental Studies, London VI ১৯৩১, পৃঃ ৩২৩—৮) নৃপতি শ্রীবিজয়ের ৩ খানি উৎকীর্ণ লিপির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের দুইখানি সুমাত্রার পালেম্বাং ও একখানি বাঙ্কা দ্বীপ হইতে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত লিপিগুলিতে যথাক্রমে ৬০৫, ৬০৬ ও ৬০৮ শকাব্দে (অর্থাৎ যথাক্রমে খ্রীঃ ৬৮৩, ৬৮৪ ও ৬৮৬ অব্দের) উল্লেখ রহিয়াছে। এই শকাব্দসূচক অঙ্কগুলি—হিন্দু স্থানীয়মান নির্দেশক অঙ্কপাতন প্রণালীতে লিখিত। কম্বোজের সম্বোর নামক স্থানে প্রাপ্ত আরেকখানি উৎকীর্ণ লিপিতেও ৬০৫ শকাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩। F. Nou, ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত Convent of Kenneshre অধিবাসী সিরীয় পণ্ডিত Severus Sebokht এর গ্রন্থে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশটীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (Journal Asiatique II, ১৯১০, পৃঃ ২২৫—৭) :—

"I will omit all discussion of the Science of the Hindus, a people not the same as the Syrians, their subtle discoveries in the Science of Astronomy, discoveries that are more ingenious that those of the Greeks and the Babylonians; their computing that surpasses description. I wish only to say that this computation is done by means of nine signs. If those who believe because they speak Greek that they have reached the limits of Science, should know these things, they would be convinced that there are also others who know something,"

৪। "পিঙ্গল-ছন্দ-সূত্র—শ্রীসীতানাথ কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৪০, VIII পৃ: ২৮

৫। বিস্তৃততর বিবরণের জন্য Dutt & Singhএর History of Hindu Mathematics ১ম খণ্ড দেখুন।

৬। "ব্রাহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত"—XVIII পৃ: ৩৩—৪

৭। ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খৃ:) ও দ্বিতীয় ভাস্কর (১১৫০ খৃ:) প্রভৃতি প্রদত্ত প্রণালীর জন্য Dutt & Singhএর History of Hindu Mathematics ২য় খণ্ড পৃ: ৬১—৯ দেখুন।

৮। বিশদ বিবরণের জন্য Dutt & Singh-এর History of Methematics-এর ২য় খণ্ড দেখুন। "$ax \pm by = c$" – এই সমীকরণের সমাধান আর্যভটের (৪৯৯ খৃ:) জানা ছিল। আবার $Nx^2 + c = y^2$

এবং $Nx^2 + 1 = y^2$—এই সমীকরণগুলি ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক আলোচিত হইয়াছিল এবং অখণ্ড রাশিদ্বারা উক্ত সমীকরণদ্বয়ের সমাধান বাহির করার জন্য তিনি নিম্নলিখিত পূর্বকরণীয়গুলি (Lemmas) প্রতিপাদন করিয়াছিলেন—

(১) যদি $x = \alpha, y = \beta$; $Nx^2 + K = y^2$ এই সমীকরণের সমাধান হয়

এবং $x = \alpha', y = \beta'$; $Nx^2 + K' = y^2$ এই সমীকরণের সমাধান হয়

তাহা হইলে $x = \alpha\beta' \pm \alpha'\beta$, $y = \beta\beta' \pm N\alpha\alpha'$, $Nx^2 + KK' = y^2$ এই সমীকরণের সমাধান হইবে।

অর্থাৎ যদি $N\alpha^2 + K = \beta^2$ এবং $N\alpha'^2 + K' = \beta'^2$

তাহা হইলে $N(\alpha\beta' \pm \alpha'\beta)^2 + KK' = (\beta\beta' \pm N\alpha\alpha')^2$

(২) যদি $x = \alpha$, $y = \beta$; $Nx^2 \pm K = y^2$ এই সমীকরণের সমাধান হয়

তাহা হইলে $x = 2\alpha\beta$, $y = \beta^2 + N\alpha^2$; $Nx^2 + K^2 = y^2$ এই সমীকরণের সমাধান হইবে।

(৩) যদি $x = \alpha$, $y = \beta$; $Nx^2 + K^2 = y^2$ এই সমীকরণের সমাধান হয় তাহা হইলে $x = \frac{\alpha}{K}$, $y = \frac{\beta}{K}$; $Nx^2 + 1 = y^2$ এই সমীকরণের সমাধান হইবে। ইউরোপে এই পূর্বকরণীয়গুলি Eular কর্তৃক ১৭৬৪ খৃ: ও Lagrange কর্তৃক ১৭৬৮ খৃ: পুনরাবিষ্কৃত হয়।

$Nx^2 + 1 = y^2$ এই সমীকরণ সমাধানে ব্রহ্মগুপ্ত অবলম্বিত পদ্ধতিই হইল α, K, এবং β কে নিরূপণ করা যাহাতে $N\alpha^2 + K = \beta^2$ সম্ভব হয়। এবং

তাহার পর তাঁহার পূর্বকরণীয়গুলির সাহায্যে $Nx^2+1=y^2$ এই সমীকরণের সাধারণ সমাধান পাওয়া যায়।

সম্ভবতঃ শ্রীপতিই ১০৩৯ খৃঃ সর্ব্বপ্রথম নিম্নলিখিত সমাধান দান করেন :—

$$x=\frac{2m}{m^2\sim N},\ y=\frac{m^2+N}{m^2\sim N},$$ যেখানে m একটি মূলদ রাশি

পরবর্ত্তী ভারতীয় গণিতবিদদের গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ইউরোপে ১৬৫৭ খৃঃ Brouncker এই সমাধান পুনরায় আবিষ্কার করেন।

৭৫০ খৃঃ) প্রদত্ত সমাধান হইল :—

$$x=\frac{2C(p^2-q^2)}{N(p-q)^2\sim C^2(p+q)^2},\ y=\frac{N(p-q)^2+C^2(p+q)^2}{N(p-q)^2\sim C^2(p+q)^2}.$$

উপরি উদ্ধৃত সমাধানটি ইহারই একটি বিশিষ্ট রূপ।

অখণ্ড ধনরাশিতে সমাধান নির্ণয়কল্পে ব্রহ্মগুপ্ত $N\alpha^2-4=\beta^2$ এই সহায়ক (Auxiliary Equation) সমীকরণটির সাহায্য লইয়াছিলেন। এবং

$x=\frac{1}{2}\alpha\beta\ (\beta^2+3)\ (\beta^2+1),$

$y=(\beta^2+2)\ \{\frac{1}{2}\ (\beta^2+3)\ (\beta^2+1)-1\}$ এই সমাধান লাভ করেন :

$p=\alpha\beta$ এবং $q=\beta^2+2$ ধরিয়া আমরা এইরূপ লিখিতে পারি :—

$x=\frac{1}{2}p(q^2-1),\ \ y=\frac{1}{2}\ q(q^2-3)$

এই সমাধানটি Euler কর্ত্তৃক পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছিল।

শ্রীপতি স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন যে, যদি $K=\pm1,\ \pm2$ অথবা ±4 হয় তবে ব্রহ্মগুপ্তের প্রণালীতে প্রাপ্ত সমাধানগুলি অখণ্ডরাশি হইবে; কিন্তু Kএর মান উপরিউক্ত যে কোনও একটি রাশি ধরিয়া $N\alpha^2\pm K=\beta^2$ এই সমীকরণের সমাধান বাহির করার কোনও প্রণালী সম্ভবতঃ তাঁহার জানা ছিল না। তবে দ্বিতীয় ভাস্কর (১১৫০ খৃঃ) অখণ্ড রাশিতে প্রকাশিত উপর্যুক্ত সমীকরণের দুইটি সমাধান বাহির করার একটি সহজ প্রণালী আবিষ্কারে সমর্থ হন। উক্ত প্রণালীকে তিনি চক্রবাল প্রণালী (Cyclic method) বলিয়া অভিহিত করেন। এইরূপ ভাবে দ্বিতীয় ভাস্কর— $Nx^2\pm C=y^2$ — এই সমীকরণের সম্পূর্ণ সমাধান দান করিতে সমর্থ হন।

দ্বিতীয় ভাস্কর নিম্নলিখিত সমীকরণগুলির ব্যাপক (General) সমাধান দানেও কৃতকার্য হন :—

(1) $ax^2+bx+c=y^2$

(2) $ax^2+bx+c=Ay^2+By+D$

(3) $ax^2+by^2\pm c=Z^2$

(4) $ax^2+bxy+cy^2=Z^2$

দ্বিতীয় ভাস্করের গ্রন্থসমূহে আরও বিভিন্ন ধরণের সমীকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে সেগুলির উল্লেখ সম্ভব নহে। কিন্তু এই প্রসঙ্গ সমাপ্তির পূর্বে আমি দ্বিতীয় ভাস্কর প্রদত্ত নিম্নোদ্ধৃত সমীকরণ যুগলের সমাধানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে চাই :—

$$ax^2+by^2+c=u^2$$
$$Ax^2+By^2+D=v^2$$

তিনি নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি গ্রহণ করেন :—

$$x^2+y^2-1=u^2$$
$$x^2-y^2-1=v^2$$

এবং ইহার নিম্নরূপ সমাধান দান করেন :—

$$x=\frac{(4m^4+n^4)+r^2}{(4m^4+n^4)-r^2},\quad u=\frac{2r(2m^2+n^2)}{(4m^4+n^4)-r^2}$$
$$y=\frac{4mnr}{(4m^4+n^4)-r^2},\quad v=\frac{2r(m^2-n^2)}{(4m^2+n^4)-r^2}$$

যেখানে m, n এবং r এক একটি মূলদ রাশি।

$r=S/t$ ধরিয়া, Genocchi (১৮৫১ খৃ:) উপরি উক্ত সমাধানের একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেন। E. Clere (১৮৫০ খৃ:) ঐ সমাধানের আর একটি বিশিষ্ট রূপ বাহির করিয়াছিলেন। Drummond (১৯০২ খৃ:) কর্তৃক সহজ অনুমেয় একটি তৃতীয় সমাধান প্রদত্ত হয়।

৯। ব্রাহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত, সুধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত, বারাণসী ১৯০২

১০। Colebrooke, "Algebra with Arithmetic and Mensuration from the Sanscrit of Brahmagupta and Bhascara" London 1817 p. 137 fn 2

১১। Colebrooke, loc. cit.

১২। বীজগণিত, সুধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত বারাণসী ১৮৮৮ পৃ: ৬—৭

১৩। Martin Ohm, Lehrbuch der niedern Analysis. Vol I Berlin 1828 pp 110, 112;

Der Geist der differential—und—Integral— Rechnung, Erlagen 1846 pp 18, 76.

১৪। Colebrooke, loc. cit.

১৫। সি, ভি, বৈদ্যর "Historv of Sanskrit Litrature" প্রথম খণ্ড, পুণা ১৯৩০. প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম পরিচ্ছেদ দেখুন।

পরিশিষ্ট

গণিতশাস্ত্র সম্পর্কিত কয়েকটী উল্লেখযোগ্য ভারতীয় আবিষ্কার সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা

রামঅবতার শুক্ল এম, এ, পি, এইচ, ডি, (লণ্ডন;)
পাটনা কলেজের সহকারী গণিত অধ্যাপক।

ক্রমান্বয়ে হস্তলিখিত বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার প্রাচীন ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের উপর অধিকতর আলোকপাত করিয়াছে। পূর্ব্ববর্তী প্রবন্ধে নীলকণ্ঠকৃত গণিত গ্রন্থের কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে যাহা গ্রেগরী শ্রেণী (Greg ry Series) বলিয়া পরিচিত, নীলকণ্ঠের 'তন্ত্রসংগ্রহ' (১৫০০ খৃঃ) নামক গ্রন্থে শুধুমাত্র সেই $\frac{\pi}{4}$ অসীম শ্রেণীর (Infinite Series) উল্লেখই পাওয়া যায় না; πএর মূলদ আসন্নমান (Rational Approximation) সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আলোচনাও সেখানে রহিয়াছে। ভারতীয়দের এই প্রচেষ্টা হইতেই প্রমাণিত হইবে যে নিউটনের যুগের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বেই ভারতীয় গণিত-বিদেরা বৃত্তকে বর্গক্ষেত্রে পরিণত করার প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। πএর আসন্নমান নির্ণয়ের সাধারণ ভারতীয় পরিকল্পনা হইতেই Log 2 এর আসন্নমান নির্ণয়ের কথা আসিয়াছে।

নীলকণ্ঠ তাঁহার উল্লিখিত অপ্রকাশিত গ্রন্থ 'তন্ত্রসংগ্রহে' কোনও বিধিসঙ্গত প্রমাণের উল্লেখ না করিয়াই এসকল আসন্নমানগুলি বিবৃত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত সূত্রটী হইতে উক্ত ফলাফলগুলি পাওয়া যায় :—

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

তবে অবশ্য ব্রহ্মগুপ্ত (১৬৩৯ খৃঃ) রচিত 'যুক্তিভাষা' নামক গ্রন্থে এই আসন্নমানগুলির তথা $\frac{\pi}{4}$ এর অসীম শ্রেণীর বিধিসঙ্গত প্রমাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'যুক্তিভাষা'—'গণিতযুক্তি' নামক গ্রন্থের, মালয়ালম্ ভাষায় কৃত অনুবাদ বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থখানি মাদ্রাজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই খসড়া প্রমাণকে

তিনটী পূর্বকরণীয়তে (Lemma) বিভক্ত করা যায়। প্রথম পূর্বকরণীয়টী নিম্নলিখিত সূত্রটীর অনুরূপ :—

$$d\,\theta = \frac{d\,(\tan\theta)}{1+\tan^2\theta}$$

Inverse tangent এর অসীমশ্রেণীর প্রমাণ কল্পে, ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে Gregory উক্ত সূত্রটী প্রয়োগ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পূর্বকরণীয়টী ইউরোপে Euler কর্তৃক ১৭৩৯ খৃঃ এবং তৃতীয়টি Roberval (১৬৩৪ খৃঃ) ও পরে স্বাধীনভাবে Fermat কর্তৃক (১৬৩৬ খৃঃ) আবিষ্কৃত হয়। প্রথম পূর্বকরণীয় দুইটী ভারতবর্ষে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা হইতে বোঝাযায় যে ইউরোপীয়দের বহুপূর্বেই ভারতীয়েরা এইগুলি জানিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বকরণীয়গুলি নিম্নে বর্ণিত হইল।

প্রথম পূঃ কঃ—BC, একক ব্যাসার্দ্ধ (unit radius) বিশিষ্ট কোনও বৃত্তের একটী বৃত্তচাপ ; O বিন্দুটি বৃত্তের কেন্দ্র। যদি OB এবং OC সরলরেখাদ্বয়, বৃত্তে
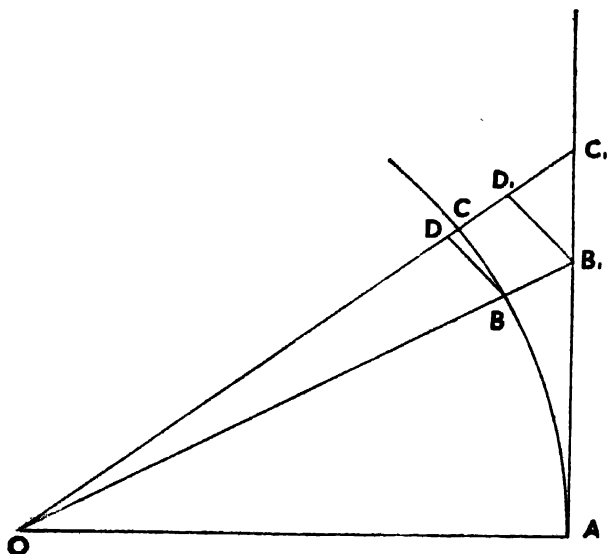
অবস্থিত যে কোন বিন্দু Aতে অঙ্কিত স্পর্শককে (Tangent) যথাক্রমে B_1 ও C_1 বিন্দুতে ছেদ করে, তাহা হইলে BC বৃত্তচাপে আসন্নমান এইভাবে বর্ণিত হইবে ;

$$\text{Arc BC approx. } \frac{B_1 C_1}{1+AB_1{}^2}$$

'যুক্তিভাষা' গ্রন্থে ইহার নিম্নরূপ প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমেই একটী সসীম বৃত্তচাপ BC লওয়া হইল (দ্বিতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য)

এবং OCর উপর BD এবং B_1D_1 লম্ব অঙ্কিত করা হইল। এখন $\triangle OBD$, $\triangle OB_1D_1$ এবং $\triangle B_1C_1D_1$ ও $\triangle OC_1A$ এই দুই জোড়া সদৃশ ত্রিভুজ হইতে

$\frac{BD}{B_1D_1}=\frac{OB}{OB_1}=\frac{1}{OB_1}$; $\frac{B_1D_1}{B_1C_1}=\frac{OA}{OC_1}=\frac{1}{OC_1}$ পাওয়া যাইবে

আবার উহা হইতে $BD=\frac{B_1C_1}{OB_1OC_1}$ পাওয়া যায়। সুতরাং BC যখন ক্ষুদ্র হইবে

তখন Arc BC approx BD approx $\frac{B_1C_1}{OB_1^2}=\frac{B_1C_1}{1+AB_1^2}$.

দ্বিতীয় পূর্বকরণীয় :—

$$\tan^{-1} t=\lim_{n\to\infty}\sum_{r=0}^{n-1}\frac{t/n}{1+(rt/n)^2} \quad \tan^{-1}t \leq \frac{\pi}{4}.$$

BC বৃত্তচাপ বেষ্টনকারী দুইটী ব্যাসার্দ্ধকে প্রসারিত করিলে উহারা বৃত্তের কোনও বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শককে যে অংশে ছেদ করিবে সেই অংশকে সম n সংখ্যক খণ্ডে ভাগ করিয়া উহার প্রত্যেক খণ্ডে প্রথম পূর্বকরণীয়টী প্রয়োগ করিলে উক্ত ফল পাওয়া যাইবে।

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{p}+1}\sum_{r=0}^{n-1} r^{p}=\frac{1}{p+1}.$$

p এর মান 1, 2, 3, 4, অথবা যে কোনও অখণ্ড ধনরাশিই হোক না কেন সকল ক্ষেত্রেই উক্ত ফল প্রমাণিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পূর্ব্বকরণীয়ের ডানদিকের রাশিমালা বিস্তৃত করিয়া তৃতীয় পূর্ব্বকরণীয়ের সাহায্যে 'যুক্তিভাষা' গ্রন্থে এই প্রতিজ্ঞাটী $\tan^{-1}t=t-\frac{t^3}{3}+\frac{t^5}{5}-\dots\dots\dots$ $|t|<1$ প্রমাণ করা হইয়াছে। 'তন্ত্রসংগ্রহে'র পূর্ববর্তী ভারতীয় গণিতগ্রন্থ "কর্ণ-পদ্ধতি"তেই সম্ভবতঃ ইহার প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা লক্ষ্য

করিবার বিষয় যে দ্বিতীয় পূর্ব্বকরণীয়ের সাহায্যে প্রাপ্ত উক্ত প্রতিজ্ঞার প্রমাণ, $\theta = \int_0^\theta d(\tan\theta)\,[1+\tan^2\theta]^{-1}$ ইহার প্রতিপদে সমাকলন প্রক্রিয়ার (Term by term Integration) প্রয়োগে প্রাপ্ত ফলের সমতুল্য।

এখন $\frac{\pi}{4}$ এর মূলদ আসন্নমান নির্ণয় করিতে গেলে 'নীলকণ্ঠ' বর্ণিত নিম্নলিখিত তিনটী ফলের সাহায্য লওয়া যায়। 'যুক্তিভাষা' গ্রন্থে ইহাদের প্রমাণ উল্লিখিত রহিয়াছে।

(1) $\frac{\pi}{4}$ approx. $1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\ldots\ldots\pm\frac{1}{n}\mp\frac{1}{2(n+1)}$

(2) $\frac{\pi}{4}$ approx. $1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\ldots\ldots\pm\frac{1}{n}\mp\frac{(n+1)/2}{(n+1)^2+1}$

(3) $\frac{\pi}{4}$ approx. $1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\cdots\cdots\pm\frac{1}{n}$

$$\mp\frac{\frac{(n+1)^2}{4}+1}{\{(n+1)^2+4+1\}\times\left(\frac{n+1}{2}\right)}$$

এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে অনুরূপ আসন্নমান প্রণালী অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। উপরিউক্ত সূত্র সমূহের প্রমাণগুলি, n^{-1} দ্বারা প্রকাশিত ক্ষুদ্রত্ব-ক্রমের (orders of smallness) স্বজ্ঞা-সম্মত গণনার উপর প্রতিষ্ঠিত। [ইহাদের বিস্তৃত আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত গবেষণা-পত্রগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে; উহাদের উপর ভিত্তি করিয়াই বর্ত্তমান আলোচনাপত্রটী রচিত হইয়াছে। (১) "On Hindu Quadrature of the Circle," Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. N. S. Vol 20, 1944; (২) "Gregory's Series in the Mathematical Literature of Kerala" (By M. Murar & Rajgopal) in the Mathematics Student Vol XIII. No. 3. Sept. 1945; (৩) "A neglected Chapter of Hindu Mathematics (By Rajgopal), Scripta Mathematica Vol XV. inos 3-4 1949; (৪) "A consolidated list of Hindu Mathematical Works" (By K. Balaganagadharam) Vol XV. Nos 3-4 of the Mathematics Student 1947].

২

পরিমাণ, সংখ্যা, শূন্য ও অনন্ত (Infinity) সম্পর্কীয় ভারতীয় ধারণা, দর্শন ও গণিত উভয়দিক হইতেই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কণাদ প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদী ও বহুবাদী বৈশেষিক দর্শন পরিমাণ ও সংখ্যাকে বস্তুর অবিচ্ছেদ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবগুণ হিসাবেই স্বীকার করিয়াছিল। পরমমহৎ, মধ্যম ও পরমাণু, সাধারণত এইরূপ বিভিন্ন মাত্রানুযায়ী পরিমাণের শ্রেণী নির্ণয় করা হইয়াছে।

সংখ্যা সম্পর্কে বৈশেষিক দর্শনের অভিমত এই যে শুধুমাত্র এককই পদার্থের অবিচ্ছেদ্য ইন্দ্রিগ্রাহ্য বাস্তবগুণ। (তুঃ 'Laws of Thought' গ্রন্থে Boole মন্তব্য করিয়াছেন যে সর্ব্ব বস্তুতে অনুস্যূত ঈশ্বরই একক) কিন্তু মন দুই অথবা বৃহত্তর সংখ্যাগুলিকে বিভিন্ন এককের সমষ্টির দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছে। (অপেক্ষা-বুদ্ধি-জ্ঞান) দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে—মন যখন দুইটী এককের 'এই একটী' এবং 'এই একটী' বলিয়া পৃথকভাবে ধরিয়া লইয়া, একত্রিত করে তখনই দুইয়ের উৎপত্তি হয়। সমষ্টিকরণের এই মানসিক ক্রিয়া ব্যতীত দুই, তিন, অথবা কোনও বৃহত্তর সংখ্যার সৃষ্টি সম্ভব নহে।

প্রসিদ্ধ গণিতবিদ Hilbert একের এই ধারণাকে একটি মৌলিক ধারণা হিসাবেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে একক একটী 'চিন্তা-মাত্র-সত্তা' এবং অন্যান্য সংখ্যাগুলি তাহা হইতেই উদ্ভূত। পক্ষান্তরে সাক্ষাৎ অনুভূতির দিক হইতে বিচার করিয়া Brouwer বলিয়াছেন গণিত শাস্ত্র গঠনের পক্ষে একের ধারণাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, উহাই অখণ্ড রাশিমালা গঠনের মূল নীতি স্বরূপ।

ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খৃঃ) ভারতীয় গণিতবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনিই শূন্যের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে :—

(১) সমমান বিশিষ্ট অথচ বিপরীতধর্মী দুই সংখ্যার যোগের ফলেই শূন্য পাওয়া যায় এবং (২) $0 \times (\pm a) = 0$; $(\pm a) \times 0 = 0$; $0 \times 0 = 0$

প্রথম সংজ্ঞা যোগ প্রক্রিয়ায়, অন্যান্য সকল সংখ্যার সহিত শূন্যের সম্পর্ক নির্দেশ করে। আবার দ্বিতীয় সংজ্ঞায় গুণনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সংখ্যার সহিত শূন্যের সম্বন্ধের নির্দেশ পাওয়া যায়।

উল্লিখিত প্রথম সংজ্ঞাটী সম্পর্কে আপত্তি উঠিতে পারে যে উহার দ্বারা শূন্যের অস্তিত্ব সূচিত হয় না। যোগ কথাটীর অর্থ যোগ প্রক্রিয়া—এই ধারণাই স্পষ্টতঃ উক্ত আপত্তির কারণ। কিন্তু উক্ত শব্দটী যদি যোগফল অর্থে গ্রহণ করা হয়—এবং এই অর্থেও শব্দটী সচরাচর ব্যবহৃত হয়—তাহা হইলে এই আপত্তি টিকিতে

পারে না। তবে বিপরীতধর্মী সংখ্যাগুলির সংজ্ঞা কিভাবে নির্দেশ করা হইবে তাহা স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

ব্রহ্মগুপ্তের পরবর্তী গণিতবিদ গণেশ (১৫৪৫ খৃঃ) এবং কৃষ্ণ (১৫৭৫ খৃঃ)—কেহই তাঁহার মত প্রতিভাবান ছিলেন না। তাঁহারা শূন্যের আধা-বৈজ্ঞানিক ও আধা-সহজজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞা দান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগুপ্তের সংজ্ঞা ইঁহাদের সংজ্ঞার অনুরূপ নহে। তাঁহার সংজ্ঞাকে "সম্পর্ক-সূচক" সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে; এবং ইহাই তাঁহার সংজ্ঞার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্যের আধুনিক বিষয়বাদী ও নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকেরা এবং রাসেলের মত গণিতবিদ দার্শনিকও ব্রহ্মগুপ্তের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দার্শনিক মনোভঙ্গীর দ্বারা অনুপ্রাণিত; এবং উক্ত মনোভাবের পক্ষেই, বস্তুর চরম প্রকৃতি নিরূপণ সাপেক্ষ সংজ্ঞা দানের প্রশ্ন না তুলিয়া, বস্তুর বিশেষ লক্ষণ সমূহ ও অন্যান্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের জ্ঞানের ভিত্তিতেই উহার কার্যকরী সংজ্ঞাদানের চেষ্টা সম্ভব। শূন্য সম্বন্ধে, এই সম্পর্কসূচক ও ব্যবহারিক সংজ্ঞাদানের জন্যই ব্রহ্মগুপ্তকে আধুনিক চিন্তানায়কদের সগোত্র বলিয়া অভিহিত করা হাইতে পারে।

শূন্যের দ্বারা ভাগের অর্থ নিরূপণের চেষ্টা হইতেই ভারতীয় গণিতে 'অনন্ত' সম্পর্কিত ধারণার উদ্ভব ঘটে। পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক গণিতশাস্ত্রে শূন্যের দ্বারা ভাগ প্রক্রিয়ার কোনও সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয় নাই। পক্ষান্তরে ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর ও কৃষ্ণের মত প্রসিদ্ধ ভারতীয় গণিতবিদেরা ভাগ প্রক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে :—

(১) $\frac{a}{0} = \infty$ (Infinity) যখন a একটী অখণ্ড ধন বা ঋণরাশি

(২) $\frac{a}{0} \pm \frac{b}{c} = \frac{a}{0} = \infty$, $\frac{b}{c}$ একটী অসীম রাশি এবং পরিশেষে

(৩) $\frac{a}{0} \pm \frac{b}{0} = \infty \pm \infty = \frac{a \pm b}{0} = \infty$

এখানেও আমরা ∞র একটি সম্পর্কসূচক সংজ্ঞা পাইতেছি।

পাটীগণিতীয় অনন্তের ধারণার সহিত কলন (Calculus) সম্মত অনন্তের ধারণার বৈপরীত্যমূলক তুলনা করা চলে। কলনে, অনন্তকে অসম্পূর্ণ প্রতীক বা একটী প্রবণতা বলিয়াই গণ্য করা হয়। কলনে উক্ত প্রতীকটী (∞) নিম্নরূপ গাণিতিক বাক্যখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে লিখিত হয় :—$x \rightarrow \infty$, (x অনন্তের অভিমুখী)। চলরাশি (Variable) x পূর্বনির্দিষ্ট যে কোন সংখ্যাকেই

অতিক্রম করিতে পারে"—উক্ত প্রতীকে প্রকাশিত বাক্যখণ্ডটীর ($\times \rightarrow \infty$) অর্থ ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। এখানে ∞ এই প্রতীকটীর নিজস্ব কোন অর্থ নাই।

অনন্ত হইতে অনন্ত বিয়োগ করিলে অনন্তই অবশিষ্ট থাকে—উপরে (৩)এতে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। উহার মধ্য দিয়া যে বিস্ময়কর ধারণাটী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ($\infty - \infty = \infty$)। ইহাকে আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অনন্ত সম্পর্কে আধুনিক গণিতবিদ্‌দের ধারণা উক্ত অভিমতকেই সমর্থন করে। প্রকৃতপক্ষে অনন্ত-সারি (Infinite Set) বলিতে এমন এক সারি বোঝায়, যাহার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটী সংখ্যাই উক্ত সারির (set) কোনও বিশেষ খণ্ডাংশের (Proper part) অন্তর্ভুক্ত প্রতিটী সংখ্যার সহিত ১ – ১ সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত (One – one correspondence)।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭,........, এই অখণ্ড রাশি শ্রেণীই অনন্ত। উহা হইতে বিচ্ছিন্ন জোড়—সংখ্যাগুলিও যথা ২, ৪, ৬......... প্রভৃতি প্রথমোক্ত অখণ্ড রাশি শ্রেণীরই খণ্ডাংশ বিশেষ। ইহারাও আর এক অনন্ত সারির অন্তর্ভুক্ত এবং প্রথম সারির রাশিগুলির সহিত ইহারা ১-১ সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত। প্রথম সারি হইতে দ্বিতীয় সারির সংখ্যাগুলি সরাইয়া লইলে অবশিষ্ট বিজোড় ১, ৩, ৫, ৭...............রাশিগুলিও এক তৃতীয় অনন্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

'বৃহদারণ্যক উপনিষদের'—(৫, ১) মত প্রাচীনতম দার্শনিক গ্রন্থেও অনন্তের এই ধারণার প্রকাশ রহিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে—অব্যক্ত ব্রহ্ম অনন্ত, ব্যক্ত ব্রহ্মও অনন্ত ; অনন্ত হইতেই অনন্তের উদ্ভব। (অব্যক্ত) অনন্ত হইতে (ব্যক্ত) অনন্তকে গ্রহণ করিলে, অনন্তই অবশিষ্ট থাকে—(পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে) —(Vide Dr. E. Roer's translation in the Twelve Principal Upaniṣads Vol II Page 384)।

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের প্রধান ধারাগুলি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সাধারণ মন্তব্য সহকারে আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। "The Meeting of East & West" গ্রন্থে F. S. C. Northrop বিশদভাবে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ভারতবর্ষ সহ সমগ্র প্রাচ্য খণ্ড বস্তুর আবেগাত্মক ও নন্দনতত্ত্বসম্মত তথা শুধুমাত্র তাহার ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রত্যক্ষ রূপের দিকেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে (P. 375)। বস্তুর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাপ্রসূত অখণ্ড সামগ্রিক রূপের প্রতি সে অভিনিবিষ্ট। কিন্তু পাশ্চাত্য, অভিজ্ঞতাপূর্ব কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা লইয়াই

অগ্রসর হইয়াছে, এবং পরে পরোক্ষভাবে অভিজ্ঞতার সাহায্যে উক্ত ধারণার সত্যতা প্রমাণের প্রয়াস পাইয়াছে (P. 294)। এইরূপ অনুমানের বশবর্তী হইয়াই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করিয়াছেন।

শূন্য ও অনন্ত সম্পর্কিত ধারণা ও সংজ্ঞা, পাটিগণিতের স্থানীয় মাননির্দেশক সংখ্যাপাতন প্রণালী, বীজগণিতে গৃহীত বর্ণমালার অক্ষর প্রতীক, এবং গ্রীকদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে—পরিমাণকে সুস্পষ্ট দৈর্ঘ্যে প্রকাশ না করিয়া—বীজগণিত ও জ্যামিতিতে তাহাকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশের ধারণা—ভারতীয় গণিতের এই সাধারণ প্রবণতার দিকে লক্ষ্য করিলে গ্রন্থকারের উক্ত অনুমানকে সম্যক বিবেচনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না।

ভারতীয় দর্শনের "নির্গুণ ব্রহ্ম" ও "শূন্যের" অতীন্দ্রিয় ধারণার সহিত উক্ত বিষয়গুলি একত্র লইয়া বিবেচনা করিলে বোঝা যাইবে যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয়েরা যেমন—Northrop যথার্থই বলিয়াছেন—পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে পরমব্রহ্মের লীলা প্রত্যক্ষ ও অনুভব করিয়া আনন্দ পাইয়াছেন, তেমনই শুদ্ধ অতীন্দ্রিয় ভাবও তাঁহাদের সমান আনন্দ দান করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা

খ। অন্যান্য বিজ্ঞান

ঐতিহাসিক : বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয়দের, আধুনিক যুগে স্বীকৃত হইতে পারে এইরূপ অবদানের একটি কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনা করা যে প্রায় অসম্ভব তার কারণ সুস্পষ্ট। প্রাচীন ঋষিদের ভূয়োদর্শন এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অধিকাংশই লিপিবদ্ধ হয় নাই। ঐ সমস্ত জ্ঞান পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া অর্থবোধশূন্য শব্দাবৃত্তি দ্বারা এক যুগ হইতে অন্য যুগে, এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে চলিয়া আসিয়াছে। ফলে এই সব তত্ত্বকে বিজ্ঞানের কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনায় নির্ভুল তথ্যরূপে পরিগণিত করা সম্ভব নয়।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার কাল আনুমানিক অথর্ব বেদের যুগ (আঃ খৃঃ পূর্ব আট শতক) হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাচীন ঋষিদের গবেষণার কিছু অংশ, বিশেষ করিয়া গণিত, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ধাতুবিজ্ঞান, ভেষজবিদ্যা ও আরোগ্য বিজ্ঞানে গবেষণাগুলি ভাবাত্মক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান বলিয়া স্বীকৃত হইবার যোগ্য। অতীতকালে প্রতীচ্যের দেশগুলি আরবীয়দের মধ্যস্থতায় এই সব জ্ঞানলাভ করিয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছিল।

মৌলিক তথ্য :

ভারতীয়গণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত জগৎ-তত্ত্ব প্রধানতঃ তিনটি দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় :—(১) সাংখ্য-পতঞ্জলি দর্শন—ইহা জাগতিক বিবর্তনের মূলসূত্রগুলি আলোচনা করিয়াছে (২) ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন—ইহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের মূল ধারণাগুলির বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে এবং (৩) বেদান্ত অন্যান্য ও দর্শন—জড়বিজ্ঞানে এই সকল দর্শনের কোন দানই নাই।

শক্তির ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ধারায় এই জগতের বিবর্তন ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম সাংখ্য-পতঞ্জলি দর্শনেই দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই

প্রচেষ্টার ফলাফল তত্ত্ববিদ্যার ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেইজন্যই বিবর্তন বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে ইহাকে সহজে যুক্ত করা সম্ভব নয়। বিবিধ দৃশ্যাবলী সমন্বিত এই পার্থিব জগৎ প্রকৃতি, মূল বা আদি শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই শক্তি সর্বব্যাপী, অনন্ত, অননুকরণীয়, অবিনশ্বর এবং নিরবয়ব। এইভাবে অসীম প্রকৃতি হইতে যাহাদিগকে গুণ বলা হয় এইরূপ তিনটি বিশেষ ধর্মের—অর্থাৎ মূল উপাদানগুলির সহযোগে সসীম জগতের উদ্ভব হইয়াছে। এই তিনটি গুণ হইল—(১) সত্ত্ব বা সার, যাহা বস্তু সকলের বিভিন্ন প্রকাশের কারণ, (২) রজঃ বা শক্তি—যাহা প্রতিবন্ধক ও প্রতিরোধ অতিক্রম করিয়া বস্তু সমূহের সঞ্চরণ ক্ষমতা ও কর্ম ক্ষমতার কারণ, (৩) তমঃ বা কুপ্রভাব– যাহা রজঃ গুণের পরিপন্থী এবং জড়ত্বের কারণ।

সকলরকম শক্তিই গতীয়, এমন কি স্থৈতিক শক্তিও, কারণ স্থিতি অবস্থাকেও গতিরই একটি অবস্থা বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে, অর্থাৎ স্থিতি সেইরকম গতি যাহা অনুভব করা যায় না। একটি যন্ত্র যাহা এত ধীরে চলিতেছে যে তাহার গতি বুঝিতেই পারা যায় না, সেই যন্ত্রের উপর তৈলের ক্রিয়ার সহিত অনুঘটকের ক্রিয়াকে Ostwald তুলনা করিয়াছিলেন। স্থিতিকে অননুভবনীয় গতি বলিয়া কল্পনা করিলে Ostwald-এর এই তুলনার কথা মনে পড়ে।

নিরবয়ব ও নিগুর্ণ প্রকৃতিতে পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়া জড় জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ভাঙ্গাগড়ার ফলে একটি বিশেষ অথচ অনির্দিষ্ট পদার্থের সাময়িক আবির্ভাব ঘটে। তার পর, দুইটি সমান শ্রেণীতে ভাঙ্গা-গড়ার ফলে বিষয়ী ও বিষয়, নির্দিষ্ট মন (জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, এবং মন) এবং নির্দিষ্ট জড় পদার্থ (সাধারণ বস্তু) অণু ও পরমাণুর আকারে উদ্ভূত হইল। শেষোক্ত পদার্থ হইতে শুধু অজৈব পদার্থ নয়, উদ্ভিদ ও জান্তব সজীব পদার্থেরও সৃষ্টি হইল।

শক্তি ও ভরের নিত্যতা—অসংখ্য বিভিন্ন প্রকারের বস্তুতে অবস্থিত গুণগুলিকে সৃষ্টি বা বিনাশ করা সম্ভব নয়। সমস্ত তমঃ বা ভরের এবং সমস্ত রজঃ বা শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তনীয়; সুতরাং ইহাদের মধ্যে একটির অন্যেতে পরিবর্তন সম্ভবপর। এই তত্ত্বকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভর হইতে শক্তিতে বা শক্তি হইতে ভরে রূপ পরিবর্তনের তত্ত্বই বলা যায়। শক্তির নিত্যতা এবং শক্তির রূপ পরিবর্তনের তথ্যের অনুসিদ্ধান্ত রূপে কার্য কারণবাদ পাওয়া যায়। যেহেতু সমস্ত শক্তির সমগ্র পরিমাণ অপরিবর্তনীয় এবং যেহেতু জগতে বিবর্তন ঘটিয়াই চলিয়াছে, সুতরাং সমস্ত বস্তুই একটী চরম শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ।

কার্যকারণবাদের শৃঙ্খল :

শক্তির রূপান্তর সহ বিবর্তনের ক্রম একটি বিশেষ সূত্র মানিয়া চলে। বস্তু-সমূহের গুণ বা ধর্ম বা শক্তির বিভিন্ন প্রকার অথবা আকার মাত্র; এই শক্তি কখনও গতীয়, কখনও স্থৈতিক। ভর বা শক্তি হিসাবে, অজৈব পদার্থ এবং ও জান্তব সজীব পদার্থ মূলতঃ এবং চরম বিচারে এক। শক্তির বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন বাহ্য প্রকৃতি হইতেই এই সব পদার্থ উদ্ভূত হয় এবং সামান্য ও বিশেষ ধর্ম প্রাপ্ত হয়। ইহাদের আবির্ভাবের অনুক্রম একটি অপরিবর্তনীয় সূত্রানুসারে পরিচালিত হয়। জাগতিক বিবর্তন বা পরিণাম একটী দ্বিভাবাপন্ন প্রক্রিয়া—যাহাতে একই সঙ্গে সৃষ্টি ও বিনাশ, আত্তীকরণ ও অনাত্তীকরণ, অপচিতি ও উপচিতি উভয়ই বর্তমান। আদিতে ভর ও শক্তির অসম সমষ্টির ফলেই অজৈব ও জৈব পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই হইল জগতের সৃষ্টি রহস্য।

সাংখ্য-পতঞ্জলি দর্শন পদার্থের চরম গঠন-প্রকৃতি (তান্মাত্রিক-সৃষ্টি) গভীর কৌতূহলের বিষয়। পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি স্বীকৃত বা কল্পিত হইত—যথা (১) প্রাথমিক অতি ক্ষুদ্র কণা (ভূতাদি) বা ভরের একক যেগুলি সমসত্ত্ব এবং শক্তির অদলবদল যাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও সাম্যের পরিবর্তন ঘটায়; (২) বিভিন্ন শক্তি আশ্রিত পরমাণু হইতে আকারে বৃহত্তর পদার্থকণা (তন্মাত্র); (৩) পাঁচটি বিভিন্ন প্রকারের পরমাণু, প্রত্যেক পদার্থকেই পঞ্চেন্দ্রিয় যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সাহায্যে এই পাঁচ প্রকার পরমাণুতে ভাগ করা যায়। ইহাদের সমন্বয়েই পঞ্চভুতের উৎপত্তি—যথা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ এবং পৃথিবী। পদার্থগুলি এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণী বিভাগ যতটা ভৌত ততটা রাসায়নিক নয় এবং আধুনিক রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক পদার্থগুলি যে ভাবে সজ্জিত করা হয় অথবা তাহাদের বিবর্তন যে ভাবে বর্ণিত হয়, এই শ্রেণীবিভাগ মোটেই সেরূপ নয়, পদার্থগুলিকে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ রূপে ভাগ করার একটি অস্পষ্ট চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়। মৌল পদার্থের নিবিড় মিলনের ফলেই যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট হয়; যৌগিক পদার্থে মৌল পদার্থগুলির ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়।

পদার্থবিদ্যা—জড়বিদ্যার কোন প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ গ্রীক বা ভারতীয়গণ কর্তৃক আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া বলা যাইতে পারে না। এই দুই জাতিই মোটামুটি একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহাদের সিদ্ধান্তও মোটামুটি একই রকম। বরং একথা বলা যাইতে পারে যে ভারতীয় পদার্থবিদ্গণ তাঁহাদের বিস্তৃততর

দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে পদার্থবিদ্যার সঙ্গে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সুষ্ঠু সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পদার্থের অণু ও পরমাণুতে বিভাজন-ক্ষমতা, পরমাণবিক শক্তি সাহায্যে পরমাণু হইতে অণুর গঠন এবং পদার্থের গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র প্রকল্প হইতে বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা কণাদ এবং জৈন, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সমসাময়িক মনীষীগণ পদার্থের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ধর্মগুলি হইল—স্থিতিস্থাপকতা, আসঞ্জন, অভেদ্যতা, সান্দ্রতা, তরলীভবন, সচ্ছিদ্রতা ইত্যাদি। বৃক্ষের মূল হইতে কাণ্ডে রস-সঞ্চারণ এবং সচ্ছিদ্র পাত্রে তরল পদার্থের অনুপ্রবেশ কৈশিক গতির উদাহরণ রূপে ব্যাখ্যাত হইত এবং বায়ু কর্তৃক চাপ সঞ্চালন এই তত্ত্বের ভিত্তিতে নলের ভিতরে জলের ঊর্ধ্বগতি ব্যাখ্যা করা হইত।

গতিবাদ: ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ই শব্দ, আলোক, ও তাপের মূল কারণ হিসাবে আণবিক ও পরমাণবিক উভয় প্রকার গতিই কল্পনা করিয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ গতির লক্ষণ যেভাবে দিয়াছেন, প্রাচীন-কালেও গতির লক্ষণ অনেকটা সেইভাবে দেওয়া হইত, যেমন, একটি কণার স্থান পরিবর্তনই তাহার গতি নির্দেশ করে। প্রাচীনকালেও দুই রকম গতি স্বতন্ত্র করিয়া দেখানো হইত—যেমন, ক্ষণিক বেগ এবং গতিপরম্পরার নির্দেশক আরোপিত বেগ। একই সময়ে একটি বিশেষ কণার শুধু একটিমাত্র গতি থাকিতে পারে। এই গতি ঋজুরেখ অর্থাৎ ঊর্ধ্ব বা অধঃ একই দিকে হইতে পারে; এবং ইহা বক্ররেখও হইতে পারে, যেক্ষেত্রে গতির দিক ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হইবে যথা ঘূর্ণগতি বা ভ্রমণ এবং কম্পগতি বা স্পন্দন। এই দুই রকমের গতিকে একসঙ্গে 'গমন' বলা হয়। অনেক রকমের গতি স্বীকৃত হইয়াছে, যেমন (ক) প্রযত্ন; (খ) মাধ্যাকর্ষণ জনিত গতি বা গুরুত্ব, যাহা আকর্ষণশক্তি হইতে উদ্ভূত এবং যাহা প্রযত্ন দ্বারা রোধও করা যাইতে পারে; (গ) তরল পদার্থের নিম্নগতি (স্যন্দন); (ঘ) শ্রেণীবিভক্ত হয় নাই এমন গতি, যে সব গতির কারণ অ-দৃষ্ট; বায়বীয় পদার্থের বিকিরণ, চুম্বকের আকর্ষণ ইত্যাদি এই ধরণের গতি। প্রাচীন বিজ্ঞানীদের বল সম্বন্ধে ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল। একটি পদার্থকণা অনেকগুলি বল বা গতির একযোগে ক্রিয়ার ফলে কোন্ দিকে কত বেগ সম্পন্ন হইবে তাহাও তাঁহারা বলিয়া দিতে পারিতেন। চাপ বা সংঘাত মূল গতির দিকে অথবা উহার বিপরীত দিকে, ইহার উপরই লব্ধগতির দিক নির্ভর করিবে।

ভারতীয়গণ তাঁহাদের নির্ভুল গণনাতে স্থান ও কালের অতি সূক্ষ্ম মাত্রা ব্যবহার করিতেন, যদিও তাঁহাদের ব্যবহৃত যন্ত্রগুলি স্থূল ছিল। এক সেকেণ্ডের ৩৩৭৫০ ভাগের একভাগকে সময়ের সবচেয়ে ছোট অংশ (ত্রুটি) ধরা হইত এবং সূর্য-রশ্মিতে দেখা বা উপলব্ধি করার মত সব চেয়ে ছোট ধূলিকণার আকার এক ইঞ্চির ৩৪৯২৫ ভাগের একভাগ মাত্র বলিয়া ধরা হইত। পরমাণুর আকার $\pi(৩\cdot৫)^{-১} \times ২^{-৬২}$ ঘন ইঞ্চির সমান ধরা হইত; আশ্চর্যের বিষয়, উদজান পরমাণুর অধুনা নির্ধারিত আকারের সঙ্গে এই আকার তুলনীয়। গতির কোন একক নির্দিষ্ট ছিল না, কিন্তু বেগ $= \frac{\text{বিস্থাপন}}{\text{সময়}}$ এই সূত্র অনুসারে গড়বেগ নির্ধারিত হইত। ইহাদের সাহায্যেই সংগীতের বিভিন্ন স্বরগুলির আপেক্ষিক তীক্ষ্ণতা অত্যন্ত নির্ভুলভাবে নিরূপিত হইয়াছিল, যে কোনো সময়ে কোন গ্রহের গতিও ইহাদের সাহায্যেই নির্ভুলভাবে বলা যাইত, এবং ইহাই Differential Calculus ("অন্তরকলন")-এর ভিত্তি। শূন্যে একটি কণার স্থান পরিবর্তনকে তাহার গতির লক্ষণ বলিয়া ধরা হইত বলিয়া অন্য একটি কণার অবস্থানের হিসাবে উহার অবস্থানকে তিনটি অক্ষের সাহায্যে পরিমাপ করিয়া নির্ধারিত হইত (বাচস্পতি, আনুমানিক ৮৪২ খৃঃ, অঃ) এবং এই ভাবেই ঘন জ্যামিতি বা বৈশ্লেষিক জ্যামিতির সূত্রপাত হইল। পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত ধারণাগুলি ভারতীয়দের লিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে, যদিও এই তত্ত্বগুলি যে সমস্তই তাঁহাদের পরীক্ষালব্ধ তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই।

<u>তাপ</u>

১। আলোক ও তাপ একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ (কণাদ)।

? ২। আলোক ও তাপ মূলতঃ কণাদ্বারা গঠিত..................... এবং ইহারা সরলরেখায় গমন করে (বাচস্পতি)।

৩। বাষ্পীভবন তনূভবন উৎপন্ন করে এবং তরলের বাষ্পের চাপ পরিবেষ্টক বায়ুর চাপের সমান হইলে তরল পদার্থ ফুটিতে শুরু করে (শংকর মিশ্র)।

<u>আলোক</u>

১। পদার্থকে আলোকে স্বচ্ছ, ঈষদচ্ছ ও অনচ্ছ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

২। আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্রগুলি এবং ছায়া সম্পর্কিত ঘটনাগুলি তাঁহারা জানিতেন ও ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন।

৩। *আলোকের রাসায়নিক ক্রিয়ার উদাহরণগুলি তাঁহারা জানিতেন ও অনুশীলন করিতেন (জয়ন্ত)।*

৪। কাচ প্রস্তুত ও পালিশ করা একটি বড় রকমের শিল্প ছিল এবং কয়েক রকম উৎকৃষ্ট ধরণের কাচ প্রস্তুত করার পন্থা ভারতীয়গণ জানিতেন।

৫। বিভিন্ন ধরণের লেন্স ও দর্পণ তাঁহারা ব্যবহার করিতেন ; এবং দাহ্য বস্তুতে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া দহন করিতে পারিতেন।

শব্দ

শব্দকে বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা তিন রকমের শব্দ স্বীকার করিতেন ; (১) নাদ, বায়ুর একটি গুণ যাহা শব্দের বাস্তব ভিত্তি, (২) ধ্বনি বা শ্রবণসাধ্য শব্দ এবং (৩) স্ফোট বা বুদ্ধিগম্য শব্দ। বায়ুতে শব্দ কিভাবে চলে সে বিষয়ে এই মত স্বীকৃত হইত যে নাদ, যাহা শব্দের ভিত্তি তাহা এক রকম তরঙ্গ (শবরী স্বামী)। বায়ুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাতে সংযোগ ও বিয়োগ পরিবহনের ফলেই এই তরঙ্গ সৃষ্ট হয়। প্রথম সংঘাতে যে তরঙ্গ সৃষ্ট হয়, সেই তরঙ্গই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার পরবর্তী সংঘাত দ্বারা পরিচালিত হয়। অনুদৈর্ঘ্য কম্পন দ্বারা শব্দতরঙ্গ পরিবাহিত হয় বলিয়া মনে করা হইত এবং এই পরিবহনের সময়ে ঘনীভবন ও তনুকরণ পর্যায়ক্রমে ঘটিত বলিয়া জানা ছিল। জল ও অন্যান্য বস্তু যাহা তরঙ্গ পরিবহনে কম বা বেশী বাধা সৃষ্টি করে, তাহাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ফলেই শব্দ কম বা বেশী দূরে পরিচালিত হয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইত।

প্রতিধ্বনিকে শব্দের প্রতিফলন বলিয়া মনে করা হইত। কখনও কখনও ইহাকে প্রতিবিম্বের সঙ্গে তুলনা করা হইত এবং প্রতিবিম্বের মতই অপ্রকৃত বলিয়া ধরা হইত।

সঙ্গীত শাস্ত্রগুলিতে একটি শব্দকে অন্য একটি শব্দ হইতে তীক্ষ্ণতা (তার-মন্দাদিভেদ) তীব্রতা (তীব্রমন্দাদিভেদ) এবং বৈশিষ্ট্যমূলক গুণ বা ধ্বনিবৈশিষ্ট্য দ্বারা পৃথক করা হইত। মধ্যবর্তী, শ্রাব্য (শ্রুতি-ভেদ) ও নির্ণেয় তীক্ষ্ণতাগুলির (তীব্র মন্দাদি) মধ্যে পার্থক্য ও উহাদের বিভিন্ন তীব্রতার কারণ স্বরূপ কম্পনাঙ্কের বিভিন্নতা ধরা হইত। সংগীতের জন্য দুই রকম সুর স্বীকৃত হইত—শ্রুতি ও স্বর। শ্রুতি একটি বিশেষ তীক্ষ্ণতার অবিমিশ্র মূল সুর, এবং সাধারণ-সুরযুক্ত স্বরে একটি শ্রুতি ও তাহার কয়েকটি বিশেষ অনুরণন থাকে। দ্বাবিংশ প্রকার শ্রুতির উল্লেখ আছে এবং ইহারা সঙ্গীতে ব্যবহৃত হইত।[১]

ভারতীয়গণ তারে কম্পনের নিয়মগুলিও জানিতেন। একটি সুরের তীক্ষ্ণতা (কম্পনাঙ্ক) তারের দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুসারে পরিবর্তিত হয় বলিয়া তাঁহারা জানিতেন।[২] শুদ্ধ মূল সুরের তীক্ষ্ণতা ঐ সুরের উচ্চগ্রামের সুরগুলির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ১ : ২[৩] এই হারে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইত।

চুম্বকতত্ত্ব—চুম্বকতত্ত্বের সাধারণ ঘটনাগুলি যথা লোড্‌ষ্টোন্ কর্তৃক লৌহখণ্ড আকর্ষণ বা অ্যাম্বার কর্তৃক ঘাস বা খড় আকর্ষণ অ-দৃষ্ট বা অজ্ঞাত কারণে সংঘটিত হইত বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। মনে হয়, ভোজ (১০৫০ খৃষ্টাব্দ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অর্ণবপোত নির্মাণে কাষ্ঠখণ্ডগুলি যুক্ত করিতে লৌহ ব্যবহার করা বিপজ্জনক, কারণ সমুদ্রের চুম্বকপাহাড়গুলি ঐ পোত আকর্ষণ করিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে।

ভারতীয় অর্ণবপোতগুলিতে, বিশেষ করিয়া খৃষ্টীয় যুগের প্রথম ভাগে নির্মিত অর্ণবপোতগুলিতে 'মৎস্য-যন্ত্র' নামে একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। এই যন্ত্রটি একটি তৈলপাত্রে ভাসমান থাকিয়া সর্বদাই উত্তর দিক নির্দেশ করিত। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে বসবাস করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভারতীয়গণ যে বিদ্যুৎ-সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী বুঝিতে পারিতেন ইহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। তবে পরমাণুর সংযোগকে তাঁহারা যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যাতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেরু কল্পনার মূল নিহিত আছে বলিয়া ধরা যায়। এই রকম মেরুর কল্পনা Berzelius কয়েক শত বৎসর পর তাঁহার দ্বৈতবাদী বিদ্যুৎ-রাসায়নিক তত্ত্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রসায়ন—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোন দেশেই প্রথম যুগে রসায়ন একটি পৃথক বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সর্বপ্রথম ইহা একরকম খাঁটি অপরসায়ন মাত্র ছিল, ইতর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করাই ইহার লক্ষ্য ছিল। পরে ইহা চিকিৎসা-বিদ্যার সাহায্যকারী এবং তার পর ধাতুবিদ্যা ও শিল্প-সংক্রান্ত বিদ্যার সঙ্গে এক হইয়া গেল। এই সব বিষয়ে ভারতীয় গবেষকগণ আরবীয় ও চীনাবাসী উভয়েরই শিক্ষকরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বৈদিক যুগে, যতদিন না শেষ পর্য্যন্ত এই বিজ্ঞান তান্ত্রিক পদ্ধতির অনুগত হইয়া পড়িয়াছে, ততদিন পর্যন্ত প্রধানতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের সাহায্যকারী হিসাবেই এই বিজ্ঞানে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে। অশ্বিনী আরোগ্য-বিদ্যার অধিষ্ঠাতা দেবতা এবং ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে রোগ-আরোগ্যকর গুণসমন্বিত ঔষধি ও বৃক্ষকে

দেবতার সম্মান দেওয়া হইয়াছে, যেমন, সোমবৃক্ষের রস অমরত্ব প্রদান করে বলিয়া মনে করা হইত।

আয়ুর্বেদের যুগে ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সহ যুক্তিপূর্ণ ভিত্তিতে নিয়মাবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করা হইল। এই যুগের দুইটি বড় গ্রন্থ হইল, একটি, চিকিৎসা-বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ চরক (আনুমানিক খৃঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে চতুর্থ শতক), এবং আরেকটি শল্য চিকিৎসা-সংক্রান্ত গ্রন্থ সুশ্রুত (খৃষ্টীয় আদি যুগ)। চরকে আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপাঙ্গ এবং ইহা দেবতাগণ কর্তৃক সরাসরি উদ্‌ঘাটিত এই হিসাবে ধরা হয়; কিন্তু সুশ্রুতের মতে ব্রহ্মা অথর্ববেদের উপাঙ্গ হিসাবে আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। চরক অপেক্ষা সুশ্রুত অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও নিরীক্ষা ব্যতিরেকেই চরক তত্ত্ববিদ্যার বিশদ আলোচনায় সাহসের সঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান-ভাণ্ডারে আয়ুর্বেদের সর্বাগ্রগণ্য প্রকৃত দান পদার্থগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করা এবং রাসায়নিক সংযোগ ও বিভাজনের একটি তত্ত্ব প্রচার করা। পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম) রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ গঠনের জন্য দায়ী এবং পদার্থের গঠনে পঞ্চভূতের সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই উহাদিগকে এক—, দ্বি—, ত্রি—, চতুঃ—, এবং পঞ্চ-যোজ্যতা-বিশিষ্ট বলা হইত (ইহা অনেকটা Dalton-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত যৌগিক পদার্থের মত)।

ক্ষার প্রস্তুত প্রণালী ও ক্ষারের ব্যবহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা আছে। ক্ষার কর্তন করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করা ও আল্‌তোভাবে চিরিয়া দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হইত। ইহা রোগগ্রস্ত অংশ দূর করিত, চর্ম ও মাংস নষ্ট করিত, নির্গত বস্তু শুষ্ক করিত এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ করিত। ক্ষার দুইপ্রকার ছিল বলিয়া জানা ছিল, এক, যাহা বাহ্যিক প্রযুক্ত হইত (তীক্ষ্ণ ক্ষার), দুই, যাহা আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে ব্যবহৃত হইত (মৃদু ক্ষার)। মৃদু ক্ষারকে চুণ সহযোগে তীক্ষ্ণ ক্ষারে পরিবর্তিত করা হইত।

বিষ জান্তব, উদ্ভিজ্জ এবং খনিজ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইত। ঔষধ দুই শ্রেণীর বলিয়া মনে করা হইত, এক, যাহা বল ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, দুই, যাহা রোগ নিরাময় করে। যাহা কিছু আয়ু, বল, স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিত তাহাকেই রসায়ন বলা হইত। ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ভারতীয় রসায়নবিদ্‌গণ ভস্মীকরণ, পাতন, বাষ্পপাতন, ঊর্ধপাতন, বন্ধন প্রভৃতি রাসায়নিক

প্রক্রিয়াগুলিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পতঞ্জলি, নাগার্জুন এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গ রাসায়নিক যোজন ও বিয়োজনে এই সব প্রক্রিয়া ব্যবহার করিতেন। পতঞ্জলি তাঁহার ধাতুবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে (লৌহশাস্ত্র) অনেক ধাতুবিদ্যাবিষয়ক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিস্তৃত নির্দেশ দিয়াছেন, বিশেষ করিয়া ধাতব লবণ, সংকর ধাতু, পারদসংকর প্রস্তুত করার ও তাম্র, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর গন্ধকমিশ্র হইতে ঐ সকল ধাতু নিষ্কাশন ও শোধন করার পন্থার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। ইহা বলা হয় যে অম্লরাজও তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পতঞ্জলির আবিষ্কারের অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু "রসায়ন" গ্রন্থে পতঞ্জলির আবিষ্কারের উদ্ধৃতি বারংবার পাওয়া যায়। ইহা বলা হয় যে পতঞ্জলির পূর্বে নাগার্জুনও ধাতুবিদ্যা বিষয়ে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তান্ত্রিক যুগের মধ্যকালে (আনুমানিক ১২০০ খৃষ্টাব্দ) রচিত গ্রন্থ "রসার্ণবে" রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে যন্ত্রের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ধাতুকে "মারা" অর্থাৎ যৌগিক পদার্থে পরিণত করা, মুচি প্রস্তুত করা ইত্যাদি কাজের জন্য বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রের বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। কোন্ ধাতু কোন্ রংএর শিখা দেয় তাহাও এই গ্রন্থে নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে—যেমন, তাম্রখণ্ড নীল শিখা, রাং কপোত-বর্ণী শিক্ষা, সীসা বিবর্ণ শিখা, লৌহ তামাটে শিখা ইত্যাদি। পারদের উপর ঔৎসুক্যের সাক্ষ্য এই যুগে খুব বেশী পাওয়া যায়। পারদ শোধন ও ইহা হইতে ক্যালোমেল, পারক্লোরাইড্, ও সালফাইড্ (সিঁদুর) প্রস্তুত করার পদ্ধতি এই গ্রন্থে সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ১৩০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ এই সময়ের মধ্যে লিখিত "রস-রত্ন-সমুচ্চয়" একটি মূল্যবান চিকিৎসা-সংক্রান্ত রসায়ন গ্রন্থ। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুতের বিদ্যা-সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এই সব প্রস্তুতিতে পারদই সর্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয় ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ "রস" এই শব্দটিকে বিভিন্ন গ্রন্থে, যেমন 'ভাব-প্রকাশ' গ্রন্থে, দুইটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে, একটি রস বা অন্নরস অর্থে, আর একটি পারদের সমার্থক শব্দ হিসাবে, এবং তখন ইহাকে ধাতুরূপেই গণ্য করা হইয়াছে।

এইভাবে 'রসায়ন' শব্দটি চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদ ও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার বুঝাইতেই প্রায় সকল সময়ে ব্যবহৃত হইত, এবং ইহা অপরসায়নকেও বুঝাইত। রসরত্ন-সমুচ্চয় অজৈব প্রাকৃতিক পদার্থগুলিকে (মৌল ও যৌগিক উভয় প্রকার পার্থিব পদার্থগুলি) নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করিয়াছে—(১) লঘুভার রস, যথা

অভ্র, মাক্ষিক, শিলাজতু, তুথ, ক্যালামাইন্ ইত্যাদি ; (২) লঘুভার উপরস (পারদের সঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী) যথা, গন্ধক, ফটকিরি, হিরাকস, হরিতাল, ইত্যাদি ; (৩) রত্নসমূহ যথা, পান্না, হীরক, নীলকান্তমণি, বৈদূর্যমণি, ইত্যাদি ; (৪) ধাতুসমূহ যথা, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসা, রাং ; এবং (৫) সংকর ধাতু যথা, কাংস্য ও পিত্তল। ছয়টি লবণ, তিনটি ক্ষার, এবং খনিজ পদার্থও অজৈব প্রাকৃতিক পদার্থের পর্যায়ে ধরা হইত। ভস্মীকরণ, অধঃ-পাতন, উর্ধ-পাতন, স্বেদন, এবং স্তম্ভন প্রক্রিয়াগুলি বর্ণিত হইয়াছে। লবণ হইতে রস-কর্পূর, গন্ধক ও পারদ হইতে হিঙ্গুল প্রস্তুত করা এবং স্বর্ণ-সিন্দুর ও রস-সিন্দুর প্রস্তুত করার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন তীব্রতাযুক্ত তাপের ব্যবহার যথা খর-পাক, মধ্যম-পাক ও মৃদু-পাকের উল্লেখ আছে। রসশালা নির্মাণের নির্দেশও দেওয়া আছে এবং রসশালাতে কোন্ কোন্ ধরণের যন্ত্র থাকা উচিত তাহাও বলা আছে, যেমন, খল, মুষল, নিষ্কর্ষক যন্ত্র, চালনি, মুচি, উত্তাপন যন্ত্রপাতি, ভস্ত্রা, লৌহ চাটু ইত্যাদিও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে তাহাদের সাফল্যের জন্য গবেষকগণের কি রকম জীবনযাপন করা উচিত তাহাও উল্লিখিত আছে। "রস-রত্ন-সমুচ্চয়"কে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ গ্রন্থবিশেষ বলা যাইতে পারে। জৈব রসায়ন সহ রসায়ন শাস্ত্র, মণিকবিদ্যা ও ধাতুবিদ্যাতে ভারতীয়গণ যুগ যুগ ধরিয়া যে জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার প্রায় সমস্তই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

ধাতুবিদ্যা ও অন্যান্য শিল্প—যদিও বৈদিক যুগে স্বর্ণ ও রৌপ্য পরিজ্ঞাত ছিল এবং বিবিধ অলঙ্কার নির্মাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহৃত হইত, এবং যদিও অন্যান্য ধাতু যথা লৌহ, সীসা ও রাংও উল্লিখিত হইয়াছে, তবু প্রাচীন ভারতীয়গণের ধাতুবিদ্যাগত দক্ষতার একটি সুসংবদ্ধ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তথাকথিত Damascas blades বা দামাস্কাসের ফলা নির্মাণ করিবার গোপন তথ্যের জন্য অর্থাৎ ইস্পাতে পান দেওয়ার দক্ষতার জন্য ভারতীয়গণ বিখ্যাত ছিলেন। এই দক্ষতা ভারতীয়গণের নিকট হইতে পারসীকগণ এবং পারসীকগণের নিকট হইতে আরবীয়গণ লাভ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধির জলন্ত প্রমাণ হইল কুতুবের নিকট প্রায় সার্দ্ধসহস্র বৎসরের পুরাতন মরিচাবিহীন পেটা লোহার স্তম্ভটি। ধাতুর নিষ্কাশন, শোধন, দ্রবীকরণ, ও ছাঁচ গঠনের পদ্ধতিগুলি তাঁহারা ভালভাবে বুঝিতেন ও ব্যবহার করিতেন। ভারতের দেশজ অধিবাসীরা ঢালাই লোহাতে পরিমাণমত অঙ্গারক মিশ্রণ করিতে পারিতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা

প্রথমে প্রয়োজনাতিরিক্ত অঙ্গারক মিশ্রণ এবং ধীরে পান দেওয়ার পন্থায় ক্রমে ক্রমে অতিরিক্ত অঙ্গারক বাহির করিয়া লইতেন। তাঁহারা অঙ্গারক দূরীকরণের এই পন্থাটি মধ্যপথে যথা সময়ে বন্ধ করিতে দক্ষ ছিলেন। সাম্রাজ্য-যুগের রোমকগণ ভারতীয়গণকে শিল্পদক্ষ জাতি বলিয়া গণ্য করিতেন। সেই সময়ে ভারতীয়দের আবিষ্কার ও তাঁহাদের ব্যবসায়ক্ষেত্রে অভিযান মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। ভারতীয়গণ নিম্নলিখিত কার্যাবলীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন যথা—বিরঞ্জন, রঞ্জন, সূতীবস্ত্র ছাপানো, চাম্ড়া পাকা করা, সাবান, কাচ, ইস্পাত, বারুদ, বাজী, বজ্রলেপ প্রস্তুত করা প্রভৃতি।

ভেষজ-বিজ্ঞান ও শল্য চিকিৎসা—অন্যান্য বিষয়ের মত এই বিষয়ে ভারতীয়দের সাফল্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যতীত কিছুটা নিশ্চিত মূল্যও আছে। চরক ও সুশ্রুত ভারতীয় ভেষজ-বিজ্ঞান ও শল্য চিকিৎসাতে দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি। চরক একজন ভিষক্ এবং সু ত একজন শল্য চিকিৎসক। যদিও ইঁহাদিগকে এই বিজ্ঞানের প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করা সম্ভবপর নাও হইতে পারে, তবু তাঁহাদের কার্য্যের প্রকৃত গুরুত্ব হইল যে তাঁহারা পূর্ববর্তী কালের অব্যবস্থার মধ্য হইতে একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভেষজবিজ্ঞান ও শল্য চিকিৎসাকে বিজ্ঞানের মর্য্যাদা দিয়াছিলেন। আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের মধ্যে শল্যচিকিৎসা একটি পরিপূর্ণ ব্যবহারিক বিদ্যা হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে; কিন্তু ভৈষজ্য বিদ্যা নূতন নূতন উদ্ভিজ, জান্তব ও খনিজ ঔষধ আবিষ্কারের মাধ্যমে যুগে যুগে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে; এই সমস্ত ঔষধের রোগনিরাময়ী ক্ষমতা যথাযথ পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণও হইয়াছে। খৃঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও ভারতীয়দের হাসপাতাল ও ঔষধালয় ছিল; এবং মানুষ ও পশু চিকিৎসার জন্য ঔষধের ব্যবস্থাপত্র প্রচার ও জনপ্রিয় করিবার চেষ্টার প্রমাণ অশোকের অনেক শিলা-লিপিতে পাওয়া যায়। হাঁপানির জন্য ধুতুরার ধূমপান করা এবং পক্ষাঘাত ও অজীর্ণের জন্য কুঁচিলা ফল ব্যবহার করা য়ুরোপীয়দের অনেক পূর্বে ভারতীয়গণই জানিতেন। ভারতীয়গণই সর্বপ্রথম পারদের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার সমর্থন করেন এবং চিকিৎসকগণ বলবর্দ্ধক হিসাবে পারদঘটিত ঔষধ (মকরধ্বজ) ব্যবহার করিতেন। ভারতীয়গণ শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা যায় এইরূপ নিদ্রাউদ্রেককর চূর্ণ ভেষজ পদার্থ প্রস্তুত করিতে জানিতেন; এই সব ঔষধ স্থানিক অবেদন সাধনেও কার্য্যকরী ছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয়দিগের ভৈষজ্য বিদ্যার প্রত্যেক গ্রন্থই আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য ধাতুভস্ম সুপারিশ করিয়াছে। স্বর্ণভস্ম, রসসিন্দুর এবং রজতভস্ম খুব প্রচলিত ঔষধ ছিল। ভারতীয় চিকিৎসক ও ভেষজবিজ্ঞানীদিগের গ্রন্থের কথা প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ জানিতেন। ভেষজবিজ্ঞানের জনক Hippocrates (খৃঃ পূঃ ৪৫০) নিম্নলিখিত ঔষধের কথা জানিতেন, যথা, গোলমরিচ, এলাচ, আদা, দারুচিনি, ক্যাসিয়া ইত্যাদি। ভারতীয় ভেষজ-গবেষণাগারে প্রস্তুত ঔষধাবলী গ্রীস দেশে এবং গ্রীক ও রোমক সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত হইত। বাগদাদে আরবীয়দের হাসপাতালে ভারতীয় চিকিৎসকগণ অধীক্ষকরূপে নিযুক্ত হইতেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শল্য চিকিৎসা ভারতবর্ষে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাচীনতম শাখাগুলির মধ্যে একটি। প্রাচীন ভারতীয় শল্যচিকিৎসকগণ মনে করিতেন যে শল্যচিকিৎসা চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্ব্বাগ্রগণ্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং ইহাতে অন্যান্য শাখা অপেক্ষা অনুমান ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত হেত্বাভাস হইবার সম্ভাবনা কম। শলাকা অথবা শল্য এই শব্দটি হইতে, অর্থাৎ শরীর হইতে শায়ক বা ঐ শ্রেণীর বিজাতীয় পদার্থ দূর করার কৌশল হইতে এই বিজ্ঞানের নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে যুদ্ধ বা শিকারকালীন আকস্মিক দুর্ঘটনা হইতে এই বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। যদিও প্রাচীন শল্যচিকিৎসাপদ্ধতি আধুনিক কালে অনুসৃত পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গতার সঙ্গে তুলনীয় নহে, তবু ভারতীয় শল্য চিকিৎসকগণ মৃত ভ্রূণ বাহির করিতে, শরীরের কলা হইতে বহিরাগত পদার্থ বাহির করিতে এবং শল্য চিকিৎসামূলক প্রক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন ধরণের প্রদাহ, স্ফোটক, ক্ষত এবং অন্যান্য ব্যাধি নিরাময় করিতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। অস্থি কর্তন করা ও যুক্ত করা এবং অন্যান্য বিপজ্জনক অস্ত্রোপচারও তাঁহারা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করিতেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সুশ্রুত-পন্থীরা বলিতেন যে দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান অর্জনের অপরিহার্য পন্থাগুলির মধ্যে শবব্যবচ্ছেদ একটি পন্থা। শবব্যবচ্ছেদ দ্বারা মানুষের শারীরস্থান সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান অর্জন ব্যতীত জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য দেহমধ্যস্থ যন্ত্র ও অংশগুলি যথেষ্ট সতর্কতার সহিত পরিহার করিয়া অস্ত্রোপচার করাও শিক্ষা হইত। শল্যচিকিৎসাগারে অন্ততঃপক্ষে একশত সাতাশ প্রকার যন্ত্র থাকিত, যথা, করাত, শল্যচিকিৎসকের ছুরি, সূঁচ সাধারণ ছুরি, কাঁচি, সাঁড়াশির মত যন্ত্র, ইত্যাদি। অনুশীলনের জন্য মোমের ছাঁচ,

অলাবু, শশা ব্যবহৃত হইত এবং ক্ষতস্থানাদি বন্ধনের কৌশল অনুশীলনের জন্য মনুষ্য শরীরের নমনীয় ছাঁচ ব্যবহৃত হইত।

পাচনতন্ত্রের শারীরবৃত্ত, ভ্রূণবিদ্যা, ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয়দের জ্ঞান মোটামুটি ব্যাপক ও নির্ভুল ছিল। পাঁচটি মৌল বস্তুর সহযোগে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য প্রাণবায়ু নামক বিশেষ ধরণের জৈবিকশক্তির সাহায্যে গ্রাসনালীর ভিতর চালিত হয়। পাকস্থলীতে ঐ খাদ্য একটি নরম ও আঠাল শ্লেষ্মাজাতীয় পদার্থের (স্পষ্টতঃ পাচকরস) সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আরও অম্লযুক্ত হয়। এইভাবে ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে একটি মণ্ডে পরিণত হয়, সেই মণ্ড সমান-বায়ুর ক্রিয়াতে পিত্তাশয়ে (গ্রহণী) যায় এবং তথা হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্রে (আম-পক্বাশয়) যায়। তার পর মণ্ডটি পিত্তের পাচক রস দ্বারা রসে পরিণত হয়। এই রসে কলা-উৎপাদনকারী "ক্ষিতি" যুক্ত যৌগিক পদার্থ, "অপ্"-যুক্ত যৌগিক পদার্থ, তাপ-উৎপাদনকারী "তেজঃ"-যুক্ত যৌগিক পদার্থ, বল-উৎপাদনকারী "বায়ু"-যুক্ত যৌগিক পদার্থ, এবং পরিশেষে সূক্ষ্ম অশরীরী উপাদানমূলক অংশ আছে ; এবং এই রসই চেতনার পরিবাহক। রসের সূক্ষ্ম ভাগ ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে প্রাণবায়ুরূপ জৈবিকশক্তি দ্বারা ধমনী বা মধ্যশরীরের (মুখ্যা রস কুল্যা) ভিতর দিয়া প্রথমে হৃৎপিণ্ড, পরে হৃৎপিণ্ড হইতে যকৃতে যায় ; সেখানে পিত্তের রঞ্জক দ্রব্য রসের সারবস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া ইহাকে রক্তে পরিণত করে। ব্যান-বায়ু নামক জৈবিকশক্তি রসের অধিকাংশ সমস্ত শরীরে পরিচালিত করে। বায়ু ও কফ রক্ত মাংস-কলাতে পরিণত হয়। মাংস কলার সূক্ষ্ম সারবস্তু বায়ু এবং বিপাকীয় উত্তাপের একত্রিত ক্রিয়ার ফলে স্নেহ-কলা প্রস্তুত করে ; এই ক্রিয়াতে "অপ্"-যুক্ত যৌগিক পদার্থের দান খুব বেশী বলিয়া মনে করা হইত। স্নেহ পদার্থের সূক্ষ্ম সারবস্তু মজ্জাতে প্রবেশ করিয়া বায়ুর সহযোগে তথায় বিপাকীয় উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং পরিশেষে শুক্রে পরিণত হইয়া শুক্রাশয়ে পরিচালিত হয়। শুক্র ওজঃ (শক্তি) প্রদান করে, ওজঃ হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাগমন করে ও পুনরায় সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হয় এবং একটি স্বয়ং প্রত্যাগমনী বিপাক চক্র শুরু হয়। শরীরের শিরা, ধমনী এবং স্রোতের ভিতর রক্তসঞ্চালন হয় বলিয়া মনে করা হইত ; শিরা, ধমনী, মাংসপেশী, লসিকাবহ আধার ইত্যাদি এই সমস্ত পথের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, হৃৎপিণ্ড হইতে যকৃতে ধমনী দূষিত রক্ত বহন করিয়া আনে এবং শিরার মাধ্যমে শোধিত রক্ত পরিচালিত হয় বলিয়া জানা ছিল। চরক ও সুশ্রুতে শিরা ও ধমনীর শারীরস্থান নির্দেশ কিছুটা অস্পষ্ট ; কাজেই উহা হইতে শুধু মোটামুটি ধারণা করাই সম্ভবপর। সমস্ত শিরা এবং যে সমস্ত ধমনী শরীরে রস পরিবহন করে না, সেই

সমস্ত ধমনী করোটি-সংক্রান্ত স্নায়ু ; ইহারা হৃৎপিণ্ড হইতে করোটিতে গিয়াছে। সুষুম্না বা মেরুদণ্ডের মধ্য তন্ত্রীতে (ব্রহ্ম-দণ্ড) দুই শ্রেণী স্বতন্ত্র-স্নায়ু-তন্ত্র আছে, শরীরের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ইহারা ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটি শাখাতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। শরীরে সাত শত স্নায়ু-তন্ত্রী আছে ; ইহাদের মধ্যে চৌদ্দটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ; ইহাদের সাহায্যেই নানাপ্রকার গতি হইয়া থাকে। চরক এবং সুশ্রুতের মতে বায়ুগুলিই প্রধান চালক এবং বাধ্যকারী শক্তি ; ইহাদের দ্বারাই বিভিন্ন অঙ্গ এবং মনও চালিত হয় ; ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির জন্যও ইহারা দায়ী। বায়ু পাঁচ প্রকার যথা, প্রাণ, যাহা স্বরযন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র চালনা করে, এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলা, কাসি ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত পেশীদিগকে নিয়ন্ত্রণ করে ; অপান বায়ু রেচন তন্ত্রের সহিত সংযুক্ত ; ব্যান বায়ু পৈশিক ক্রিয়ার সহিত জড়িত ; সমান বায়ু বিপাকের মাধ্যমে শরীরের তাপ-সংরক্ষণের কার্যে নিযুক্ত, এবং উদান বায়ু সাধারণ ভারসাম্য রক্ষা করে এবং দেহের বিভিন্ন যন্ত্র-সংস্থান অক্ষুণ্ণ রাখে।

ডিম্বাণু শুক্রাণু কর্তৃক গর্ভাহিত হইলে দৈহিক উত্তাপের প্রভাবে পর্য্যায়ক্রমে একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। রাসায়নিক ক্রিয়া বা বিপাকের সাহায্যে অন্নরস রক্তে পরিণত হয় ; পরে রক্ত হইতে মেদ, স্নেহ, অস্থি, মজ্জা ইত্যাদি হইয়া থাকে। তৃতীয় মাসে মস্তক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাথমিক অবস্থা দৃষ্ট হয়, চতুর্থ মাসে ইহা পরিপূর্ণ হয় ; অস্থি, অস্থিসমূহের মধ্যে সংযোগস্থাপক অংশুল শিরাগুচ্ছ, নখ, এবং কেশ ষষ্ঠমাসে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় মাসে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণীত হয় বলিয়া মনে করা হইত।

উদ্ভিদ-বিদ্যা ও কৃষি-বিজ্ঞান—উদ্ভিদ বিদ্যাতে সুসম্বদ্ধ জ্ঞান বলিতে আধুনিক কালে যাহা বোঝায় সেইরূপ জ্ঞান প্রাচীন ভারতীয়দিগের ছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। প্রথমে খাদ্য সরবরাহ সমস্যা সমাধান পরে অসুস্থতা ও ব্যাধি নিরাময় করিয়া দীর্ঘজীবন দিতে পারে এই রকম ঔষধি সন্ধান উপলক্ষেই ভারতীয়-গণের উদ্ভিদ্-বিদ্যা-সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণে কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছিল। ইহা বলা যাইতে পারে যে এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলেই উদ্ভিদগুলিকে মোটামুটিভাবে শ্রেণী বিভক্ত করা হইয়াছিল। চরক এবং সুশ্রুত উদ্ভিদকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন—(১) বনস্পতি বা যে সমস্ত বৃক্ষ ফুল ব্যতীত ফল প্রসব করিয়া থাকে ; (২) বানস্পত্য, যে সমস্ত বৃক্ষ ফুল ও ফল উভয়ই দিয়া থাকে ; (৩) ওষধি, যে সমস্ত উদ্ভিদ ফল দেওয়ার পর শুকাইয়া যায় ; (৪) বীরুধ বা অন্যান্য উদ্ভিদ যাহাদের কাণ্ড সকলদিকে ছড়াইয়া যায়। শেষোক্ত শ্রেণীকে আবার দুইভাগে

বিভক্ত করা যায়—(১) লতা, (২) গুল্ম বা cartaceous (ত্বকসমন্বিত) কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ। উপরোক্ত বিভাগ ব্যতীত আরও দুইটি বিভাগের কথা প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন—(১) তৃণ এবং (২) অবতান অর্থাৎ বৃক্ষবৎ উদ্ভিদ এবং গুল্ম।

অমর পরজীবীয় উদ্ভিদকে লতাজাতীয় বলিয়াছেন; কিন্তু ইহাদিগকে "অবরোহ" অর্থাৎ বৃক্ষের শাখা হইতে অবরোহী আস্থানিক মূল হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। ভারতীয় ভৈষজ্যবিদ্যার গ্রন্থে আরও কয়েক শ্রেণী উদ্ভিদের উল্লেখ আছে—যথা, আকাশবতী বা আকাশলতা; প্লব বা বদ্ধ জলাশয়ে ভাসমান আগাছা; এবং শৈবাল অর্থাৎ শেওলা ও শেওলার ন্যায় পুষ্পল ছত্রক বিশেষ।

উদ্ভিদ শারীরবৃত্ত—উদয়ন উদ্ভিদের মধ্যে জীবন, মৃত্যু, নিদ্রা, জাগরণ, রোগ ও মাদকদ্রব্যের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যাহা অনুকূল সেই দিকে উদ্ভিদের গতি এবং যাহা প্রতিকূল তাহা হইতে উদ্ভিদের সরিয়া আসার ঘটনাও উদয়ন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যেমন সূর্যমুখীর সূর্যের দিকে মুখ রাখিয়া ঘোরা ইত্যাদি।

গুণরত্ন ষড়-দর্শন-সমুচ্চয় (১৩৫০ খৃষ্টাব্দ) গ্রন্থের টীকাতে উদ্ভিদ জীবনের নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন—(১) শৈশব, (২) নিয়মিত বৃদ্ধি, (৩) নিদ্রা, জাগরণ বা উদ্দীপনায় প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন গতি ও ক্রিয়া, (৪) উৎপন্ন ক্ষত শুষ্ক হওয়া (৫) মৃত্তিকার প্রকৃতি অনুসারে খাদ্য আত্তীকরণ (৬) রোগ এবং রোগ-মুক্তি। যে বৃক্ষের ফল হয় অথচ ফুল লক্ষিত হয় না অর্থাৎ বনস্পতিকেও পুষ্পিত করা সম্ভব হইত (বরাহ মিহির)। নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর হইতে দেখা যায় যে সকল দিক হইতেই উদ্ভিদের সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও জীবনের সঙ্গে মানুষের সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও জীবনের নিকট সাদৃশ্য আছে :—

হারীত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনিবর সঙ্গম ব্যতীত গর্ভাধান হয় না কেন? অথবা বিপরীত লিঙ্গের মিলন ব্যতীত ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় না কেন? উদ্ভিদের মত রমণীতেও একই প্রকার ফলোৎপাদন দৃষ্ট হয় না কেন?"

আত্রেয় উত্তর দিলেন—"সমস্ত উদ্ভিদেই শিব ও শক্তি অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী জন্মদায়ক শক্তি সমাহিত আছে। হে মহাত্মা, যে শক্তি স্থৈতিক গুণ সম্পন্ন উহা শিব বা পুরুষ এবং যে শক্তি গতীয় গুণসম্পন্ন উহা শক্তি বা স্ত্রী।"

ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ বলেন যে উদ্ভিদে এক প্রকার ম্লান সচেতনতা আছে এবং ইহারা আনন্দ ও বেদনা[৫] ভোগ করিতে পারে এবং ইহাদের শ্রবণশক্তিও আছে।[৬]

ঋগ্‌বেদের কাল হইতেই ভারতীয়দিগের উদ্ভিদ বিষয়ক জ্ঞানার্জনে উৎসাহ ছিল, এবং বিশেষ করিয়া এই কারণেই কৃষিবিজ্ঞানে উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল। ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতে, অনেক নদী-নালা এবং প্রচুর জল সরবরাহের বন্দোবস্ত থাকার জন্য ঋষিগণ কৃষিকর্ম পবিত্র মহান্‌ জীবিকা বলিয়া মনে করিতেন। কৃষিকর্মে অনুরাগ স্বভাবতঃই গৃহপালিত পশুসমূহের উন্নতি ও মঙ্গল সাধনে সমপরিমাণ প্রগাঢ় অনুরাগে রূপপরিগ্রহ করিত। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও কৃষিবিদ্যা সরকারের আন্তরিক মনোযোগ আকর্ষণ করিত এবং সেই সময়ে ইহা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। ইহা সরকারের একটি প্রয়োজনীয় বিভাগ ছিল। এই বিভাগ একজন অধীক্ষকের অধীনে থাকিত। তাঁহার বীজসংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া শস্য উৎপাদন, ফসল সংরক্ষণ এবং শ্রমিক পরিচালনার গুরুভার কর্তব্য ও দায়িত্ব থাকিত। কৃষি-পরাশর (আনুমানিক প্রথম শতক) নামক একটি অমূল্য গ্রন্থে প্রধানতঃ ধান্য-চাষ সম্বন্ধে এবং অপ্রধানতঃ কৃষি-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে যথা আবহ পর্যবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনা আছে। আদিযুগে ভারতবর্ষে কৃষিবিদ্যাতে কতখানি জ্ঞান ছিল এবং উন্নতি হইয়াছিল এই গ্রন্থ সেই বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছে। হলকর্ষণ সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে: হেমন্তে হলকর্ষণ স্বর্ণপ্রসূ, বসন্তে তাম্র ও রৌপ্য, গ্রীষ্মে শুধু শস্য এবং বর্ষায় হলকর্ষণ ভয়াবহ দারিদ্র্যজনক।[৮]

বীজবপন, রোপণ, শস্যকর্তন ইত্যাদি বিষয়েও অনুরূপ নির্দেশ আছে।

প্রাণিবিদ্যা: ভারতীয়গণ প্রাণীদিগকে, বিশেষ করিয়া পথ্যবিজ্ঞান, অর্থ নৈতিক জীবন, ঔষধ, চারুকলা, এবং ধর্মের তুলনায়, একটি প্রধান স্থান দিয়াছেন। গৃহপালিত এবং বন্য উভয় প্রকার প্রাণীরই প্রকৃতি, জন্মস্থান, এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহাদের গভীর জ্ঞান ছিল। প্রাণীদিগকে অনেকভাবে শ্রেণী বিভক্ত করিবার পন্থা প্রচলিত ছিল। চরকের মতে চারিটি প্রধান বিভাগ স্বীকৃত হইত:

(১) জরায়ুজ—জরায়ু হইতে জাত (যথা মানুষ এবং চতুষ্পদ প্রাণী)।

(২) অণ্ডজ—ডিম্বাণু হইতে জাত (যথা মৎস্য, সরীসৃপ এবং পক্ষীকুল)।

(৩) স্বেদজ—আর্দ্রতা হইতে জাত (যথা, কীট, মক্ষিকা এবং মশক)।

(৪) উদ্ভিজ্জ—উদ্ভিদ্‌ অঙ্গ হইতে জাত।

যৌন-সঙ্গম ব্যতিরেকে জাত প্রাণীদিগকে ক্ষুদ্র জন্তুও বলা হইত। তাহাদের সংজ্ঞা এইভাবে নির্ধারণ করা হইত, যেমন, প্রাণী যাহাদের অস্থি নাই (অনস্থিক),

প্রাণী যাহাদের নিজেদের রক্ত নাই (যেষাং স্বং শোনিতং নাস্তি) বহু সন্তান প্রসূ প্রজাতি এবং সেই সমস্ত প্রাণী যাহারা দমিত হয় না।

পথ্যের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার মাংস লক্ষ্য করিয়া চরক পশু ও পক্ষীকে বিভিন্ন শ্রেণী বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী বিভাগের একটি ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে। সুশ্রুত এবং নাগার্জুন বিশেষ করিয়া বিষ-বিজ্ঞান সম্পর্কেই সর্পকুলকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা এবং ইঁহাদের শিষ্যবর্গ ছয় প্রকার পিপীলিকা, ছয় প্রকার মক্ষিকা, পাঁচ প্রকার মশক, ত্রিশ প্রকার বৃশ্চিক, এবং ষোল প্রকার উর্ণনাভের নাম করিয়াছেন। ভারতীয় শল্যচিকিৎসকগণ খুব আদিকাল হইতেই জলৌকা ব্যবহার করিতেন ; সুশ্রুত ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণী, স্বভাব এবং প্রয়োগ-বিধি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাণীবিদ্যাতে ভারতীয়দিগের পাণ্ডিত্য, প্রাণীদিগের জীবনসম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্যে বিজ্ঞানীসুলভ কৌতূহলের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পশুরোগসংক্রান্ত বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বও ভারতীয়গণ বহু প্রাচীনকাল হইতেই জানিতেন। বলির জন্য ব্যবহৃত পশু যেমন ছাগ, মেষ, অশ্ব, এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় যে সমস্ত পশু যেমন হস্তী, ইহাদেরও প্রয়োজনীয় শারীরস্থান বিষয়ে ভারতীয়গণ বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ; এবং খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতকেই পশু চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপিত করিয়াছিলেন। পশুদের অস্থি ভগ্ন হইলে এবং স্থানচ্যুত হইলে তাঁহারা ভগ্ন অস্থি যুক্ত করিতে পারিতেন এবং স্থানচ্যুত অস্থি যথাস্থানে স্থাপিত করিতে পারিতেন ; পশুদিগের বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসাও জানিতেন।

উপসংহার : বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার মূলনীতি, এবং বিশ্বজগতে সংঘটিত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী কার্য ও কারণ সূত্রে গ্রথিত করিবার দৃঢ় প্রয়াস, প্রাচীনকালের অগ্রসর জাতিগুলির মধ্যে গ্রীক ও অন্যান্য জাতির মত প্রাচীন ভারতীয়গণের মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পদার্থের চূড়ান্ত গঠন প্রকৃতি, মৌল পদার্থের বিবর্তন ও পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু গঠনে উহাদের সংযোগ, যৌগিক পদার্থের শ্রেণী বিভাজন, ইত্যাদি বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট মতবাদ, মনে হয়, ভারতীয়গণই সর্ব্বপ্রথম, তাঁহাদের নিজস্ব দূরকল্পী ভাষাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সূক্ষ্ম ও উন্নততর পরিমাপ যন্ত্রের অভাব প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাও সত্য যে, আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি যে সমস্তই পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছিল তাহারও কোনো লিখিত প্রমাণ নাই, তবু এই কথা বলিলে ভুল হইবে না যে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তথ্য আহরণ করিয়া সেইগুলি

বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার উপরেই তাঁহাদের অবলম্বিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিত।

প্রত্যেক বিভাগে নিজস্ব বৈজ্ঞানিক পরিভাষাতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। পদার্থবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান, ভেষজবিদ্যা, এবং শারীরস্থানসহ শল্য চিকিৎসা—প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল, এবং প্রত্যেক বিভাগে বিভিন্ন মতাবলম্বী কর্মী ছিলেন। তাঁহারা অবাধে একে অন্য বিভাগের কার্যাবলীর সমালোচনা করিতেন। বিশেষ করিয়া শারীরস্থানবিষয়ক বিদ্যাতে ভারতীয়গণ অন্য বিভাগ অপেক্ষা একধাপ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা শব-ব্যবচ্ছেদ করিতেন। শব-ব্যবচ্ছেদ এবং ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত অন্যান্য বৃহৎ অস্ত্রোপচারের ফলাফল তাঁহারা ভ্রূণবিদ্যাবিষয়ক অনুশীলনে ব্যবহার করিতেন। রোগলক্ষণনির্ণয় বিদ্যাও যথাযথ এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিত। ভৈষজ্যবিদ্যাতে সেঁকোবিষ, পারদ এবং রসাঞ্জনের মত বিষাক্ত ঔষধের সাফল্যের সঙ্গে নির্ভয়ে ব্যবহার পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন পারস্য, মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের দৃষ্টি ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। এই সমস্ত দেশে ভারতীয় ভিষকৃগণ ও শল্য চিকিৎসকগণ সাদর অভ্যর্থনা ও বিশেষ সম্মান লাভ করিতেন। ধাতুবিদ্যাতে ভারতীয়গণ অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান শিল্পের পরম উন্নতি সাধনে এবং রঞ্জকদ্রব্য, রাগদ্রব্য, সুগন্ধদ্রব্য, ঔষধ ইত্যাদি বহুল পরিমাণে উৎপাদনে সহায়ক হইয়াছিল। উদ্ভিদ্‌বিদ্যাতে উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাজন অনেকটা বিধিসম্মত নহে এবং অগভীর; কিন্তু প্রধানতঃ ভৈষজদ্রব্য ও কৃষির স্বার্থের জন্যই যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল তাহা অত্যন্ত বিচিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণিবিদ্যাতে প্রজাতির শ্রেণী বিভাজন শারীরস্থানবিষয়ক বৈশিষ্ট্য হিসাবে না করিয়া প্রাণীদিগের বহিঃপ্রকৃতি ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি অনুসারেই করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, প্রতিটি বিভাগে বর্ণিত বিশদ বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে ভৌত বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতীয়গণের দানের স্থায়ী মূল্য আছে এবং এই ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির তুলনায় ভারতীয়দিগের নিশ্চিত অগ্রগতি হইয়াছিল। এইরূপে একটি বৃহৎ জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এই জ্ঞান গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছিল আরও পরে।

সংক্ষেপে, যদিও ভারতীয়গণের বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে বর্তমান যুগের অগ্রগতির তুলনা করা সুন্দরও নহে, শোভনও নহে, তবু সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবে

ইহা বলা যাইতে পারে যে সেই প্রাচীনকালে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিবাদের যে মনোভাব তাঁহাদের ছিল, বর্তমানকালে বিজ্ঞানীদের মনোভাব তাহা হইতে মূলতঃ পৃথক্ নহে।

দ্রষ্টব্য

১। দ্বাবিংশতি-বিধো মন্দ্রো ধ্বনিঃ সঞ্জায়তে হৃদি—সংগীত—সংগীত-সময়-সার, ১; স্বরূপ-মাত্র-শ্রবণান—নাদোনুরণনম্ বিনাঃ শ্রুতির ইত্যুচ্যতে।—দামোদর, সংগীত-দর্পণ, ১ম পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৫১।

২। তন্ত্রী-তন্ত-স্বরূপো জ্ঞেয়ঃ তদ-দৈর্ঘ্য-ব্যস্ত-মানতঃ—শেষ-লীলাবতী, দেবল প্রণীত Hindu Musical Scale গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৩। মধ্য-স্থান-স্থঃ সড়জঃ দ্বিগুণ-সমঃ - ঐ

৪; হারীত-সংহিতা, শরীর-স্থান, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৪৪ সম্পাদক কৈলাশচন্দ্র সেন, কলিকাতা' ১৮০৭

৫। মনুসংহিতা ১, ৪৯।

৬। মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব।

৭। ঐ

৮। "হেমন্তে কৃষ্যতে হেম, বসন্তে তাম্র-রৌপ্যকম্
ধান্যম্ নিদাঘ-কালে তু, দারিদ্র্যস্ত ঘনা'গমে।"

গ্রন্থবিবরণী

সার্টন, জর্জ: ইন্‌ট্রোডাকৃশন টু দি হিষ্ট্রি অব সায়েন্স, ১ম ও ২য় খণ্ড (কার্ণেগী ইনষ্টিটিউশন অব ওয়াশিংটন পাব্লিকেশনস্ ১৯২৭)

ড্যাম্পিয়ার, সার উইলিয়ম্ সেসিল্: দি হিষ্ট্রি অব সায়েন্স (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪২)

সামার, ডব্লিউ, এল্: প্রোগ্রেস অব সায়েন্স (ব্ল্যাকওয়েল, অক্সফোর্ড, ১৯৪২)

মেয়ার, ই: এ হিষ্ট্রি অব কেমিস্ট্রি ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট টাইমস টু দি প্রেজেণ্ট ডে, (ম্যাকমিলান, লণ্ডন ১৯০৬)

থর্প, সার এড্‌ওয়ার্ড: এসেজ ইন্ হিস্টরিক্যাল কেমিস্ট্রি (ম্যাকমিলান লণ্ডন ১৯২৩)

জীন্‌স্ : দি গ্রোথ অব ফিজিক্যাল সায়েন্স (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৪৮)

মজুমদার, জি, পি : বনস্পতি প্ল্যান্টস্ অ্যাণ্ড প্ল্যান্ট্ লাইফ অ্যাজ ইন্ ইণ্ডিয়ান্ ট্রীটিজেস্ অ্যাণ্ড ট্র্যাডিশন্‌স্ (গ্রিফিথ্ মেমোরিয়াল প্রাইজ এসে, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ১৯২৭)

মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ : হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান্ মেডিসিন্ ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট এজেস্ টু দি প্রেজেণ্ট টাইমস্ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড (গ্রিফিথ্ মেমোরিয়াল প্রাইজ এসে, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ১৯১১)

রায়, সার পি, সি : হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি ১ম ও ২য় খণ্ড (বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ ১ম খণ্ড ১৯০২, ২য় খণ্ড ১৯০৯)

শীল, ডাঃ বি. এন : পজিটিভ সায়েন্সেস্ অব দি এনশিয়েণ্ট হিন্দুজ (লঙ্গম্যান্‌স্ গ্রীণ অ্যাণ্ড কোং ১৯১৫)

সরকার, বিনয় কুমার : হিন্দু অ্যাচীভমেণ্টস্ ইন্ এগজ্যাক্ট সায়েন্স (লঙ্গম্যান্‌স্ গ্রীণ অ্যাণ্ড কোং ১৯১৮)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব

ভূমিকা

ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে সুন্দরের উপলব্ধির আলোচনায় সৌন্দর্যতত্ত্ব বলিতে একটি দুর্বোধ্য বিজ্ঞানকে নিছক দুর্বোধ্য বলিয়া বুঝায় না। বৌম্‌গারটেন যেমন মনে করিতেন যে ইহা অনুভূতির বিষয়মাত্র এবং উপযুক্ত শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপনযোগ্য নহে, ইহা তদ্রূপ নহে। হেগেলের মতে সুকুমার কলাবিদ্যার দর্শন বলিতে যাহা বুঝায়—ইহা তদ্রূপও নহে। সুন্দর বলিতে সর্বজনব্যবহৃত যে তাৎপর্য, তাহা শিল্পকলাতেই হউক বা প্রকৃতিতেই হউক, সেইরূপ সৌন্দর্যবাদও ইহা নহে। বর্তমান প্রসঙ্গে ইহা সুকুমার কলাবিদ্যার বিজ্ঞান এবং দর্শন অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে (১) ইহাকে এই অর্থে সুকুমার শিল্পবিজ্ঞান বলা যায় যে শিল্পের সমস্যাসমূহ বলিতে প্রথমে শিল্পের অনুশীলন সংক্রান্ত উপকরণসমূহের সমস্যাই ধরা হইয়াছে। যে সমস্ত গ্রন্থে শিল্পের দর্শন আলোচিত হইয়াছে সেইখানে তাহার অনুশীলনসংক্রান্ত উপকরণ সমূহেরই আলোচনা করা হইয়াছে। তবে ইহার সঙ্গে দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা হইয়াছে। (২) ইহাকে সুকুমার শিল্পবিদ্যার দর্শন বলা হইয়া থাকে এই অর্থে যে একজন সৌন্দর্যতত্ত্বনিষ্ঠ উপভোক্তার মনে একটা শিল্পকার্য যে অনুভূতি জাগায়—ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী তাহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং কাব্য, সঙ্গীতকলা ও স্থপতিবিদ্যা এই তিনটি শিল্পকলার প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে এই মত ব্যক্ত করা হয় যে তাহাদের মতে পরমতত্ত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, শিল্পকলার অনুভূতিও তাহাই জাগাইয়া দিয়া থাকে। এইভাবে শিল্পের দর্শনসম্বন্ধীয় তিনটি সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে—(ক) রসব্রহ্মবাদ, (খ) নাদব্রহ্মবাদ ও (গ) বাস্তুব্রহ্মবাদ (৩) সুকুমার শিল্প এই অর্থে বলা হইয়া থাকে যে সুকুমার শিল্পের একটা নিজস্ব মূল্য স্বীকৃত হইয়া থাকে, কেন না এই শিল্পসৃষ্টি এমন একটা অনুভূতি জাগায় যাহা প্রাকৃতিক কোনও পদার্থ জাগাইতে পারে না—যদি তাহাকে শিল্পকার্য বলিয়া ধরা না হয়। আরও কারণ এই যে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও যান্ত্রিকশিল্প সকল সুকুমার কলা হইতে

পৃথক্ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং দার্শনিক আলোচনা এই শেষোক্ত শিল্পসম্বন্ধেই করা হইয়াছে।

সমস্যা সমাধানের উপযোগী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

সৌন্দর্যতত্ত্বের বিষয়টিকে শিল্পসংক্রান্ত তত্ত্ববিদ্যাসংক্রান্ত, মনস্তাত্ত্বিক, জ্ঞানসম্বন্ধীয়, যৌক্তিক ও সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

অর্থ-তত্ত্ব ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। শিল্পের গঠন-সংক্রান্ত বিচারে শিলাখণ্ড, চিত্র, সঙ্গীতের ধ্বনি, ভাষাতত্ত্বঘটিত শব্দাভিব্যক্তি এবং মানবদেহ প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমের মারফতে শিল্পকার্য সৃষ্টির উপায় ও পথ আলোচিত হইয়াছে। শিল্পকার্যের উপস্থাপ্য বিষয় তাহার আধেয় বস্তু এবং ইহা যে চরম অনুভূতি জাগায় তাহার স্বরূপ তত্ত্ববিদ্যার দৃষ্টিতে আলোচিত হইয়াছে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সৌন্দর্যতত্ত্বনিষ্ঠ উপলব্ধির বিভিন্নস্তরে মনস্তত্ত্বের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞানসম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচিত হইয়াছে—(১) সৌন্দর্যতত্ত্বমূলক বিষয়ের সঙ্গে সৌন্দর্য-তত্ত্বনিষ্ঠ উপভোক্তার সম্বন্ধের প্রকৃত স্বরূপ ; (২) সৌন্দর্যতত্ত্বনিষ্ঠ বিষয়ের প্রতিরূপ-প্রদর্শনের ব্যাখ্যার জন্য এবং কোন শিল্পকার্যে মূর্ত্ত অনুভূতির অনুরূপ অনুভূতি সৌন্দর্যানুভবকারীর মনে কেমন করিয়া জাগে তাহার ব্যাখ্যার জন্য আবশ্যক মানসিক অবস্থাসমূহ, (৩) দর্শকের মনে সৌন্দর্যতত্ত্ববিষয়ক ধারণার ক্রমবিকাশের অবসরে যে সমস্ত মানসিক বৃত্তি কার্যকরী থাকে, (৪) ঐ প্রকার বৃত্তিসমূহের সঙ্গে ব্যবহারিক স্তরে কার্যকরী বৃত্তিসমূহের প্রভেদ ; (৫) সৌন্দর্যতত্ত্ববিষয়ক উপলব্ধির ব্যাপারে সৌন্দর্যের বিষয় ও বিষয়ের উপভোক্তার স্বকীয়ত্বের উপাদান সমূহ ও তাহাদের পার্থিব ও অপরাপর বাধার পরিহার। যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সৌন্দর্যতত্ত্ববিষয়ক বিচারকে (ক) অভ্রান্ত (খ) ভ্রান্ত (গ) সন্দিগ্ধ এবং (ঘ) মায়িক প্রভৃতি ব্যবহারিক বিচার হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা হয়। আর সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গীতে—

(১) শিল্পের উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া (২) শিল্পী এবং (৩) সৌন্দর্যতত্ত্বনিষ্ঠ উপলব্ধিকারীর দিক্ দিয়াও ইহা আলোচিত হইয়াছে। শিল্প সম্বন্ধে প্রাচীনতম মতবাদসকল—তাহা ভোগ-সুখ-বাদী মতই হউক অথবা শিক্ষকোচিত মতই হউক অথবা নীতিনিষ্ঠই হউক, শিল্পের উদ্দেশ্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে—কি উদ্দেশ্যে শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সমস্যা আলোচনা করিয়াছে। শিল্পীর দিক্

দিয়া (১) অনুকরণবাদ, (২) মায়াবাদ এবং (৩) আদর্শীকরণবাদ প্রভৃতি মতবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল মতবাদ প্রদর্শন করে যে, যে বস্তু শিল্পীকে অনুপ্রেরণা দান করে, তাহা লইয়া শিল্পী শিল্পসঙ্গত উপায়ে কিভাবে কাজ করিয়া যায়। সৌন্দর্য-উপভোক্তার দিক্ দিয়াও অনুরূপভাবে শিল্পকলাকে (১) মোহপ্রাপ্ত জ্ঞান বা যে জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করা যায় না এমন জ্ঞান (২) অনুমান, (৩) আবেগের বহিঃপ্রকাশ (৪) রহস্যোপলব্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন মতবাদ রহিয়াছে। ঐ সকল মতবাদ শিল্পকার্য সৌন্দর্য-উপভোক্তার মনে যে অনুভূতি জাগায় তাহার স্বরূপ এবং যে উপায়সমূহদ্বারা তিনি সেই উপলব্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা প্রতিপাদিত করে।

ইতিহাস এবং সাহিত্য

নাট্যশাস্ত্রের দুইখানা গ্রন্থের কথা পাণিণি (৩।৩।১১০-১১১) উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একটি শিলালিকৃত অপরটি কৃশাশ্বকৃত। ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, গ্রীস দেশে নাট্যকলার উদ্ভবের বহুপূর্বেই ভারতবর্ষে নাট্যকলা বিদ্যমান ছিল।

যেহেতু গ্রন্থদ্বয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ইহাদের পুনরুদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য ভরতের কাল হইতেই আমরা নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাসের আরম্ভ গণনা করিব। তাঁহার গ্রন্থ বর্তমানে প্রাপ্ত নাট্যশাস্ত্র সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। (১) শার্ঙ্গদেবকৃত সঙ্গীতশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ সঙ্গীতরত্নাকার (২) স্থপতিবিদ্যাসম্বন্ধীয় ভোজরাজকৃত গ্রন্থের সমরাঙ্গণ-সূত্রধার নামক মূর্তিশিল্প-বিষয়কখণ্ডে ভরতকে নাট্যশাস্ত্রসম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থকার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ভোজরাজ প্রায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রের (নবম অধ্যায়) ভাষাতেই হস্তসঙ্কেত প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন এবং চিত্রবিদ্যা প্রসঙ্গে রসদৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রায় ভরতের কথাতেই অভিব্যক্ত করিয়াছেন (অষ্টম অধ্যায়)।

নাটক

নাটকের প্রসঙ্গে সৌন্দর্যতত্ত্বের ক্রমবিকাশের ব্যাপারে প্রথম সাড়ে তিনশত বৎসরে, অর্থাৎ ভরতের সময় (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) হইতে ভট্ট লোল্লটের (খৃঃ ৮৫০) কাল পর্যন্ত, সৌন্দর্যতত্ত্বের বিষয় ছিল মুখ্যতঃ শিল্পসংক্রান্ত। বস্তুতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল নাটকসৃষ্টি সম্বন্ধে নাট্যকার, সূত্রধার ও অভিনেতৃবর্গকে উপদেশদান করা এবং নাটকের আবশ্যক উপাদান কি কি ও

রঙ্গমঞ্চে উহা প্রদর্শনের উপায় ও উপকরণ কি—সেই সম্বন্ধে নির্দেশ দান করা। আধুনিক মনীষিগণের মনে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে—তিনি সেই সব বিষয়ের সমাধানেরও চেষ্টা করিয়াছেন।

(১) তাঁহার অভিমত এই যে, সৌন্দর্যোপলব্ধির ব্যাপারে চক্ষু এবং কর্ণই উপযুক্ত ইন্দ্রিয়। এই বিষয়ে তিনি নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বগিন্দ্রিয়ের উপযুক্ততা অস্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে সেণ্ট টমাস, এ্যাডিসন এবং ক্যাণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য সৌন্দর্যতত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ একমত।

(২) তাঁহার মতে নাট্যকলার উদ্দেশ্য হইল দর্শকের নৈতিক অভ্যুন্নতি। অবশ্য তাহা মুখ্যভাবে অভিনেতৃবর্গের মুখে প্রদত্ত কোন উপদেশের মারফতে হয় না—তাহা হইয়া থাকে গৌণভাবে, যখন দর্শক নাটকীয় ঘটনার কেন্দ্রীভূত বিষয়ের সঙ্গে নিজের মনের ঐক্য স্থাপন করিয়া সৎপথের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

(৩) তিনি এই অভিমত পোষণ করেন যে, নাটকাভিনয় দর্শনদ্বারা জাত অনুভূতির মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দকে অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য ইহা প্রারম্ভিক বিষয় মাত্র। সুতরাং সৌন্দর্যতত্ত্ববিষয়ে যাহাকে ভোগসুখবাদ বলা যায় এবং যাহা অবলম্বন করিয়া প্লেটো তাঁহার রিপাবলিক নামক গ্রন্থে শিল্পকলার নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং শিক্ষকতাবাদ—যাহার দ্বারা আরিষ্টটল্ শিল্পকলার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—ভরত এই দুই মতের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

(৪) রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

(৫) নাটকোদ্ভূত সৌন্দর্যানুভূতির জন্য যে সকল মানসিক অবস্থার প্রয়োজন তাহা তিনি বিবৃত করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইল অভিনীত বিষয়ের যিনি কেন্দ্র—তাঁহার সঙ্গে নিজের অবস্থার ঐক্য সাধন করার সামর্থ্য।

(৬) তাঁহার মতে (ক) আঙ্গিক, (খ) বাচিক, (গ) সাত্ত্বিক (আভ্যন্তরীণ) ও (ঘ) আহার্য (বহিরঙ্গ বা কৃত্রিম)—এই চারিপ্রকার অভিনয়ের দ্বারা নাটক রস পরিবেশন করিয়া থাকে।

(৭) দৃশ্যপটের ব্যবস্থা নাটকাভিনয়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক এইটি তাঁহার মত।

সৌন্দর্যানুভূতির বিষয়রূপে রস

নাট্যকার কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয়ই হইল রস। রস সৌন্দর্যানুভূতির আস্বাদ্য বিষয়। প্রকৃতির সৃষ্ট বিষয়-সকলের মধ্যে ইহা পাওয়া যায় না। ইহা

শুধু একত্ব নহে—কেন না ইহা বহুত্বের মধ্যে ঐক্য। মনের একটি স্থায়িভাব হইল এই বহুত্বের মধ্যে ঐক্য সাধক। ইহা নিম্নোক্ত ভাব সমূহের ঐক্য স্থাপনের দ্বারা একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়া থাকে। (১) মনের স্থায়িভাবের মূল কারণ (?) স্বরূপ মনুষ্যের ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট আবেগজনক অবস্থা (বিভাব) (২) মনে উদ্ভূত স্থায়িভাবের দ্বারা অনুপ্রেরিত এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থার নির্দেশক অনুকারী ক্রিয়া (অনুভাব) এবং (৩) অস্থায়ীভাব ব্যভিচারিভাব।

এই পূর্ণাঙ্গরূপের অবস্থার মধ্যে মনের স্থায়িভাবই হইল কেন্দ্রীভূত এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অবশিষ্টগুলি হইল মাত্র সঙ্গীয়ভাব—অনেকটা যেমন রাজার সঙ্গে রাজার অনুচর ও সাজ-সজ্জা প্রভৃতি। ইহারা মনের স্থায়িভাবের প্রাধান্যপ্রাপ্তিতে সাহায্য করিয়া থাকে এবং এই স্থায়িভাবই দর্শকের পক্ষে আকর্ষণের কেন্দ্রস্বরূপ।

যে নাটকীয় ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া অভিনেতা নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সেই নাটকীয় ঘটনাকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত এবং দর্শককর্তৃক অনুভূত স্থায়ি-ভাবের কারণ বলা যায় না। দর্শকের মনে যে আন্দোলন অনুভূত হয় এই ঘটনাকে তাহারও কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। অভিনেতা যে ঐতিহাসিক চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন—তাহার সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার সম্পর্ক যতটা হয় ততটা অভিনেতার সঙ্গে নহে এবং দর্শকের সঙ্গেও নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে সীতাকে প্রেমপাত্রীরূপে অভিনেতাও যেমন মনে করিতে পারে না, দর্শকও তেমন পারে না। কেন না ঐতিহাসিক চরিত্রের সম্পর্কে ধর্মীয় ধারণা ঐরূপ ভাবের উদয়ের পরিপন্থী; পক্ষান্তরে,উহা শৃঙ্গার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাব—শ্রদ্ধা এবং ভক্তির উদ্রেকে সহায়তা করে। কারণের অস্তিত্বাভাবে কার্যের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং অভিনেতা অভিনয়কালে মুখভাবের যে পরিবর্তন ও অন্যান্য যে সকল পরিবর্তন করিয়া থাকেন, ঐগুলিকে শৃঙ্গার ভাবের ফল বলা যাইতে পারে না। অভিনেতা ব্যভিচারিভাবের স্থূল লক্ষণ ও ভাবভঙ্গীসকল প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু সেই ব্যভিচারিভাব সমূহকে ও স্থায়িভাবের অপরিবর্তনীয় সহযোগী বলা যাইতে পারে না। সমগ্র পরিবেশটা হইল একটা বাহন যাহার মারফতে অভিনেতা তাঁহার মানসিক আবেগকে সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছাইয়া দেন। অভিনেতাকর্তৃক রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত ভাবাবেশের সঙ্গে পরিবেশ, আঙ্গিক পরিবর্তন ও অপরিবর্তনীয় সহযোগিদের সম্পর্কের পার্থক্য দেখাইবার জন্যই উহাদিগকে কারণ, কার্য এবং

নিত্যসহযোগী বলা হয় নাই। তৎপরিবর্তে উহাদিগকে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব এই সকল পারিভাষিক নাম দেওয়া হইয়াছে।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সকল চিন্তাশীল মনীষী শিল্পের সমস্যাবলী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কাশ্মীরের অধিবাসী। তাঁহারা (১) ন্যায়, (২) সাংখ্য, (৩) বেদান্ত এবং (৩) কাশ্মীরের অদ্বৈত শৈববাদ—এই চারিটি মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করিয়াছেন।

ভট্টলোল্লট (খৃ: ৮৫০)

রসসূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে অভিনব ভারতীতে ভট্ট লোল্লটের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়ে তিনি সর্বপ্রাচীন টীকাকার। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী একান্তরূপে ব্যবহারিক। দর্শকের মনে রসের উৎপত্তির কোন হেতু প্রদর্শন করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার মনে দুইটি প্রশ্ন ছিল, (১) রসের উপাদান সমূহের ঐক্য সংঘটিত হয় কোথায়? এবং (২) যে রস বহুত্বের মধ্যে একত্ব—সেই রসের অভ্যন্তরে তাহার বিভিন্ন উপাদান কিরূপে পরস্পর সম্বদ্ধ থাকে? তিনি জানিতেন যে বহুত্বের মধ্যে একত্ব একটি মনোঘটিত রচনা। সুতরাং তাহা শুধু মানুষের মনেই সম্ভবপর। তদনুসারে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া তিনি বিবৃত করিয়াছেন যে মুখ্যতঃ রস ঐতিহাসিক মৌলিক চরিত্রের মধ্যেই রহিয়াছে এবং শুধু গৌণভাবেই তাহা ঐতিহাসিক ব্যক্তির ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ অভিনেতার মনে বর্তমান থাকে। তাহার কারণ নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

যদিও সাধারণভাবে মনের স্থায়িভাবের তখনই সম্ভব হয় যখন তাহার প্রকৃত কারণ বিদ্যমান থাকে—তথাপি অভিনেতা তাঁহার শিক্ষা এবং রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় পরিবেশের সাহায্যে কবিকল্পিত চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে একাত্ম করিয়া লইয়া থাকেন যে তিনি ঠিক কবিকল্পিত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য, গতিবিধি ও অনুভূতির দ্বারা কবিকল্পিত ব্যক্তির মধ্যে কবি যে ভাবাবেগের সংযোজনা করিয়াছেন—তাহার অনুরূপ ভাবাবেগ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। রহস্যতত্ত্বের প্রতীকের সঙ্গে রহস্যতত্ত্বানুভূতির যে সম্বন্ধ, অভিনেতার মনের স্থায়িভাবের সঙ্গে নাটকীয় পরিবেশের (বিভাবের) সম্বন্ধ তাহার অনুরূপ। এইরূপে ভট্ট লোল্লটের মতে সৌন্দর্যতত্ত্বের বিষয় হইল—ব্যভিচারিভাব প্রভৃতি বহুত্বের মধ্যে স্থায়িভাবের

ঐক্য সাধন। এই বহুত্বের উপাদান সমূহের দ্বারাই স্থায়িভাব সমন্বিত, শক্তিশালীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হয় অথবা প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়।

শিল্পকলাতে মায়াবাদ

শিল্পের ইতিহাসের প্রাচীনতম সময়ে সর্বত্র অনুকরণকে শিল্পসঙ্গত সৃষ্টির নীতি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অনুকরণ যখন সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্য লাভ করিয়া থাকে তখন তাহা মায়ার সৃষ্টি করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে কূটতার্কিক গর্জিয়াস শিল্পে মায়াবাদ মানিতেন। প্লেটো উপরি উক্ত মত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শিল্পের নিন্দা করিয়াছিলেন। শিল্পকার্য মায়ার সৃষ্টি করে ও ইহার দ্বারা গুণজ্ঞ ব্যক্তি শিল্পসৃষ্টিকে প্রকৃতির সৃষ্টি মনে করিয়া বিভ্রান্ত হন এবং ইহা প্রকৃতির সৃষ্টির অনুরূপ দৈহিক ও মানসিক সাড়া জাগায়—শিল্পে এই মতবাদ ভট্টলোল্লটের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে ভট্টলোল্লট এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে—শুক্তির শুভ্রতাদর্শনে রজতপ্রাপ্তির সময়ে যেমন মুহূর্তের জন্য যথার্থ রজতের অনুভূতি জাগে—সেইরূপ ঐতিহাসিক চরিত্রের নাট্যোচিত প্রদর্শনের বিষয়নিষ্ঠ উপলব্ধি দ্বারা অল্প সময়ের জন্য যথার্থ ঐতিহাসিক চরিত্রের দর্শনে জাত অনুভূতির অনুরূপ একটা চমৎকার অনুভূতি জাগিয়া থাকে, কারণ দর্শক মনে করেন যে নাটকীয় পরিবেশের কেন্দ্রীভূত নায়কের মধ্যে একটি স্থায়িভাব রহিয়াছে—যদিও বস্তুতঃ তাহা তথায় নাই।

এই মতবাদের সমালোচনায় বলা হয় যে, যদি শিল্পকলা মায়ার সৃষ্টি করিত তবে ইহা লোকের মনে সাধারণ ভাব ও সাড়া জাগাইত। এইরূপ স্বীকৃতির দ্বারা শিল্পকলার যে একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে—তাহাকে অস্বীকার করা হয়। ইহার দ্বারা সমস্ত করুণাত্মক দৃশ্যের উপস্থাপনার নিন্দা করা হয়। কারণ আমাদের স্বীকার করিতে হয় যে এইরূপ দৃশ্য দর্শনে আমাদের মনে দুঃখের অতি পীড়াদায়ক অনুভূতি-সমুদয়ের উদয় হইয়া থাকে এবং তাহা কখনও আস্বাদ্য হইতে পারে না।

ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে সৌন্দর্যতত্ত্ব

শ্রীশঙ্কুক (খৃঃ ৮৬০) ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অনুকরণানুমানবাদের মারফতে সৌন্দর্যতত্ত্বানুভূতির ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে উপস্থাপিত বিষয়নিষ্ঠ-উপলব্ধিই সৌন্দর্যতত্ত্ব-নিষ্ঠ অনুভূতির হেতু এবং উপস্থাপিত স্থায়িভাবের মধ্যেই ইহার সত্তা। সৌন্দর্য-উপভোক্তার মধ্যে ইহা কিরূপে আবির্ভূত হয় ইহাই ছিল তাঁহার সমস্যা। কারণ

শিল্পসঙ্গত উপস্থাপনার অন্যান্য উপাদান সকলকে যে ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়, উহার কেন্দ্রীভূত বস্তু যে স্থায়িভাব তাহাকে সেইভাবে স্বীকার করা যায় না। কারণ ইহা একটি মানসিক অবস্থা মাত্র—সুতরাং কোন বস্তুনিষ্ঠ উপলব্ধির স্বীকৃতি পায় না। সুতরাং তাঁহাকে অনুমানবাদ উপস্থাপিত করিতে হইয়াছে।

তাঁহার অভিমত এই যে, নাটকীয় পরিবেশ (বিভাব) অনুভাব, ব্যভিচারিভাব ও স্থায়িভাব-এই সবগুলিই সৌন্দর্যানুভূতির সহায়ক জ্ঞানের আধেয়বস্তু নহে, পরন্তু কেবলমাত্র স্থায়িভাব। তিনি বলেন যে নাটকীয় শিল্পের উপস্থাপনার দুইটি প্রধান উপায় রহিয়াছে—(১) ভাষা এবং (২) অভিনেতৃবর্গের শারীরিক এবং মানসিক শিক্ষা। এই দুইটি অন্য সকল কলার সাহায্যে একটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে এমন ভাবে উপস্থাপিত করিতে পারে যাহাতে দর্শক মনে করেন যে এই শিল্পসঙ্গত উপস্থাপনা 'খাঁটি'। তিনি মনে করেন যে এই গুলির সাহায্যেও স্থায়িভাবকে ততটা বস্তুনিষ্ঠরূপে প্রদর্শন করা যায় না। সুতরাং ইহার উপস্থাপনার উপায় হইল—অনুকরণ। কিন্তু তিনি তাঁহার উক্তির তাৎপর্য পরিস্ফুট করেন নাই।

অতএব তাঁহার (১) অভিমত এই যে, (১) কোন একটি স্থায়িভাবের (ক) কারণ—বিভাব (খ) কার্য—অনুভাব (গ) নিত্যসহযোগী—ব্যভিচারিভাব—এই তিন প্রকার নিমিত্ত রঙ্গমঞ্চে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হইলে—ইহাদের হইতে অনুমিত যে স্থায়িভাব দর্শকের চেতনায় জাগে সৌন্দর্যানুভূতি হইল এইরূপ একটি অনুকৃত স্থায়িভাবের উপলব্ধি। (২) এই অনুকৃত স্থায়িভাব যাহা অনুমিত, তাহা রস বলিয়া অভিহিত হয়। তাহার কারণ শুধু এই যে, উহা রামের মত একজন 'খাঁটি' নায়কের 'খাঁটি' স্থায়িভাবের অনুকরণ। আরও কারণ এই যে একটি অতি মনোরম পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ইহার একটি বিশিষ্ট মাধুর্য বৃদ্ধি পায় এবং দর্শকের মনে ইহা একটি আনন্দদায়ক অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে।

চিত্রের প্রভাব

নাটকীয় উপস্থাপনায় সৌন্দর্যানুভূতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি একজন সুনিপুণ চিত্রকরকর্তৃক অঙ্কিত অশ্বের অনুপ্রেরণায় জাত অনুভূতির উপমা দিয়াছেন। এই উপমার তাৎপর্য এই যে (১) সৌন্দর্যানুভূতি স্বকীয় সত্তায় বিশিষ্ট এবং এই জন্যই ইহা ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত অন্য যে কোনপ্রকার

জ্ঞান হইতে পৃথক্‌। (২) ইহা একটি জ্ঞান—যাহাকে সত্য, মিথ্যা বা সন্দিগ্ধরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না। (৩) শিল্পগত বস্তু দ্বারা স্বষ্ট মূর্তির সঙ্গে পূর্ব হইতে মনে অবস্থিত মূর্তির ঐক্য সাধনের দ্বারা ইহার উদ্ভব। (৪) চিত্রিত বা মৃন্ময় একটি অশ্বের দ্বারা যেমন মনে তাহার মৌলিকরূপ জাগিয়া উঠে, তেমনই কোন মৌলিকবস্তুর যথাযথ উপস্থাপনা দ্বারা মনে তাহার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই মতবাদের অসঙ্গতি সুস্পষ্ট। রঙ্গমঞ্চে যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত নিমিত্তসমূহকে যদি যথার্থ বলিয়া দর্শক মনে করেন—তবে সেই সকল হইতে অনুমিত মনের স্থায়িভাবকে কিরূপে অনুকরণ বলা যাইতে পারে? যদি দর্শক ঐগুলিকে শিল্পের সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন—তবে তাহা হইতে অনুমিত স্থায়িভাবের কোন প্রশ্নই উঠেনা। বিশেষতঃ রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত নায়কের পরিচিতিমূলক ধারণাকে কিরূপে শ্রেণীবিভাগের অযোগ্য বলা যাইতে পারে? কারণ যদি শেষপর্যন্ত ইহা বাধিত না হয়—ইহা ঠিক। কিন্তু যদি বাধিত হয়—তবে ইহা ভুল। চিত্রের উপমাও যুক্তিসহ নহে। কেননা আমরা যখন কোন চিত্র দেখি—তখন তাহাকে মৌলিক বস্তু বলিয়া মনে করিনা—পরন্তু মৌলিক বস্তুর সদৃশ মাত্র বলিয়া মনে করি।

সাংখ্যমতে সৌন্দর্যতত্ত্ব

সাংখ্যকারিকাতে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই জায়গায় উল্লেখ রহিয়াছে। একজায়গায় অভিনেতা যে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন—তাঁহার সঙ্গে অভিনেতার সম্বন্ধের স্বরূপ দেখান হইয়াছে। এই মতানুযায়ী অভিনেতা নায়কের অনুকরণ করেন না, পরন্তু তিনি নিজেই নায়ক হইয়া যান। অভিনেতার সঙ্গে নায়কের সম্বন্ধ স্থূলদেহের সঙ্গে সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধের অনুরূপ। একটি সূক্ষ্মদেহ ঠিক যেমন ভাবে একটি মানব বা জন্তু হইয়া যায়,[১] সেইরূপ নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনেতা নায়ক হইয়া যান।

অপরটি এই অভিমত প্রকাশ করে যে, সৌন্দর্যানুভূতির বেলায় অনুভবকর্ত্রী রজঃ ও তমোগুণ হইতে মুক্ত থাকেন। এবং এই কারণেই তিনি স্বার্থ-নিষ্ঠ ও উদ্দেশ্যমূলক ভাব হইতে মুক্ত থাকেন এবং গঠনমূলক জ্ঞান-ক্রিয়া হইতে মুক্ত (ক্যান্টের মত তুলনীয়) থাকেন। প্রকৃতি হইতে পুরুষের প্রভেদ উপলব্ধির পরে প্রকৃতিকে পুরুষ যেইরূপ জানেন, তিনিও সৌন্দর্যানুভূতির বস্তুকে ঠিক সেই ভাবেই জানেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উপস্থাপিত বিষয় শোকাবহ হইলেও সৌন্দর্যানুভূতি দুঃখ হইতে মুক্তির কারণ ইহা হইতে বুঝা যায়।

বেদান্তদর্শন মতে সৌন্দর্যতত্ত্ব

ভট্টনায়ক (খৃঃ ৮৮৩) বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সমস্যা সমাধানে চেষ্টিত হইয়াছেন। সৌন্দর্যানুভূতিতে অনুভবকারী ও অনুভবের বিষয় উভয়ই সাধারণীকৃত হইয়া যায়—সাংখ্যের এই মত তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠে, অনুভবকারী এবং অনুভবের বিষয়—এই উভয়েই কিভাবে সৌন্দর্যতত্ত্ব-মূলক স্তরে সাধারণীকৃত হইয়া যায়? সাধারণতঃ কাব্যের ভাষার ব্যবহারিক অর্থের ধারণা জন্মাইবার জন্য অভিধা নামক যে শক্তি আছে বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা ছাড়া তিনি আরও দুইটি শক্তি ধরিয়া লইয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সেই দুইটি হইল ভাবকত্ব এবং ভোজকত্ব। (১) ভাবকত্ব—লৌকিক জীবনে সৌন্দর্যানুভূতির বিষয়ীভূত বস্তুর অনুরূপ বস্তুর যে সকল সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে—ভাবকত্বশক্তি এই বস্তুটিকে সেই সকল সম্বন্ধ হইতে মুক্ত করিয়া লয় এবং এইভাবে ইহাকে সাধারণীকৃত করিয়া থাকে। (২) ভোজকত্ব—ভোজকত্বশক্তি সৌন্দর্যানুভূতির বিষয়ীভূত বস্তুর অনুভবকারী ব্যক্তির রজঃ এবং তমোগুণকে পশ্চাতে রাখিয়া সত্ত্বগুণকে প্রাধান্য দিয়া থাকে। যখন সাধারণীকৃত অনুভবকারীর সঙ্গে সাধারণীকৃত সৌন্দর্যানুভূতির বিষয়-বস্তুর সম্বন্ধ কিরূপ এই প্রশ্ন তোলা হয় তখন তিনি একটি নূতন জ্ঞানক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া উত্তর দিয়াছেন। এই ক্রিয়াকে পারিভাষিক কথায় 'ভোগ' বলা হইয়া থাকে। তাঁহার বক্তব্য নিম্নোক্তরূপে বিবৃত করা যায়—

যেহেতু উপস্থাপিত বিষয় সাধারণীকৃত হইয়া যায় সেইজন্য সৌন্দর্যানুভূতির স্তরে রজোগুণের ক্রিয়া থাকে না। এইজন্য ইহা কোন বাসনার উদ্রেকে সমর্থ হয় না বলিয়া দৈহিক এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতেও অসমর্থ। রজোগুণকে পশ্চাতে রাখিয়া সত্ত্বগুণকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এইজন্য তমোগুণ নিষ্ক্রিয়। অতএব উপস্থাপিত বিষয়ের একটা সাধারণ জ্ঞানের উদ্ভব হয়। জ্ঞানের অবস্থারূপেই ইহা ব্রহ্মের অনুভূতির অনুরূপ। কিন্তু ইহাতে ইচ্ছা বিষয়ক, মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক ক্রিয়াসমূহ থাকে না। কেননা ইহা একটি সীমাবদ্ধ অনুভূতি বলিয়া ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অনুভূতি ইহতে পৃথক্; যদিও অনুভূতির সময়ে এই সীমাবদ্ধতার জ্ঞান থাকে না। কেননা সাধারণীকৃত সৌন্দর্যানুভূতির বিষয়বস্তু সাধারণীকৃত সৌন্দর্যানুভবকারীকে প্রভাবিত করিয়া রাখে। ভট্টনায়কের মতে—সৌন্দর্যানুভূতি হইল—সত্ত্বগুণের প্রাধান্যহেতু সাধারণীকৃত সৌন্দর্যানুভবকারি-কর্তৃক সাধারণীকৃত সৌন্দর্যানুভূতির বিষয়ের পরিশুদ্ধ আনন্দাবস্থার অনুভূতি।

সৌন্দর্যানুভূতি যৌগিক বা রহস্যতত্ত্বের অনুভূতির অনুরূপ এই মত পাশ্চাত্যদেশে প্লোটিনাস পোষণ করেন।

কাব্যের ভাষার দুইটি শক্তিকে এবং একটি বিশেষ জ্ঞানক্রিয়াকে বিনা বিচারে মানিয়া লয় বলিয়া এই মত যুক্তিসহ নয়। তাহা ছাড়া ইহা বিরোধী মত সমূহের সহায়তায় এই অনুভূতির ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়া থাকে। কারণ সাংখ্য, বৈশেষিক ও যোগদর্শনের মতে ভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ কর্তৃকর্মসম্বন্ধ নিহিত থাকে, কিন্তু যতক্ষণ সীমাবদ্ধ কর্তৃকর্মসম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ আনন্দোৎপত্তি সম্ভব নহে।

কাশ্মীরশৈববাদে সৌন্দর্যতত্ত্ব

অভিনবগুপ্ত কাশ্মীরের অদ্বৈতশৈবদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, সর্বোচ্চ পর্যায়ে সৌন্দর্যানুভূতি হইল—আনন্দানুভূতি; কিন্তু তিনি ইহাও বলেন যে আনন্দ শুধু সত্ত্বের প্রাধান্য নহে। সাধারণীকৃত কর্তা ও কর্ম যে স্তরে থাকে ইহা সেই স্তর নহে। অলৌকিক স্তর—যাহা হইল আনন্দের স্তর ইহাকে তিনি সাধারণীভাবের স্তর হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাধারণীকৃত স্তরে সৌন্দর্যানুভূতির সাধারণীকৃত কর্তৃনিষ্ঠ ও কর্মনিষ্ঠ অবস্থানের জন্য দায়ী হইল নাটকীয় শিল্প। আর কাব্যের ভাষার দুইটি শক্তি ও একটি বিশেষ জ্ঞান-ক্রিয়াকে ধরিয়া লওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। তাঁহার অভিমত এই যে সৌন্দর্যানুভূতি শুধু হৃদয়াবেগঘটিত অনুভূতি নহে অর্থাৎ শ্রীশঙ্কুক সেইরূপ নাটকীয় বিভাগ, অনুভাব ও ব্যাভিচারিভাব প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন একটি স্থায়িভাবের অনুভূতিকে সৌন্দর্যানুভূতি বলিয়াছেন – ইহা সেইরূপ নহে। কিন্তু পানক-রসের উপাদান সমূহ সেইরূপ পরস্পর একীভূত হইয়া যায়—সেইরূপ রসের অনুভূতিতে পূর্বোক্ত ভাব সকল একীভূত হয়। তিনি মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখাইয়াছেন যে সৌন্দর্যানুভূতির বস্তু অনুকরণ নহে অথবা ইহা মায়ার সৃষ্টি করে না, ইহা প্রতিবিম্ব নহে এবং ইহা রসের উপাদানসমূহের যে কোন একটির উপ-স্থাপনাও নহে। তিনি বলেন যে ইহা অলৌকিক। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে সৌন্দর্যানুভবকারীর সত্তা লৌকিক সত্তা হইতে পৃথক্; এবং ইহা অনুভব কর্তার (১) রসিকত্ব, (২) সহৃদয়ত্ব, (৩) প্রতিভা, (৪) কাব্যানুশীলন, (৫) ভাবনা ও (৬) তন্ময়ীভাবে যোগ্যতার দ্বারা সম্ভব হইয়া থাকে। তিনি মনস্তত্ত্বের

দিক্ দিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিরূপে আমরা ব্যবহারিকস্তর হইতে (ক) ইন্দ্রিয়, (খ) কল্পনা, (গ) আবেগ, (ঘ) সাধারণিভাব, (ঙ) অলৌকিকত্ব প্রভৃতির সৌন্দর্যতত্ত্বনিষ্ঠস্তরে উন্নীত হই।

সৌন্দর্যানুভূতির মনোভাব

কোন নাটকের অভিনয়জাত সৌন্দর্যানুভূতির উদয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যে মানসিক প্রক্রিয়া তাহার আরম্ভ হয় প্রেক্ষাগৃহে নাটকাভিনয়দর্শনে যাওয়ার সংকল্প করার সঙ্গে সঙ্গে। লৌকিক জীবনের ব্যবহারিক ভাব হইতে এই ভাব পৃথক্। কেন না এই ভাবের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের যাহা সত্য তাহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। শব্দ ও দৃশ্যের স্বল্পস্থায়ী আদর্শজগতে মনের কিছুক্ষণ বাস করার প্রত্যাশার মধ্যেই ইহা নিহিত। এই মনোভাব নান্দী বা প্রারম্ভিক প্রার্থনাদৃশ্য আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের একাগ্রতাকে স্থির করিয়া দেয়।

নান্দী সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূত্রধার আসিয়া যে নাটকের অভিনয় হইবে তাহার নাম ঘোষণা করেন এবং দর্শকের মনে একটা আত্মবিস্মৃতির ভাব জাগাইবার জন্য নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করেন। তাহার পরে নায়ক বা অন্য কোন অভিনেতার আগমন ঘোষণা করিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। সঙ্গীতকলার দ্বারা যে আত্মবিস্মৃতি হয় অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে কালিদাস এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

মনের উপর এইরূপ প্রারম্ভিক দৃশ্যের কার্য সুস্পষ্ট। ইহা দর্শকের মনোভাব নির্ধারণ করিয়া দেয়। এই নির্ধারণের মধ্যে রহিয়াছে, (১) মনের স্থায়িভাবের উপস্থিতি-যে স্থায়িভাবের সাহায্যে তিনি সমগ্র নাটকীয় অভিনয় দর্শন করিবেন এবং (২) নাটকের কেন্দ্রীভূত নায়কের সঙ্গে নিজের একাত্মতা সম্পাদনের ও তাহারই চক্ষুকর্ণের মাধ্যমে নাটকীয় বিষয়োপলব্ধির প্রবৃত্তি।

তদাত্মতা সম্পাদনের প্রক্রিয়া

নাটকীয় বিষয়ের উপস্থাপনা তখনই আরম্ভ হয় যখন সৌন্দর্যলিপ্সু দর্শক নিজকে ভুলিয়া যান। অতএব নায়ক যখন একটি অতি হৃদয়গ্রাহী পরিবেশের মধ্যে তাঁহার শিল্পসঙ্গত আকৃতি লইয়া উপস্থিত হন ও মুখভঙ্গী এবং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তি করিয়া থাকেন, অভিনেতার স্বকীয়ত্বের কোন উপাদান সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় না। বর্তমান চেহারায় দর্শক অভিনেতাকে চিনিতে

পারেন না। বস্তুতঃ ইহা সর্বপ্রকারে ঐতিহাসিক আকৃতি। কিন্তু তিনিই যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এই ভাব সম্যক্‌রূপে জন্মিতে বাধা দেয় কাল এবং আরও কয়েকটি বিষয়। সুতরাং এই উপস্থাপনা কতকগুলি বিরোধী উপাদানের দ্বারা সংগঠিত।

তখন যে অবস্থা হয় তাহা এইরূপ: মনের প্রকৃতি এইরূপভাবে গঠিত যে যদি ইহা একবার একটি অবস্থার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাহাতে আনন্দ পায় তবে তাহার মধ্যে যাহা কিছু নীরস এবং বিরোধী তাহা উপেক্ষা করিয়া যায়। সুতরাং কোন একটি সৌন্দর্যানুভূতির উদ্দীপক পরিবেশের উপস্থাপনাকালে দর্শকের সৌন্দর্যনিষ্ঠ মনোভাব বর্তমান থাকায়—তাঁহার মন এই উপস্থাপনার মধ্যে যাহা বিরোধী তাহা অগ্রাহ্য করে এবং আর সব কিছু গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব উপস্থাপ্য বিষয়ের মধ্যে স্থান, কাল ও পাত্র এই তিনটি বিরোধী উপাদানকে চাপা দিয়া রাখায় অবশিষ্ট উপাদানগুলি শ্রোতৃবর্গের মনকে প্রভাবিত করে।

এইরূপে শ্রোতৃবর্গের দিকে আত্মবিস্মৃত সত্তা এবং উপস্থাপিত দৃশ্যে বর্তমান শারীরিক-মানসিক অবস্থা সমূহ একীভূত হইয়া একটা অবস্থার উদ্ভব করে, পারিভাষিক কথায় যাহাকে বলা হয়—তাদাত্ম্য।

তদাত্মতা হইতে কল্পনা

সাধারণ রীতি অনুসারে রঙ্গমঞ্চে নায়কের আবির্ভাব কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-বিহীন নহে। যেহেতু প্রত্যেক উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্ক থাকে—ইহাও স্বভাবতঃ একটা শারীরিক মানসিক অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অতএব দর্শক যখন নায়কের সঙ্গে একাত্ম হইয়া নাটকীয় অবস্থার সম্মুখীন হন– তখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই প্রবল হইয়া দাঁড়ায় এবং সৌন্দর্যতত্ত্বনিষ্ঠ উপভোক্তার নিম্নোক্ত উপাদানগুলির উদ্রেক করে।

(১) রুচি—ইহাদ্বারা উপস্থাপিত বিষয়ে শুধু মনোযোগ রক্ষিত হয় এমন নহে, পরন্তু এমন কোন ভাব যাহাদ্বারা দর্শকের মনে কোন ব্যক্তিত্বের চেতনা জাগিতে পারে—তাহাকে কিছুতেই প্রাধান্য দেয় না।

(২) প্রতিভা—(ক) চেতনকে অচেতন হইতে পৃথক্ করিয়া দেয় যে অস্পষ্ট বাধা প্রতিভা তাহাকে আংশিকভাবে দূর করে।

(খ) প্রদত্ত বিষয়ের সঙ্গে বাধার পশ্চাৎ হইতে প্রকাশিত বিষয়ের যোগসাধন করিয়া থাকে, (গ) এবং এইরূপভাবে গঠিত চিত্রকে বুদ্ধির পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে ও কল্পনাজগতের সৃষ্টি করে।

কল্পনা হইতে ভাবাবেগ

যখন সৌন্দর্যের উপভোক্তা তাঁহার প্রতিভাশক্তি ও বুদ্ধির পটভূমিকাদ্বারা সৃষ্ট কল্পনাজগতে থাকেন—তখন আর একটি মানসিক শক্তি—সহৃদয়ত্বের উদ্রেক হয় এবং তাহাকে প্রয়োজনে লাগান হইয়া থাকে। মনোবিষ্ট অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্য ও ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য—বিশিষ্ট চিত্র গঠনে সহায়তা করে। তদনন্তর উপযুক্ত সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক আবেগের স্তরে পৌঁছানো যায়।

ভাবাবেগ হইতে সাধারণীভাব

সাধারণীভাবের স্তর বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত মতের জন্য পাঠক—কাশ্মীর শৈবতত্ত্ব বিষয়ক অধ্যায়ের 'আভাসবাদের আলোকে সৌন্দর্যানুভূতি' নামক খণ্ড দেখিতে পারেন।

সাধারণীভাব হইতে অলৌকিকত্ব

রসগঙ্গাধরে জগন্নাথ সৌন্দর্যানুভূতি বিষয়ে অভিনব গুপ্তের একটি মতের কথা বলিয়াছেন এবং সেই মতের সঙ্গে তাঁহার নিজের মতের পার্থক্য দেখাইয়াছেন।

অভিনব একটি স্থায়িভাবের যথা রতির অনুভূতিকে সৌন্দর্যানুভূতি বলিয়াছেন এবং এই অনুভূতিতে অস্পষ্টতাবিধায়ক বাধাসমূহ হইতে যুক্ত সাধারণীকৃত আত্মা বা 'চিৎ'কে এই স্থায়িভাবের ধর্ম বলিয়াছেন। এই মত হইতে তাঁহার (জগন্নাথের) মতের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া তিনি জোরের সহিত বলেন যে সৌন্দর্যানুভূতিতে 'চিৎ' স্থায়িভাবের ধর্মরূপে বিরাজ করে না। পক্ষান্তরে ইহাই সত্তাবান্‌রূপে বিরাজ করে এবং স্থায়িভাব ইহার একটি ধর্ম। কিন্তু অভিনবগুপ্ত এইরূপ মত পোষণ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তিনি সুস্পষ্টরূপে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে 'চিৎ' সম্বন্ধে ধর্মি-ধর্ম সম্বন্ধের কথা বলা যাইতে পারে না। কেননা 'চিৎ' বস্তুনিষ্ঠ নহে, বহিরাগতও নহে। এমন কিছুই নাই যাহাকে ইহার সঙ্গে সমস্তরে স্থাপন করা যাইতে পারে এবং ধর্মি-ধর্ম সম্বন্ধ শুধু সেই সকল বস্তুর মধ্যেই থাকিতে পারে যেগুলিকে একসঙ্গে সমস্তরে স্থাপন করা যায়। অতএব 'চিৎ'কে স্থায়িভাবের ধর্মরূপে বর্ণনা করা ভুল। কেননা শেষোক্তটি (স্থায়িভাব) প্রথমোক্তটির ('চিৎ) সমপর্যায়ভুক্ত নহে।

অভিনবগুপ্ত তাঁহার মত সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে ইহা তাঁহার নিজস্ব মত।[8] (অস্মন্মতে তু সমবেদনম্ এবানন্দঘনম্ আস্বাদ্যতে) তিনি মনে করেন

সৌন্দর্যানুভূতি চরম স্তরে নির্মল আনন্দরূপে 'চিৎ'এর অনুভূতি। এই স্তরে নিরতিশয় অন্তর্মুখীকরণতা হেতু কর্তা ও কর্মরূপ দ্বৈত অদৃশ্য হইয়া যায় এবং স্থায়িভাব অবচেতন মনে পড়িয়া থাকে। কারণ তখন ইহা সর্বপ্রকারে উপেক্ষিত। তিনি স্বীকার করেন যে সাধারণীভাবের স্তরে সাধারণীকৃত 'ইহা', সাধারণীকৃত 'আমি'র স্থলে শোভা পায় কিন্তু ইহা ও বলেন যে তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হইল কাশ্মীরশৈববাদের চতুর্থতত্ত্ব—ঈশ্বরের স্তরে তাহাদের যে সম্পর্ক—সেই সম্পর্কের অনুরূপ।

কাব্য

নাট্যশাস্ত্রকারগণ কবিতাকে যদিও নাটকের পরিচারিকারূপে মনে করিতেন তথাপি আলঙ্কারিকগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ইহার একটি স্বতন্ত্র স্থান রহিয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের বহু সম্প্রদায় রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মতের পার্থক্য হইল—'কাব্যের আত্মা বা স্বরূপ কি'—এই সমস্যা সম্পর্কে। কাণ্ট্ এবং হেগেল শিল্প সম্বন্ধে ঠিক এই সমস্যারই সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—কাব্যের ধারণা ধীরে ধীরে গঠিত হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ভরত যে রসকে নাটকের আত্মা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—তাহাই কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। নাট্য-শাস্ত্রকারদিগের সঙ্গে আলঙ্কারিক-দিগের পার্থক্য শুধু কাব্যের সার সম্পর্কেই নহে, পরন্তু কাব্য যে অনুভূতি জাগায় তাহার সম্পর্কেও। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে ভামহ কাব্যানুভূতিকে 'রসাস্বাদ' না বলিয়া 'প্রীতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। তাঁহার মতে বক্রোক্তি অর্থাৎ একটি হৃদয়গ্রাহী ভাবকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তদনুরূপ হৃদয়গ্রাহিশব্দসমষ্টির মারফতে অভিব্যক্তিই—কাব্যের সার। এই বক্রোক্তি একটি সাধারণ অলঙ্কাররূপে স্বীকৃত।

সাহিত্যসমালোচনায় দণ্ডী অধিকতর অগ্রগামী একটি সম্প্রদায়ের মত উপস্থাপিত করেন। প্রাদেশিক কাব্যে তাঁহার অনুশীলন ছিল গভীরতর। তিনি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা দ্বারা (১) বৈদর্ভ ও (২) গৌড়ীয়—এই দুইটি মার্গের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি ভরতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং আলঙ্কারিক দশটি গুণই স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে বৈদর্ভমার্গের প্রাণস্বরূপ বলিয়াছেন। মাধুর্য নামক আলঙ্কারিক গুণ সম্পর্কে তাঁহার যে ধারণা তাহাতে মনে হয় সমস্ত কাব্য বিষয়ক উপস্থাপনাতে রসকে তিনি একটি প্রধান উপাদান বলিয়া দেখিয়াছেন।

কল্পনা হইতে ভাবাবেগ

যখন সৌন্দর্যের উপভোক্তা তাঁহার প্রতিভাশক্তি ও বুদ্ধির পটভূমিকাদ্বারা সৃষ্ট কল্পনাজগতে থাকেন—তখন আর একটি মানসিক শক্তি—সহৃদয়ত্বের উদ্রেক হয় এবং তাহাকে প্রয়োজনে লাগান হইয়া থাকে। মনোবিষ্ট অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্য ও ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য—বিশিষ্ট চিত্র গঠনে সহায়তা করে। তদনন্তর উপযুক্ত সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক আবেগের স্তরে পৌঁছানো যায়।

ভাবাবেগ হইতে সাধারণীভাব

সাধারণীভাবের স্তর বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত মতের জন্য পাঠক—কাশ্মীর শৈবতত্ত্ব বিষয়ক অধ্যায়ের 'আভাসবাদের আলোকে সৌন্দর্যানুভূতি' নামক খণ্ড দেখিতে পারেন।

সাধারণীভাব হইতে অলৌকিকত্ব

রসগঙ্গাধরে জগন্নাথ সৌন্দর্যানুভূতি বিষয়ে অভিনব গুপ্তের একটি মতের কথা বলিয়াছেন এবং সেই মতের সঙ্গে তাঁহার নিজের মতের পার্থক্য দেখাইয়াছেন।

অভিনব একটি স্থায়িভাবের যথা রতির অনুভূতিকে সৌন্দর্যানুভূতি বলিয়াছেন এবং এই অনুভূতিতে অস্পষ্টতাবিধায়ক বাধাসমূহ হইতে যুক্ত সাধারণীকৃত আত্মা বা 'চিৎ'কে এই স্থায়িভাবের ধর্ম বলিয়াছেন। এই মত হইতে তাঁহার (জগন্নাথের) মতের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া তিনি জোরের সহিত বলেন যে সৌন্দর্যানুভূতিতে 'চিৎ' স্থায়িভাবের ধর্মরূপে বিরাজ করে না। পক্ষান্তরে ইহাই সত্তাবানরূপে বিরাজ করে এবং স্থায়িভাব ইহার একটি ধর্ম। কিন্তু অভিনবগুপ্ত এইরূপ মত পোষণ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তিনি সুস্পষ্টরূপে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে 'চিৎ' সম্বন্ধে ধর্মি-ধর্ম সম্বন্ধের কথা বলা যাইতে পারে না। কেননা 'চিৎ' বস্তুনিষ্ঠ নহে, বহিরাগতও নহে। এমন কিছুই নাই যাহাকে ইহার সঙ্গে সমস্তরে স্থাপন করা যাইতে পারে এবং ধর্মি-ধর্ম সম্বন্ধ শুধু সেই সকল বস্তুর মধ্যেই থাকিতে পারে যেগুলিকে একসঙ্গে সমস্তরে স্থাপন করা যায়। অতএব 'চিৎ'কে স্থায়িভাবের ধর্মরূপে বর্ণনা করা ভুল। কেননা শেষোক্তটি (স্থায়িভাব) প্রথমোক্তটির ('চিৎ) সমপর্যায়ভুক্ত নহে।

অভিনবগুপ্ত তাঁহার মত সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে ইহা তাঁহার নিজস্ব মত।[৪] (অস্মন্মতে তু সমবেদনম্ এবানন্দঘনম্ আস্বাদ্যতে) তিনি মনে করেন

সৌন্দর্যানুভূতি চরম স্তরে নির্মল আনন্দরূপে 'চিৎ'এর অনুভূতি। এই স্তরে নিরতিশয় অন্তর্মুখীকরণতা হেতু কর্তা ও কর্মরূপ দ্বৈত অদৃশ্য হইয়া যায় এবং স্থায়িভাব অবচেতন মনে পড়িয়া থাকে। কারণ তখন ইহা সর্বপ্রকারে উপেক্ষিত। তিনি স্বীকার করেন যে সাধারণীভাবের স্তরে সাধারণীকৃত 'ইহা', সাধারণীকৃত 'আমি'র স্থলে শোভা পায় কিন্তু ইহা ও বলেন যে তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হইল কাশ্মীরশৈববাদের চতুর্থতত্ত্ব—ঈশ্বরের স্তরে তাহাদের যে সম্পর্ক—সেই সম্পর্কের অনুরূপ।

কাব্য

নাট্যশাস্ত্রকারগণ কবিতাকে যদিও নাটকের পরিচারিকারূপে মনে করিতেন তথাপি আলঙ্কারিকগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ইহার একটি স্বতন্ত্র স্থান রহিয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের বহু সম্প্রদায় রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মতের পার্থক্য হইল—'কাব্যের আত্মা বা স্বরূপ কি'—এই সমস্যা সম্পর্কে। কাণ্ট্ এবং হেগেল শিল্প সম্বন্ধে ঠিক এই সমস্যারই সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—কাব্যের ধারণা ধীরে ধীরে গঠিত হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ভরত যে রসকে নাটকের আত্মা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—তাহাই কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রকারদিগের সঙ্গে আলঙ্কারিক-দিগের পার্থক্য শুধু কাব্যের সার সম্পর্কেই নহে, পরন্তু কাব্য যে অনুভূতি জাগায় তাহার সম্পর্কেও। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে ভামহ কাব্যানুভূতিকে 'রসাস্বাদ' না বলিয়া 'প্রীতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। তাঁহার মতে বক্রোক্তি অর্থাৎ একটি হৃদয়গ্রাহী ভাবকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তদনুরূপ হৃদয়গ্রাহিশব্দসমষ্টির মারফতে অভিব্যক্তিই—কাব্যের সার। এই বক্রোক্তি একটি সাধারণ অলঙ্কাররূপে স্বীকৃত।

সাহিত্যসমালোচনায় দণ্ডী অধিকতর অগ্রগামী একটি সম্প্রদায়ের লক্ষ উপস্থাপিত করেন। প্রাদেশিক কাব্যে তাঁহার অনুশীলন ছিল গভীরতর। তিনি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা দ্বারা (১) বৈদর্ভ ও (২) গৌড়ীয়—এই দুইটি মার্গের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি ভরতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং আলঙ্কারিক দশটি গুণই স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে বৈদর্ভমার্গের প্রাণস্বরূপ বলিয়াছেন। মাধুর্য নামক আলঙ্কারিক গুণ সম্পর্কে তাঁহার যে ধারণা তাহাতে মনে হয় সমস্ত কাব্য বিষয়ক উপস্থাপনাতে রসকে তিনি একটি প্রধান উপাদান বলিয়া দেখিয়াছেন।

ওজঃ (শক্তিসম্পন্নতা) প্রসাদ (স্বচ্ছতা) কান্তি (ঔজ্জ্বল্য) প্রভৃতি দশটি আলঙ্কারিক গুণ সমন্বিত ভাষা সম্বন্ধীয় উপস্থাপনাবিধি বা রীতিতে বামনের আগ্রহ সর্বাধিক। তাঁহার অভিমত হইল যে রীতিই কাব্যের আত্মা।

কাব্যের গঠন সম্পর্কে কাব্য ও নাটক সম্বন্ধীয় আদর্শের বিরোধে উদ্ভটের মত সর্বশেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছায়। তাঁহার বিশিষ্ট অবদান হইল বৃত্তিসম্পর্কীয় ধারণা। তিনি আবিষ্কার করেন যে কোন একটি ভাবপ্রকাশে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অন্তর্গত বর্ণসমষ্টির ধ্বনি-মূল্য অভীপ্সিত প্রতিক্রিয়া জাগাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তিনি ভাবসমূহকে—(১) দীপ্ত (২) মসৃণ ও (৩) মধ্যম এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তদনুরূপভাবে তিনি বর্ণসমষ্টির ধ্বনিকে বিভক্ত করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে কোন একটি বিশিষ্ট ভাবপ্রকাশে বিশিষ্টপ্রকারের ধ্বনিসমূহের প্রাচুর্য গুরুত্বপূর্ণ। অলঙ্কারশাস্ত্রে আনন্দবর্ধনের মৌলিকদান হইল তাঁহার ধ্বনিবাদ। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া অভিনবগুপ্ত—প্রচলিত, লাক্ষণিক বা গৌণ এবং প্রাসঙ্গিক অর্থসমূহ হইতে ইহার পার্থক্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহিমভট্ট ধ্বনিবাদকে বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু রুয্যক তাঁহার সমালোচনার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

সঙ্গীতকলা

ভারতবর্ষে সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে কিংবদন্তী সামবেদে গিয়া পৌঁছায়। ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে যে সঙ্গীতপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার প্রকাশ সামবেদে। ইহা উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের প্রাচীনতম পদ্ধতি এবং ইহার লিখিত প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ইহার প্রধান প্রধান নীতিগুলি প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরে বর্তমানকাল পর্যন্তও অনুসৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য যে কোন সুকুমার কলা হইতে সঙ্গীতের আবেদন প্রশস্ততর। ইহা শার্ঙ্গদেব (খৃষ্টীয় ১২১০) তাঁহার সঙ্গীতরত্নাকরে ও নারদ তাঁহার সঙ্গীতমকরন্দে স্বীকার করিয়াছেন। শিব, ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, সরস্বতী ও নারদ সঙ্গীতপ্রিয় দেবতা বলিয়া বিশেষভাবে পরিচিত। দোলায় শয়ান শিশুর নিকটেও ইহার আবেদন রহিয়াছে। এমন কি হরিণ ও সর্পগণও ইহা দ্বারা মোহিত হয়।

স্বরসমূহের সঙ্গতিই হইল সঙ্গীতের মূলনীতি

স্বর (সঙ্গীতের ধ্বনি) বলা হয় এই জন্য যে শ্রবণকারীর মনে ইহা নিজেই মধুর। কিন্তু স্বরসমূহের সংযোগে উৎপন্ন হইলেও গীত সেইরূপ নহে। গীতের মধ্যে অনেক

সময় যে ঝাঁকুনি অনুভূত হয়—কোন একটি শ্রুতিকটু স্বরের বিদ্যমানতা অথবা স্বরসমষ্টির মধ্যে কোন একটি স্বরের অবশিষ্টের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যের অভাবই তাহার কারণরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই জন্য স্বরসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যের নীতিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। সঙ্গীত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকে আদর্শে পরিণত করে। সুরের ভিতর দিয়া ইহা বস্তুনিষ্ঠ বিভূতি প্রদর্শন করে না—পরন্তু বস্তুনিষ্ঠ দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের কম্পন ও গতি প্রদর্শন করে। সঙ্গীত এবং কাব্য উভয়েতেই ধ্বনি একটি আধ্যাত্মিক বস্তু প্রদর্শন করে। কাব্যে ধ্বনি একটি ভাবের চিহ্নমাত্র—আধেয়বস্তু নহে। সঙ্গীতে কিন্তু ধ্বনি কোন ভাব, অনুভূতি বা আবেগের চিহ্নমাত্র নহে। ইহা একটি স্বতন্ত্র বাহন। অতএব শিল্পসঙ্গতভাবে পরিণতিপ্রাপ্ত সুরের ধারাসমূহ সঙ্গীতের মুখ্য লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। সঙ্গীতে আভ্যন্তরীণ প্রাণ যদিও সুরের আধেয়বস্তুরূপে বিদ্যমান, তথাপি ইহা আধেয়বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন নহে। সুর চেতনাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আধেয় একটি অনুভূতি বা আবেগের সঙ্গে মিলিত হইয়া হৃদয়াবেগঘটিত সুরে অনুভূতির বস্তুনিষ্ঠ আকার রচনা করে।

নাদব্রহ্মবাদ

সঙ্গীতের দর্শন

সঙ্গীত কলাবিদ্যা এবং তাহার সম্পর্ক নাদ বা ধ্বনির সঙ্গে। তাই সঙ্গীতের দর্শনে ব্যাকরণ দর্শনের শব্দব্রহ্ম নাদব্রহ্ম নামে গৃহীত হইয়াছে। ইহা ভর্তৃহরি-সম্প্রদায়ের অনুগামী। তিনি পরা এবং পশ্যন্তীর মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। ভর্তৃহরি পশ্যন্তী এবং মধ্যমার মধ্যে যেরূপ পার্থক্য স্বীকার করিয়াছিলেন সঙ্গীতদর্শনে নাদ ও নাদব্রহ্মের মধ্যে সেইরূপ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। নাদ হৃদয়ে স্থিত এবং শ্রুতিসকল তাহার বহিঃপ্রকাশ। এই দর্শনের মতে নাদ নাদব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই দর্শনোক্ত নাদ ব্যাকরণ-দর্শনের স্ফোটের প্রায় সম্পূর্ণ অনুরূপ এবং স্ফোটের সঙ্গে শব্দব্রহ্মের যে সম্পর্ক নাদের সঙ্গে নাদব্রহ্মের ঠিক সেইরূপ সম্পর্ক। অতএব নাদই স্ফোট এবং মধ্যমস্তরে তাহার প্রকাশ। দিয়াসলাই-এর একটি কাঠির অন্তর্নিহিত শক্তিসম্পন্ন অগ্নি যেমন প্রত্যক্ষানুভূত শিখার হেতু—সেইরূপ হৃদয়গুহায় অবস্থিত কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য নাদ নাড়ীসমূহ ও অন্যান্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যহেতু বিভিন্ন শ্রুতিসমূহের কারণ হইয়া

থাকে। নাদ কার্যে রূপান্তরিত হইলে শ্রুতিসমূহের উদ্ভব হয়। শ্রুতির সঙ্গে নাদের সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের সঙ্গে অন্তর্নিহিত শক্তিসম্পন্নের সম্বন্ধ।

চরম তত্ত্বের প্রাপ্তির পক্ষে সঙ্গীত একটি মনোরম পন্থা বলিয়া এই দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রুতিসমূহ নাদের অব্যবহিত প্রকাশ বলিয়া স্বাভাবিক ভাবে ইহার প্রাপ্তির পথে লইয়া যায়। রশ্মিসমূহের সঙ্গে মণি যেরূপভাবে সম্বদ্ধ নাদের সঙ্গেও চরমতত্ত্ব সেইরূপ ভাবে সম্বদ্ধ। এবং এই জন্যই রশ্মিসমূহের সন্নিকটে উপস্থিতি যেমন মণিরই প্রাপ্তি ঘটাইয়া দেয়, সেইরূপ নাদপ্রাপ্তি, চরমতত্ত্বের প্রাপ্তির পথে লইয়া যায়।

এই সঙ্গীতদর্শন যোগদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। যোগদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে যে অনাহত নাদের ধ্যান পরমার্থপ্রাপ্তির উপায়। (অনাহতনাদ—হৃদয়ে নিত্য বর্তমান শব্দ যদিও ইহা ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। কিন্তু যোগী তাঁহার অন্তর্দর্শনক্ষম ধ্যানের দ্বারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন; মানবদেহের কেন্দ্রস্থিত অগ্নিতে প্রাণবায়ুর দ্বারা প্রদত্ত স্পন্দনে এই শব্দের উদ্ভব নহে)। ইহার অভিমত এই যে মুক্তির এই পথ দুরূহ। ইহা যোগের অভ্যাসসাপেক্ষ। অনাহত নাদ আরামপ্রদও নহে, সুন্দরও নহে। কিন্তু আহতনাদ (স্পন্দনজনিত শব্দ, যাহা ইচ্ছার ফলস্বরূপ) শ্রুতিসমূহের প্রকাশের মাধ্যমে চমৎকাররূপে গৃহীত হইতে পারে। যোগদর্শনে যেইরূপ বলা হইয়াছে, এই দর্শনেও মানবদেহে দশটি চক্র স্বীকৃত হইয়াছে; এবং ইহা এই মত পোষণ করে যে সুধাধার ও বিশুদ্ধি চক্রের কোন কোন অংশে প্রাণবায়ুকে সমাহিত করিলে সঙ্গীতানুষ্ঠানে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

সঙ্গীতদর্শনের অভিমত এই যে সঙ্গীতের ধ্বনিরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহনের মাধ্যমে চরমতত্ত্ব নাদব্রহ্মে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে। (এই প্রসঙ্গে হেগেলের মত তুলনীয়) সঙ্গীত মনোরম, কেন না ইহার মধ্যে হৃদয়গ্রাহী ধ্বনির মাধ্যমে পরমতত্ত্ব শোভা পায়। শ্রবণেন্দ্রিয় ও মন—এই উভয়ের কাছেই ইহার আবেদন রহিয়াছে। যে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই মনোরম নহে। সঙ্গীত সুন্দর কেন না মন উপলব্ধি করে যে সঙ্গীতের অভ্যন্তরে চরমতত্ত্ব শোভা পায়।

গীত বা সঙ্গীতের বেশে চরমতত্ত্বোপলব্ধিজাত সৌন্দর্য্যানুভূতির বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহাতে উপভোক্তা ও উপভোগের সম্পূর্ণ ঐক্য সম্পাদিত হয়। ইহার মধ্যে মন স্বাধীনভাবে আত্মধ্যানে নিযুক্ত এবং এইজন্যই ইহা অসীম এবং চরমতত্ত্বের স্তরে গিয়া পৌঁছায়। ইহা অপরোক্ষানুভূতি।

বাস্তু-শাস্ত্র

বাস্তু-শাস্ত্রের সম্পর্ক প্রধানতঃ নগর নগরী, গ্রাম, বৃহৎ প্রকোষ্ঠ, মন্দির এবং গৃহের নক্সা তৈয়ারী ও নির্মাণের কাজের সঙ্গে। অলঙ্করণের দৃষ্টিভঙ্গীতে মূর্তি ও চিত্রশিল্প লইয়া ও ইহার কাজ। এই শাস্ত্রে কাষ্ঠবিমান (আকাশ-গামী-দারুময়-বিমানযন্ত্র) দ্বাররক্ষার যন্ত্র (দ্বারপাল যন্ত্র) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রের কার্য্যসমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের নির্মাণের প্রক্রিয়া দেওয়া হয় নাই। ইহার অর্থ এই নহে যে উহা জ্ঞাত ছিল না, পরন্তু ঐগুলি গোপন রাখা হইত।[৫] হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদড়োর পুরাতত্ত্বঘটিত আবিষ্কারসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিয়া দেয় যে ভারতবর্ষে বাস্তুবিদ্যার ধারা খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসরের প্রাচীন।

স্থাপত্যশিল্প একটি বহিরঙ্গশিল্প কেননা ইহার সৃষ্টিসমূহের সঙ্গে আধ্যাত্মিকভাবের সম্বন্ধ বাহিরের দিক দিয়া; ভাব তাহাদের মধ্যে মূর্ত নহে। চিত্র এবং ভাস্কর্য্য আধ্যাত্মিকভাবকে অব্যবহিতরূপে প্রকাশ করে; পক্ষান্তরে স্থাপত্য শুধু তাহার পরিবেশ বা বিভাব সৃষ্টি করে।

বাস্তুব্রহ্মবাদ

স্থাপত্যশিল্পের দর্শন

স্থাপত্যশিল্পের প্রসঙ্গে এই ধারণা পোষণ করা হয় যে তত্ত্ববিদ্যার দিক্ দিয়া বাস্তুব্রহ্ম হইল প্রকৃত সত্তা। ইহা কেবল প্রকৃতির বিবর্তিত বস্তু-নিচয় বলিয়া স্বীকৃত সমস্তই সৃষ্টি করে এমন নহে পরন্তু ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহসমষ্টিও ইহার সৃষ্টি। যখন ইন্দ্রিয়যুক্তদেহের সৃষ্টিকর্তা তখন ইহাকে শরীরী বলিয়া মনে করা হয় এবং এই ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। স্থাপত্যশিল্পের প্রসঙ্গে এই সত্তাকে বাস্তুপুরুষ বলিয়া ধারণা করা হয়। স্থাপত্যশিল্পের সৃষ্টি জাগতিক বিন্যাসই দেখাইয়া থাকে। স্থাপত্যশিল্পের মূলনীতি—সজীবপদার্থের বিশেষ ধর্ম-সমন্বিত বিন্যাস, সঙ্গতি ও অনুপাতের নীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। স্থাপত্য আদর্শ দান করে। ইহা মর্ত্যে স্বর্গ উপস্থাপিত করে এবং বিস্ময় জাগায়। এইভাবে ইহা যে সৌন্দর্য্যানুভূতি উদ্রেক করে তাহাকে পারিভাষিক কথায়—'অদ্ভুত' বলা হয়।

মূর্তিকলা

মূর্তিকলা মর্মরপ্রস্তর, মৃত্তিকা, মণি, স্বর্ণ অথবা অন্য যে কোন ধাতুর মাধ্যমে একটি আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই

শিল্প ধর্মীয় ভাবসমূহ প্রদর্শনের ব্যাপারে নিয়োজিত। কোন নাটকের নায়ক যেমন সহৃদয় রসবেত্তার নিকট রস পরিবেশন করে ঠিক সেইরূপেই কঠিন পদার্থ হইতে ক্ষোদিত একটি প্রতিমূর্তি ভক্তের নিকট ধর্মীয় ভাব অভিব্যক্ত করিয়া থাকে এবং ভক্ত ইহা অবলম্বন করিয়া ধ্যানে রত থাকেন। এই প্রতিমূর্তি ভক্তের নিকটে ভক্তির পাত্রকে এমনভাবে উপস্থাপিত করে যেন ভক্ত তাঁহার সামনাসামনি বিদ্যমান আছেন। আধ্যাত্মিক ভাবোপলব্ধির ব্যাপারে ইহা একটি উপায় মাত্র। ইহা চেতনাতে প্রকাশিত ভাবের উদয়ে সহায়তা করে, কিন্তু স্মৃতিরূপে নহে—একটা কিছু সন্নিধিকররূপে।[৬]

চিত্র

চিত্রের কার্য বহির্ভাগের আয়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দৃশ্যবস্তুর মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া চিত্র দৃশ্যবস্তুকে বিশিষ্ট করিয়া তোলে। মনে যে কোন অনুভূতি বা উদ্দেশ্য উদ্দীপ্ত হইয়া উঠুক না কেন—তাহা চিত্রের বিষয়ীভূত হইতে পারে। দেহঘটিত পরিবর্তনের দ্বারা যেমন আন্তরসত্তার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে—চিত্র তেমন আন্তরসত্তার একটা মুহূর্তের অভিব্যক্তি করিয়া থাকে। কিন্তু নাটকে চারিপ্রকার অভিনয়ের সাহায্যে উপযুক্ত পরিবেশে ইহার সমস্ত প্রধান অবস্থার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। অতএব চিত্রসম্বন্ধীয় সমস্ত গ্রন্থ ভরতের মতানুসারী এবং ভরত আঙ্গিকাভিনয় অর্থাৎ হস্তসঙ্কেত ও মুখভঙ্গী প্রভৃতির দ্বারা মনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রদর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন এই সকল গ্রন্থে প্রায় তাহাই বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে রসদৃষ্টির উপস্থাপনা প্রসঙ্গেই রসের কথা বলা হইয়াছে। আঙ্গিকাভিনয়ে ভরতের মতসমূহ যে অনুসৃত হইত তাহার প্রমাণ অজন্তাগুহায় চিত্রিত একটি নৃত্যরতা বালিকা। এই চিত্রের মস্তক ও গ্রীবা ভরতের মতের অনুকার্য ভাবেরই রূপায়ণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য ঃ

১। সাংখ্যকারিকা, ৫৬-৭।
২। ঐ ৭৭।
৩। ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাবৃত্তি বিমর্শিনী ১ম খণ্ড ১৪৭।
৪। অভিনবভারতী ১ম খণ্ড ২৯৩।
৫। সমরাঙ্গণ সূত্রধার ১ম খণ্ড ১৭৫।
৬। ঐ ২য় খণ্ড ২৬৬।

গ্রন্থপঞ্জী

অভিনবভারতী
ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাবৃত্তি বিমর্শিনী
সাংখ্যকারিকা
সমরাঙ্গণ সূত্রধার
(তুলনামূলক আলোচনার জন্য)
বোসাঙ্কে : হিস্টরি অব এস্থেটিক্‌স্
অ্যাডিসন, জোসেফ : ওয়ার্কস্ ৩য় খণ্ড
কাণ্ট : ক্রিটিক্ অব জাজ্‌মেণ্ট্ (জে. এইচ. বার্নার্ডের ইংরাজী অনুবাদ)
ইঙ্গে, ডব্লিউ, আর : দি ফিলজফি অব প্লটিনাস্ ২য় খণ্ড ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ঐস্লামিক চিন্তাধারার বিকাশ

হর্ষের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি যুগের অবসান চিহ্নিত হইয়াছিল, এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্য সৃষ্ট ভারতের পরিবর্তে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবাদচিহ্নিত ভারতের উদ্ভব হইয়াছিল। উত্তরাঞ্চলে পরবর্তী তিনশত বৎসরের ইতিহাসে দেখা গেল উচ্চাভিলাষপরায়ণ রাজবংশগুলির কর্তৃত্বে পরস্পরের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামশীল স্বাধীন সামন্তরাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা। এই সমস্ত শাসকদের অধিকাংশই ছিলেন বিভিন্ন রাজপুত বংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলপতিগণ, যাঁহারা ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন আগন্তুক উপাদান। তাঁহাদের প্রভাবাধীনে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটিয়া গেল, যাহার অনিবার্য পরিণতিতে প্রাচীন পূজাপদ্ধতি এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড, আইন এবং ব্যবহারিক বিধি, ভাষা এবং শিল্পকলা সমস্তই রূপান্তরিত হইয়া গেল।

দাক্ষিণাত্যে এবং দক্ষিণদেশে অবশ্য ইতিহাস এতখানি বিক্ষোভময় হইয়া উঠিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ যদিও সেখানে ঘটিয়া গিয়াছে, তবু উত্তরাঞ্চলে যেমন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল, সেরূপ সেখানে হইতে পারে নাই। প্রায় পাঁচশত বৎসরের মধ্যে সেখানে কোন শক্তিমন্ত বিপ্লব দেখা দেয় নাই বলিয়া সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ণই ছিল।

কিন্তু দশম শতাব্দীর পরে উত্তরাঞ্চলে, এবং আরও দুইশত বৎসর পরে দক্ষিণ-দেশে মুসলমান শাসনাধিকার বিস্তৃত হইবার ফলে রাজনৈতিক পট দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া গেল। কিন্তু এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সামাজিক বিধিব্যবস্থা, ব্যক্তি মানবের জীবনভঙ্গী এবং সংস্কৃতির সাধারণ রূপটি মোটামুটি অপরিবর্তিতই ছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবে দেশে একটি নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ, মুসলমানদের আগমনের পূর্বে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে আক্রমণ পরিচালনা করিলেও ভারতীয় সমাজ-দেহে তাহারা দ্রুতগতিতে লীন হইয়া গিয়াছিল। সেক্ষেত্রে নবাগতগণ শুধু প্রখর ব্যক্তিত্বচিহ্নিত ধর্মমত লইয়াই অনুপ্রবেশ করে নাই, পূর্ববর্তীগণ হইতে পৃথক্ ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া

তাহারা তাহাদের আদিভূমির সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। ভারতীয় মুসলমানদের সহিত পশ্চিম এশিয়ায় তাহাদের স্বধর্মীদের সম্বন্ধবন্ধন ঘনিষ্ঠই ছিল, এবং ঐস্লামিক দেশগুলি ও ভারতবর্ষের মধ্যে ভাবপ্রবাহ এবং সংস্কৃতিধারা অবিচ্ছেদে বহিয়া চলিয়াছিল। এই সম্বন্ধবন্ধনকে জিয়াইয়া রাখিবার পক্ষে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ উভয়প্রান্তেই পণ্ডিত ব্যক্তিরা ধর্ম ও বিদ্যাচর্চার ভাষা হিসাবে ফার্সী এবং আরবী ভাষারই প্রয়োগ করিতেন।

মধ্যযুগে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষে, এবং বিশেষভাবে দক্ষিণাঞ্চলে, চিন্তার প্রাচীন ধারা প্রবল বেগে বহমান ছিল, এবং সংস্কৃতভাষা ও তাহার আধারে প্রকাশিত জ্ঞানরাজি আপন প্রাণশক্তিকে অক্ষুণ্ণ ভাবেই রক্ষা করিয়াছিল।

এইভাবে সংস্কৃতির দুইটি ধারা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের জলরাশির মিশ্রণে একটি অভিনব সংস্কৃতির উত্থান ঘটিল। শিল্পকলা এবং কারুকর্মের ক্ষেত্রে এই মিলন এমন পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিয়াছিল যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির চিহ্ন সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্মে বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক-সাধারণের একই কথ্য ভাষা ছিল, এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির বিবর্তনে সহ-যোগিতা করিয়া উভয় সম্প্রদায়ই সেই সব ভাষায় সাহিত্যের বিকাশ সাধনে নিজস্ব অবদান যুক্ত করিয়াছে। দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে হিন্দু এবং মুসলমান মনীষীদের মধ্যে নানা জ্ঞান-সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন রক্ষণশীল, তাঁহারা ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠা রক্ষা করিতে যত্নবান্ ছিলেন ; কেহ কেহ পরস্পরের ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অন্য সকলে দুইটি ধারার মধ্যে সমন্বয়ের পথ সন্ধান করিয়াছিলেন।

বৈচিত্র্যে ও ভাবোৎকর্ষে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের চিন্তার ইতিহাস বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে, এবং নানা তত্ত্বপন্থার উদ্ভবের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। হিন্দু চিন্তা-ধারা প্রধানতঃ প্রাচীন শ্রুতি-নিরুক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত সত্যের প্রমাণেই আপন যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহাতে তাহার মৌলিকতা প্রভূত পরিমাণে খর্ব হইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যাসূত্রেই সম্প্রদায়-স্রষ্টাগণ দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্বশাখার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে দার্শনিক তত্ত্বগুলি প্রধানতঃ শিক্ষণীয় সূত্রসার হিসাবেই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা এবং ষড়্দর্শন—মধ্যযুগীয় হিন্দুতত্ত্বের এই আকরগ্রন্থগুলি সাধারণ অর্থে দর্শন এবং ধর্ম বিষয়কগ্রন্থ বলিতে

যাহা বুঝায় তাহা নহে। এগুলিতে অবশ্য সিদ্ধান্তসমূহ আছে, কিন্তু যে যুক্তিপথে তাহাদের উদ্ভব, সে সম্পর্কে অন্ততঃ প্রাচীনতর গ্রন্থগুলিতে বিশেষ কিছু ব্যাখ্যাত হয় নাই। বিচারশীল যুক্তি অপেক্ষা দিব্যজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টিই যেন ছিল প্রজ্ঞার উপায় স্বরূপ।

মধ্যযুগের তাত্ত্বিকগণ এই আকরগ্রন্থগুলিকেই তাঁহাদের ভিন্নপন্থার বিচ্ছেদস্থান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব এবং বল্লভ প্রভৃতি মহান্ আচার্যগণ শাস্ত্রগ্রন্থগুলির উপরে, বিশেষতঃ বাদরায়ণের বেদান্তসূত্রের উপরে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, এবং সূত্রমর্ম ব্যাখ্যার প্রসঙ্গেই আপন আপন বিশেষ মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

আচার্যগণ এইভাবে যে ধর্মচিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার পরম পরিণতি দেখা গেল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠায় এবং প্রচারে। ইহার উদ্ভব দক্ষিণাঞ্চলে, এবং ইহার মহান্ নেতৃগণের অধিকাংশই ছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী। এই বিশেষ সময়ে এই বিশেষ অঞ্চলে তাঁহাদের আবির্ভাব একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কিছু পরিমাণে তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এবং কিছুটা চিন্তার স্বাভাবিক বিকাশধারা অনুসারে ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঐস্লামিক ইতিহাসের সূচনাকাল অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দী হইতেই মুসলমানগণ ভারতীয়দের সহিত দক্ষিণ উপকূলে সংযোগ সাধন করিয়াছিল, এবং এই অঞ্চলের জীবনযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবার মত সুযোগ অর্জন করিয়াছিল।

আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই ঘটনা-সংযোগের কোনও প্রভাব ছিল কি না তাহা একান্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে প্রমাণ করা যায় না বটে, কিন্তু সেকালের ধর্ম-সংস্কারকদের চিন্তাভঙ্গীর মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিল যাহা ঐস্লামিক প্রত্যয় ও সাধনক্রমেরই প্রতিরূপ বলিয়া মনে হয়।

যে সংযোগ ইস্‌লামের ইতিহাসের আদিকাল হইতেই স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান শাসকদের অধিকারে ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তির কাল পর্যন্ত ক্রমাগত বর্ধিত হইয়া চলিয়াছিল। এই কয় শতাব্দী ধরিয়া মুসলমান সাধু, পণ্ডিত এবং সুফীগণ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের ভারতজাত শিষ্যগণের সহিত মিলিয়া ইস্‌লামপন্থী চিন্তার অগ্রনায়কগণের রচনাসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, নিবন্ধ

প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং অধ্যয়ন ও অনুশীলনের জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে মুসলমান দর্শনের ইতিহাস বিদেশে ইহার ক্রমবিকাশের সহিত অবিচ্ছিন্ন ধারায় যুক্ত, সুতরাং ভারতের অবদান বিচার করিতে হইলে ইহার ভারতীয় বিবর্তনের পূর্বেকার বিকাশ কাহিনী অনুসরণ করা প্রয়োজন। হিন্দু-দর্শনের মত ঐস্লামিক তত্ত্বের মূলটিও শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যেই নিহিত, এবং কোরাণ তাহার উৎসমুখ। ইস্‌লামের পূত গ্রন্থটি একটি দার্শনিক নিবন্ধ নয়, এবং যদিও ইহাতে মুস্‌লিম ধর্মমত, মৌলপ্রত্যয়, এবং সুনীতিতত্ত্ব, আইন ও সমাজবিধির মুখ্য আদর্শগুলি সংকলিত আছে, তথাপি সেগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করাহয় নাই, বরং এমন ভাষাভঙ্গিতে সে বিষয়গুলি উপস্থাপিত হইয়াছে, যাহাতে বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকিয়া যায়।

রাজনৈতিক সংঘর্ষ, ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের স্বার্থ এবং নানা জাতি ও নানা সভ্যতা হইতে আগত ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণের মনোধর্মের ফলস্বরূপ প্রাচীনতম যুগ হইতেই কতকগুলি দল এবং সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কখনও কখনও নির্যাতন এবং রক্তপাতসহ প্রচণ্ড মত-সংঘাত দেখা দিয়াছিল।

অন্যপক্ষে প্রাচীন খলিফাশাসিত রাজ্যটি ছিল বিভিন্ন পুরাকালীন সভ্যতার মিলনভূমি। পশ্চিম এশিয়ায় ছিল ইহুদী, গ্রীক, হেলেনীয়-পন্থী, রোমান এবং খৃষ্টান সংস্কৃতির অনেকগুলি কেন্দ্র, আবার পূর্বাঞ্চল ছিল পারসিক, বৌদ্ধ এবং হিন্দু সংস্কৃতির আগার। প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল্, প্লটিনাস ও ফিলো, জরথুস্ত্র ও মনি, এবং মহাযান ও বেদান্তের দ্বারা মুস্‌লিম তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রভাবিত হওয়া অনিবার্য ছিল।

কোরাণের সারতত্ত্বটি সরল। ঈশ্বরস্বরূপের অদ্বয়বাদ, মানুষের একান্ত ঈশ্বর নির্ভরত্ব এবং প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন বিচারই ইহার কেন্দ্রীয় তত্ত্ব। কিন্তু ইহার প্রত্যেকটিতেই বহুলপরিমাণে দুর্বোধ্যতা আছে। প্রেরিত পুরুষের সাঙ্গোপাঙ্গগণ (সাহাবা) বাণীপ্রেরক ও তাঁহার বাণীর এত নিকটবর্তী ছিলেন যে, প্রকাশিত বাণীকে যুক্তিদ্বারা স্থাপন করিতে তাঁহারা মোটেই সম্মত ছিলেন না। কিন্তু অনুগামীদের (তবিয়ুন) মধ্যে সংশয় দেখা দিল, এবং লোকে ঈশ্বরের প্রকৃতি ও মানবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্ন তুলিতে লাগিল। কোরাণের বাণী কি চিরায়ত, শুধু তাহার লিপিক্রমই কি কাল-লাঞ্ছিত? মানুষের ইচ্ছাশক্তি অভিপ্রায়ে এবং কর্মে কি বন্ধহীন? সৎ কি, অসৎ কি, কি ভাবে এবং কেনই তাহাতে দণ্ড-পুরস্কারের ভাগ নির্দিষ্ট হয়?

মুক্ত ইচ্ছাশক্তির সমস্যা হইতে দুইটি পরস্পর-বিরোধী তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, ঈশ্বরের শাশ্বত নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী দল (জবরীয়া), এবং মানব ইচ্ছার স্বাধীন কর্তৃত্বে বিশ্বাসী দল (কদরীয়া)। যাঁহারা ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা মানিতেন, তাঁহারা নিজেদের 'ঐশ্বরিক অভেদ এবং ঐশ্বরিক ন্যায়পরতার অনুপন্থী দল' (আহ্‌লাল তৃহীদ ওয়াল আদ্‌ল্) নামে পরিচয় দিয়া একটি নূতন সম্প্রদায়ে পরিণত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা মু'তাজীলা (দলত্যাগী) নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের ন্যায়নীতি অনুক্রমে মানবগণ ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের স্বাধীনতা উপভোগ করিবে। কিন্তু অল্পকাল পরেই ধর্মতত্ত্বের গভীরতর সমস্যাগুলি দেখা দিল। ঈশ্বর যদি ন্যায়পরায়ণ হন, তবে ন্যায়পরতা কি তাঁহার স্বরূপসত্তা হইতে পৃথক্ কোন ঐশ্বর্য ? ঐশ্বর্যাবলী যদি শাশ্বত এবং স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট হয়, তবে ঈশ্বরসত্তার অদ্বয় পরিচয় বর্জন করিতে হয়, কিন্তু মু'তাজীলা-পন্থীরা ছিলেন অদ্বয়-বাদের অনমনীয় প্রবক্তা, এবং সেই কারণেই তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর স্বরূপই একমাত্র শাশ্বত সত্তারূপে গণ্য হইতে পারেন, ঐশ্বর্য কেবল তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বিক্ষেপমাত্র। অধিকন্তু অদ্বয়তত্ত্বের সুকঠোর প্রয়োগের ফলে এইরূপ সিদ্ধান্তই গড়িয়া উঠে যে, কোরাণকে শাশ্বত বলিয়া গণ্য করা অসঙ্গত। কারণ তাহা যদি হয়, তবে অনাদি সত্তার দ্বৈততা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মু'তাজীলা আন্দোলনে ইহাই প্রমাণ করিবার প্রয়াস ছিল যে, কোরাণের শিক্ষা যুক্তির নির্দেশকে অতিক্রম করে নাই। ইহার সূত্রপাত হয় ওয়াসিল বিন অতা হইতে, যিনি ম্যানিকী-পন্থা হইতে আগত দ্বৈততত্ত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছিলেন। এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, ওয়াসিল এবং তাঁহার বন্ধুগণ সুমনীয় (বৌদ্ধ) দিগের সহিত আলোচনা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আব্বাস-পন্থী খলিফাদের মধ্যে কেহ কেহ এই আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন, এবং মামুন (৮১৩-৩৩ খৃঃ অঃ) তাঁহাদের মতের বিরোধীদের নির্যাতিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আব্বাস-পন্থীদের শাসনশক্তির হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন গতিবেগ হারাইয়া ফেলিল।

মু'তাজীলা-পন্থীরা অবশ্য চিন্তার প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহাদের মধ্য হইতে তিনটি বিভিন্ন তত্ত্বপন্থার উদ্ভব হইয়াছিল। মু'তাকল্লমীন্‌গণ (বিচারবাদীগণ, শাস্ত্রপ্রমাণবাদীগণ), যাঁহারা ধর্মশাস্ত্রীয় মতকেই যুক্তিপ্রয়োগে সমর্থন করিতে প্রয়াসী ছিলেন, ফ'লাসীফা বা হুকামাগণ (দার্শনিকবর্গ), দর্শনশাস্ত্রের নানা সমস্যাবিচারে যাঁহাদের আগ্রহ ছিল এবং গ্রীক চিন্তাধারা দ্বারা যাঁহারা

বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন, এবং সুফীগণ (মরমিয়াগণ), যাঁহারা আত্মার ধর্মকে অনুসরণ করিতে ও ঈশ্বরোপলব্ধির লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে মানবসাধারণকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

সমস্ত পন্থার মনীষীরাই উপায় অথবা লক্ষ্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়া দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই দার্শনিকচিন্তার উন্নয়নে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রত্যেক শ্রেণী হইতেই প্রসিদ্ধ চিন্তানায়কগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের পারস্পরিক মতবিরোধই বিচার-বিশ্লেষণ ও নূতন চিন্তাপদ্ধতির উন্মেষের অনুকূলে প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিল।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় লেখকগণের মতই ঈল্‌মে-কালাম (শাস্ত্রবিচার) বিষয়ে লেখকগণ শাস্ত্রবচনের পক্ষে দার্শনিক সমর্থন সংগ্রহ করিতে যত্নপর ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মু'তাজ্জীলা-পন্থীরা ছিলেন পূর্বতন কালের এবং আশরী-পন্থীরা পরবর্তী কালের। পূর্বে বলা হইয়াছে, মু'তাজ্জীলা-পন্থী মনীষীরা ছিলেন চূড়ান্ত একেশ্বরবাদী। কিন্তু ঈশ্বরস্বরূপ ও তাঁহার বিভূতি সম্পর্কে যে আধ্যাত্মিক সমস্যার ফলে তাঁহাদিগকে 'পরবর্তীকালের বহুদেবতাবাদের বহিঃসীমা' স্পর্শ করিতে হইয়াছিল, তাহা ব্যতীত, অন্তরের সংযম ও অনুশাসনের প্রতি প্রবণতায় এক সর্বাতিশায়ী বিধানের বহিরঙ্গ কাঠিন্যকে প্রশমিত করিবার পথ তাঁহারাই রচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

ঈশ্বরপ্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাসূত্রে তাঁহারা যে জগদ্ব্যাপারের প্রকৃতি, ইহার জন্মকথা এবং স্থিতি সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় দার্শনিক সমস্যার সম্মুখীন হইবেন, তাহা নিশ্চিত ছিল। সহজেই বোঝা যায় যে তাঁহারা এই মতেরই অনুবর্তী হইবেন যে, ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, এবং ঈশ্বরের প্রসাদেই বস্তুর অস্তিত্ব, সুতরাং জগৎ অথবা বস্তুরূপ কিছুই চিরন্তন নয়। প্রকৃতপক্ষে বস্তু (জাওজর্‌) কতকগুলি গুণের (আরজ্‌) সমবায় মাত্র, এবং ব্রহ্মাণ্ড অমিত-সংখ্যক প্রাথমিক বস্তু-উপাদান বা পরমাণুর (জাওহার্‌ উল্‌ ফারদ্‌) গ্রন্থনে রচিত।

এই সমস্ত আলোচনা হইতেই পরবর্তী পর্যায়ের কলামের উদ্ভব হইয়াছিল, যাহা মু'তাজ্জীলা-পন্থীদের যুক্তিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। ইহার ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে সবচেয়ে মুখ্য ছিলেন আশরী (জন্ম ৮৭৩ খৃঃ অঃ)। যে যুক্তিবাদ ধর্মের উপর দর্শনের আধিপত্য স্থাপন করিয়া শেষ নিষ্পত্তি করে তিনি সেই যুক্তিবাদকেই একমাত্র আশ্রয় না করিয়া, বরং আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, দিব্যজ্ঞান এবং ধর্মবিশ্বাসের সাহায্যে শাস্ত্রবচনকে সমর্থন করিবার উপায় সন্ধান করিয়াছিলেন। ঐতিহ্যবাদী (উলামায়ে

নকল) এবং যুক্তিবাদীদের (উলামায়ে আকল) মাঝামাঝি একটি মধ্যপন্থা তাঁহারা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মু'তাজীলা-পন্থীরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের নিত্যতার তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদের মতে ঐশ্বর্য তাঁহার অখণ্ড স্বরূপেরই অঙ্গীভূত ; আশরী-পন্থীরা কিন্তু সেই তত্ত্বের প্রতিই সমর্থন জানাইয়াছিলেন। স্বাধীন ইচ্ছার প্রশ্নটিতে তাঁহাদের অভিমত ছিল এই যে, যদিও অভিপ্রায় এবং কর্মের প্রথম সূচনা ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারিত বিষয়, তথাপি মানুষ কোন কর্মকে সম্পূর্ণ করিবার যোগ্যতা অর্জন (কাসৃব্) করিতে পারে। ঈশ্বরপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর সকল পরিণামের অতীত ধ্রুব অস্তিত্ব, তাঁহার সত্তা (য়ুজুদ্) এবং স্বভাব (মাহীয়াত্) ঐক্যরূপপ্রাপ্ত, এবং তিনি আপন সত্তার আধারেই তাঁহার ঐশ্বর্যাবলী ধারণ করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্তাধীন (মুমকিন্), যেমন সর্তাধীন বস্তু এবং গুণ উভয়েই। সকল গুণই চৈতন্যাশ্রিত সম্বন্ধ মাত্র, এবং যেহেতু গুণ-সংশ্লেষ ছাড়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই সম্ভব নয়, অতএব বস্তুর জগৎ মায়াপ্রপঞ্চময়, 'চৈতন্যের সুসম্বদ্ধ প্রকাশ মাত্র'। নিয়তই ঈশ্বরের ইচ্ছায় যাহার সৃষ্টি এবং লয় হইতেছে, এমন অদৃশ্য উপাদান বা পরমাণুর সমবায়ে গঠিত হইয়াছে বস্তু এবং তাহার অনিত্য গুণাবলী। প্রতিটি পরমাণুর প্রকৃতিই সরল, তাহার ব্যাপ্তি নাই, পরিমাণ নাই, তাহার অনিত্য গুণাবলী হইতে তাহার বিচ্ছেদও নাই। কিন্তু অনিত্য গুণাবলী হইতেছে কতকগুলি সম্ভাবনামাত্র, এবং সৃষ্টি তাহাদেরই কার্যরূপের আভাস। অতএব কেবল ঐশী ইচ্ছায় বিরাজিত পরমাণুসমূহ নিয়ত অস্থির। আকারমাত্রই পরমাণুর সমষ্টিবিশেষ। ব্যোম এবং কালও পরমাণুজাত, কারণ ব্যোম হইতেছে শূন্য (খ়লা)—পরিচ্ছিন্ন অসংখ্য অণুপুঞ্জ, এবং কাল হইতেছে সময়-ছিদ্রের দ্বারা বিশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মুহূর্তের মালা। বস্তুজগৎ এবং মনোজগতের সকল ঘটনাই ব্যোম এবং কালকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াশীল পরমাণুর কার্য।

ব্রহ্মাণ্ডের পারমাণবিক ব্যাখ্যাটি ঈশ্বর সম্পর্কে কোরাণ-তত্ত্বেরই নিশ্চিত পরিণতিস্বরূপ। কারণ ঈশ্বর যদি সর্বাত্মক হন, এবং তাঁহা হইতে ভিন্ন সত্তা যদি কিছু না থাকে, তবে তাঁহার ইচ্ছাই হইবে স্বরাট্, কোন নিয়ম বা বাধ্যতার অধীন নহে। তিনি সর্বক্ষম। শূন্য হইতে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। সকল পরিবর্তন এবং জঙ্গমতার উৎস তিনি, এবং প্রাকৃত কারণবাদ বলিয়া কিছু নাই। কোন বিধান নাই, ঘটনামাত্রই এক পরমাশ্চর্য অতিলৌকিক সংঘটন। প্রাকৃত জগৎ মায়াবন্ধে রচিত।

বাকিল্লাজি (মৃত্যু ১০১৩ খৃঃ অঃ), ফখ্রুদ্দীন রাজী (মৃত্যু ১২২২ খৃঃ অঃ), সইফুদ্দীন আমদী (মৃত্যু ১২৩৩ খৃঃ অঃ) এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারা আশরী-পন্থী কলাম পরিবর্ধিত হইয়াছিল। আশরী-র সমসাময়িক, হানাফ-পন্থী কলামের প্রতিষ্ঠাতা মাতুরীদী (মৃত্যু ৯৪৪ খৃঃ অঃ) অনেক বিষয়ে আশরী-র সহিত মত পার্থক্য পোষণ করিতেন। পরবর্তীকালে ইবন্ তইমীয় (মৃত্যু ১৩২৮ খৃঃ অঃ) আশরীয় শাস্ত্রানুগত্যকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং আপন বিচারবাদী পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইবন্ তইমীয় ছিলেন নব উদ্ভাবনের (বীদা) পরম দ্বেষী, তিনি ছিলেন কোরান এবং হদীথের আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাসী একজন যথার্থবাদী। নররূপ-ঈশ্বর-তত্ত্ববাদী (মুতাশাব্বীহা) হিসাবে তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরের বিভূতি মানুষেরই অনুরূপ, এবং অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড সমালোচনাকারী বিতর্ক-প্রবণ লেখক ছিলেন। তাঁহার ভাবধারা উগ্র বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ সমেত দূর দূর দেশগুলিতে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের মনীষিগণ, যাঁহারা হুকমা বা ফলাসিফা নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সর্বাগ্রে বিজ্ঞান এবং দর্শনেরই অনুরাগী ছিলেন, যদিও বারবার একথা বলার প্রয়োজন নাই যে, আধুনিক চিন্তাশীলেরা দর্শন এবং ধর্মশাস্ত্রের যে পার্থক্য নির্দেশ করেন, ঐস্লামিক চিন্তার সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। কলামের ক্ষেত্রে এমন দেখা গিয়াছে যে, বাস্তব প্রয়োজনবশেই আরবগণ বিজ্ঞান এবং দর্শনের চর্চা সুরু করিয়াছিলেন। আরবদের বিজয় অভিযানের ফলে পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া এবং মিশর তাহাদের অধিকারে আসিল। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ইস্লাম ধর্মের শিবিরে আনিতে আরবদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল না। কিন্তু সময়ক্রমে তাহাদের বৃহৎ সংখ্যক অংশ ব্যক্তি-শুল্ক হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের ধর্মান্তরগ্রহণের ফলে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সমর্থকদের মধ্যে মতবিরোধ এবং বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাচীনতর সভ্যতাসমূহ হইতে আগন্তুক ধর্মান্তরিতগণ তাহাদের ভিন্নতর পরিবেশ হইতে আনীত ভাবধারা অনুসারেই নূতন ধর্মমতের মর্মব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছিল।

বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তির সম্মুখীন হইবার জন্য এবং ধর্মান্তরিতদের সংশয় নিরস্ত করিবার জন্য অপর পক্ষগুলির ব্যবহৃত দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিসমূহ এবং তাহাদের দার্শনিক ধারণাগুলি গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। গ্রীক, পারসিক এবং ভারতীয়

চিন্তায় ওতপ্রোত এক পরিবেশ হইতেই মু'তাজীলা-পন্থী তত্ত্বসমূহের যাত্রা সুরু হইয়াছিল, এবং মুঅম্মর (আনুমানিক ৮৫০ খৃঃ অঃ) নজ্জম (আনুমানিক ৮৪৫ খৃঃ অঃ), এবং আবু হাসিম (মৃত্যু ৯৩৩ খৃঃ অঃ) প্রভৃতি তাহাদের নেতাগণ মিশ্রমতবাদসমূহ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

ভারতীয়, গ্রীক এবং সিরীয় গ্রন্থগুলির আরবী অনুবাদ হওয়ায় তত্ত্বদর্শনের নূতনতর প্রেরণা সৃষ্টি হইয়াছিল। আব্বাস-পন্থী খলিফাগণ জ্ঞান-সাধনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং তাঁহারা স্বয়ং যে বুদ্ধিবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার সমর্থন সংগ্রহের জন্য তাঁহারা উন্মুখ ছিলেন। মামুন নিজের চারিপাশে অনেক পণ্ডিতকে সমবেত করিয়াছিলেন, এবং আলোচনা, অনুবাদ ও সংকলন কার্যের জন্য একটি জ্ঞানসভা (বায়তুল্ হীকমাত্) স্থাপন করিয়াছিলেন।

গ্রীক ভাষা হইতে অনুবাদকারীদের মধ্যে ছিলেন এ্যারিষ্টট্ল্ ও প্লেটোর রচনার আরবী অনুবাদক হুনাইন (৮০৯-৭৩ খৃঃ অঃ) এবং তাঁহার পুত্র ইশাক (৮৭০-৯১০ খৃঃ অঃ)। অন্যান্য অনুদিত গ্রন্থগুলি ছিল: আলেকজাণ্ডারের আফ্রোদিসিয়াসের ও পরফিরিয়াসের টীকাসমূহ, এবং প্লটিনাসের এন্নিয়াডের কিছু অংশ। অল্ কিন্দী (মৃত্যু আনুমানিক ৮৭৩ খৃঃ অঃ), ফারাবি (মৃত্যু ৯৫০ খৃঃ অঃ), ইখ্বান-অল্-সফা (পবিত্র ভ্রাতৃগণ, আনুমানিক ৯৭০ খৃঃ অঃ), ইবন্ মস্কওয়াইব্ (মৃত্যু ১০৩০ খৃঃ অঃ) এবং ইবন্ সীনা (মৃত্যু ১০৩৭ খৃঃ অঃ), ইঁহারা ছিলেন প্রাচ্যদেশে মুস্লিম দর্শনের ইতিহাসে খ্যাতনামা পুরুষ।

আরব দার্শনিকেরা গ্রীকদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন একথা সত্য হইলেও ভারতের নিকট তাঁহাদের ঋণের কথা অস্বীকার করিলে ভুল হইবে, এবং তাঁহাদের নিজস্ব মৌলিকতার পরিচয় অগ্রাহ্য করিলেও ব্যর্থচেষ্টা হইবে। এ্যারিষ্টটলের রচনাবলী সম্বন্ধে যদিও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল অসম্পূর্ণ, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্ত, এবং এমন সব ভাব-ধারণাকে তাঁহারা তৎ-প্রণীত বলিয়া মনে করিতেন, যাহা আসলে নব্য-প্লেটোনীয়দের বিষয়, তবু তাঁহারা নিজেদের এ্যারিষ্টট্লের শিষ্য বলিয়াই মনে করিতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা প্লেটোর রিপাব্লিকের সহিত পরিচিত ছিলেন, কিন্তু এ্যারিষ্টট্লের পোলিটিক্স্-এর সন্ধান তাঁহারা রাখিতেন না।

আরব দার্শনিকদের প্রত্যেকের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করার পরিবর্তে তাঁহাদের মুখ্য ভাব-ধারণাগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। অল্-কিন্দী হইতে পরবর্তী সময়ে যে দুইটি প্রধান দর্শনশাখায় তাঁহাদের আগ্রহ ছিল, তাহা হইতেছে

পরাবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব। উভয় শাখাতেই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, গ্রীক এবং অন্যান্য দার্শনিকদের নিকট হইতে যে ভাববস্তুগুলি তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইস্‌লামের উগ্র একেশ্বরবাদী আকৃতির সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন করা।

পরাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ অদ্বয়ত্ব এবং বহুত্বের সমস্যাই মুস্‌লিম দার্শনিকদের মনোযোগ অধিকার করিয়াছিল। ঈশ্বর অদ্বয়, ইহাই কোরানের উপদেশ। তিনি মহান্ এবং শক্তিমান্, তিনি বিশ্বের স্রষ্টা, দ্যাবাপৃথিবীর অধীশ্বর, প্রকৃতি-জগৎ তাঁহারই আজ্ঞার অধীন, তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই আবিঃ এবং তিনিই গূঢ়। চিন্তা ও কল্পনার অতীত তিনিই অদ্বিতীয় সত্য। এই ঐশ্বর্যগুলির তাৎপর্য এবং গুরুত্ব কি? একদল বিশ্বাস করিতেন যে, এগুলি মানবিক গুণাবলীর অনুরূপ, তাঁহারা ছিলেন নররূপ-ঈশ্বর-বাদী (মুতাশাব্বীহা)। অন্যদল মনে করিতেন, ঈশ্বরের ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক গুণাবলী আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার গুণের প্রকৃতি মানব-গুণাবলী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; ইঁহারা ছিলেন কঠোর শাস্ত্রবিশ্বাসী ধর্মতাত্ত্বিকদল (সীফাতীয়া)। মুতাজিল-পন্থীগণ ঐশ্বরিক অদ্বয়তত্ত্বের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার বিভূতিসমূহ বর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন উদার মতবর্জনকারীদল (মু'আত্তীলা)। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন দার্শনিকগণ। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর হইতেছেন নিশ্চয়াত্মক আদি সত্তা, এবং অন্যান্য সকল সত্তার উৎপত্তি-কারণ তিনি। তিনি সৎ, অহেতুক তাঁহার সত্তা। তাঁহার সত্তা জড়মুক্ত এবং আকারবিহীন। তাঁহার সত্তাই তাঁহার স্বরূপ। তিনি অদ্বিতীয় এবং পূর্ণ—মহত্ত্বে, সৌন্দর্যে এবং স্বরূপে তিনি পূর্ণ। তিনি অনির্ণেয় এবং অবিভাজ্য।

ঈশ্বরের স্বরূপশক্তির বাহিরে তাঁহার কোন ঐশ্বর্য নাই। তিনিই বুধ, তিনিই বুদ্ধি তিনিই বোধ্য। তাঁহার বুদ্ধি আপনাকে অতিক্রম করিয়া অন্য কোন বোধোপায়ের উপরে নির্ভর করে না। তিনিই জ্ঞান, তাঁহার জ্ঞান অন্য কোন বহিরঙ্গ বিষয়ের অপেক্ষা রাখে না। তিনিই জ্ঞাতা, কারণ তিনি চিন্ময়, জ্ঞানই তাঁহার স্বরূপ। সত্য, জীবন এবং অমেয় আনন্দ তিনি। ঈশ্বরই প্রেম।

কোরান নানা নামে ঈশ্বরকে বিশেষিত করিয়াছে। এরূপ সুন্দর নামের নিরানব্বইটি সেখানে উল্লিখিত আছে। দার্শনিকদের মতে এই নামগুলির অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর-প্রকৃতি একটি যৌগিক বিষয়, অথবা তাঁহার ঐশ্বর্যাবলী তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন। অদ্বয়ত্ব এবং অবিভাজ্যতাই ঈশ্বর-প্রকৃতির স্বরূপ-পরিচয়।

কিন্তু সত্য যদি অদ্বয় হয়, তবে বিশ্বের বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা কি? এক কিভাবে বহু হইয়াছে? ঈশ্বর যদি কেবল আত্মচিন্তা-নিবিষ্ট চিচ্ছক্তি হন, অথবা যদি

স্বয়ং অচল হইয়াও গতির প্রেরক হন, তবে তাঁহার একান্ত নির্জনতা হইতে কে তাঁহাকে বাহিরে আকর্ষণ করে? স্রষ্টা কেনই বা সৃষ্টি করেন?

মুস্লিম দার্শনিকদের উত্তর এই যে, এই সৃষ্টি, অনেকাত্মক এই জগৎ, ইহা ঈশ্বরেরই প্রসাদ (ফায়জ্)। তাঁহার ঐশী প্রসাদেই তিনি সৃষ্টিলোকে প্রবেশ করেন। তাঁহার অনাদি চিচ্ছক্তিই তাঁহা হইতে ভিন্ন অপর সকল সত্তার সৃষ্টি-কারণ। তাঁহার ভাবনাই তাঁহার কৃতি। নিসর্গ-স্বভাব সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানই নিসর্গ-শৃঙ্খলার মূল।

এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে দুটি মৌলিক তত্ত্বের প্রয়োগ আছে। প্রথমতঃ এক পূর্ণ অদ্বয় সত্তার মধ্য হইতে অনধিক একটি সত্তাই আবির্ভূত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সত্তার দুইটি লক্ষণ আছে, হয় তাহা নিশ্চয়াত্মক (য়ুাজীব্), নয় তাহা সম্ভাব্য (মুমকিন্); হয় তাহা স্বরূপ (আ-ইন্), অথবা তাহা সত্তা (য়ুজুদ)। একমাত্র ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই স্বরূপ এবং সত্তা একীভূত, অন্য সকল সত্তার ক্ষেত্রে অস্তিত্ব হইতে স্বরূপ ভিন্ন, যাহার অর্থ এই যে, সকল যথার্থ সত্তাই স্বরূপতঃ সম্ভাব্য এবং স্রষ্টার কার্যেই তাহারা নিশ্চয়াত্মক হয়। অতএব সকল সত্তার মধ্যেই দ্বৈতত্ব বর্তমান।

নিশ্চয়াত্মক সত্তা হইতে প্রথম উৎপত্তি সংখ্যায় একটিমাত্র, তাহা হইতেছে প্রথম বুদ্ধি। একদিক দিয়া ইহার অস্তিত্ব আত্ম-স্বভাবে সম্ভাব্য, এবং প্রথম সত্তার সম্বন্ধযোগে তাহা নিশ্চয়াত্মক; অন্য দিকে ইহা আপন স্বরূপকেও জানে, আবার প্রথম সত্তার স্বরূপকেও জানে। ইহার দ্বৈত অস্তিত্ব—সম্ভাব্য ও নিশ্চয়াত্মক, অতএব ইহা বহুত্বের উৎস-স্বরূপ। প্রথম বুদ্ধির ত্রিবিধ জ্ঞান আছে—প্রথম সত্তার জ্ঞান, আপন নিশ্চয়াত্মক স্বরূপের জ্ঞান এবং ইহার সম্ভাব্য সত্তার জ্ঞান, সুতরাং প্রথম বুদ্ধি হইতে তিনটি সত্তার আবির্ভাব হয়: দ্বিতীয় বুদ্ধি, প্রথম আত্মা এবং প্রথম নক্ষত্রলোক। দ্বিতীয় বুদ্ধি হইতে আবির্ভূত হয় অপর এক বুদ্ধি, দ্বিতীয় জ্যোতির্লোক এবং তাহার আত্মা। এইভাবে আবির্ভাব-ক্রম চলিতে চলিতে অবশেষে দশম বা সর্বশেষ বুদ্ধির সহিত আবির্ভূত হয় চন্দ্রের নবম লোক ও তাহার আত্মা। সর্বশেষটিই মানব-আত্মার এবং যে চারিটি ভৌতিক পদার্থ হইতে সমগ্র জীবকুল সৃষ্ট, তাহার উদ্ভবের কারণ।

দশটি বুদ্ধির আবির্ভাবে একটি স্তর-পরম্পরার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথম বুদ্ধি প্রথম সত্তার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, ইহার স্থানই সর্বোচ্চে, এবং অন্য সকলের অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। এক-কেন্দ্রিক ক্ষেত্রসমূহের বিন্যাসে সর্বশেষে যাহার স্থান,

সেই জড়বস্তু হইতে ইহা সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী। পৃথিবী এই বিন্যাসের কেন্দ্র, এবং তাহা গতিহীন। আটটি গ্রহলোক পৃথিবীকে ঘিরিয়া আবর্তিত হইতেছে, এবং নবম ক্ষেত্রের বাহিরে আছে তুঙ্গতম স্বর্গ অথবা নিশ্চল তারকার মহালোক। ক্ষেত্রসমূহ নিয়ত চক্রপথে আবর্তিত হইতেছে। ক্ষেত্রের আত্মাই ক্ষেত্রকে চালিত করে, কিন্তু আত্মা তাহার চালক-শক্তি সংগ্রহ করে সেই ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত বুদ্ধি হইতে। প্রথম সত্তাই সমস্ত ক্ষেত্রগুলির মূল চালক, কারণ দশটি বুদ্ধিই তাঁহার অভিমুখে আনত, তাঁহার নিকট হইতেই তাহারা আকার এবং পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং বুদ্ধিসমূহ প্রথম সত্তার প্রতি যে আকর্ষণ পোষণ করে, তাহাতেই বিশ্ব সচল হয়। ঈশ্বরের প্রেমই বিশ্ব-সঞ্চালক আদিম গতি।

সর্বনিম্ন লোকের দশম বুদ্ধিটি জ্যোতির্লোকগুলির আবর্তনে কোন সাহায্য করে না। এই বুদ্ধিটি আমাদের জগতে সক্রিয়। অন্যান্য দিব্য এবং লৌকিক বুদ্ধিসমূহ হইতে প্রাপ্ত আকার যে গ্রহণ করে, সেই নিষ্ক্রিয় এবং প্রথমতম জড়বস্তুকে (হায়ুলা) ইহা উৎপন্ন করে। যে চারিটি ভৌতিক পদার্থের যোগ-বিয়োগে সমগ্র বস্তু পদার্থের জন্ম এবং জরাপ্রাপ্তি ঘটে, প্রথমতম জড়বস্তুটি তাহার ভিত্তি-স্বরূপ। কিন্তু ক্ষেত্রসমূহের নিয়মবদ্ধ শৃঙ্খলা ও ঐশ বিধানের ক্রম অনুসরণ করিয়াই এই সকল রূপান্তর সংঘটিত হয়।

নিসর্গ-নিয়মের বিধিবদ্ধতার অর্থ এই যে, সমস্ত বস্তুর গতিপথই পূর্বনিয়ন্ত্রিত। যাহা অনিযন্ত্রিত বলিয়া মনে হয়, তাহার সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষ কারণগুলি আমরা জানি না বলিয়াই ঐরূপ বোধ আমাদের মনে জাগে।

দশম বুদ্ধি বা সক্রিয় বুদ্ধিই (আকূল ফাআল্) আকারসমূহের স্রষ্টা (ওয়হীবুল্ মাওার) ইহা যেমন প্রত্যেক জড়বস্তুকে তাহার আকৃতি দান করে, তেমনই প্রত্যেক আকৃতি যখন আত্মা লাভের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন তাহাদের আত্মা দান করে। আত্মা এক সরল অবস্তু পদার্থ, এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য আকারসমূহকে ইহা অধিগত করিতে পারে। ইহা অদ্বিতীয়, অজর এবং অমর। মানবসত্তার সমগ্র তত্ত্বই ইহাতে বিধৃত। বিভিন্ন তারতম্যের দুঃখ-সুখ অভিজ্ঞতার অবসানের পর এবং দেহের মৃত্যুর পরও ইহা উদ্বৃত্ত থাকে।

আত্মার নানা কর্ম, অবস্থা ও গুণ (কুয়া) আছে। সক্রিয় বুদ্ধিই আত্মার আধ্যাত্মিক মূল, তাহার দিব্য লক্ষণস্বরূপ। মানব-বুদ্ধিকে ইহা উজ্জ্বল এবং ক্রিয়াশীল করিয়া তোলে। ইহা যেন প্রসুপ্ত দর্শনক্ষমতা-সম্পন্ন দৃষ্টির কাছে সূর্যের আলো। যখন সূর্যালোক ছড়াইয়া পড়ে, তখন যে দর্শনশক্তি প্রসুপ্ত ছিল,

তাহা সক্রিয় হয়। দেহের সঙ্গে আকারের যে সম্বন্ধ, মানব-বুদ্ধির সহিত সক্রিয় বুদ্ধির সম্বন্ধ সেইরূপ।

মানব-বুদ্ধি তিনটি স্তর-পরম্পরা সমন্বিত। সর্বনিম্ন স্তরে আছে উদ্ভিদ্‌ধর্মী আত্মা, আহরণ, পুষ্টি এবং প্রজনন যাহার কার্য; উচ্চতর স্তরে আছে পশুধর্মী আত্মা, যাহার দুইটি লক্ষণ—প্রত্যক্ষবোধ এবং চরিষ্ণুতা। প্রত্যক্ষবোধের ভাগে পাঁচটি বহিরঙ্গ এবং পাঁচটি অন্তরঙ্গ ইন্দ্রিয়শক্তি আছে (সংবেদন, প্রত্যক্ষানুভূতি, ধারণা, কল্পনা এবং স্মৃতি); সর্বোচ্চ স্তরে আছে বুদ্ধিধর্মী আত্মা, যাহার একটি ফলিত বিভাগ এবং একটি তত্ত্বপ্রধান বিভাগ আছে। হর্ষ, শোক, হাস্য প্রভৃতি আবেগ-প্রধান অবস্থাগুলি ফলিত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। তত্ত্বপ্রধান বিভাগটি চার পর্যায়ে বিভক্ত: (১) প্রসুপ্ত বুদ্ধি (আকলে হ্বায়ুলানী), অর্থাৎ মানুষের বোধের সহায় যে বুদ্ধিশক্তি; (২) অভ্যাসগত বুদ্ধি (আকলে বীল মালাকা), যে বুদ্ধি জ্ঞানের তত্ত্ববিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত; (৩) কর্মঠ বুদ্ধি (আকলে বীল ফীইল), বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়সমূহে যাহার প্রয়োগ; এবং (৪) অর্জিত বুদ্ধি (আকলে মুস্‌তাফা'দ), বা সক্রিয় বুদ্ধি আকার-নির্মাতার দানস্বরূপ যাহা লব্ধ।

মানব-বুদ্ধি বা আত্মার চারিটি পর্যায় মিলিয়া জড়বস্তু এবং আকারসমূহের একটি ক্রমারোহী স্তর-পরম্পরা গড়িয়া তোলে। প্রসুপ্ত বুদ্ধি দৃশ্যমান্ জগৎ হইতে সংবেদনগ্রাহ্য তথ্যগুলি গ্রহণ করে, অভ্যাসগত বুদ্ধি এবং কর্মঠ বুদ্ধি সংবেদনের তথ্য হইতে যথার্থ বোধের বিষয়গুলি সংগ্রহ করে, তখন জড়মুক্ত আকাররূপে যাহা বস্তুর মধ্যে প্রসুপ্ত অবস্থায় ছিল, তাহা বুদ্ধির জগতে প্রকট হইয়া উঠে, এবং বুদ্ধি-দ্বারা আয়ত্ত বিষয়রূপে চিন্তার অঙ্গীভূত হইয়া যায়। বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক বিষয়গুলি অবশ্য জড়বস্তুতে প্রসুপ্ত অবস্থায় ছিল; অর্জিত বুদ্ধি বোধির সাহায্যে সেই রূপাতীত আকারসমূহ আয়ত্ত করে, সংবেদনগ্রাহ্য তথ্যের সহিত যাহার সম্পর্ক নাই। মানবদেহাশ্রিত মানব-বুদ্ধির বিবর্তন সাধিত হয় সক্রিয় বুদ্ধির দ্বারা, যাহা বিশুদ্ধ আত্মা।

তৃতীয় তত্ত্বপন্থাটির উদ্ভব হইয়াছিল মরমিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই তত্ত্বপন্থার উদ্ভব সন্ধান করা যাইতে পারে কোরানের মধ্যে, যেখানে মরমী তাৎপর্য-সূচক কতকগুলি শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু মরমিয়া তত্ত্বের প্রতি প্রবণতাবিশিষ্ট মুসলমান-দের প্রাচীনতম দলগুলি ছিল বৈরাগ্য-ধর্মী সম্প্রদায়, যাঁহারা ধ্যানে ও আরাধনায় নিঃশেষে মগ্ন থাকিবার জন্য মর্ত্ত্য প্রলোভন হইতে মুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিতেন। তাঁহারা প্রবল আধ্যাত্মিক আবেগের দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন, এবং ধর্মীয়

নির্দেশের অনুসরণ ও ধর্মীয় ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান অপেক্ষা অন্তরের সংযম এবং পবিত্রতার উপরেই তাঁহারা অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। বুদ্ধির জগতে কিছু আবেদন আনিলেও যে দার্শনিক যুক্তিজাল তাঁহাদের ধর্মীয় নির্ভরতার আকুল আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিতে পারে না, শুধুমাত্র তাহা লইয়াই তাঁহারা তৃপ্ত ছিলেন না।

ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের কয়েকজন সঙ্গী, যাঁহারা সন্ন্যাসী (জ়্হ্হা'দ), ধর্মপ্রচারক (কাস্ সাস্), তাপস (শকৃকাউন), শুদ্ধসত্ত (নাস্মাক্) প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা আত্মপীড়নে এবং ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া নির্জনে বাস করিতেন। পাপ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে একটি জাগ্রত চেতনা ছিল এবং ঐশ প্রতিবিধান সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে প্রচণ্ড আতঙ্ক ছিল, এই দুই মনোভাবই যিনি মহান্ সচেতক, সেই ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের প্রেরণাময় উপদেশ হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল। অতঃপর অষ্টম শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ হইতে সুফী নামটি ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইস্লামের দ্বারা যাহা আদিষ্ট (আম্র্) এবং যাহা নিষিদ্ধ (নাহী) ছিল, তাহা প্রথম যুগের সুফীগণ নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলিতেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবনাদর্শ ছিল ত্যাগ, আত্মবঞ্চনা এবং দারিদ্র্য। উপবাস ও ঈশ্বরের সহিত আদান-প্রদানের (জ়ীক্র্) মধ্য দিয়া তাঁহারা অতিসাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। মরমিয়া পন্থা (তারিকা) অনুসরণ করিয়া যে ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরমিলন সম্ভব হয়, একথা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন।

যে পথ (তারিকা, সুলুক্) অনুসরণ করিয়া লক্ষ্যলাভ বা ঈশ্বরের সহিত মিলন হয়, সুফীদের পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবন হইয়া উঠিয়াছিল সেই পথে যাত্রার (সাফ্র্) মত। যাত্রার নানা পর্যায় আছে, এবং প্রতিটি পর্যায়ে (মাকাস্) অর্জিত পুণ্যের প্রকৃতি অনুসারে সমানুপাতিক অবস্থাসমূহ (হা'ল) আছে। পথের পথিকের পক্ষে কতকগুলি নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে যাহা দক্ষ ব্যক্তিরা জানেন। এই জ্ঞান (মাআবি ফাৎ) অবশ্য সাধারণ জ্ঞান হইতে ভিন্ন, কারণ ইহা যেমন অন্তরের জ্ঞান (ঈল্মুল কলুব্) অপরটি তেমনই বুদ্ধির প্রয়োগ-সঞ্জাত বস্তু, এবং ঈশ্বর-প্রসাদের (ফায়জ) বিশেষ চিহ্ন (ফাওয়েদ্) ছাড়া কেহই ইহা লাভ করিতে পারে না। এই জ্ঞানের লক্ষ্য মহাজাগতিক চেতনা ও সিদ্ধদৃষ্টি লাভ করা এবং পরম সত্যের সহিত আনন্দময় মিলনে তন্ময়তা উপভোগ করা।

আদি যুগের সুফীগণ ক্রমশঃ তাঁহাদের উপদেশের মধ্য দিয়া এই ধারণাগুলি প্রচার করিয়াছিলেন ; যেমন, ধুল নুন মিস্রী বা মা'রিফতের তত্ত্ব ; বয়াজিদ বিস্তামী

প্রচারিত ফণার তত্ত্ব; খর্‌রাজ প্রচারিত আইন উল্‌-জমার তত্ত্ব; ব্যক্তিতে দেবভাবারোপ বা মানুষেরঐশ-স্বভাব সম্পর্কিত মনসুর অল্‌-হল্লাজ কর্তৃক প্রচারিত তত্ত্ব।

৯২২ খৃষ্টাব্দে মনসুরের প্রাণদণ্ডের পরেই পদ্ধতীকরণের যুগ আরম্ভ হইয়াছিল এবং অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আবু নসর্‌ উল্‌ সর্‌রাজ লিখিত 'কিতাব উল্‌ লুমা', কলাবাধী রচিত 'কিতাব উল্‌ তাআরুফ', মক্কী রচিত 'কুত উল্‌ কুলুব', সুলমী রচিত 'তবকাত্‌ উল্‌-সুফীয়', ইস্‌বহানি রচিত 'তবকাত্‌ অল্‌ আসফীয়', কুশইরী রচিত 'রিসাল কুশইরীয়', হুজ্বীরী রচিত 'কশফুল মজ্‌হুব' প্রভৃতি তাহার নিদর্শন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তসব্বুফ এমনভাবে মুসলমানদের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের চিন্তাই ইহার দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রথম সূচনায় যাহার প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত ঘটিয়াছিল, তাহাই শেষে প্রতিষ্ঠিত মতবাদের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। ইমাম ঘজালী (১০৫৮-১১১১ খৃঃ অঃ) যিনি ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিকরূপে, ইস্‌লামের প্রমাণ (হুজ্‌জাতুল ইস্‌লাম) রূপে, গণ্য হইয়াছেন, ইহা বিশেষভাবে তাঁহারই কৃতিত্বের ফল। দর্শনশাস্ত্রের গভীর এবং ব্যাপক অনুশীলনের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে, ইহা অপূর্ণ এবং অতৃপ্তিকর, এবং যে সন্দেহরাশি হৃদয়কে পিষ্ট করে, তাহার অবসান করিয়া, জীবনের সঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় আশ্বাস এবং আস্থা একমাত্র ব্যক্তিগত উপলব্ধি, আত্মপ্রভা এবং বিমলানন্দই দান করিতে পারে। তিনি মরমিয়াবাদের সহিত ঐস্‌লামিক উপদেশের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন. এবং শাস্ত্রমত ও ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যুক্তিবাদী পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়াছিলেন। চিত্ত যথার্থভাবে সংযত থাকিলে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যস্থতা ছাড়াই যে ধর্মজ্ঞান বা গুহাহিত তত্ত্বকে লাভ করা যায়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যের উপরে যে ঐহিক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, এই দুই প্রকারের জ্ঞানের পার্থক্যের ভিত্তিতেই তাঁহার মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মজ্ঞান বা নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষণের জন্য প্রয়োজন ধর্মবিধির নির্দেশ (শারীয়াত্‌) পালন করা, অনুতাপ (তাওবা), ত্যাগ (ফাকর্‌), দেহ-পীড়ন (তাজকিয়ায়ে নফস্‌), নির্ভরতা (তাওয়াকল), ঐক্যের (তওহীদ্‌) পথ অনুসরণ করা, এবং যে যোগ (জীকর্‌) ও ধ্যান (মোরাকাবা) পরিশেষে তত্ত্বপ্রভা ও বিমলানন্দ সৃষ্টি করে, তাহা সাধন করা। এইভাবে পথযাত্রীর সমগ্র সত্তাই রূপান্তরিত হয়, বাসনা এবং আবেগ প্রশমিত হয়, জাগতিক বিষয়সমূহ

হইতে মুক্ত হইয়া চেতনা ঈশ্বরে নিবিষ্ট হয়, এবং সর্বশেষে মরমী সাধক সিদ্ধদৃষ্টি-লাভে ধন্য হন, যাহাতে তিনি অহং হইতে প্রয়াণ (ফ'না) করিয়া ঐশী সত্তার সাযুজ্য (বাকা) লাভ করেন।

ঘজালীর প্রভাব ছিল ব্যাপক এবং স্থায়ী। দার্শনিকদের মধ্যে ইব্‌ন্ তুফাইল (মৃত্যু ১১৮৫ খৃঃ অঃ) ছিলেন তাঁহার অনুরাগী, কিন্তু সুফীদের মধ্যে কয়েকজন মহান সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা তাঁহাকে তাঁহাদের নেতারূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। কাদিরীয় সম্প্রদায়ের প্রেরণাদাতা আব্দুল কাদির জীলানী (১১৬৬ খৃঃ অঃ), রিফাইয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আহ্‌মদ অল্ রিফাঈ (১১৮২ খৃঃ অঃ), এবং সুহ্‌রাবর্দীয় সম্প্রদাহের শিহাব অল্ দীন সুহ্‌রাবর্দি (১২৩৪ খৃঃ অঃ) ঘজালীর উপদেশই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

আবার মুসলিম মরমিয়া তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধান, সেই মুহী অল্-দীন ইব্‌ন্ অল্-আরবী (১১৬৪ খৃঃ অঃ) ঘজালীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইব্‌ন্ অল্-আরবী পরম শ্রেষ্ঠ মরমিয়া দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে মরমিয়া দর্শনতত্ত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইয়াছিল। তাঁহার পরে আবির্ভূত মরমিয়াবাদের লেখকগণ নূতন তত্ত্বপন্থার উদ্ভাবক ছিলেন না, ছিলেন টীকাকার এবং ব্যাখ্যাতা। তাঁহার পূর্বে আবির্ভূত মরমীদের ধারণাগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি সেগুলিকে সর্বেশ্বরবাদী তত্ত্বপদ্ধতিরূপে গ্রথিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, যাহা যুগপৎ মুস্‌লিম কবিতা ও সুফীপন্থী মতবাদের প্রেরণাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ইব্‌ন্-অল্ আরবীর দর্শনের মূলে ছিল সত্তার ঐক্যের (ওয়াহ্‌-দাতুল য়ুজুদ্) বোধ। তাঁহার মতে সকল সত্তাই এক, এবং পূর্ণ অদ্বয় স্বরূপ। এই পরমসত্তাকে মানব-বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় না, ঈশ্বর ব্যতীত কেহ তাহার অতিবর্তী স্বভাবকে জানেন না, অথবা তাহার স্বরূপগত অদ্বয় পরিচয়কে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহার মধ্যে কর্তা-কর্মের দ্বৈতত্ব নাই বলিয়া ইহা সকল বিধেয়ারোপ হইতে মুক্ত। ইহাকেই বলে একাত্ম (আহাদীয়া) দশা।

এই অদ্বয়ত্ব যতদূর পর্যন্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহা হইতে এমন একটি সত্যের ধারণা গড়িয়া উঠে যাহাতে সর্বাতিশয়িতার সহিত সর্বাশ্রয়িতা সংযুক্তভাবে বিরাজমান। এই পরমসত্য সর্তাধীন, সৃষ্ট ও কারণ-সঞ্জাত (খল্‌ক্) সত্তার বিপরীতরূপে পরমসত্তা নিশ্চয়াত্মক সত্তা, স্বয়ম্ভূ স্বনিদান ইত্যাদি (হক্) নানা পরিচয়ে জ্ঞাত। কিন্তু হক্ (সত্য, স্বরূপ, অদ্বয়) এবং খল্‌ক্ (আভাস, আকৃতি, বহু) আসলে অদ্বয়েরই অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুটি লক্ষণ। ইব্‌ন্ অল্-আরবী বলেন, "তুমি যদি

তাঁহারই মধ্য দিয়া তাঁহাকে মান, তবে তিনি নিজের মধ্য দিয়া নিজেকে মানিবেন, তাহাই ঐক্যদশা; কিন্তু তুমি যদি তোমার মধ্য দিয়া তাঁহাকে মান, তবে ঐক্য অন্তর্হিত হয়।" বিধেয়-আরোপ অর্থাৎ প্রকার-সিদ্ধির ফলেই অদ্বয়ের বহুত্ব সম্পাদিত হয়। অদ্বয় স্বয়ং সরল এবং অবিভাজ্য।

কিন্তু যদিও অদ্বয় এবং বহু মূলতঃ এবং স্বরূপতঃ এক, তবু বহুর বিধেয়সমূহ হইতে অদ্বয়ের বিধেয়গুলির পার্থক্য নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন। অদ্বয় সকল আকারের অতিবর্তী; বহুর দুইটি লক্ষণ আছে—ঐক্যলক্ষণ (জিহাতুল জামা) এবং বিভেদলক্ষণ (জিহাতুল ফার্‌ক্‌)। প্রথমটি নিশ্চয়াত্মকতা (য়ুজ্‌বূ), অধ্যক্ষতা (রুবুবীয়া), এবং চিরন্তনতা (কীদাস্‌) দ্বারা চিহ্নিত, এবং দ্বিতীয়টি সর্তাপেক্ষা (ইম্‌কান্‌), বশ্যতা (উবুদীয়া), এবং কালাধীনতা (হুদুস্‌) দ্বারা চিহ্নিত।

হক্‌ এবং খল্‌ক, ঈশ্বর এবং বিশ্ব, স্বরূপতঃ এক, সুতরাং উভয়ে একই চিরন্তনতার অংশী। একটি হইতেছে পরমসত্যের সর্বাতিশয়ী রূপ, এবং অন্যটি সর্বাশ্রয়ী রূপ। অদ্বয় বহুকে সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি (তাকীন্‌) আসলে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান এক সত্তার প্রকাশরূপায়ণ মাত্র। শাশ্বত সত্তা প্রসুপ্ত অবস্থা (সুবূত্‌) হইতে বহিরঙ্গ আভাসের (জুহুর্‌) আবরণে কালাধীন অস্তিত্বে অতিক্রমণ করেন। বিশ্ব অস্তিত্ব অর্জন করে না, ইহা বহিরঙ্গ অস্তিত্বের ও সম্বন্ধের (নিসাব্‌) বিবৃতি (আহ্‌কাম্‌) লাভ করে মাত্র।

যে বিশ্ব ঈশ্বরের চিরন্তনতার সমভাগী, তাহা ঠিক এই আমাদের পরিচিত বিশ্ব নয়। চিরন্তন বিশ্ব হইতেছে স্বরূপ, আকৃতি নয়; শেষোক্তটি সৃষ্ট (হাদিথ্‌), সর্তাধীন এবং অ-সৎ।

অতএব ইব্‌ন্‌ অল্‌-আরবীর মতে আমাদের জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত পরম-সত্যের তিনটি আকার আছে:

(১) যে পরমসত্য বহির্জগতে রূপায়িত, এবং চিদ্‌-বিষয়রূপে যাহা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত এবং পরিজ্ঞাত;

(২) যাহার সম্বন্ধে আমরা কেবলমাত্র অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন বিধেয় আরোপ করিতে পারি না, সেই সর্বাতিবর্তী পরমসত্তারূপ সত্য;

(৩) যে পরমসত্য অনুমান-সিদ্ধ অস্তিত্ব, বোধির দ্বারা অধিগত। প্রথমটি অবভাসিত বিশ্ব, দ্বিতীয়টি পরমসত্তা, তৃতীয়টি আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস-সৃষ্ট ঈশ্বর। প্রথমটি এবং তৃতীয়টি পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত, উভয়েই সগুণ; প্রথমটির গুণ সর্বাশ্রয়িতা (সি ফাতুল তাস্‌বীহ্‌)। তৃতীয়টির গুণ সর্বাতিবর্তিতা (সি ফাতুল

তান্‌জীহ্) ঈশ্বরের মধ্যে অদ্বয়ত্ব বৈচিত্র্যের সহিত যুক্ত হইয়া আছে, তাহা বহুত্বের মধ্যে ঐক্য, এবং তাহা ঐশী অভিধাসমূহের ঐক্য (ওয়াহ্‌দীয়াত্)।

দ্বিতীয়টিতে বহুত্বের অবকাশ নাই, ইহার ঐক্য (আহ্‌দীয়াত্) সকল সম্ভাবনার সমগ্রতা লইয়া ; ইহা জ্ঞানের বা আরাধনার বিষয় নহে, ইহা অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের আবরক এক অন্ধতা (আ 'মা)। ঈশ্বর আবার অন্য দিকে আমাদের বিশ্বাস-নির্ভর বিষয়, আমাদের আত্মবিষয়ক জ্ঞানের সাহায্যে তিনি পরিজ্ঞাত, সুতরাং আমাদেরই দ্বারা স্পষ্ট। নীতিশাস্ত্র এবং ধর্মতত্ত্বের ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর আসলে অন্তরালস্থিত পরম-তত্ত্বেরই ছদ্মরূপ।

অবভাসের জগৎ এবং ঈশ্বর, বহু এবং এক, এই দুইয়ের মাঝখানে পরম-সত্যের প্রথম নামরূপায়ণ (আল্‌তাইয়্যুন্ আল আওয়াল্) হয়, ইহাই নিজের কাছে ঈশ্বরের প্রথম আত্ম-প্রকাশ (তাজাল্লী)। ঈশ্বর আপনাকে দেখেন আকারসমূহের অনন্ততার মধ্যে, আপন চিত্ত এবং স্বরূপের অভ্যন্তরে প্রসুপ্ত অবস্থাসমূহের মধ্যে, বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবসমূহের মধ্যে এবং ইহজাগতিক বিকারসমূহের (আয়ানুল সাবিতা) মধ্যে। এই স্থির-নির্দিষ্ট প্রতিরূপগুলি অথবা প্রসুপ্ত অবস্থাগুলি কেবল সম্ভাব্য সত্তা মাত্র, তাহাদের বাহ্য অস্তিত্ব নাই।

কিন্তু অদ্বয় আপনাকে কেবল আয়ানুল-সাবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেন না, যাহা পরমসত্যের পরমসত্য (বাকী কাতুল হাকায়েক), সেই বিশ্বচৈতন্য বা প্রথম বুদ্ধিরূপে, এবং অবভাসের জগৎরূপে, বিশ্ব-দেহরূপে (আল্‌জীসম্ আলকুল্লী) ও আদিম জড়বস্তুরূপে (হায়ুলা) তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন। অবভাসের জগৎ নিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে, ইহা ব্যষ্টিরূপ সৃষ্টির এক অনন্ত পালা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া শাশ্বত ও চিরস্থায়ী দিব্যপ্রকাশ (তাজাল্লী) স্ফুরিত হয়।

বিশ্বকে বলা যায় এক আত্মাবর্জিত দেহ, মলিনগাত্র দর্পণ-বিশেষ। ঈশ্বর এই দর্পণের উজ্জ্বলতা সম্পাদনার বাসনা করিলেন, যাহাতে তাঁহার নামের (ঐশ্বর্যের) স্বরূপ (আ'য়ান্) আভাসিত হয়। তাহার পর এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপের (কাওন্‌জামী) আবির্ভাব হইল, যাহার মধ্য দিয়া আপন অন্তরতম চেতনা (সির্‌র্) ঈশ্বরের নিকট উদ্ভাসিত হয়। এই সত্তাই মানব (ইন্‌সান), ঈশ্বরের প্রতিনিধি (খ্‌ালিফা), দেহে সে সৃষ্ট, আত্মায় সে শাশ্বত।

বিশ্বচৈতন্য, প্রথম বুদ্ধি, সত্যের সত্যকেই ইব্‌ন্ অল্-আরবী বলিয়াছেন মুহম্মদের আত্মা (হাকী কাতুল মুহামাদীয়া), যাহার চরমতম প্রকাশ ঘটে পূর্ণ মানবের (ইন্‌সানে কামীল) মধ্যে, এবং সমস্ত ধর্মপ্রবর্তক ও সাধুব্যক্তিদের মধ্যে

যাহা আপনাকে প্রকাশ করে। ইহা অন্তরশায়ী আত্মা; যাঁহারা ইহাকে লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহা যাবতীয় দিব্যজ্ঞান প্রেরণ করে; ইহা পূত আত্মা (রুহ্), বিশ্বকে যাহা পালন ও নিয়ন্ত্রণ করে, ইহা সেই ঐশ্বরিক সৃজন-কৃতি।

বিশ্বচৈতন্য বা বিশ্ববুদ্ধি আপনার নানা বিকারের মধ্যে, যথা ব্যক্ত আত্মাসমূহের মধ্যে, আপনাকে প্রকাশ করে। বিশ্ব-আত্মা নিজের সমগ্র সত্তা সম্বন্ধে সচেতন, সুতরাং তাহা আপনার নানা বিকার সম্বন্ধেও সচেতন; কিন্তু বিকারসমূহ অথবা ব্যক্ত আত্মাসকল স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন খণ্ডাংশ সম্বন্ধে সচেতন হইলেও পূর্ণ সম্বন্ধে সচেতন নয়। ব্যক্ত আত্মা বা মানুষের তিনটি অংশ আছে—দেহ, আত্মা, বিজ্ঞান। মানব-শরীর বিশ্বদেহেরই (আল্ জিস্‌ম্ আল্ কুল্লী) এক বিশিষ্ট বিকার, মানব-আত্মা বিশ্ব আত্মারই (আন্ নাফসাল্ কুল্লীয়া) বিকাররূপ এক মর্মসত্য, এবং মানব-বিজ্ঞান বিশ্ব-বুদ্ধিরই (আল্ আকলাল কুল্লী) বিকারমাত্র।

পরমপুরুষের পূর্ণ অদ্বয়স্বরূপ হইতে পরমসত্যের আত্মপ্রকাশনের দিকে নানা পর্যায় অতিক্রম করিয়া অভিব্যক্তির ধারা বহিয়া চলিয়াছে। মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান এবং জড়বস্তু, প্রকট এবং সম্ভাব্য, অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ পরস্পর মিলিয়া আছে। যে স্তরমালা অনুসরণ করিয়া অদ্বয় আপনাকে বহুর মধ্যে প্রকাশ করে, তাহার মধ্যে একটি যৌক্তিক প্রণালী আছে বলা যায়; সে সকল পর্যায় অতিক্রম করিয়া পরমতত্ত্ব অবশেষে আমাদের জ্ঞানের জগতে অবতীর্ণ হন; সেই প্রত্যেকটি পর্যায়কে বিপরীতভাবে অতিক্রম করিয়া পরমসত্যের সহিত আপন ঐক্য উপলব্ধি করিবার জন্য মানুষকে বিপরীত যাত্রার পথ ধরিতে হইবে। যে পথে মানুষ ঈশ্বরের সহিত আপন স্বরূপগত ঐক্য অনুভব করিতে পারে, সেই 'গূঢ়তত্ত্বের অন্তরাবর্তনের' পথে ইব্‌ন্ অল্-আরবী এরূপ মোট সাতটি পর্যায় গণ্য করিয়াছেন। মানুষের উপলব্ধি ক্রমে ধ্রুব-জ্ঞান (ঈল্‌মুল্ ইয়াকীন্) হইতে যাত্রা করিয়া ধ্রুব-স্বরূপ (আইন্-উল্-ইয়াকীন্) অতিক্রম করিয়া ধ্রুব-তত্ত্বে (হাককুল্ ইয়াকীন্) উপনীত হয়। অজ্ঞানতা হইতে ক্রমশঃ সার্বিক ঐক্যের প্রমাদহীন চেতনায় উন্নয়ন (ফ'না), আকারের অন্তর্ধান এবং সারাংশের স্থিতি, অবভাসিত রূপের বিলোপ এবং পরমসত্যের প্রকাশ (তাজাল্লী) এই পরিক্রমার তাৎপর্য। এই পর্যায়সমূহের প্রত্যেকটিতেই এক একটি করিয়া আবরণ—অবভাসিত জগতের এক একটি চরিত্রচিহ্ন—খসিয়া পড়ে, এবং তত্ত্বসন্ধানী মহাসত্যের দিকে ততক্ষণ এক এক ধাপ অগ্রসর হইয়া চলেন যতক্ষণে অবশেষে সমস্ত আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়—যাহা কিছু অনীশ্বর

(মা'আসীওয়া) তাহা নিঃশেষে অপনীত হয়—, পরমতত্ত্ব আপন অখণ্ড মহিমা লইয়া আবির্ভূত হন, এবং আত্মা নির্বিকল্প মুক্তিতে অধিরোহণ করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ সম্ভোগ করে। ঘরের দিকে মানুষের যাত্রার এইখানেই শেষ, এবং এইখানেই তাহার গন্তব্যের প্রাপ্তি।

যে অতীন্দ্রিয়বাদের পথ ধরিয়া সুফী আপন লক্ষ্যের অভিমুখে যাত্রা করেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব জ্ঞান-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি যুক্তি-সিদ্ধ প্রক্রিয়া। ইঁহার মতে জ্ঞান দুই শ্রেণীর : (১) ইল্‌ম্ অথবা বুদ্ধি-আশ্রিত জ্ঞান, বা বিচার-সাধ্য জ্ঞান, (২) মারিফত্ অথবা বোধি-অর্জিত জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান। প্রথম প্রকারের জ্ঞানের উপায় হইতেছে ইন্দ্রিয়গুলি ও বুদ্ধি ; তাহাদের মধ্য দিয়া আমরা বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান হইতেছে পরমসত্যের যথার্থ জ্ঞান ; ইহা সাধ্য জ্ঞান হইতে পৃথক্, কারণ মহাসত্যের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিই ইহার তাৎপর্য। বিশ্ববুদ্ধি হইতে উদ্ভূত হইয়া এই জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে মানববুদ্ধিতে পরিণত হয় ; ইহা ঐশ জ্ঞান (ইল্‌মে লাদুন্নী), রহস্যসমূহের জ্ঞান, অদৃশ্যের (ঈল্‌মুল এসরার, ঈল্‌মুল্ গায়েব) জ্ঞান, ইহা ঈশ্বরের প্রসাদ (আল্ ফায়েজ্ আল্ ইলাহী) হইতে জাত। সম্ভাব্য, অনুমানাত্মক, সীমাবদ্ধ এবং পরোক্ষ বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞানের বিপরীতরূপে মারিফত্ (গূঢ়তত্ত্ব) হইতেছে সুনিশ্চিত, অনির্বাচ্য, পূর্ণ এবং অপরোক্ষ। আত্মা যখন পরম নৈষ্কর্ম্য, শান্তি এবং পবিত্রতার স্তরে বিরাজ করে, তখনই এই জ্ঞান সহসা আত্মায় আবির্ভূত হয়। হৃদয়ের পবিত্রতার বিধায়ক চিত্তসংযম, যাহা আত্মাকে ঈশ্বর-সাযুজ্যের অভিমুখী করে, তাহা হইতেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়।

ইবুন্ অল্-আরবী তাঁহার প্রবর্তিত পরাবিজ্ঞান-পদ্ধতির মধ্য দিয়া ধর্ম সম্পর্কে কতকগুলি চিত্তাকর্ষক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সর্ব ধর্মের সমন্বয়ে তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে সকল পথই ঈশ্বরাভিমুখী এক 'সহজ পথে' (আল্ তারিকুল্ আমাম্) মিলিত হইয়াছে। একেশ্বরবাদ ও বহু দেবতাবাদ, দর্শনতত্ত্বসম্মত ধর্ম ও পৌত্তলিকতাবাদের সর্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন রূপগুলি পর্যন্ত সমস্তই অদ্বয় ঈশ্বরে বিশ্বাসেরই ইঙ্গিত, সমস্তই এক বিশ্বজনীন ধর্মের আঙ্গিক-স্বরূপ। কারণ কোরান বলিতেছে, "তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ধর্ম এবং চলার পথ রচনা করিয়াছি"। আবার যে দেবতারা পূজিত হন, তাঁহাদের লইয়া সমস্ত কিছুরই স্বরূপ হইতেছেন ঈশ্বর, সুতরাং নানা মূর্তিতে তিনিই সব পূজা পাইতেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহারও পূজা সম্ভবই নয়, কারণ তিনি বিধান দিয়াছেন, "তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পূজা করিবে না"। মানুষের পূজ্য

বিষয় অনুসারে মানুষের ধর্মের পার্থক্য দেখা দেয়। কেহ কেহ আপনাদের মানস কল্পনার রচনা (ঈলা বিল জাল্) তারকা, বৃক্ষ, দেব-দেবী প্রভৃতি ঈশ্বরের আংশিক প্রকাশগুলিকে পূজা করে, কিন্তু আপন আপন বিশ্বাসে প্রত্যেকেই অভ্রান্ত। অবশ্য সমগ্র ঐশ নামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বজনীন নাম আল্লাহ্-রূপে সর্বাত্মক ঈশ্বরকে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানী (আরিফ)। পূজ্য বিষয়ে অনুরাগই সকল পূজার মূল ভিত্তি, কিন্তু অনুরাগ একটি বিশ্বগ বৃত্তি, যাহা সকল সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাদিগকে এক করিয়া বাঁধে। সুতরাং প্রেমই সর্বাধিক উন্নত এবং যথার্থ পূজা, ঈশ্বরের মহত্তম প্রকাশরূপের পূজা।

ইবন্ অল্-আরবীর দার্শনিক মতবাদ মুসলমান মনীষার নির্মিত সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রমযোগ্য কীর্তিসমূহের অন্যতম। পরবর্তী সমস্ত চিন্তাধারা ইহার প্রভাব বহন করিয়াছে, এবং ইহার প্রেরণা সঙ্গীতে কাব্যে, সাধারণ মানুষের আচরণে, এবং সুফী ও সাধুদের জীবনে ক্রিয়াশীল হইয়াছে। বিভিন্ন লেখক তাঁহার গ্রন্থাবলীর উপরে টীকা রচনা করিয়াছিলেন, এবং ব্যাখ্যাতৃগণ নানা বিদগ্ধ রচনা ও জনপ্রিয় নিবন্ধের মধ্য দিয়া সেগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নব্য মত পোষণ করিবার ফলে তাঁহাকে আক্রমণ করা হইয়াছিল, এবং কেহ কেহ বিধর্মী বলিয়া তাঁহাকে ধিক্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য সকলে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের (আল্-শাখ্-উল্-আকৃবর) মধ্যে অন্যতম বলিয়া এবং একজন ঈশ্বর-মত্ত সাধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

ইবন্ অল্-আরবীর সমসাময়িক শিহার অল্ দীন্ সুহ্রাবর্দি মকতুল (১১৫৫-১১৯০ খৃঃ অঃ) ছিলেন সর্বদেবতাবাদে বিশ্বাসী আর একজন মরমিয়া দার্শনিক। নিত্য-জ্যোতি যাঁহার স্বরূপ-প্রকৃতিরূপে গণ্য সেই আদিম পরম আলোককে (নূর-ই-কাহীব) তিনি চরম ভাব-সত্তারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মতবাদের নাম হইয়াছে হিকমৎ অল্ ইশ্রাক্। বিখ্যাত গ্রন্থ ইন্সাহুল কামিল (পূর্ণ মানব)-এর রচয়িতা আবদুল করীম জীলী (১৩৪৫-১৪১৭ খৃঃ অঃ) ইবন্ অল্-আরবীর মতানুবর্তী ছিলেন, এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর সর্বপ্রধান সুফী পণ্ডিত নুর অল্ দিন জামী (১৪১৪-৯২ খৃঃ অঃ)-ও তাঁহার অনুগামী ছিলেন। ল-আইহ্ (দীপ্তি) নামে তাঁহার যে ক্ষুদ্র গ্রন্থটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, তাহা অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শনের একটি সংক্ষিপ্তসার।

শাস্ত্রপন্থা (কলাম), দর্শন (হিকৃমৎ) এবং মরমিয়াবাদ (তসব্বুফ্)—মুসলিম তত্ত্বপন্থার এই সমগ্র তিনটি ধারাই এক উৎস অর্থাৎ কোরান হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রভাব ছাড়াও ইহাদের পরিণতি

নির্ধারিত হইয়াছে মুসলমানদের বৌদ্ধিক পরিবেশের দ্বারা। তাহার প্রধান উপাদানগুলি ছিল একদিকে নব্য-প্লেটোনীয় খৃষ্টীয় তত্ত্ব, অন্য দিকে ইরানীয় এবং ভারতীয় চিন্তাসম্ভার। এই সকল অবদানের সঠিক অনুপাত নির্ধারণ করা কঠিন, এবং ইহা তাহার উপযুক্ত স্থানও নহে। কিন্তু ব্রাউন, ম্যাক্স হর্টেন, গোল্ড্‌জিহার এবং অন্যান্য অনেকের সাক্ষ্যে সমর্থিত প্রকৃত সত্য এই যে, মুস্‌লিম তত্ত্বসাধনার মধ্যে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আছে যাহা ভারত হইতেই গৃহীত হইয়াছিল।

শাস্ত্রপন্থা, দর্শন এবং মরমিয়াবাদ—এই বিভিন্ন তত্ত্বপন্থা ভারতে আগন্তুক এবং বসবাসকারী মুসলমানদের সঙ্গ ধরিয়াই ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। তাঁহারা ভারতে প্রচলিত চিন্তা ও বিশ্বাসের বিভিন্ন রূপের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় মুসলমান এবং হিন্দু পণ্ডিতগণের মধ্যে সংযোগ অতি সামান্যই ছিল, এবং দার্শনিক জ্ঞানের বিনিময় ছিল অকিঞ্চিৎকর। যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান পণ্ডিত সংস্কৃতপাঠে উৎসাহী ছিলেন না, সুতরাং সুফী ও দরবেশগণের উৎস্বষ্ট জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা তাঁহাদের চারিপাশে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মাধ্যমেই হিন্দু ভাবধারা তাঁহাদের নিকট পৌঁছিয়াছিল। এই আদান-প্রদানের ফলে বিশেষতঃ অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শনের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছিলেন। মুসলমান সুফীগণ এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়গুলি কিছু সংখ্যক হিন্দু আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সুফী চিন্তা হিন্দু বেদান্তের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়াছিল।

অন্যদিকে মুসলিম মরমিয়াতত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে কয়েকটি সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত হইয়াছিল, যাহা সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং হিন্দুসুলভ জীবনদৃষ্টি এবং চিন্তাভঙ্গীকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

প্রাক্‌-মোগল যুগে মুসলমান শাসনকর্তাদের রাজসভায় মধ্য এশিয়া এবং পারস্য হইতে আগত পণ্ডিতবর্গের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে বহু কবি, ঐতিহাসিক এবং ধর্মশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের সমাদর তেমন না থাকিলেও ধর্মবিধানের (ফীকহ্‌) চর্চা ছিল। অবশ্য মরমিয়া সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব যথেষ্টই ছিল এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সংখ্যক প্রখ্যাত সুফী বাস করিতেন এবং শিক্ষা দান করিতেন। তাঁহারা অনেক অনুগামীকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষে ইস্‌লামের প্রসারের জন্য তাঁহারা ছিলেন দায়ী।

তুঘ্লক-বংশীয়গণ মুস্লিম ধর্মবিধানের পঠন-পাঠনে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, এবং সংস্কৃত গ্রন্থের, বিশেষতঃ জ্যোতিষ, সঙ্গীত এবং উপাখ্যানমূলক গ্রন্থগুলির অনুবাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবশ্য সমগ্রভাবে এই যুগ ছিল বিদ্যার ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের যুগ। কিন্তু তৈমুরের আক্রমণ এবং তুঘ্লক-বংশীয়দের রাজত্বের অবসানের পর অনেক মুসলমান পণ্ডিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষে মোগল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে এই আগমনের ধারা প্রভূত উৎসাহ লাভ করিয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে অবস্থিত মুসলমান পণ্ডিতেরা প্রধানতঃ সেই সমস্ত বিজ্ঞানশাখায় ব্যাপৃত ছিলেন, যাহাতে শাস্ত্রপ্রমাণেরই প্রাধান্য (উহুমে মানকুনা), কিন্তু এই সময় হইতে যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানশাখাগুলির প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। ইহার ফলে যুক্তিবিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র বিদ্যালয়গুলির পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইল এবং তাহাদের ব্যাপক চর্চা সুরু হইল।

এইভাবে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শাস্ত্রমত (কালাম) এবং দর্শনশাস্ত্র (হিকমাত) ভারতের বাহিরের মনীষীদের নির্দেশিত পথে চলিতে লাগিল। এই ক্ষেত্রগুলিতে যথেষ্ট কর্মতৎপরতা ছিল বটে, কিন্তু মৌলিক চিন্তাশীলগণের আবির্ভাব হইয়াছিল মাত্র মোগল যুগে। ইঁহাদের মধ্যে শাহ্জাহানের পৃষ্ঠপোষিত আবৃদুল হালিম শিয়ালকোটি ছিলেন একজন, ঔরঙ্গজীবের অধীনে যিনি সদর্ রূপে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সেই মীর জাহিদ ছিলেন আর একজন। অন্যান্য প্রখ্যাত লেখকগণ ছিলেন শেখ আবৃদুল ওয়াহাব এবং শেখ আহমদ সিরহিন্দী (মুজাদ্দিদ্-ই-আল্‌ফ্-ই-সানী নামে যিনি পরিচিত)। তাঁহারা বিদগ্ধ তত্ত্বমতের প্রবর্তক এবং বিতার্কিক ছিলেন।

ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রকৃতি বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলিই প্রধানতঃ তাঁহাদের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। ঈশ্বর কি জ্ঞানের অধিকারী, অথবা জ্ঞানশূন্য হইয়াই তিনি সৃষ্টি করেন? জ্ঞাতা এবং পরিজ্ঞাত এই দুয়ের সম্পর্কই যদি জ্ঞান হয়, তবে কিভাবে আমরা ঈশ্বরের আত্মসম্বন্ধী জ্ঞান তাঁহাতে আরোপ করিতে পারি? জ্ঞান কি ঈশ্বরের সত্তা এবং স্বরূপের অঙ্গীভূত, অথবা তাহা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কোন বিভূতি? ঈশ্বরের জ্ঞান কি কেবল সামান্য লক্ষণ সমূহে কেন্দ্রীভূত, অথবা তাহা বিশেষ লক্ষণগুলিতেও প্রসারিত?

ভারতীয় শাস্ত্রপন্থানুসারীদের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন দিল্লীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (মৃত্যু ১৭৬২ খৃঃ অঃ)। পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া

গজালী, রাজি এবং ইব্‌ন্ রুশ্‌দ্‌-এর সহিত তাঁহার তুলনা করা হইয়া থাকে। সেকালের কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল ঐস্লামিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান বহু গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার উপদেশের মূল কথাটি ছিল এই যে, ধর্ম এবং দর্শনের মধ্যে যথার্থতঃ কোন অসঙ্গতি নাই। যে নীতিতে কোরানের ব্যাখ্যা এবং ভাষ্য করা হইবে, তাহা তিনি সুনির্দিষ্ট করিয়া দিলেন, আগমগ্রন্থগুলির (হাদিথ) গুরুত্বের ক্রম নির্ধারণ করিয়া দিলেন এবং অপ্রামাণ্য গ্রন্থগুলি হইতে প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির পার্থক্য বিচার করিবার পদ্ধতি নিরূপণ করিলেন, ধর্মবিধি (ফীকহ্‌) সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেন, এবং তাহাদের পার্থক্য যে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে সূত্রবদ্ধ হওয়ার ফলে উদ্ভূত হইয়াছে, এইভাবে ব্যাখ্যা করিলেন।

শাস্ত্রমত এবং ঐশ আদেশ—ধর্মের এই দুইটি অঙ্গের উপর তিনি সমান গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং কোরানের আদেশসমূহ এবং বিচারবুদ্ধির মূলসূত্র-গুলির মধ্যে কোনও বিরোধ নাই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বিধান (শারীয়াত্‌) এবং অতীন্দ্রিয়ানুভূতির (ম'আরিফাত্‌) মধ্যবর্তী সঙ্গতিটুকু তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম মুস্‌লিম লেখক, যিনি আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ জনসাধারণের এক বৃহদংশের নিকট কোরান এবং আগমগ্রন্থগুলি সহজলভ্য করিবার জন্য পারসী ভাষায় সেগুলির অনুবাদ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন; মুসলিমবিধিশাস্ত্রের প্রগতির পথ তিনি উন্মুক্ত করিলেন, এবং শাস্ত্রপ্রাধান্যের সীমা নির্দেশ করিয়া দিলেন।

তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ রচনা হুজ্জত্‌ উল আল্লা আল্‌বালিঘা গ্রন্থটিতে প্রথমতঃ ধর্ম এবং মতনিষ্ঠা সম্পর্কে সাধারণ নীতি এবং সামান্য ধারণাগুলির আলোচনা করা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল নীতির ভিত্তিতেই ঐস্লামিক নির্দেশ এবং বিধানগুলির সম্বদ্ধতা বিচার করা হইয়াছে। প্রথম অংশে শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ্‌ ধর্মের প্রয়োজন, তাহার উৎপত্তি, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মূলগত ঐক্য এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের কারণ, এবং পরলোকতত্ত্ব এবং অবতারতত্ত্বের সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করিয়াছেন। এ সবের মাঝখানে ভাব-জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত মনোজ্ঞ একটি অধ্যায় আছে—যে ভাব-জগৎ বস্তুমুক্ত, বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে সৃষ্ট হইবার পূর্বে প্রথম যে জগতে আবির্ভূত হয়।

যে সময়ে মুস্‌লিম রাজ্যগুলি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল এবং পাশ্চাত্যের উদীয়মান শক্তির কাছে এশিয়া ক্রমাগত পরাজয় বরণ করিতেছিল, সেই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ

সময়ে ওয়ালিউল্লাহ্ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই প্রশ্নে স্বভাবতঃই তাঁহার মন নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ব্যক্তি-আচরণ ও সামাজিক নীতিবোধের সমস্যার প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার মতে ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের বোধ বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, বরং একটি সমগ্র প্রজাতির অংশরূপ যে ব্যক্তি, তাহারই সম্পর্কে প্রযোজ্য। সুতরাং মানুষের পূর্ণতার আদর্শ নির্ধারণ করিতে হইলে মানুষের সামান্য বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান করিতে হইবে এবং বুঝিতে হইবে কোথায় তাহার আপন পূর্ণতা বিরাজ করে।

এই মত অনুসারে নীতিশাস্ত্র সাধারণ সমাজ-দর্শনেরই অঙ্গ হইয়া পড়ে, এবং সাময়িক কল্যাণ ও শাশ্বত ত্রাণ এই দুই লক্ষণে নৈতিকতার পরিচয় গড়িয়া ওঠে। মানুষ অপরিহার্যভাবে একটি দলের অংশ, অন্যান্য মানুষের সহিত অজস্র বন্ধনে সে আবদ্ধ, সে একটি পরিবারের, একটি গ্রামের, একটি সমাজের এবং সমগ্র মানবতার অঙ্গস্বরূপ। সুতরাং যে গুণ সমাজ-কল্যাণের ভিত্তিস্বরূপ, তাহার অনুশীলন এবং ব্যবহারিক প্রয়োগেই মানুষের চরম উন্নতি। ওয়ালীউল্লাহ্-র মতে ন্যায় হইতেছে সেই কল্যাণ। ন্যায়ের চারিটি রূপ আছে; প্রতিদিনের সাধারণ জীবনযাত্রায় আমাদের বাক্যে আচরণে আকৃতিতে বেশভূষায় যখন ইহার প্রয়োগ ঘটে তখন ইহার নাম সুনীতি, ভদ্রতা (আদব); যখন আমাদের আয়-ব্যয় এবং আর্থিক অবস্থার উপরে ইহার প্রসার তখন ইহার নাম মিতব্যয় (কিফায়ৎ); যখন আমাদের পারিবারিক ক্ষেত্রে গৃহস্থালীতে এবং রাষ্ট্রে ইহার প্রয়োগ তখন ইহা স্বাধীনতা ও নিয়মানুবর্তিতার সমার্থক; ইহা যখন পারস্পরিক প্রীতি ভ্রাতৃত্ব এবং আত্মীয়তার ভিত্তিভূমি হয় তখন ইহা মানবমৈত্রীর (হুস্‌নে মা আশারাত) পরমোৎকর্ষরূপে গণ্য। ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত সমাজদেহ এমন এক পরিবেশ রচনা করে যাহাতে ব্যক্তি মানুষ ঈশ্বরের সহিত তাহার আপন সম্বন্ধের দিক হইতে, এবং ঈশ্বরের সমগ্র সৃষ্টির সহিত তাহার নিজ সম্বন্ধের দিক হইতে তাহার সকল করণীয় সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে।

আদর্শ সমাজ যেহেতু ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণে ইহা স্পষ্ট যে, যে পরিমাণে সমাজ ন্যায়কে লঙ্ঘন করিয়া চলে, সেই পরিমাণেই তাহা অকল্যাণ-দুষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ বলেন, যখন পারস্যবাসীরা এবং রোমানগণ বিত্ত এবং বিলাসকে তাহাদের জীবনের পরমার্থরূপে গণ্য করিল, এবং মানুষ তাহার ধন-সম্পদের গর্ব করিতে লাগিল, মুষ্টিমেয় ধনীব্যক্তি বহুসংখ্যক দরিদ্রকে দুর্দশা এবং নিঃস্বতার জীবন গ্রহণে বাধ্য করিল, কৃষক বণিক এবং কারিগরদের

নিকট হইতে জোর করিয়া ঘাড়-ভাঙা কর আদায় করিতে লাগিল, অত্যাচার অবিচার অবাধে দেশ জুড়িয়া চলিতে লাগিল, চাটুকারের দল শক্তিশালী ধনীদিগের নিকট অলস পরজীবী বৃত্তি গ্রহণ করিল, সততা এবং পুণ্য অন্তর্হিত হইল এবং নৈতিক ব্যাধি দুঃসাধ্য হইয়া দেখা দিল, তখনই ঈশ্বর একজন নিরক্ষর ধর্মপ্রবর্তককে প্রেরণ করিলেন, যিনি আবির্ভূত হইয়া সামাজিক অন্যায়কে রোধ করিয়া দুর্নীতি-প্রবণ বিলাসী জীবনপদ্ধতিকে নিষিদ্ধ করিয়া এবং মহান আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া ন্যায়ের ভিত্তিতে নিষ্কলুষ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। অনুরূপভাবে তাঁহার সমসাময়িক ভারতের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি রাষ্ট্রশক্তির ক্ষয়ের এবং সামাজিক দুর্গতির দুইটি প্রধান কারণ উদ্‌ঘাটন করিলেন। রাষ্ট্রের উপর অযোগ্য ব্যক্তি-গণের পরগাছাসুলভ নির্ভরতা এবং রাজকোষের অর্থের অপচয়ই প্রথম কারণ। অসংখ্য লোক কিছুমাত্র সেবা না দিয়াই সৈনিক এবং পণ্ডিতের ছদ্মভূমিকায় বৃত্তি ভোগ করিত। ইহা ছাড়া অনেকেই সাধু, সুফী এবং কবির ছদ্মরূপ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা দাবী করিত। এই সমস্তই বিষম বোঝাস্বরূপ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ এই সব নিষ্কর্মা কর্মচারীর পিছনে ব্যয়বৃদ্ধির ফলে কৃষক, ব্যবসায়ী এবং কারিগরদের উপর দুর্বহ গুরুভার করের বোঝা চাপাইতে রাষ্ট্র বাধ্য হইয়াছিল। তাহারই ফলে যাহারা রাষ্ট্রকে মান্য করিয়া চলিত, তাহারা সর্বস্বান্ত হইল এবং অন্য সকলে বিদ্রোহী এবং কর-বঞ্চনাকারীতে পরিণত হইল।

এই ইতিহাস-পর্যালোচনার মধ্য দিয়া তিনি এমন কতকগুলি চিত্তাকর্ষক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার নীতিতত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলিকেই সমর্থন দান করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি তত্ত্ব এই যে, নীতি এবং রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, কারণ নীতির অবক্ষয় এবং ন্যায়বোধের হ্রাসের ফলে সমাজ-ভুক্ত জীব হিসাবে ব্যক্তিমানবের ব্যবহারিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও আচরণের অবনতি ঘটে। অপর তত্ত্ব এই যে, অর্থনীতির মধ্যেই সামাজিক ন্যায়বোধের মূল নিহিত আছে, কারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাই সমাজে তাহার ব্যক্তিগত ভূমিকাটি এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে তাহার যোগ্যতা নির্ধারিত করে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মনের শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অপরিহার্য, এবং ইহার অভাবে বাস্তব অনটনের পীড়নে নৈতিক কৃত্যের কোন দাবী টিকিতে পারে না। তবুও ধনের অতিপ্রাচুর্য এবং বণ্টনের বৈষম্য নিদারুণ অকল্যাণরূপে গণ্য। ধনের আকাঙ্ক্ষার কোন সীমা নাই, এবং ধনসঞ্চয়ের ফলে বিলাসিতা এবং নৈতিক অনুভূতির স্থূলতা দেখা দেয়। ইহারই ফলে দেখা দেয় মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে

গোষ্ঠীতে ঈর্ষা ও শত্রুতা, এবং তাহার পরিণতিতে সমাজের অধঃপতন এবং বিপর্যয়। ধনের সাম্যমূলক ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এবং সুসমঞ্জস সমাজগঠনই ইহার একমাত্র প্রতিকার, যাহার ফলে উৎপাদকগণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুস্লিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিলেন, এবং নৈতিক পুনর্গঠন ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষে একটি প্রবল আবেদন উপস্থিত করিলেন। তাঁহার জীবনকালেই ঐতিহ্যবাদিগণ এবং শাস্ত্রপ্রমাণবাদিগণ তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছিলেন; এবং একদিন প্রার্থনার পর মসজিদ্ হইতে তাঁহার বাহিরে আসিবার সময়ে প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার মহান্ কর্তব্যে দৃঢ় থাকিয়া বিরোধিতা সত্ত্বেও নির্ভীকভাবে শেষ পর্যন্ত আপনার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার যে উপদেশগুলি উনবিংশ শতাব্দীর মুস্লিম চিন্তায় এবং জীবনে মহৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তাঁহার পুত্রগণ ও শিষ্যবর্গের মধ্য দিয়া প্রচার লাভ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে দর্শনের (হিক্মৎ) চর্চা হইয়াছিল, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিকতার শোচনীয় অভাব রহিয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ তর্কশাস্ত্রে অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু যে সমস্ত পুস্তক তাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ছিল পূর্ববর্তী মুস্লিম মনীষীদেরই টীকা এবং ভাষ্যমাত্র। "কোন নূতন সমস্যার বিচারের দ্বারা অথবা পুরাতন সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কোন বিশিষ্ট প্রয়াসের দ্বারা ইহা স্বকীয়তা অর্জন করে নাই"—দ্য বোয়রের এই অভিযোগ এড়ান কঠিন। তথাপি মুস্লিম চিত্তে তর্কবিদ্যার আধিপত্য প্রবল ছিল, এবং বিচার্য সমস্যামাত্রকেই তাঁহারা যুক্তিবিন্যাসসম্মত সুনির্দিষ্ট পন্থায় বিচার করিতেন। যুক্তিশাস্ত্র বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পদার্থবিদ্যা, পরাবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্র দীর্ঘকালের ব্যবধানে আবির্ভূত হইয়াছিল। এক্ষেত্রেও পণ্ডিতদের প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল অতি প্রাচীন মতবাদগুলিকে ব্যাখ্যা করা। জ্যোতিষ এবং ভেষজবিদ্যার ক্ষেত্রে অবশ্য হিন্দু ও মুস্লিম বিজ্ঞানের সমন্বয়ের মধ্য দিয়া কিছু প্রশংসনীয় চেষ্টা হইয়াছিল।

তর্কবিদ্যার ক্ষেত্রে সংজ্ঞা নির্ধারণের ব্যাপারে অনেক নৈপুণ্যের প্রয়োগ ঘটিয়াছিল, এবং যে বিতর্ক ও আলোচনার সাহায্যে সত্যের প্রমাণ নির্ধারিত হইতে পারে তাহার পদ্ধতিবিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হইয়াছিল। ছাত্রদের জন্য

কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক রচিত হইয়াছিল ; তাহার মধ্যে মুহিব্ব্ আল্লাহ্ বিহারী রচিত 'মুল্লম্ অল্ উলুম' গ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ইহাতে জ্ঞান ও তাহার প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচনা আছে—ধারণা (তাসাওয়ার) এবং বিচার (তাস্দীইক) ছাড়াও আরোহ-যুক্তি এবং আরোহানুমানের প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। কয়েকটি পাঠ্যগ্রন্থ রচনা ব্যতীত ভারতীয় পণ্ডিতদের প্রধান রচনাবস্তু ছিল বিদেশী ও ভারতীয় পাঠ্যগ্রন্থের টীকাসমূহ।

দর্শনের ক্ষেত্রে দুইটি নাম উজ্জ্বল হইয়া আছে,—জৌনপুরের মুল্লাহ্ মাহমুদ (মৃত্যু ১৬৫১ খৃঃ অঃ) এবং মুহিব্ব্ আল্লাহ্ বিহারীর (মৃত্যু ১৭০৭ খৃঃ অঃ) নাম। প্রথম জন কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা, যাহার মধ্যে 'অল্ শম্স্ অল্ বাজিঘ' গ্রন্থটি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ইহা গ্রন্থকারেরই রচিত 'অল্-হিক্মৎ অল্-বালিঘ' গ্রন্থের টীকা। তর্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং পরাবিদ্যা লইয়া দর্শনের সমস্ত শাখা সম্পর্কে আলোচনার জন্য গ্রন্থ দুইটি একত্রে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু রচনার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল গ্রন্থকারের অন্তিম পীড়ার সময়ে, তাহার ফলে তাহা অসমাপ্তই থাকিয়া গিয়াছে। ইহাতে বিজ্ঞানের পদ্ধতি, তাহার প্রাথমিক সূত্রাবলী এবং নিয়মসমূহ আলোচিত হইয়াছে ; পদার্থবিদ্যার প্রাথমিক সূত্রগুলি হইতেছে অ-সৎ, জড়বস্তু, গতি ও আকার ; আদি কারণ কারণতত্ত্বের বিষয়। দেশ এবং কাল আবশ্যিক পরিবেশ গড়িয়া তোলে, শূন্য দেশের অন্তর্ভুক্ত নহে, আবার কালও চরম অর্থে অ-শাশ্বত। তিনি বস্তুদেহসমূহের নিত্য গুণাবলী, তাহাদের সীমা-অসীমের তত্ত্ব, গতি ও বিশ্রাম, সৃষ্টি ও প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

তত্ত্বগুলি প্রধানতঃ আভিসেনা (ইবন্ সিনা)র পদার্থবিদ্যার (অল্-শিফা) মাধ্যমে আরিষ্টটল হইতে সংগৃহীত।

মুল্লা মাহ্মূদ পরিণামবাদ এবং মুক্ত ইচ্ছাশক্তি (জাবর্ ও ইখ্তীয়ার্) বিষয়ে সমস্যার উপরেও আলোচনা করিয়াছেন। আশরীপন্থীদের চরম পরিণামবাদ এবং মুতাজিলপন্থীদের চূড়ান্ত ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদের মাঝখানে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মানুষের ইচ্ছাই মানুষের কার্যাবলীর অব্যবহিত কারণ, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে তাহা চরম পরিণামাশ্রয়ী ; সুতরাং মানুষের কর্ম স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তাহার ইচ্ছা শৃঙ্খলিত।

মুহিব্ব্ আল্লাহ্ বিহারী তর্কশাস্ত্র এবং দর্শনের একজন লেখক ছিলেন। 'অল্ জওহর অল্ ফর্দ্' নামক তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থে মুস্লিম ধর্মতত্ত্বের একটি ভিত্তিস্থানীয়

আলোচনা আছে, অর্থাৎ অবিভাজ্য অণু প্রসঙ্গে। এ পর্যন্ত শাস্ত্রবাদীদের অধিকাংশই এই মত পোষণ করিতেছিলেন যে বস্তুদেহ কতকগুলি নির্দিষ্টসংখ্যক অবিভাজ্য অণুর সমবায়ে গঠিত। ইহার বিরুদ্ধে আদিযুগের মুতাজিলপন্থী একজন দার্শনিক, নজ্জক, এই মত পোষণ করিয়াছিলেন যে, বস্তুদেহ অসীমসংখ্যক বিভাজ্য অণুর দ্বারা গঠিত। অবিভাজ্য অণুর তত্ত্বটিকে (আল্ জুজ্বলা য়াতাজাজ্জা) সমর্থন করিবার জন্য পুথি-পণ্ডিত তাত্ত্বিকগণের উৎকণ্ঠা উপলব্ধির যোগ্য। তাঁহারা ঈশ্বরের অদ্বয়ত্ব এবং শূন্য হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিতে তাঁহার সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মুল্লা মাহমুদ এবং মুহিব্ব্ আল্লাহ্-র মত দার্শনিকেরা এই তত্ত্বের মধ্যে অলঙ্ঘ্য বাধা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং বিরুদ্ধপক্ষের আক্রমণ এড়াইবার জন্য অবিভাজ্য অণুর ধারণাটিকে যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিতে চাহিয়াছিলেন।

আকবরের মহান্ মন্ত্রী আবুল ফজলের উল্লেখ ছাড়া ভারতবর্ষে দার্শনিকদের যে-কোন তালিকাই অসম্পূর্ণ থাকিবে। তিনি বৃত্তিগতভাবে দার্শনিক ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন সে যুগের জ্ঞানিশ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রনীতিবিদ্, ঐতিহাসিক, নথি-সংরক্ষক, পত্রলেখক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি। আকবরের রাজত্বকালের স্মরণীয় দেশ-বিবরণীতে (আঈন্-ঈ-আকবরী) তাঁহার লিখিত ভূমিকাটি তাঁহার রাজনৈতিক তত্ত্বজ্ঞানের নিদর্শনস্বরূপ।

রাজতন্ত্রই তাঁহার মতে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা। যথার্থ নৃপতি এবং স্বার্থান্বেষী রাজার মধ্যে তিনি পার্থক্য করেন। যদিও উভয়েরই সাধারণ লক্ষণ হিসাবে ধনকোষ, সৈন্যদল, ভৃত্যগণ এবং প্রজাবর্গ আছে, তথাপি প্রথম শ্রেণীর নৃপতি এগুলির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করেন না; কারণ লক্ষ্য হিসাবে তিনি নিজের সম্মুখে স্থাপন করেন কল্যাণকে, যাহা হইতে নিরাপত্তা, ন্যায়, সত্য এবং পুণ্যের উৎসার ঘটে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নৃপতি রাজকীয় ক্ষমতার বহিরঙ্গ আঙ্গিকের মধ্যে বন্দী হইয়া থাকেন, সুতরাং গর্ব, প্রমোদ, দাসত্ব, অনিশ্চয়তা, দ্বন্দ্ব এবং পাপ ইহার নিত্যসঙ্গী।

আবুল ফজলের মতে পাদশাহ্ (নৃপতি) কথাটিতে আক্ষরিক অর্থে শৃঙ্খলা এবং সম্পত্তির উৎস বোঝায়। নৃপতিত্ব একটি ঐশ্বরিক দান, ইহা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছুরিত আলোক, সুতরাং ইহা "বিশ্বজগতের উজ্জ্বলতা-বিধায়ক; ইহা পূর্ণতত্ত্ব-শাস্ত্রের যুক্তি-স্বরূপ; ইহা সকল পুণ্যের আধার।" ঈশ্বর সাক্ষাৎরূপে রাজার মধ্যে এই আলোক প্রেরণ করেন, সুতরাং নৃপতি-পদের পরিচয় পিতৃসুলভ প্রীতিতে ঔদার্যে, ঈশ্বরবিশ্বাসে, ধর্মবোধে এবং নিষ্ঠায়। রাজার ক্ষেত্রে বাসনা যুক্তির

কাছে পরাভূত, ক্রোধ বিচক্ষণতার দ্বারা পরাস্ত, ন্যায় করুণার দ্বারা সিঞ্চিত, প্রতাপধর্ম বিসর্জিত এবং সত্য আরাধ্য বস্তু।

সমাজ চারিটি উপাদানের যৌগিক ফল। জগৎ যেমন অগ্নি, বায়ু, অপ্ এবং ক্ষিতির দ্বারা নির্মিত, তেমনি সমাজ গঠিত হয় কারুশিল্পী, বণিক্, পণ্ডিত, ও কৃষক-শ্রমিক দ্বারা। রাষ্ট্রীয় সত্তা যেমন এই চার শ্রেণীর লোকের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থিতিসাম্য বজায় রাখে, রাজতন্ত্রও তেমনি ভকিল-পুরঃসর সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, ওয়াজির বা দেওয়ান-নেতৃক বিজয়-সহকারিবর্গ, বা হাকিম-শীর্ষক সভাসদ্‌গণ এবং রাজার ব্যক্তিগত ভৃত্যদলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

ভারতবর্ষে মরমিয়াবাদের প্রাচুর্যময় বিকাশ ঘটিয়াছিল। সুফীদের মধ্যে অনেকেই এদেশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং অনেকেই ভারতবর্ষকে তাঁহাদের স্থায়ী বাসভূমিরূপে গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। পীর, মুর্‌শিদ বা শেখ (নেতা)-গণের অধ্যক্ষতায় শিষ্য (মুরীদ)-গণকে আত্মোপলব্ধির পথে (তরীকা) পরিচালিত করিবার জন্য মঠ-সহিত অনেক প্রধান প্রধান সুফী সম্প্রদায় এখানে তাঁহাদের শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মরমিয়াবাদের একটি সাধন-রূপ ও একটি তত্ত্ব-রূপ ছিল। ইহাতে চিত্ত-সংযম, বৈরাগ্য-সাধন, ধর্মচর্যা, ধ্যান প্রভৃতির স্থান ছিল। ভারতবর্ষে সুফী পদ্ধতি ছিল অনেকটা হিন্দু যোগমার্গের অনুরূপ।

তত্ত্বের দিক দিয়া ভারতের মুস্‌লিম মরমিয়া সাধকগণ দুইটি সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন—চরম সর্বেশ্বরবাদী এবং মধ্যম সর্বেশ্বরবাদী, ঐজুদিয়া এবং শুহুদিয়া। প্রথমোক্ত দল বিশ্বাস করিতেন যে, সকলই ঈশ্বরময় (হামা ওসত্), এবং শেষোক্ত দল বিশ্বাস করিতেন যে, সকলই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত (হামা আজ্ ওসত্)। হিন্দুধর্মে এই দুই মতবাদের সাদৃশ্য পাওয়া যায় শঙ্করের অদ্বৈতবাদে এবং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে। ভারতবর্ষে আনীত হইবার পূর্বে মুস্‌লিম মরমিয়াবাদ (তসব্বুফ্) ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদ হইতে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিল, ভারতে আবির্ভাবের ফলে ইহার মধ্যে কিছু চিত্তাকর্ষক নবরূপায়ণ ঘটিয়াছিল। সাধনার ক্ষেত্রে সদৃশ পদ্ধতি গ্রহণ করা ব্যতীত তত্ত্বের দিক দিয়াও হিন্দু ও মুস্‌লিম উভয় মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের একটি সচেতন চেষ্টা চলিয়াছিল।

প্রাচীনতম সুফীদের মধ্যে যাঁহারা ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মন্‌সুর অল্ হল্লাজ্-এর নাম জনশ্রুতিতে প্রচারিত। অন্য যাঁহারা দাক্ষিণাত্যে

আসিয়া সেখানেই স্থিতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথম উল্লেখযোগ্য সুফী পণ্ডিত যিনি ভারতবর্ষে বসবাস করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন উস্‌মান বিন্‌ আলি অল্‌ হুজ্বীরী। তিনি লাহোরের অধিবাসী ছিলেন, এবং মরমিয়াবাদের উপরে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'কাশ্‌ফ্‌-অল্‌ মহ্‌জুব' পারসী ভাষায় রচিত।

'কাশ্‌ফ্‌-অল্‌ মহ্‌জুব' গ্রন্থটিতে সুফী তত্ত্ব এবং সাধনপ্রক্রিয়া, ইহার বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং প্রধান প্রধান সুফীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত সুফীমতবাদের একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির আলোচনা আছে। পথ এবং তাহার বিভিন্ন নিকেত সম্বন্ধে যথার্থ তাৎপর্য জিজ্ঞাসু কোন সঙ্গী ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে এই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য একথা প্রমাণ করা যে, "বিশ্বজগৎ ঐশী রহস্যের আলয় বস্তুস্বরূপ, অনিত্যগুণসকল, ভৌতিক পদার্থগুলি, আকারসমূহ এবং বস্তুদেহগুলি ঐশী রহস্যের আবরণমাত্র, এবং ঐক্যের (তৌহীদ) দৃষ্টিকোণ হইতে গণ্য করিলে আবরণ সমূহের অস্তিত্ব নিশ্চয় করার অর্থ হইতেছে বহুদেবতাবাদ। অবভাসিত সত্তার সহিত সংশ্রবের ফলে তাহার মধ্যে যে আত্মা নিরুদ্ধ হইয়া থাকেন, অবভাসিত সত্তা তাঁহারই আবরণস্বরূপ। অবভাসিত সত্তার রূপমোহ মানুষকে অজ্ঞান এবং অনীহার মধ্যে নিমজ্জিত রাখে, যাহাতে অদ্বয়ের সৌন্দর্যরাগ সম্বন্ধে অন্ধদৃষ্টি হইয়া সে ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া পড়ে, জাগতিক মিথ্যার অভিসারী হয়, এবং যুক্তির উপরে বাসনা-প্রবৃত্তিকে প্রাধান্যলাভের সুযোগ করিয়া দেয়।

হুজ্বীরী এমন এক সময়ে লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন—যখন সুফী মতবাদ একটি সুগঠিত তত্ত্বপদ্ধতিতে (সিল্‌ সিলাহ্‌) পরিণতি লাভ করে নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়, এবং মঠকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের বিশিষ্ট সাধনপন্থা, আচরণবিধি, নিয়মশৃঙ্খলা এবং উপদেশ লইয়া উদ্ভূত হইয়াছিল। ভ্রাতৃস্থানীয় সম্প্রদায়গুলি হজরত মহম্মদ হইতেই ক্রমবিকাশসূত্রে তাঁহাদের উদ্ভব গণ্য করিতেন। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে চারিটি ভারতবর্ষে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল, এবং ইহাদের প্রত্যেকটিতেই অনুগামীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। ইঁহারা হইলেন চিশ্‌তিয়, কাদ্‌রিয়, সুহ্‌রাবর্দীয় এবং নক্‌শ্‌বন্দীয় সম্পদায়। প্রত্যেকটি সম্প্রদায় হইতেই এমন অনেক শিক্ষাদাতার উদ্ভব হইয়াছিল যাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক কালে যথেষ্ট প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হুজ্বীরীর বক্তব্য অনুসারে "সংযম (মুজহদাহ্‌) এবং ধ্যান (মুশহদাহ্‌) সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল, কিন্তু ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানে এবং বৈরাগ্যচর্যায় তাঁহাদের

পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ছিল ; মূলতত্ত্ব বিষয়ে এবং ধর্মবিধি ও অন্বয়স্থাপনের বিষয়ে আনুষঙ্গিকতত্ত্বে তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল।"

সমস্ত সম্প্রদায়েরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাযুজ্য লাভের পথে মানুষকে পরিচালিত করা। তত্ত্বটি এই যে, বিশ্বের সমগ্র-সত্তার বিপরীতরূপে খণ্ড-সত্তারূপ মানুষ নিজের মধ্যেই অনুশাসনের বিশ্বরূপ (আলামে আম্র) এবং সৃষ্টির বিশ্বরূপ (আলামে খ্‌ালক্‌) ধারণ করে। প্রথমটি আত্মময় বিশ্ব, দ্বিতীয়টি বস্তুময় বিশ্ব। মানুষের মধ্যে পঞ্চ আধ্যাত্মিক উপাদান হইতেছে হৃদয় (কাল্‌ব), আত্মা (রুহ্‌), চেতনা (সির্‌), গূঢ় (খ্‌ফি) এবং অতিগূঢ় (আখ্‌ফা)। পঞ্চ বস্তু-উপাদান হইতেছে অহংভাব (নাফ্‌স), এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, ব্যোম এই চারিটি ভৌতিক উপাদান।

বস্তু-উপাদানগুলির সংশ্রবে আধ্যাত্মিক উপাদানগুলির আদিম পবিত্রতা কলঙ্কিত হয়, মানুষের স্বরূপ-প্রকৃতির বিস্মৃতি ঘটে এবং তাহার ও ঈশ্বরের মাঝখানে একটি আবরণ পড়িয়া যায়। কিন্তু মানুষের গভীরতম কামনা এই আবরণকে অপসারিত করিয়া সত্যকে লাভ করা। আধ্যাত্মিক জীবনে ঊর্ধ্বগামিতা যেন একটি পথযাত্রার (তরীকা) মত, এবং ঈশ্বর-সন্ধানী ব্যক্তি যেন পথিক (সালিক্‌)। অনুতাপের দ্বারা আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তোলা এবং ধর্মবিধির (শরিয়ত) অনুগত থাকা, ইহাই প্রথম স্তর ; দ্বিতীয় স্তরে বৈরাগ্যের দ্বারা সংযমসাধন, পবিত্রতা অর্জন এবং স্মরণ (ধিক্‌র), যাহাতে অন্তর হইতে ঈশ্বর-আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর সব আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হয় ; তৃতীয় স্তরে ধ্যান এবং আনন্দ-তন্ময়তার মধ্য দিয়া অর্জিত আধ্যাত্মজ্ঞান, যাহাতে ব্যষ্টি-চেতনা এবং স্বাতন্ত্র্যের বোধ লুপ্ত হইয়া বিশ্বাত্মার উপলব্ধি ঘটে। সত্য (হকিকৎ) ও অদ্বৈতের (ওয়াস্‌ল্‌) চরম লক্ষ্যের অভিমুখে ইহা পরিচালনা করে ; তখনই যাত্রার শেষ, এবং অক্ষয় আনন্দ ও দিব্যজ্যোতি অন্তরকে পূর্ণ করিয়া তোলে।

সম্প্রদায়গুলির বিভিন্ন নিজস্ব পন্থার দার্শনিক মূল বিচার করিলে তাহাদের পার্থক্যকে দুইটি মাত্র ভাগে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। একদল চরম অদ্বয়তত্ত্বকে (য়ুজুদীয়া) সমর্থন করিয়াছেন, অন্যান্যেরা সংশোধিত আকারে অদ্বৈততত্ত্ব (শুহুদীয়া) মানিয়াছেন। প্রথম দল ছিলেন ইব্‌ন্‌ এল্‌-আরবী এবং আব্দুল করীম জীলীর অনুগামী। তাঁহাদের মধ্যে আবদার্‌ রহমান জামী ভারতবর্ষে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল কাটাইয়া পারসী ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যেটি ভারতবর্ষে সুফী দর্শনের একটি জনপ্রিয় সার-গ্রন্থ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

তিনি নির্দেশ করিয়াছেন যে, 'সত্তা' কথাটি কখনও একটি সাধারণ ধারণা বা অ-বস্তু ভাব বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, আবার অন্য সময়ে ইহা সেই পরম সত্তার অর্থ প্রকাশ করে, যিনি স্বয়ংবৃত্ত, এবং যাঁহার উপরে অন্য সকল সত্তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। তাঁহার বাহিরে অন্য কোন সত্তারই যথার্থ অস্তিত্ব নাই। যাহা কিছু তাঁহার বহির্ভূত তাহাই বাস্তব অস্তিত্ববিহীন মনের রঞ্জিত বিষয়মাত্র, এবং তাহার আকার একটি কাল্পনিক বস্তুমাত্র। পরম সত্তাই একমাত্র সত্তা-পদবীর অধিকারী রূপে সকল নামের ও সকল গুণের অতীত এবং সকল সর্ত ও সকল সম্বন্ধ হইতে মুক্ত। তাঁহার গুণগুলি স্বতন্ত্র বলিয়া চিন্তায় প্রতিভাত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ এবং যথার্থতঃ তাহারা অভিন্ন।

পরম সত্তা তাঁহার অংশ-বিভূতির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে প্রথমটি নিরঞ্জন অদ্বয় রূপ, যাহার মাধ্যমে তিনি আপন স্বরূপকে আপনার মধ্য হইতে আপনার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, এবং জ্ঞান, জ্যোতি, ভব ও বৃত্তির গুণ আয়ত্ব করিয়াছেন। তাহার পরে পরবর্তী প্রকাশসমূহ ঘটিয়াছে, যাহার অন্তে প্রকটিত হইয়াছে বহুত্বময় জগৎ। কিন্তু এই জগৎ কেবল অবভাসাত্মক, কারণ ইহার সত্য অস্তিত্ব নাই, আজ ইহা বর্তমান আছে, কাল ইহা লুপ্ত হইবে। নিত্য পরিবর্তনশীল, নিয়ত নবায়মান, প্রতিমুহূর্তে বিলুপ্ত এবং প্রতিমুহূর্তে সমরূপ দ্বারা পূর্ণিত কতকগুলি অনিত্য গুণের সমষ্টি ছাড়া বিশ্বজগৎ আর কিছু নয়। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, সমস্ত বস্তুর অন্তরশায়ী সত্যরূপী পরমসত্তা এক এবং অদ্বিতীয়, বহুত্বের সম্ভাবনা তাঁহাতে নাই। তিনি অবভাসের দ্বারা, বহুত্বের দ্বারা, সীমার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করেন। তাঁহার পূর্বাপরতা কেবল তাঁহার সাপেক্ষ সম্বন্ধ এবং ভঙ্গিমা মাত্র। এই দুইয়ের মধ্যে আছে সেই সম্বন্ধ, যাহা আছে নির্বিশেষে এবং বিশেষের মধ্যে; একটিকে ছাড়া অন্যটিকে ধারণা করা যায় না, যদিও নির্বিশেষ হইতেছে আবশ্যিক, আর বিশেষ হইতেছে সর্তাধীন।

এই চরম একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে জামী তাঁহার মরমিয়া দর্শনতত্ত্ব, ব্যক্তির প্রকৃতি, তাহার ভবিতব্য এবং তাহার চিত্তসংযম সম্পর্কিত তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন।

বহু বৎসর ধরিয়া ইব্‌ন্ অল্ আরবীর সম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট প্রবাহপথ ধরিয়াই প্রধান সুফী মতবাদগুলি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। ইহাতে তত্ত্বজ্ঞানের (মা' রিফাৎ) নিকট ধর্মবিধিকে (শারীয়াত্) নিম্নস্থান দিবার ফলে নৈতিক নিয়ম বিমুখতা এবং সর্বধর্মবাদের প্রবণতা সমর্থন লাভ করিয়াছিল, যাহার উদাহরণ

উদারপন্থী (কে শারা') সম্প্রদায়গুলি, আকবরের ধর্মীয় পরীক্ষা, এবং সমন্বয়বাদী ধর্মশাখাগুলি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন শেখ আহ্‌মদ সিরহিন্দি (জন্ম ১৫৬৪ খৃঃ আঃ, মৃত্যু ১৬২৪ খৃঃ অঃ), যিনি মুজাদ্দিদ্-ই-আল্‌ফ-ই-থানি (দ্বিতীয় স্বর্ণযুগের পুনরুজ্জীবনকারী) নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্মবিধির প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি নক্‌শাবন্দীয় সম্প্রদায়-মতের পুনরুজ্জীবন এবং প্রচার করিয়াছিলেন। সমগ্রভাবে সুন্নী ধর্মবিধির মূল ভিত্তি অবলম্বন করিয়া এই সম্প্রদায়ের তত্ত্বাদর্শ এবং সাধন-প্রক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সকলপ্রকার উদ্ভাবন-চেষ্টাকে পরিহার করিয়াছিল। বস্তুতপক্ষে তিনি ধর্মশাস্ত্রকে অতীন্দ্রিয়বাদের উপরে স্থান দিয়াছিলেন এবং সুফী ও তত্ত্ব যাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছিল, সেই সংকীর্ণতা এবং কুসংস্কারকেই দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি উৎসাহিত বরিয়া তুলিয়াছিলেন।

সংশোধিত অদ্বয়বাদ (ওয়াহদাৎ-ই-শুহুদীয়া) তত্ত্বের গঠনই দর্শনক্ষেত্রে সিরহিন্দির কীর্তি। তাঁহার মতে ধ্যানানন্দের মধ্য দিয়া নহে, ঈশ্বরকে জানা যায় কেবল তাঁহার প্রকাশরূপের মধ্য দিয়া, কারণ মরমিয়া উপলব্ধির মধ্য দিয়া যে জ্ঞান আয়ত্ব করা যায়, তাহা একান্তই ব্যক্তিনির্ভর, সুতরাং সংশয়ের যোগ্য। অতীন্দ্রিয় সমাধির মধ্যে যে ঈশ্বর আপনাকে মানুষের নিকট প্রকাশ করেন এ ধারণা ভ্রান্ত, কারণ ঈশ্বর হইতেছেন পরাৎপর, এবং তিনি বুদ্ধি এবং বোধির সম্পূর্ণ অতীত। তাঁহার স্বরূপ ঐশ্বর্যাবলীর বিষয়ে কোন অব্যবহিত জ্ঞান সম্ভবপর নয়। প্রেরিত পুরুষের নিকট ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করেন এই স্থির প্রত্যয় হইতেই শুধু সত্যকে লাভ করা যায়।

সিরহিন্দি পরম সত্যের স্বরূপ এশ্বর্যের অভিন্নতা সম্পর্কে নির্বিশেষবাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তিনি মনে করেন, ঈশ্বরের বিভূতিসমূহ ঈশ্বরের স্বরূপেরই বর্ধিত অংশ ; এবং বিশ্বজগৎ বিভূতি সমূহের প্রকাশ-রূপ নহে, তাহার ছায়ামাত্র ; কারণ ঈশ্বরের বিভূতি ক্রটিহীনরূপে পূর্ণ অথচ বিশ্বজগৎ অপূর্ণতায় আচ্ছন্ন। আবার ঈশ্বরের গুণ এবং মানব গুণাবলীর মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। বিশ্বজগৎও একটি সত্য, তাহা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এবং ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ; কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেমন একদিকে আবশ্যিক এবং শাশ্বত, অন্যদিকে আবার বিশ্ব হইতেছে সম্ভাব্য এবং কালাধীন। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বর এবং বিশ্ব একাত্মক নহে,

কারণ একটি হইতেছে কারণরূপ, একটি তাহার কার্যফল। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এই যে, তিনি শূন্য হইতে রচনাকারী স্রষ্টা, তিনি তাঁহার সৃষ্ট জীবকুলের পুষ্টিদাতা পোষণকর্তা, পথপ্রদর্শকরূপে তিনি তাঁহার অবতারগণকে লোকশিক্ষার জন্য অবতার করান,—এক কথায়, সমগ্র গুণ, শক্তি ও পূর্ণতার তিনি আধার।

অনুরূপভাবে তিনি মনে করেন, ঈশ্বর এবং পরমাত্মা দেশকাল অতিক্রম করেন সত্য, কিন্তু তবুও ঈশ্বর এবং মানবকে স্বরূপতঃ এক মনে করা যায় না। আত্মা বস্তু-জগৎ হইতে পৃথক্, কিন্তু দেহের সংশ্রব স্বীকার করিয়া তাহা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহার স্বরূপগত আধ্যাত্মিকতার দিকেই ইহার স্বাভাবিক প্রবণতা, এবং ধর্মের অনুশাসনের প্রতি বশ্যতার মধ্য দিয়া ইহার সহজাত প্রবণতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া অশুভ প্রভাবসমূহকে রোধ করা যায়। সুতরাং দ্বিধাহীনভাবে পূর্ণ অবস্থা এবং নির্ভরতা লইয়া ঈশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিলে মানুষ পূর্ণতা অর্জন করিতে পারে।

এই দুই মতশাখার মধ্যে বিতর্কধারাটিকে তাহাদের অনুগামীরা অগ্রসর করিয়া নিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কোন নূতন যুক্তি উপস্থাপিত হয় নাই, অথবা নূতন কোন তত্ত্বপন্থারও উদ্ভব ঘটে নাই।

হিন্দু ও মুসলমান মরমিয়া দার্শনিকগণকে পরস্পরের নিকটে আনিবার জন্য ধর্মসমন্বয়পন্থীদের মধ্যে চিত্তাকর্ষক প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। ইহার মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল একদিকে দারা শিকোহ্-র চেষ্টা, অন্যদিকে ভক্তিধর্ম-আন্দোলনের নেতৃগণের প্রচেষ্টা।

পণ্ডিত হিসাবে দারা শিকোহ্-র কীর্তি ছিল বিস্ময়কর। নানা ধর্মের বিষয়ে এবং হিন্দু ও মুস্‌লিম দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ছিল সুগভীর। তখনকার দিনে পরিচিত সমস্ত উপনিষদেরই (সংখ্যায় বাহান্নটি) তিনি সংস্কৃত হইতে পারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, মুস্‌লিম মরমিয়াবাদ সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু ও মুস্‌লিম মরমিয়া দর্শনতত্ত্বের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

তিনি যে সমস্ত প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞানতত্ত্ব, পরাবিজ্ঞান ও নীতিতত্ত্বের বিষয় সম্পর্কিত। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুস্‌লিম উভয় সম্প্রদায়ের মরমিয়াতত্ত্বে জ্ঞানের প্রকৃতি ও প্রামাণ্যতা বিষয়ে এবং তাহা অর্জন করিবার পন্থা সম্পর্কে সদৃশ ধারণা প্রচলিত আছে। উভয় সম্প্রদায়ের মতে মানবিক ও ঐশ ভেদে দুই প্রকারের জ্ঞান আছে। প্রথমটি বুদ্ধি-আশ্রিত জ্ঞান, প্রদর্শন ও যুক্তির সহযোগে অর্জিত জগদ্বিষয়ক জ্ঞান, দ্বিতীয়টি অপরোক্ষানু-

স্মৃতির দ্বারা অর্জিত জ্ঞান, যে জ্ঞান বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া সত্যের অভিমুখে পরিচালিত করে। প্রথমটি ইন্দ্রিয়-সংবেদনের উপর নির্ভরশীল, অপরটি উদ্ভূত হয় তখন, যখন ইন্দ্রিয়-সংবেদন বিলুপ্ত। একটি প্রকাশ করে সর্তাধীন সত্যকে, অন্যটি ধ্রুবকে। সুফীগণ ইহাদের জ্ঞান (ইল্‌ম্) ও তত্ত্বজ্ঞান (মারিফত্) নাম দিয়াছেন, হিন্দুরা নাম দিয়াছেন ইহ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান (অপরা) এবং পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান (পরা)।

তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, সত্যের সমস্যা বিচারে হিন্দু এবং মুস্‌লিম উভয়পক্ষের মত একই। সত্য অখণ্ড, এবং তাহার তত্ত্ব অদ্বয়াত্মক (অদ্বৈত, তৌহিদ্)। এই সত্য হইতেছে নির্বিশেষ (পরম্, মুত্‌লাক্), ইহা সত্যের সত্য (সত্যস্য সত্যম, হকীকত্ উল্ হকাইক্), আলোর আলো (জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ, নূর্ আল্‌নুরিন্)। যাহা ইহা হইতে ভিন্ন (অন্যদ্, মাসিবা), তাহা শুধু চিত্তের বর্ণলেপ, কাল্পনিক সত্তা (মিথ্যা, কল্পনা, মায়া, মালুমে মা'দুম্ মাওজুদে মাওহম্), ইহা আবৃত (অব্যক্ত, বাতিন্), আবার ইহা প্রকাশিতও (ব্যক্ত, জাহির) বটে, সর্বাতিগ (সর্বব্যাপিন্, মুহীত্), এবং সর্বানুগ (অন্তর-যামিন্, সারী)। ইহা অনির্বচনীয় এবং অজ্ঞেয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলেন, "যাঁহার মধ্য দিয়া এই সমস্তের জ্ঞান লব্ধ হয়, তাঁহাকে কেমন করিয়া জানা যাইবে, জ্ঞাতাকে কেমন করিয়া কেহ জানিবে", এবং হুসেন অল্-নূরী বলেন :

"কারণ যুক্তিসিদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় না, জানা যায় কেবল ঈশ্বরেরই মাধ্যমে।"

কেনোপনিষদ্ বলেন :

"তাহাদের দৃষ্টি সেখানে প্রবেশ করে না, বচন নয়, মনও নয়", এবং জামি বলেন :

"সত্যের পরম মহিমময় স্বরূপ জ্ঞান বা দৃষ্টির অধিগম্য নহে।"

পরম সত্যের কোন অভিধা (নামন্, ইস্‌ম্) ও আকার (রূপম্, সিফত্) নাই, এবং তাহা পরিণামহীন ; তাহা যখন পরিণামকে আশ্রয় করে, তখন আপনাতে নাম ও আকার আরোপ করে এবং ভঙ্গী ও অবস্থার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। ঐতরেয় উপনিষদে বলা হইয়াছে, "আদিতে যথার্থই এই আত্মা একমাত্র ছিলেন, অন্য কাহারও পক্ষপাতন তখন ছিল না। তিনি চিন্তা করিলেন, এখন জগৎসমূহ সৃষ্টি করিব"। হাদীসী কুদ্‌সী বলেন, "আমি ছিলাম এক গুপ্তধন, তারপর আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করিলাম, সেই কারণেই আমি সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্পাদন করিয়াছি"।

প্রকাশ-পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কঠোপনিষদ্ অনুসারে হিন্দু পরিকল্পনাটি এইরূপ :

(১) ব্রহ্ম যাহা আত্মা ও বস্তুর অবিচ্ছেদ্য ঐক্যস্বরূপ ; অতঃপর (২) বিশ্বাত্মা (মহৎ-আত্মন্) এবং বিশ্ববস্তু (অ-ব্যক্ত); তারপর (৩) বিশ্বাত্মা হইতে ঐশী শক্তিসকল ও আত্মাসমূহ, এবং প্রকাশিত প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) ও ভৌতিক উপাদানগুলি ; পরে (৪) আত্মা এবং বস্তুর সঙ্গমস্থলরূপে মানুষ। ইবন্ অল্-অরবীর অনুসরণে সুফী পরিকল্পনাটিও উল্লিখিত তত্ত্বের অনুরূপ।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অবতরণ এবং ঈশ্বরের দিকে মানুষের উদ্গতি এই উভয় দিক সম্পর্কে হিন্দু ও মুস্‌লিম মরমিয়াগণের আচারপদ্ধতি এবং বিশ্বাসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যটি দারা শিকোহ্‌ নির্দেশ করিয়াছেন। উভয়েরই লক্ষ্য তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি। যখন শাশ্বতের উপলব্ধি চিত্তের শান্তিকে বিঘ্নহীন করে, তখনই ইহা অর্জিত হয় ; নিদিধ্যাসন (ধ্যান, মরাকুবাহ্‌) এবং নিয়মন (সংযম, মুজাহিদা) হইতেছে উপায়স্বরূপ, এবং সত্যদর্শন (সাক্ষাৎকার, মুশাহিদাহ্‌) ইহার লক্ষ্যস্বরূপ। মনঃপ্রক্রিয়ার চারিটি স্তর (ভূমি, মঞ্জিল্) আছে। প্রথম স্তরটি হইতেছে সাধারণ সজ্ঞানতা (জাগ্রৎ, নাস্থত্‌), দ্বিতীয়টি ভাবধ্যান (স্বপ্ন, মালাকুত্‌), তৃতীয়টি বহুত্বের মধ্যে ঐক্যের চেতনা (সুষুপ্তি, জবরুত্‌) এবং চতুর্থটি পূর্ণ অন্তর্নিবিষ্টতা (তুরীয়, লাহুত্‌), যাহার ফলে দেশ ও কালের চেতনা ও 'আমি' এবং 'তুমি'-র পার্থক্যবোধ লুপ্ত হয়, এবং মরমী সাধক 'আমি সেই' (সোঽহম্ অস্মি, অনল্ হক্) এই জ্ঞান লাভ করেন।

যে ভক্তি-আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং যাহা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে নৈতিক তাৎপর্য এবং মূল্যবোধ আনয়ন করিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল দুইটি। প্রথমতঃ ইহা ছিল বৈধীমার্গ এবং বহিরঙ্গ আনুষ্ঠানিকতার প্রতিবাদস্বরূপ। ইহা মানুষকে এই সত্যের উপলব্ধিতে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিল যে, ধর্ম এমন এক বিষয় যেখানে সমগ্র মন এবং আত্মার সমর্পণ ঘটে, তাহা শুধু ধর্মকৃত্য এবং অনুষ্ঠানসর্বস্ব ব্যাপার নহে, অথবা শাস্ত্রমত এবং শাস্ত্রোপদেশের বিষয়ও নহে। দ্বিতীয়তঃ অনেক মহাপুরুষের পক্ষ হইতে এই আন্দোলন ছিল হিন্দু ও মুস্‌লিমদের মধ্যে সমন্বয়ের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা, এবং উভয়ের নিকট ইহা প্রমাণ করিবার প্রয়াস যে মূলগত বিষয়ে তাহাদের সামান্যই পার্থক্য আছে। প্রেম এবং সেবা ছিল তাঁহাদের মূলমন্ত্র।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক ধর্মেই এই আন্দোলনের নেতৃবর্গের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের বাণী প্রধানতঃ সাধারণ মানুষদের জন্যই প্রচার করিয়াছিলেন, এবং পাণ্ডিত্যের ভাষা বর্জন করিয়া তাহাদের আঞ্চলিক ভাষাতেই বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বাসব, সিদ্ধরগণ, দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব এবং শৈব সাধুগণ, উত্তরাঞ্চলের কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম এবং অন্যান্য আরও অনেকে ভক্তিধর্ম বা প্রেমধর্ম শিখাইয়াছেন এবং প্রচার করিয়াছেন। কাহারও কাহারও উপাস্য ছিল নির্গুণ ব্রহ্ম, অন্যান্যেরা রাম এবং কৃষ্ণরূপে সগুণ ঈশ্বরের ভজনা করিতেন, কিন্তু সকলেই ছিলেন একতত্ত্ববাদী অথবা একেশ্বরবাদী, এবং তাঁহাদের ধর্মপরতা এবং বিশ্বাস ছিল আবেগস্নাত। সমস্ত জাগতিক বাসনার নিবৃত্তির মধ্য দিয়া হৃদয়ের পবিত্রতাসাধনে এবং মানব ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট সমর্পণে তাঁহারা বিশ্বাসবান্ ছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই ধারণা ছিল যে, শিষ্যকে আত্মোপলব্ধির দুর্গম পথে পরিচালনা করিবার জন্য গুরুর প্রয়োজন আছে। ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রবিদ্ পুরোহিতের প্রয়োজন তাঁহারা গণ্য করেন নাই, এবং উপবাস, তীর্থভ্রমণ, মূর্তিপূজা ও আড়ম্বরপূর্ণ পূজোপকরণ প্রভৃতির তাঁহারা নিন্দা করিয়াছেন। সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁহারা সকল মানুষের মূলগত সাম্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, এবং জাতিপ্রথা বর্জন করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের সর্ববাদী ধর্মে তাঁহারা সুফীতত্ত্বের সহিত বেদান্তের উপকরণগুলি মিলাইয়া লইয়াছিলেন, সকল প্রকার শাস্ত্রনির্ভরতা পরিহার করিয়াছিলেন, এবং যে সমস্ত আচার-সর্বস্বতা তাঁহাদের নিকট নিরর্থক ও বিরোধের উদ্দীপকরূপে গণ্য হইয়াছিল, সেই সমস্তের তাঁহারা নিন্দা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি প্রেমে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের সারল্যময় বিশ্বাস এবং তাঁহাদের ধর্মসমর্পিত জীবন এমন এক জীবন-দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এবং উন্নত চিন্তা ও নম্র জীবন-প্রণালীর এমন এক আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, যাহা ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে এক সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা করিয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

শিখ দর্শন

১। ভূমিকা

শিখধর্ম উহার গুরুগণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল: এই গুরুসম্প্রদায়ের প্রথম গুরু হইতেছেন নানক (১৪৬৯—১৫৩৮ খৃঃ) এবং অন্ত্যগুরু গোবিন্দ সিং (১৬৬৬—১৭০৮ খৃঃ)। গুরুনানকের ধর্মবিষয়ক কাব্যরচনাবলীর (গুর্বাণীর) মধ্যে শিখ দর্শন নিহিত আছে—ইহা অন্যান্য নয়জন গুরুর স্তোত্র সমূহে (শবদ্ সমূহে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ভাই গুর্দাস নামক একজন বিদ্বান ও ভক্ত শিখের গাথাসমূহে (ওয়ার্ সমূহে) উহা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই ভাই গুর্দাস পঞ্চমগুরু অর্জুনের (১৫৫৪—১৬০৬ খৃঃ) আত্মীয় ও সমসাময়িক ছিলেন।

গুরুনানক এবং অন্যান্য শিখ গুরুগণ যে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিবার জন্য কাব্য বা সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থসাহেবের প্রত্যেকটি পংক্তিকে যে গানের সুর দেওয়া হইয়াছে ইহার একটি মহা তাৎপর্য আছে। কবিতা এবং সুর মনের ভাবকে আবেগ, সৌন্দর্য, সংক্ষিপ্ততা এবং শক্তি প্রদান করে; এবং যে ব্যক্তি কবিতা আবৃত্তি করে অথবা গায় অথবা ভক্তির সহিত শ্রবণ করে তাহার অন্তঃকরণ আনন্দ ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে। কবিতায় ব্যক্ত ভাবের সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করা সম্ভবতঃ তাহার পক্ষে কঠিন হইতে পারে এবং হয়ত স্তোত্রের প্রত্যেকটি পংক্তিরই বিবিধ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—তথাপি তাহার মনের উপর উহার প্রভাব গভীর এবং প্রেরণাদায়ক—দুইই হইয়া থাকে। সে ভক্তি ও পরমানন্দের মধ্যে নিজেকে ভুলিয়া যায়।

গুর্বাণীতে, অর্থাৎ শিখ গুরুগণের স্তোত্রসমূহে, যে দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক ভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা অনুপ্রেরণা অথবা অলৌকিক প্রকাশের ফল; শুধু বৌদ্ধিক তর্ক অথবা যুক্তিবিচারের ফল নহে। স্বয়ং গুরুনানক এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

"ভগবদ্বাণী (আমার প্রভুর বাণী) আমার নিকট যে ভাবে আসে আমি সেইভাবেই উহা ব্যক্ত করি।" স্তোত্রসমূহের জন্ম অন্তর্জ্যোতির প্রকাশে—অনন্তের সুরের সহিত জীবাত্মার সুরের মিলনে। ইহারা ঐশ্বরিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত

অন্তঃকরণের উচ্ছ্বাস এবং একমাত্র ইহারাই ঐশ্বরিক অথবা আধ্যাত্মিক নামের যোগ্য। গুরু নানকের দর্শন তাঁহার ধর্ম অথবা নীতি হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে—জ্ঞান, সত্য, কল্যাণ এবং ঈশ্বর এই সবগুলিই তাঁহার নিকট অভিন্ন ছিল। সৎ সৎ নামের সহিত অর্থাৎ পবিত্রতম সত্তার পবিত্র নামের সহিত এবং সৎ আচারের সহিত জড়িত। এইভাবে তাঁহার দর্শনে জীবনের চরম মূল্যবান যে দুইটি পদার্থ সত্য এবং কল্যাণ উহাদিগকে একত্র করা হইয়াছে। গুরু নানক লিখিয়াছেন:

"অন্য সর্বপদার্থ হইতে সত্যের স্থান উচ্চে, কিন্তু সৎ আচারের স্থান আরও উচ্চে।" যে ব্যক্তি সদাচার ও প্রকৃত সংস্কৃতির অধিকারী তিনিই সম্যক্ ও সাক্ষাৎ উপলব্ধিরও অধিকারী; এবং সন্তজনই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ববেত্তা ও পথপ্রদর্শক; কারণ উর্ধ্ব হইতে তাঁহার উপর জ্ঞানালোক ঐশ্বরিক অনুগ্রহরূপে অবতীর্ণ হয়।

গুরু নানকের নিজ মনে অথবা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সন্তদের সহিত কথোপকথন কিংবা বাদবিবাদে যখন যে সকল দার্শনিক সমস্যা উঠিয়াছিল তখন তিনি সেই সকল দার্শনিক সমস্যা আলোচনা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের শেষের দিকে গুরু নানকের নিজের ভাষায় তাঁহার মতের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। গুরু নানক প্রত্যেক মানবীয় কর্মের মূল্য (তিনি এই অর্থে 'কিম্মৎ' এই ফার্সী শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন) নির্ধারণ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন; উহার সাময়িক অথবা মানবীয় দৃষ্টিতে মূল্য কি এবং উহার নিত্য অথবা ঐশ্বরিক দৃষ্টিতে মূল্য কি তাহা নির্ধারণ করা দরকার। তাঁহার মতানুসারে মানবীয় মূল্য সকল মনুষ্যরূপে—মনুষ্যের উপর নির্ভর করে এবং নিত্য মূল্য সকল পারমার্থিক সত্তায় অথবা ঈশ্বরে স্থিতরূপে মানুষের উপর নির্ভর করে। একমাত্র সন্তদের এই প্রকার মূল্যবান্ জীবনের মধ্যেই পরমতত্ত্বের উপলব্ধি সম্ভবপর—এই প্রকার পবিত্র জীবন নিজ মহিমায় মহিমান্বিত এবং উহা ঈশ্বরেরও একটি মহিমা। শিখ গুরুগণ এই প্রকার কঠোর জীবন যাপন করিয়াছিলেন, এবং দর্শনের সত্যসকল—উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর সত্যগুলিও—তাঁহাদের জীবনে মূর্ত আকার ধারণ করিয়াছে।

২। ঈশ্বর: একমাত্র সত্তা

শিখদের শাস্ত্রগ্রন্থ গুর্বাণীতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেব ও দেবীর নামের উল্লেখ দেখা যায় বটে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে শিখ গুরুগণ স্পষ্টতঃই বহুদেবতাবাদের অথবা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেবতাকে প্রাধান্য দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা স্পষ্টভাষায় একেশ্বরবাদেরই সমর্থন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শিখ ধর্মগ্রন্থের প্রারম্ভে '১' এই সংখ্যাটি আছে। শব্দের নানা অর্থ থাকিতে পারে অথবা নানা অর্থে উহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু সংখ্যার সম্বন্ধে একথা সত্য নহে। কারণ সর্বদাই উহাদের একই নির্দিষ্ট অর্থ থাকে। তাই পারমার্থিক সত্তার একত্ব ব্যক্ত করিবার জন্য '১' এই সংখ্যাটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই সংখ্যার পর ওম্ যুক্ত হইয়াছে, এবং উহা 'ইক ওঙ্কার' এইভাবে উচ্চারিত হয়। "ওম্ এই শব্দ দ্বারা যে সমস্ত ব্যক্ত হয় তাহা এক। তাঁহার যদি কিছু নাম দিতে চাও তাহা হইলে তাঁহাকে সত্য নামে অভিহিত কর। তিনি কর্তা, সর্বব্যাপী, নির্ভীক এবং অসূয়াবিহীন। তাঁহার সত্তা কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন নয়। তিনি অজ এবং স্বয়ম্ভু। গুরু-কৃপায় তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়।" এই কথা কয়টি শিখ ধর্মের মূলমন্ত্র বা কল্‌মা। দীক্ষার সময় প্রত্যেক নবদীক্ষিতকে এই মন্ত্রটি পাঁচবার উচ্চারণ করিতে হয়। তাঁহাকে ঈশ্বর, আল্লা অথবা রাম যে নামই দেওয়া হউক না কেন তিনি একই নিত্যসত্তা এবং এই এক নিত্যসত্তায় বিশ্বাস শিখধর্মের একটি মূল মত। তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা এবং তাহার সহিত নিজের সামঞ্জস্যস্থাপন করা ইহাই প্রত্যেক শিখের নিকট জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

গুরু নানক এবং তাঁহার পরবর্তী গুরুগণের মতে ঈশ্বর হইতেছেন এই বিশ্বের সর্ব দৃশ্য এবং অদৃশ্য পদার্থের একমাত্র স্রষ্টা। সংসার সৃষ্টির জন্য তাঁহাকে অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিতে হয় না। "তুমি নিজেই ফলক, লেখনী এবং ফলকস্থ লিপি। হে নানক, একের কথাই বল, দ্বিতীয়ের নামনির্দেশ কেন? তুমিই সর্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তুমিই এই জগৎ নির্মাণ করিয়াছিলে তুমি ছাড়া অন্য কেহই নাই। তুমিই সকলের মধ্যে অনুস্যূত। তুমিই তোমার পরিমাণ এবং উদ্দেশ্য জান এবং তুমিই তোমার মূল্য নিরূপণ করিতে পার। তুমি অজ্ঞেয়, অপরিমেয় এবং ইন্দ্রিয়াতীত কিন্তু গুরুর বাণীর সাহায্যে তোমাকে উপলব্ধি করা যায়।"

প্রকৃতি, মায়া, মোহ, গুণসকল, দেব ও দানবগণ এই সকলই তাঁহার সৃষ্টি। উহাদের অস্তিত্ব ঈশ্বর-নিরপেক্ষ নহে। "চেতন (পুরুষ) ও অচেতন (প্রকৃতি) পদার্থ সৃষ্টি করিয়া স্রষ্টা নিজেই তাঁহার হুকুম জারি করিয়াছেন।" "স্বয়ম্ভু সমগ্র সৃষ্টিরূপ নাটকটিকে রচনা করিয়াছেন। তিনি তিনগুণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মায়া ও মোহকে তীব্রতা প্রদান করিয়াছেন।" "তিনি বিষ্ণুর কোটি কোটি অবতার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কোটি কোটি বিশ্বে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিন কোটি কোটি শিবকে সৃষ্টি এবং সংহার করিয়াছেন এবং জগৎ

নির্মাণের জন্য কোটি কোটি ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমার প্রভু এত বড় প্রভু। আমি তাঁহার গুণের গণনা করিতে পারি না।" লোকেরা যাহা শুনিয়াছে তাহার পুনরুক্তি করে। শিবও প্রভুর 'মনকে' জানে না। তাঁহার অন্বেষণে সর্ব দেবগণ পরিশ্রান্ত। দেবীরাও তাঁহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে অসমর্থ। সেই অজ্ঞেয় পরব্রহ্ম ইহাদের সকলের উর্ধ্বে। তিনি তাঁহার ইচ্ছামত ক্রীড়া করেন। তিনি নিজেই সংযোজক এবং নিজেই বিয়োজক। কেহ কেহ সন্দেহে বিস্ময়াকুল হয়; অন্যেরা ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার করে। তিনি জগৎ সকল সৃষ্টি করেন এবং তাহার পর নিজেকে প্রকট করেন। সন্তদের প্রকৃত সাক্ষ্য শ্রবণ কর। তাঁহারা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন তাহাই বলেন। তিনি সর্ব পাপ ও পুণ্যের উর্ধ্বে। নানকের প্রভু হইতেছেন স্বয়ম্ভু।"

"সর্ব যুগে এবং সর্বলোকে একই জ্যোতি ব্যাপিয়া আছে। উহাতে বৃদ্ধিও নাই, হ্রাসও নাই এবং উহা কখনও বৃদ্ধি বা হ্রাসের অধীন হইবে না।" "যে সদ্বস্তুর কখনও মরণ অথবা জন্মান্তর হয় না, আমার প্রেম তাহাতেই নিরূঢ়। তিনি সর্বব্যাপী এবং তাঁহাকে কোনও কিছু হইতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তিনি দীনজনের দুঃখ কষ্ট দূর করেন। তাঁহার সেবকের নিকট তিনিই একমাত্র সদ্বস্তু। গুরুদেব আমাকে তাঁহার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। ওগো জননী এবং হে ভ্রাতৃবৃন্দ, সেই অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী এবং নিরঞ্জন প্রভুর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর। যে মায়া ও মোহ হইতে কাহারও সুখ হয় না তাহাদের প্রতি আসক্তিকে ধিক্। তিনি জ্ঞানী, উদার, উপকারী, পবিত্র, অনন্ত সৌন্দর্যের অধিকারী, সর্বোত্তম বন্ধু ও সহায়ক, উন্নত এবং অপরিমেয়। তাঁহার বাল্যও নাই, বার্ধক্যও নাই। তাঁহার দরবার চিরন্তন। তাঁহার দ্বারে আমরা যাহাই প্রার্থনা করি না তাহাই আমরা পাইয়া থাকি। তিনি দুর্বলের প্রধান অবলম্বন। তাঁহার দর্শন ঘটিলে সর্ব পাপ বিনষ্ট হয় এবং মন ও শরীর উভয়েই শান্ত হয়। মনের সর্ব সন্দেহ দূর করিয়া একচিত্তে সর্বগুণের সেই একমাত্র সাগরকে ধ্যান কর। তিনি চির তরুণ। তিনি যাহা কিছু দান করেন তাহাই নিখুঁত। দিবারাত্র তাঁহার ভজন কর; তাঁহাকে কখনও ভুলিও না।"

কোন কোন দার্শনিকের মতে পরমাত্মা হইতেছেন শুধু একটি সাক্ষী এবং অকর্তা—সৃষ্ট জগৎ মায়া অথবা প্রকৃতির খেলা। শিখগুরুগণ এই মত সমর্থন করেন না। "সেই অদ্বিতীয় এক ঈশ্বর সর্ব কারণ সমূহেরও কারণ, তাঁহা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। হে নানক, যিনি জল, মরু, পৃথিবী ও আকাশ ব্যাপিয়া আছেন

তাঁহার নিকট যেন আমি নিজেকে আহুতি দিতে পারি।" "তিনি প্রথমে নিজেকে সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার পর নামকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া উহাতে প্রবেশ করিলেন এবং নিজের সৃষ্টি সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন।

এই সংসারে যে অমঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায় তাহার ব্যাখ্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত উপস্থাপিত হইয়াছে। কোনও কোনও ধর্মোপদেশক দুই ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন; মঙ্গলের ঈশ্বর এবং অমঙ্গলের ঈশ্বর। অন্যেরা সয়তান অথবা অমঙ্গলের ঈশ্বরকে মঙ্গলের ঈশ্বরের নিম্নে স্থান দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে অমঙ্গল অথবা অবিদ্যা অনাদি, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা তাহা বিনষ্ট হইতে পারে। আবার অন্যদের মতে, যাহার ধ্বংস হইতে পারে তাহা কখনও অস্তিত্ববান্ নহে; কারণ, যাহা যাহা অস্তিত্ববান্ তাহা তাহা সর্বদাই থাকিতে বাধ্য; সুতরাং অমঙ্গলের মূল কারণ যে মায়া অথবা ভ্রান্তি তাহা অ-সৎ। তাই গুরুদাস একটি যথাযোগ্য উপমার সাহায্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "দেব ও দানবগণ সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে জীবনদায়ক অমৃত এবং মৃত্যুদায়ক বিষ উভয়ই উত্থিত হইয়াছিল।" কেন যে এইরূপ হইয়াছিল তাহা কেহই জানে না, কিন্তু সকলেই জানে যে আমরা যদি বিষভক্ষণ করি তাহা হইলে আমাদের মরণ হইবে, এবং যদি আমরা অমৃত পান করি তাহা হইলে অনন্তজীবন লাভ করিব।" গুরু অর্জুন এই জগৎকে মল্লযুদ্ধের একটি বৃহৎ অঙ্গনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য আত্মাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং অহঙ্কারের সঙ্গে লড়িতে হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন এবং আধ্যাত্মিক শক্তিবর্ধনের জন্য আমাদের সম্মুখে এই সকল প্রতিবন্ধক রাখা হইয়াছে। "আমি জগদীশ্বরের একটি সামান্য কুস্তিগীর; কিন্তু গুরুর সহিত দেখা হওয়ার পর আমি একটি উঁচু পাগ্‌ড়ী পরিয়াছি। আমরা কুস্তীর জন্য মিলিত হইয়াছি; স্বয়ং ঈশ্বর উহার দর্শক। দামামা, ডুগ্‌ডুগি নাকাড়া প্রভৃতি ঢাকসকল বাজিতেছে। কুস্তিগীররা অঙ্গনের চারিদিকে ঘুরিতেছে। গুরুদেব আমার পিঠ চাপড়াইলেন আর আমি পাঁচজন শত্রুকে ধরাশায়ী করিলাম। তাহারা আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য একই সঙ্গে সকলে ছুটিয়া আসিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে পরাজিত হইয়া মাথা হেঁট করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। যাহারা গুরুকে অনুসরণ করে তাহারা মূল্যবান পুরস্কার লাভ করে। যাহারা নিজেদের খামখেয়ালকে অনুসরণ করে তাহারা মূলধনও হারায়।"

সুতরাং শিখ গুরুগণ অনাদ্যনন্ত অকাল পুরুষকেই একমাত্র সত্যবস্তু বলিয়া গণ্য করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছেন যে অন্তিম সত্তা মূলতঃ এক। পরমাণুগুলিকে আরও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং আজকাল এরূপ মনে করা হয় যে বিভিন্ন প্রকার মৌলিক পদার্থ সকল বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক আধান (electric charge) সমূহদ্বারা গঠিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এখনও এই মত পরিত্যাগ করেন নাই যে প্রাণও চেতনা অচেতন ও নিষ্প্রাণ জড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু শিখ গুরুগণ যে অন্তিম সদ্বস্তুর গুণ গাহিয়াছেন তাহা হইতেছে একটি চেতন বস্তু। "তিনি বুঝেন, প্রত্যক্ষ করেন এবং এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থকে পৃথক্ করেন। তিনি এক আবার তিনি বহু।" "তিনি সৃষ্টি করেন এবং তিনি নিজেই ধ্বংস করেন। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি বুঝেন এবং তিনি চিন্তা করেন। তাঁহার শক্তিদ্বারা তিনি একই ক্ষণে বহু আকার ধারণ করেন।" সর্বভূতে যে চৈতন্যের আলো দেখা যায় তাহা তাঁহা হইতেই নিঃসৃত। সর্বভূতের মধ্যেই (চৈতন্যরূপ) প্রকাশ রহিয়াছে এবং এই প্রকাশ হইতেছে তিনি। "তাঁহার প্রকাশেই সর্ববস্তু প্রকাশিত।" "উচ্চ নীচ সর্বত্র প্রকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রভু বিরাজ করেন। হে সজ্জনগণ, তিনি প্রত্যেক পাত্রকে পূর্ণ করেন। পূর্ণ ভগবান্ সর্ব আকারে পরিব্যাপ্ত। প্রভু জলে এবং মরুভূমিতে উভয়স্থলেই আছেন। নানক সেই গুণসাগরের স্তুতি গায়। সদ্গুরু সর্ব সন্দেহ দূর করিয়াছেন। আমার হৃদয়-নিবাসী নিরন্তর অনাসক্ত থাকিয়াও সর্ববস্তুতেই প্রবিষ্ট।" এইভাবে ঈশ্বর জগতের মধ্যে অনুস্যূত আবার জগতের অতীত এই দুইটি ধারণার সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে।

ঈশ্বর কি জগৎ-রূপ রহস্যকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটি প্রকল্প মাত্র? অথবা তাঁহার বাস্তবিক সত্তাও আছে? এই প্রশ্নে বহু লোক বিভ্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে শিখ গুরুগণের কোনও রূপ সন্দেহ নাই। তাঁহারা বারবার বলিয়াছেন যে ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন। আমরা যেমন কোন বিষয়কে আমাদের হইতে পৃথক্-ভাবে জানি সেইভাবে আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না; কিন্তু আমরা নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ নিঃসন্দিগ্ধ তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সেইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি। পরম সদ্বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ অথবা যৌক্তিক প্রমাণের বহির্ভূত। "অপরিমেয়কে কি করিয়া পরিমাপ করা সম্ভবপর? তিনি যদি কোন ব্যক্তি হইতে পৃথক্ কোন বিষয় হইতেন তাহা হইলে সেইরূপ করা সম্ভবপর হইত। কিন্তু কেহই তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। তাঁহার মূল্যনিরূপণ

কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে?" কিন্তু তিনি অবাঙ্মানসগোচর হইলেও নিশ্চিতই আছেন। "হে সন্ত এবং ঈশ্বর-সেবক ভাইগণ, সদ্গুরুর সাক্য শ্রবণ কর—শুধু ভাগ্যবানেরাই ইহাকে অন্তরে স্থান দিবে। আমি গুরুর ঈশ্বর-বিষয়ক পবিত্র ও উদাত্ত-উপদেশামৃত ধীরে ধীরে পান করিলাম। তখন আলোক আবির্ভূত হইল এবং সূর্য যেমন রাত্রিকে অপসারিত করিয়া দেয় তেমনভাবে অন্ধকার তিরোহিত হইল। গুরুর কৃপায় আমি স্বচক্ষে সেই অদৃশ্য এবং অজ্ঞেয়, নিরঞ্জন এবং দুরধিগম্য সত্তাকে দর্শন করিলাম।" "আমার প্রিয়তমকে যে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় তাহা চর্মচক্ষু হইতে ভিন্ন।" পঞ্চমগুরু এই ভগবৎ-উপলব্ধির বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন :

"আমাদের অন্তরে এবং বাহিরে একই অনন্ত ঈশ্বর বিরাজ করেন। সর্বপাত্রে প্রভু ব্যাপিয়া আছেন। তিনি স্বর্গ, মর্ত, পাতাল এবং সর্বলোক পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন এবং তাহাদের ধরিয়া রহিয়াছেন। অরণ্যের প্রত্যেকটি তৃণে পরমাত্মা বিদ্যমান। তাঁহারই আদেশে সকলে কর্ম করে। তিনি বায়ুতে, জলে এবং অগ্নিতে। তিনি চারিপার্শ্বে এবং দশদিকে বিরাজ করেন। এমন স্থান নাই যেখানে তিনি বিদ্যমান নহেন। গুরুর কৃপায় এই সত্য উপলব্ধি করিয়া শান্তি লাভ কর। বেদে, পুরাণে এবং স্মৃতিতে তাঁহাকে দর্শন কর। তিনি চন্দ্র, সূর্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জসমূহে ভরিয়া আছেন। সকলে প্রভুর ভাষাই বলে। তিনি কখনও কম্পিত অথবা বিচলিত হন না। তিনি পূর্ণ শক্তিসকল ধারণ করিয়া ক্রীড়ায় রত। কেহ তাঁহার পরিমাপ করিতে পারে না। তিনি অমূল্য গুণসকলের অধিকারী। সব জ্যোতির্ময় বস্তুতে তাঁহারই প্রকাশ ভরিয়া রহিয়াছে। প্রভু উহাদিগকে ওতপ্রোতভাবে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হে নানক, গুরুর কৃপায় যাহাদের সংশয় দূর হইয়াছে তাহাদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস।" গুরু নানক ঈশ্বরের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন : "তোমার হাজার হাজার চক্ষু আছে, কিন্তু কোন চক্ষুই তোমার নয়। তোমার হাজার হাজার রূপ আছে, কিন্তু কোন রূপই তোমার নয়। তোমার হাজার হাজার পা আছে কিন্তু কোন পাই তোমার নয়। তোমার একটিও নাসিকা নাই তথাপি তোমার হাজার হাজার নাসিকা আছে। তোমার এই ক্রীড়ায় আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি।"

ঈশ্বর আছেন ; তিনি তাঁহার নিজ শক্তিতে মানুষ ও বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য হইতেছে পরমসত্যকে উপলব্ধি করা, ইহাই শিখধর্মের সারতত্ত্ব।

৩। সৃষ্টির উদ্দেশ্য

সৃষ্টি কেন এবং কি করিয়া হইল, শিখগুরুগণ এই প্রশ্নের কোন পারিভাষিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা সৃষ্টিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। "তাঁহার আদেশে সর্বরূপের উৎপত্তি। ভাষায় এই আদেশের বর্ণনা দেওয়া যায় না। তাঁহার আদেশে সর্বপ্রাণ সৃষ্ট হইয়াছে এবং সর্বপ্রগতি তাঁহার আদেশদ্বারা নিয়ন্ত্রিত।" এমন এক কাল ছিল যখন বিশ্ব ছিল না। "অগণিত যুগ ধরিয়া শুধু অন্ধকার বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, ছিল শুধু অনাদ্যন্ত আদেশ। দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না, না ছিল সূর্য, না চন্দ্র।" "তাঁহার যখন ইচ্ছা হইল তখন তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু কখন যে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল একথা কেহই জানে না। কোন ঘটিকায় কোন সময়ে কোন চান্দ্র এবং সৌরদিবসে কোন ঋতুতে কোন মাসে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছিল? পণ্ডিতেরা এই ঘটিকার কথা জানিতেন না, তাহা না হইলে পুরাণে ইহার নির্দেশ করিতেন। কাজীরা ঐ সময়ের কথা জানিতেন না, তাহা না হইলে তাঁহারা কোরাণে উহা লিখিয়া রাখিতেন, যোগিগণ ঐ চান্দ্র অথবা সৌরদিবসের কথা জানেন না; অন্য কেহ সেই মাস অথবা ঋতুর কথা জানে না। যে স্রষ্টা এই বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন শুধু তিনিই এই সকল কথা জানেন।" সিদ্ধগণ যখন গুরু নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকলের প্রারম্ভ সম্বন্ধে আপনার মত কি তাহা আমাদিগকে বলুন। সৃষ্টি করার চিন্তা মনে আসিবার পূর্বে ঈশ্বর কি অবস্থায় ছিলেন?" গুরু নানক উত্তর দিলেন, "এই সকল কিভাবে আরম্ভ হইল এই প্রশ্নের চিন্তা করিলে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। সৃষ্টির পূর্বেও তিনি সর্বব্যাপী ছিলেন।"

শিখ গুরুগণ এই মত সমর্থন করেন না যে সৃষ্টির আদিও নাই, অনন্ত নাই। অবশ্য তাঁহারা এই কথাও বলেন যে সৃষ্টিও প্রলয়ের ক্রিয়া যে কতবার সংঘটিত হইয়াছে তাহার কোন গণনা নাই। গুরু অর্জুন এই সমগ্র ক্রিয়াটিকে ঐন্দ্রজালিকের খেলার সহিত উপমা দিয়াছেন।" "ঐন্দ্রজালিক যখন তাহার খেলা দেখায় তখন সে বিবিধ রূপ ও পোষাকে দেখা দেয়। যখন সে তাহার ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলে তখন সে শুধু নিজেই থাকে। যে সকল রূপ দৃষ্ট হইয়াছিল কে উহাদিগকে বিনষ্ট করিল? উহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কোথায়ই বা গেল? জলে অসংখ্য ঢেউ উঠে, সোনা হইতে বিবিধ অলঙ্কার নির্মিত হয়। বিবিধ বীজ বপন করিয়া দেখা গেল যে ফল পাকিলে উহা হইতে একই বীজ বাহির হয়।

সর্ব ঘটে একই আকাশ বিদ্যমান, ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে আকাশ পুনরায় তাহার একত্ব প্রাপ্ত হয়। সংশয়, লোভ এবং আসক্তি এইগুলি সকলেই মায়ার বিভিন্ন রূপ। সংশয় বিনষ্ট হইলে শুধু তিনি থাকেন: তিনি অবিনশ্বর; এবং তাঁহার কখনও মৃত্যু হয় না। আগমনও নাই গমনও নাই। পূর্ণগুরু আত্মার অবিশুদ্ধি দূর করিয়াছেন এবং নানক উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন।"

কোন কোন দার্শনিক দৃশ্যপদার্থমাত্রেরই সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু শিখ গুরুগণের মত এই যে সর্বদৃশ্য পদার্থই সদা পরিবর্তনশীল হইলেও উহারা সৎ। "তিনি নিজেও সৎ এবং তিনি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাও সৎ।" "তাঁহার ক্রিয়াসকল সৎ এবং তজ্জন্য তাঁহার সৃষ্টিও সৎ। সৎ মূল হইতে সৎ-ই-উৎপন্ন হয়।" "তোমার বিশ্ব সৎ এবং উহার অংশ সকলও সৎ। তোমার (স্বর্গমর্ত্যাদি) লোক সকল সত্য এবং তাহাদের আকারও সত্য। তুমি যাহা কিছু কর তাহাই সত্য। (বিশ্বে) প্রতিফলিত তোমার সর্বরূপই সত্য।" "এই সংসার সত্য-স্বরূপের আবাস-স্থল। সত্য-স্বরূপ ইহাতে বাস করেন।" সুতরাং আমার কোন অবাস্তব স্বপ্নলোকে আছি কি না এই প্রশ্নই উঠে না। জীবন সত্য। সমগ্র সৃষ্টির পশ্চাতে একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ যখন তাহার অস্মিতাকে বিনাশ করে শুধু তখনই এই উদ্দেশ্য তাহার নিকট প্রকাশিত হয়।

কোন কোন দর্শনে ঈশ্বরব্যতীত জড়প্রকৃতি এবং জীবাত্মা সকল এই দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থও স্বীকার করা হইয়াছে। তাহাদের যুক্তি এই যে ঘট নির্মাণ করিবার জন্য কুম্ভকারকে মৃত্তিকা ও চক্রের সাহায্য লইতে হয়, সুতরাং জগৎ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরকেও কোন কোন উপাদান ও যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু ইহা শিখগুরুদের মত নহে। "সর্ব আকার ও বর্ণ, বায়ু, জল, অগ্নি প্রভৃতির বিবিধ সমুদায় সকল সেই এক হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে প্রভুর বিভিন্ন রূপ বলিয়া জানিবে। শুধু একটিমাত্র বিস্ময় আছে, সম্পূর্ণভাবে এক; কিন্তু এই অনুভূতি শুধু অল্প কয়েকজনই গুরুর কৃপায় লাভ করে।" "তুমিই সেই বৃক্ষ; তোমারই শাখা সকল মুকলিত হইয়াছে। তুমি ছিলে অদৃশ্য, হইলে দৃশ্য। তুমিই সমুদ্র, তুমিই ফেনা, তুমিই বুদ্বুদ। তোমা ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই দেখিতে পাই না। তুমি মালার সূত্র, তুমিই গুটিকাসকল, তুমিই গ্রন্থি এবং তুমিই শীর্ষস্থ প্রধান গুটিকা। একই প্রভু আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে বিদ্যমান। তিনি ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না।" সুতরাং তিনি সৃষ্টির নিমিত্তকারণ (কর্তা), উপাদানকারণ এবং উদ্দেশ্যকারণ।

এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? "প্রভু সন্তের জন্য এই বিশ্বকে ধারণ করেন।" অর্থাৎ, মানবাত্মার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য ধারণ করেন। শিখ ধর্মগ্রন্থে 'সন্ত' শব্দ সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি স্বীয় জীবনের প্রতিমুহূর্তে অসীমের সহিত একতাপন্ন। পূর্ণ মানুষের লক্ষণও একই রকম শব্দে দেওয়া হইয়াছে। আমরা সেই মহা মহাজনপ্রদত্ত কিছু মূলধন সঙ্গে লইয়া এই জগতে আসিয়াছি। আমাদিগকে সেইভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে যাহাতে এই ব্যবসায়ের এই মূলধন নষ্ট না হয়, বরং শতগুণে বর্ধিত হয়; তাহা হইলেই আমরা যখন তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইব তখন আমরা সাদর অভ্যর্থনা পাইব।

৪। মানব-ব্যক্তি অথবা অহম্

"হে মানব, তুমি প্রকাশেরই প্রতিমূর্তি, তোমার স্বরূপকে অবগত হও"—ইহাই মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে শিখ ধর্মের মূল ধারণা। সর্বজীবের মধ্যে প্রাণ ও চৈতন্য বিভিন্ন মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের বর্তমান জ্ঞানে যতদূর পর্যন্ত জানা যায় তাহাতে মনে হয় যে মানুষের মধ্যেই উহাদের সর্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ হইয়াছে। "অন্যান্য প্রাণীরা তোমার সেবার জন্য। তুমিই এই পৃথিবীর প্রভু।" প্রাণ ও চৈতন্য ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ হইতে বিবর্তিত হইয়াছে এই জড়বাদী মত শিখগুরুগণ স্বীকার করেন না। "হে আমার দেহ ঈশ্বর তোমাতে চেতনা অর্পণ করিলেন এবং তাহার পর তুমি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে। জীবাত্মাকে (অহংকে) সৃষ্টির একটি সাধন (যন্ত্র) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরমাত্মা অহংকে (অস্মিতাকে) বিশ্বসৃষ্টির জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন যোগী গুরু নানককে যখন জিজ্ঞাসা করেন "কি করিয়া বিশ্ব সৃষ্ট হইল?" তখন তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "অহং জগদুৎপত্তির কারণ" গুরু নানক তাঁহার অসা-দি বারে (অসা-রাগে গেয় গাথাতে) এই কথা আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন। "অহম্-ই-ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান, সর্ব কর্ম এই অহম্-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। যে বন্ধনে আমরা বারবার সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হই তাহারও কারণ অহম্। এই অহং কোথা হইতে আসে? ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই অহং স্বীয় কর্মদ্বারা আবদ্ধ হইয়া আসা যাওয়া করে। এই অহং একটি দৃঢ়মূল রোগ কিন্তু ইহারও প্রতিকারের উপায় আছে। ঈশ্বর কৃপা করিলে এবং মানুষ গুরুর আদেশ অনুযায়ী আচরণ করিলে নানক বলে হে ঈশ্বরের সেবকগণ, শোন, এইভাবে এই রোগ তিরোহিত হয়।"

সংক্ষেপে শিখধর্মে জীবাত্মার ধারণা এই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় চৈতন্ত-সাগরে বদ্বুদ উত্থিত হয়। এইগুলি পরস্পর হইতে পৃথক্ জীবাত্মা। ইহারা তাহাদের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতিক্রিয়া করায় তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন স্বভাব বিকশিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মার সৃষ্টি কার্যকে 'বিয়োগ' অর্থাৎ বিভক্তীকরণ এই নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ সত্তার উপর গুরুত্ব অর্পণ করিলে বহু সমস্যার উদ্ভব হয়। তখন মানুষের মনে স্বামিত্ব অর্থাৎ 'ইহা আমার' এইরূপ ধারণার উৎপত্তি হয় এবং তাহারা অন্তের আক্রমণ হইতে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিবার চেষ্টা করে ও এইভাবে তথাকথিত 'জীবন-সংগ্রাম' সুরু হয়; এবং যতকাল পর্যন্ত আমরা শুধু শরীরের স্বার্থের দিকেই দৃষ্টিপাত করি ততদিন পর্যন্ত এই সংগ্রাম তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে। "অহং-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত কার্য আমাদের গলার বন্ধনরূপে পরিণত হয়। আমরা অহং-কে আঁকড়াইয়া থাকি এবং পায়ে শৃঙ্খল পরি।" "লোভ হইতেছে কারাগারের অন্ধ কুঠরী এবং আমার দুষ্কর্মগুলি হইতেছে আমার বন্ধন।" "হে নানক, তোমার চরিত্রের যত দোষ তোমার গলায় ততগুলি পাপ।" কর্ম-মাত্রই আমাদের মানসিক গঠনের উপর দাগ রাখিয়া যায়। একই কর্ম বারবার করিলে এই দাগগুলি গভীরতর হয় এবং ইহারা অভ্যাসে পরিণত হয় ও কালক্রমে ইহাদের দ্বারা আমাদের মানসিক প্রবণতাসকল নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন এক বিশিষ্ট প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমাদের প্রবণতাগুলি আমাদিগকে বিশিষ্ট দিকে চালিত করে এবং আমরা আমাদের অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ি। এইভাবে আমাদের অতীত কর্ম আমাদের বর্তমান কর্মকে প্রভাবিত করে। গুরু নানক তাঁহার 'রাগ-মরু'তে লিখিয়াছেন :—

"মন হইতেছে কাগজ এবং আমাদের কর্ম হইতেছে কালি। পাপ ও পুণ্য এই দুইটি হইতেছে উহাতে লিপিবদ্ধ লেখনদ্বয়। আমরা যে সকল কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হই তাহারা আমাদের অতীত কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত—হে ঈশ্বর, তোমার গুণের অন্ত নাই। ওহে পাগল, ঈশ্বরকে ভুলিয়া গেলে যে তোমার সর্ব সদ্‌গুণ নষ্ট হইবে এই কথা কেন বারবার চিন্তা কর না? দিবস ও রাত্রি এমন জালে পরিণত হইয়াছে যাহাতে তুমি দণ্ড (২৪ মিনিট পরিমিত কাল খণ্ড) অথবা কালের হাতে ধরা পড়িয়াছ। প্রত্যহ আহার করিবার সময় তুমি তাহাদের হাতে ধরা পড়িতেছ। হে মূর্খ, কি ভাবে মুক্ত হইতে পার তাহা কি তুমি জান? শরীর একটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে, মন যেন তত্রত্য লৌহখণ্ড, এবং পাঁচটি

অগ্নি (কাম, লোভ, ক্রোধ, আসক্তি ও অহমিকা) উহাকে দগ্ধ করিতেছে। তোমার পাপকৃত্য সকল নূতন ইন্ধন যোগাইতেছে, এবং চিন্তাদোষে আক্রান্ত হইয়া তোমার মন জ্বলিতেছে।"

এই দুঃখভোগ কি করিয়া শেষ করা যায় ? গুরু কহেন, সর্ব জীবাত্মা যে একই সমুদ্রের বুদ্বুদ এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার ফলেই এই দুঃখভোগ হয়। শরীরসকল পরস্পর হইতে ভিন্ন বটে, কিন্তু উহারা সকলে একই জ্যোতি দ্বারা আলোকিত। "তাহারা সকলে আলোকে পরিপূর্ণ, এবং তিনিই সেই আলোক। তাঁহার প্রকাশে সর্ব বস্তু প্রকাশিত", এই জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্র মানুষের জীবন পরিবর্তিত হয়। উপরে উদ্ধৃত স্তোত্রের শেষ দুই চরণে গুরু নানক এই অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইবার পথ নির্দেশ করিয়াছেন :

"যে গুরুর নিজ জীবনে সেই পরিবর্তন ঘটিয়াছে মানুষ যদি তাঁহার কাছে যায় তাহা হইলে যে মন অপদার্থ হইয়া গিয়াছে তাহাই আবার সোনায় পরিণত হইতে পারে। সে নামের অমৃত মুখে রাখে এবং তাহাতে তাহার শরীরের আগুনগুলি নিভিয়া যায়।" গুরু জীবাত্মাগুলির পৃথকত্বের উপর জোর না দিয়া তাহাদের ঐক্যের উপর জোর দেন। "আমরা সকলে একই পিতার সন্তান।" "আল্লা প্রথমে আলোক সৃষ্টি করেন। সর্ব প্রাণী তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একই আলোক হইতে ভালো মন্দ সমগ্র বিশ্ব নিঃসৃত হয়।" তাহার পর সংযোগের অর্থাৎ স্বীয় উদ্গমস্থলের সহিত আত্মার মিলনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় ; বিয়োগ (পৃথক্ পৃথক্ হওয়া) ও সংযোগ (মিলন) এই দুই অন্তের মধ্যে সমগ্র জীবন।

৫। গুরু : তাঁহার আবশ্যকতা

নৈরাশ্য ও অসহায়তার পঙ্ক হইতে বহির্গমনে মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য গুরু (ধর্মশিক্ষক) আবশ্যক। শিখগুরুগণ অবতারবাদে বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হন না, কিন্তু মানুষকে সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য সময়ে সময়ে তাঁহার সেবকগণকে প্রেরণ করেন। ঈশ্বর এবং গুরুর মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য এবং শিখগুরুদের মতে গুরুকে ঈশ্বর বলা ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ। গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করার প্রথা বন্ধ করিবার জন্য গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁহার অনুবর্তিগণকে স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাষায় বলিয়াছেন "যাহারা আমাকে ঈশ্বর বলে তাহারা নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। আমি ঈশ্বরের একজন সেবক এবং এই জগৎলীলা দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি তাঁহার সেবকদের মধ্যে একজন ;

ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।" কিন্তু গুরু কে? "যিনি প্রকৃত পুরুষকে জানিয়েছেন তিনিই প্রকৃত গুরু। তাঁহার সহবাসে শিষ্য প্রভুর স্তুতিগান করিয়া উদ্ধার পাইবে।" "জয় সেই সদ্‌গুরুর জয়, যিনি পরম সত্যকে জানিয়াছেন এবং যাঁহার দর্শনে কামতৃষ্ণা দূর হয় এবং শরীর ও মন শান্ত হয়। সেই সদ্‌গুরুর জয় যিনি সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। জয়, সেই সদ্‌গুরুর জয় যাঁহার কোন অসূয়া নাই এবং যাঁহার নিকট প্রশংসা ও নিন্দা এক। জয়, সেই সদ্‌গুরুর জয়, যাঁহার মন নিরন্তর ব্রহ্ম ধ্যান করে। জয় সেই সদ্‌গুরুর জয় যিনি নিরাকার অসীমতত্ত্বের সহিত ঐক্যলাভ করিয়াছেন। জয়, সেই সদ্‌গুরুর জয়, যিনি লোকদিগকে সত্যের অনুশীলন করান। হে নানক, জয়, জয় সেই সদ্‌গুরুর জয় যিনি আমাদিগকে তাঁহার নাম প্রদান করেন।" "সেই সদ্‌গুরুর, সেই বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ কর যাঁহার মনে সদ্‌গুণের সাগর বিরাজ করে। সেই সদ্‌গুরু, সেই প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাৎ কর যিনি স্বীয় অস্মিতাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। সেই পরম গুরু ধন্য যিনি তাঁহার উপদেশ দ্বারা সমগ্র জগতের সংস্কার সাধন করেন। যে জীবাত্মা পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন এবং উপরে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী তিনিই গুরু।

শিষ্যের পক্ষে গুরুর প্রতি দ্বিধাহীন শ্রদ্ধা অত্যাবশ্যক। শিখ ধর্মানুসারে ধর্ম-জীবন এমন একটি সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় যাহা শুধু গুরুর হস্তে নিজকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়াই লাভ করিতে পারে। এইরূপ ধর্মজীবনকে একটি নূতন জন্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। "আমি যখন গুরুর সন্নিধানে নবজন্ম লাভ করিলাম তখন আমার জন্মমৃত্যুর ধারা শেষ হইল।" কোন কোন অবস্থায় শিষ্যের পক্ষে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম না করিয়া গুরুনির্দিষ্ট কর্ম করাই কর্তব্য। এইরূপ শিষ্য তাহার অতীত কর্মের কবল হইতে মুক্ত হয়, আমাদের অতীত কর্ম আমাদের ইচ্ছা ও বাসনার মধ্য দিয়া আমাদের বর্তমান কর্মকে প্রভাবিত করে। আমরা যখন আমাদের নিজ ইচ্ছা ও অভ্যাস দ্বারা আর প্রভাবিত হই না এবং গুরুর আদেশ অনুসারে কর্ম করি তখন এই সকল বাসনা ধীরে ধীরে জীর্ণ হইতে থাকে এবং পরে আমাদের অতীত কর্ম বিনষ্ট হয়। "অতীত কর্মের ভার উঠিয়া যায়, আমরা ফলের ইচ্ছা না করিয়া কর্ম করি। গুরুর ধর্ম অনুসরণ করিয়া আমরা ভবসাগরের পারে পৌঁছিয়াছি।" "নানক বলে যে আত্মা কর্ম-নিয়মের অধীন। সদ্‌গুরুর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আত্মা মুক্তিলাভ করিতে পারে না।" "যে শিষ্য গুরু গৃহে থাকিতে চাহে, সে নিজেকে গুরুর ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবে। তাহার পক্ষে স্বীয় অহং-কে পরিত্যাগ করিয়া মনে হরিকে ধ্যান করা কর্তব্য। যে নিজের

মনকে গুরুর নিকট বিকাইয়া দেয় শুধু সেই শিষ্যেরই প্রযত্ন সফল হয়। যে ফলাকাঙ্ক্ষা বিনা সেবা করে, সে প্রভুকে পায়।"

শিখগুরুদের মতে ইহার জন্য সংসার অথবা পারিবারিক জীবন ত্যাগ করা আবশ্যক নহে। বরং শিখধর্মাবলম্বীকে এইরূপ আদেশ দেওয়া হয় যে সে নিজের জীবিকা অর্জন করিবে এবং স্বীয় সম্পত্তি অন্যের সহিত মিলিতভাবে ভোগ করিবে। "যে নিজের উপার্জিত অন্নভক্ষণ করে এবং অন্যকে উহার কিছু অংশ দান করে, শুধু সেই (শিখ-) পন্থকে জানে।" অহম্-এর উপর প্রতিষ্ঠিত কর্ম বন্ধনের কারণ, কিন্তু নিঃস্বার্থ কর্ম মানুষকে সর্বশৃঙ্খল হইতে যুক্ত করে। সুতরাং যে ব্যক্তি ফলের কামনা ব্যতীত সেবা-পরায়ণ জীবন যাপন করেন তিনিই শিখদের আদর্শ। "যে ব্যক্তি সত্যকে জানে তাহার মন পরোপকারের জন্য সদা ব্যগ্র থাকে।" গুরুর উপদেশ অনুসারে কাজ করিলে শিষ্য নৈতিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। "যে ব্যক্তির অন্য লোকের অর্থ ও স্ত্রীর প্রতি লোভ পোষণ করে না, ঈশ্বর তাহার খুব নিকটে বাস করেন।" "অন্যের সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিলে সে তাহাকে মাতা ভগ্নী অথবা কন্যা বলিয়া জ্ঞান করিবে। হিন্দু যেমন গোমাংস এবং মুসলমান যেমন শূকরমাংস বর্জন করে তেমনই সে অন্যলোকের সম্পত্তি বর্জন করিবে। নিজের স্ত্রী ও সন্তানাদির প্রতি আসক্তি দ্বারা তাহার এতটা অভিভূত হওয়া উচিত নয় যে তাহাদের জন্য সে অন্যকে প্রতারণা এবং অন্যের প্রতি অত্যাচার করিবে। নিজ কর্ণে নিন্দা বা প্রশংসা শুনিলেও তাহার কখনও গালি দেওয়া কর্তব্য নহে। ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাহার পক্ষে অহঙ্কার বশতঃ কখনও অন্যকে দুঃখ দেওয়া কর্তব্য নহে। এইরূপ শিষ্য গুরুর সাহায্যে শান্তিফল প্রাপ্ত হয়। সে রাজযোগীর সুখ ও আনন্দ প্রাপ্ত হয়।"

এই প্রসঙ্গে শিখগুরুগণ অপর একটি মতও প্রতিপাদন করিয়াছেন। গুরুর শরীর গুরু নহে। তাঁহার বাণীই গুরু। "বাণী হইতেছে গুরু এবং গুরু হইতেছে বাণী, বাণীই সর্ব অমৃতের আধার। যে শিষ্য গুরুর বাণী পালন করে, তাহাকে গুরু নিশ্চয়ই ভবসাগর পার করাইবেন।" অতএব গুরু দেহের সম্মুখে নতি অথবা গুরুর দর্শনে শিষ্যের কোনও পুণ্য হয় না। "নবদীক্ষিতগণ ও শিষ্যগণ সকলেই গুরুর নিকট আসে এবং হরির সর্বোত্তম স্তুতি গান করে। কিন্তু যাহারা যথার্থভাবে গুরুর আদেশ পালন করে শুধু তাহাদের স্তুতিগানই হরি গ্রহণ করিবেন এবং তাহাদের কথাই শুনিবেন।" "গুরুর উপদেশ অনুসারে নিজের মনকে নূতনভাবে গঠন কর। যাহা আবশ্যক তাহা হইতেছে হৃদয়ের পরিবর্তন শুধু

কোনও মতের আনুষ্ঠানিক গ্রহণ অথবা বৌদ্ধিক জ্ঞান নহে। নানক বলেন, "যে প্রকৃত 'আদেশ' জানে সে 'আমি আছি' এরূপ বলিবে না।" সর্ব ধর্ম-সাধনার উদ্দেশ্য হইতেছে অহংকে বিলোপ করা; তাহা না হইলে "মানুষ কোটি কোটি সৎকৃত্য করিতে পারে বটে, কিন্তু অহম্-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার সব কিছুই নিষ্ফল, তাহার শুধু পরিশ্রমই সার হইবে।"

৬। সংযোগ (ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার মিলন)

এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষের ভাব অথবা চিরন্তন বৌদ্ধিক অস্থিরতা অথবা ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির প্রতি একটি সাধারণ সন্দেহমূলক দৃষ্টি উৎপন্ন করে, কিন্তু শিখধর্ম এরূপ করার পরিবর্তে শ্রদ্ধা, একাগ্রতা, মানসিক শান্তি ও বিশ্বপ্রেমকে তত্ত্বোপলব্ধির ও আত্মার চরম মুক্তির জন্য অত্যাবশ্যক মনে করে। শিখ মতানুসারে আত্যন্তিক সন্দেহ ও অসন্তোষের অবস্থায় কোনও মহৎ কাজই সম্পাদন করা সম্ভব নহে।

প্রেম আত্ম-পরের ব্যবধান দূর করে, অহম্-এর পরিসর বৃদ্ধি করে এবং আত্ম-ত্যাগ, অনাসক্তি ও আত্মসমর্পণের ভাব জন্মায়—ইহাতে সমাজে অত্যাচারের পরিমাণ হ্রাস হয় ও যে বিবাদ কলহ দুঃখ কষ্টের মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় উহার অবকাশ প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়।

শিখ ধর্মগ্রন্থের প্রত্যেক পংক্তিরই সুর দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্তোত্র বা পদের আরম্ভে উহা কিভাবে গাহিতে হইবে তৎসম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া থাকে। প্রত্যেক গুরুদ্বারে সংকীর্তন দৈনিক উপাসনার একটি অঙ্গ। যে শিষ্য গুরুর শরণ লইয়াছে তাহাকে প্রত্যহ শিখপন্থে অবিচলিত থাকার স্বীয় সঙ্কল্প দৃঢ় করিবার জন্য সৎ-সঙ্গের আশ্রয় লইতে হয়। কীর্তন শ্রবণ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। "কীর্তন একটি অমূল্য রত্ন"। সঙ্গীতে অন্তঃকরণ কোমল হইলে উহার গুরুর উপদেশামৃত পান করিবার জন্য অধিক উপযুক্ত হয়। অন্যের সেবা করিয়া সে নিজের অহমিকাকে বিনষ্ট করে এবং তখন গুরুর চরম ও সর্বশ্রেষ্ঠ দান যে নাম তাহা তাহার মনে স্থায়ীভাবে নিবাস করে। শিখ ধর্মগ্রন্থে 'নাম' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে: যে সর্বব্যাপী পরমাত্মা বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন তাঁহার অভিধা ও প্রতীক। নামের নিরন্তর ধ্যানের দ্বারা অহং সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হয়। "নাম ও অহং পরস্পরের বিরোধী, উহারা একই স্থলে থাকিতে পারে না", এবং শিষ্য যখন সপ্রেম ভক্তিতে নিজ মনে অনুক্ষণ নাম ধারণ করে, তখন সে আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ স্তরে উপনীত

হয়। "একটি কিরণ সূর্যের সহিত মিলিত হয় এবং সলিল সলিলে প্রবাহিত হয়। আলোক আলোকের সহিত মিশিয়া যায়, পূর্ণতা সম্পাদিত হয়।" শিষ্য সক্রিয় সে বার জীবন যাপন করে আর ইহা শুধু সৎসঙ্গ দ্বারাই সম্ভব ; সঙ্গে সঙ্গে সে কীর্তন ও নামকে আশ্রয় করে এবং ইহাতে যে পূর্ণ 'সংযোগ' (মিলন) প্রাপ্ত হয়। ইহাই সর্বোচ্য অবস্থা। এই অবস্থার আনন্দ অবর্ণনীয়। নববিবাহিতা রমণী যেমন "প্রেমানন্দে ভরপুর হইয়া" তাহার সখীগণের নিকট সেই আনন্দ অথবা তাহার পতির "বর্ণনা দেওয়ার মত শব্দ খুঁজিয়া পায় না," তেমনই যে ব্যক্তি 'সংযোগ' অনুভব করিয়াছে, তাহার পক্ষে ঈশ্বরের সহিত মিলনের আনন্দ শব্দে বর্ণনা করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। যখন শিষ্য এই স্তরে উপনীত হয় ও নামধ্যানে নিমগ্ন থাকে এবং অন্যকেও সেইরূপ করিতে প্রবৃত্ত করে, তখন সে জীবনের চরম উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। সে সুখ ও দুঃখের অতীতে গমন করে। "সে সুখ ও দুঃখকে একই দৃষ্টিতে দেখে। সে পাপ ও পুণ্যের অবস্থা অতিক্রম করে।" তাহার সম্বন্ধে গুরু বলেন "যে নিজে পুনঃ পুনঃ নাম উচ্চারণ করে এবং অন্যকেও সেইরূপ করিতে প্রবৃত্ত করে, আমি গুরুর সেই শিষ্যের পদধূলি প্রার্থনা করি।" যে ধর্ম-সাধনার নিয়ম পালন করিয়া চলে সেই প্রকৃত শিষ্য। না না প্রকৃতপক্ষে সেই আমার গুরু এবং আমি তাহার শিষ্য।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক ভারতীয় চিন্তাধারা (অ)

১। রেনেশাঁ, নবজাগরণ ও নবীকরণ

রেনেশাঁ বা নবজাগৃতির অব্যবহিত পরবর্তী কালে এবং তৎ-প্রভাবিত সৃষ্টিমূলক প্রয়াসের পূর্বে জাতির মনে নূতন যে উদ্ভাসন ঘটিয়া থাকে, ভারতের মনোজগতে এখন তাহাই ঘটিতেছে। ভারত কেবল যে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা নয়; তাহার অতীত সম্বন্ধে,- ধর্ম, দর্শন, সামাজিক ও নৈতিক আচারাদি সম্বন্ধে চিন্তা ও ব্যাখ্যানের কাজ চলিতেছে; সেগুলির কিছু বা পরিত্যক্ত হইতেছে, কিছু বা ব্যাখ্যাত হইতেছে এবং অবশিষ্ট যাহা, তাহা নূতন ছাঁদে গড়িয়া লওয়া হইতেছে। পরিবর্তনের সহিত মানাইয়া চলিবার এই গুণ ভারতীয় সংস্কৃতির অধ্যাত্ম-স্বভাবের নমনীয়তা-প্রসূত এবং ইহাতে তাহার সুবিপুল প্রগতির সম্ভাবনাই সূচিত হইতেছে। ইহাই সেই ম্যাকনিকল-কথিত 'হিন্দুধর্মের সর্বান্বয়ী সামর্থ্য' অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের পক্ষে যাহা হইল ধারণা-বহির্ভূত ব্যাপার। পরিবর্তনশীল বাহ্য পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখার তাগিদে ভারতের অবিচ্ছেদ্য যে অধ্যাত্ম-স্বরূপ বাহিরে বিচিত্র রূপে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার গভীর সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহারা বাহিরের গৌণ আচারাদির সহিত হিন্দু-ধর্মের অভিন্নতার কথা বলিয়াছেন। কতো অভিঘাত, আক্রমণ, সংঘর্ষ ও আলোড়ন উত্তীর্ণ হইয়া এই ধর্মমত কী করিয়া যে চার-হাজার বৎসরেরও অধিক-কাল ব্যাপিয়া জীবিত আছে,—ঐতিহাসিক ও দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই সে রহস্যের কথা ভাবিয়া বিস্মিত হন। সর্ব অবস্থায় পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চলিবার যে অভিযোজনা-শক্তি আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের মজ্জাগত, সেই শক্তিই ইহার মূল কারণ।

এদেশে ব্রিটিশ-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল এবং তাহারই ফলে খ্রীষ্টীয় মতের সহিত হিন্দুমতের তুলনা অবলম্বন করিয়া হিন্দুর আত্মবিচার-প্রয়াস উৎসাহিত হয়। পশ্চিমের প্রাচ্যবিদ্ ও মনীষী-সম্প্রদায়,—কয়েকজন ধর্মপ্রচারকও তাঁহাদের মধ্যেই গণ্য,—ভারতের ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস ও দর্শন অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; ফলে, ভারতবাসীরাও নিজেদের

সংস্কৃতি পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে অনুপ্রাণিত হন। জাতীয়তার উন্মেষ ও ক্রমপরিণতির ফলে দেশের অতীত ইতিহাসের যথার্থ শক্তি ও মহত্ত্বের সূত্রগুলি পুনরাবিষ্কার করিবার প্রেরণা জাগিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য মনীষীবৃন্দের অবিরত সমালোচনার ফলে ভারতবাসী তাহার স্বদেশের ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট দুর্বলতার স্বরূপ এবং আবশ্যিক ও আপতিকের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। জাতীয়তা ইহ-জাগতিক ব্যাপার। এই জগৎ-সীমার মধ্যেই জাতির কল্যাণসাধন ও উন্নতিবিধান,—ব্যক্তির আরাম ও সুখের ব্যবস্থাপনা; ইহাই হইল জাতীয়তার লক্ষ্য। ব্রিটিশ শাসনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রতীচীর বিজ্ঞাননিষ্ঠ, মানবতাময় ভাবধারা এদেশে প্রবেশ করিবার ফলেও ভারতের অধ্যাত্মভাবময় সংস্কৃতির নূতন রূপায়ণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সকল নিমিত্তের সমবায়ে ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে শুধু পুনরুজ্জীবনই নহে, পুনর্ব্যাখ্যানও দেখা দিয়াছে,- কেবল পুনর্ব্যাখ্যানই নহে, সমগ্র চিত্তক্ষেত্রের জীর্ণোদ্ধার ও সঞ্জীবনের সূচনা সম্ভব হইয়াছে। এই সক্রিয়তার প্রকাশ ঘটিতেছে সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র ও দর্শন বিষয়ক প্রধানত চারি ক্ষেত্রে, যদিও ভারত-প্রসঙ্গে এই ক্ষেত্র-চতুষ্টয়ের পারস্পরিক সীমারেখা সুচিহ্নিত করিয়া দেওয়া সহজ নহে। ইহাদের প্রধান দিকগুলির স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যেই ইহাদের প্রভেদের তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

২। সামাজিক ও ধর্ম-সম্পর্কিত সংস্কারান্দোলন

খ্রীষ্টানী সমালোচনা ও হিন্দু-প্রতিক্রিয়া—ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকগণ এদেশে বিপুল কর্মক্ষেত্রের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বাহ্যত:, হিন্দুধর্মের মধ্যে কেবল আত্মিক ও যোগসাধনাগত সংযমবিধিসমূহের সহিত আদিম উপাসনারীতি ও বলিদান-প্রথার যে অদ্ভুত সমাবেশ লক্ষিত হয়, নিকৃষ্টতম জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা-দোষের সহিত সকলের মধ্যে একই ঐশী সত্তার অস্তিত্বে যে বিশ্বাস সূচিত হয়, তাহার অন্তরশায়ী আধ্যাত্মিক ভিত্তির স্বরূপ তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ হিন্দুর এই সকল ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহাদের স্বধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার যুক্তি-তর্কের মধ্যে এই সকল ত্রুটির সহিত হিন্দুধর্মের কল্পিত অভিন্নতার কথা প্রচার করিতেন। জনসাধারণের মধ্যে যুক্তিবাদ ও মানবতার আদর্শ ছড়াইয়া দিবার কাজে তাঁহাদের দ্বারা স্থাপিত বহুসংখ্যক বিদ্যায়তন ও চিকিৎসালয়গুলিও বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

হিন্দুত্বের নির্দিষ্ট কোনো সূত্র দেওয়া সম্ভব নহে। ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্মের ন্যায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিমাত্রের প্রয়াসে ইহা উৎপন্ন হয় নাই। অধ্যাত্মভাবের বহিঃপ্রকাশের প্রবণতা হইতেই এ ধর্ম স্বভাববশে বিকশিত হইয়াছে এবং অধুনালুপ্ত যে সকল অবস্থাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ইহার ক্রমোদ্ঘাটন সম্ভব হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইহাতে সংরক্ষিত রহিয়াছে। মানুষের অধ্যাত্ম-স্বভাবে অটুট আস্থাই ইহার প্রধান অবলম্বন, এবং আন্তর সত্তার যথার্থ উপলব্ধিতেই যে মনুষ্য-জীবনের পরম চরিতার্থতা, ইহা সেই বিশ্বাসেরই ধারক। এই মূল অধ্যাত্ম-সত্যটি স্বীকার করিয়া লইলে ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতির সর্বপ্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও হিন্দুর অনুমোদন ও উৎসাহ-প্রদানে কার্পণ্য ঘটে নাই। মূর্তি বা প্রতিমা যে ঈশ্বরের প্রতীক-স্বরূপ, তাহা পুনর্ব্যাখ্যাত হইলেও পূর্বোক্ত সংরক্ষণী প্রেরণার ফলে মূর্তি-উপাসনার যাবতীয় রূপই ইহাতে সংরক্ষিত রহিয়াছে। এইভাবে স্থূলতম ধর্মমতগুলির মধ্যেও অন্তর্মুখিতার আদর্শ সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাহ্য রূপগুলির দুর্মরতার ফলে জনসাধারণের মনে ইহার ভিতরের সত্য প্রবেশ করিতে পারে নাই।

পৃথক পৃথক খ্রীষ্টীয় গোষ্ঠীর প্রচার কার্যের দ্বারা প্রভাবিত শিক্ষিত-সমাজ ইহাই স্থির করিয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম বর্জন না করিয়া বরং তাহার সংস্কার-সাধনে মনোনিবেশ করাই সংগত হইবে। সেই সিদ্ধান্ত হইতেই সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারান্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। এখানে আমরা সেই সকল প্রসঙ্গই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ব্রাহ্মসমাজ—কেবলমাত্র হিন্দুধর্মেরই সংস্কার-কামনায় নহে, হিন্দু-সমাজকেও নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার সংকল্প লইয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়া তিনি বহুদেববাদ, পুরাণানুগত্য, প্রতিমাপূজা ইত্যাদির প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ বা ঈশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপেই যে ভগবৎ উপাসনা শ্রেয় ও বরণীয়, তিনি তাহাও প্রচার করেন। সকলই ব্রহ্ম, অথচ ব্রহ্ম সকল সংজ্ঞা ও সীমার অতিশায়ী,—শঙ্করের সর্বেশ্বরবাদ নামে এই যে দার্শনিক মত লোকসাধারণের নিকট পরিচিত,—দর্শনের ক্ষেত্রে রামমোহন তাহার বিরোধী ছিলেন; তিনি ছিলেন ঈশ্বরবাদের সমর্থক। প্রাচীনপন্থী সংরক্ষণবাদীদিগের নিকট এই সকল মতবাদের মধ্যে অনভ্যস্ত বা আপত্তিকর বলিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু রামমোহন আরো অগ্রসর হইয়া জাতিভেদপ্রথা রহিত করিয়া দেন এবং

তাঁহার অনুচর গোষ্ঠীর মধ্যে বিধবা বিবাহও প্রবর্তিত করেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংককে রাজী করাইয়া ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হৃদয়হীন সতীদাহ ব্যবস্থাও রদ করিয়া দিলেন। সংস্কার-শোধিত হিন্দু-ধর্মের নূতন অভিব্যক্তি ঘটিল ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে। প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য ভাবে অনুপ্রাণিত, শিক্ষিত হিন্দুদিগের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপ সীমিত ছিল এবং ইহার অনুসরণকারীদের মধ্যে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

প্রার্থনা সমাজ—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্ কর্তৃক স্থাপিত প্রার্থনা-সমাজ ছিল সংস্কারব্রতী অনুরূপ আর এক প্রতিষ্ঠান। ব্রাহ্মমতের ন্যায় ইঁহাদেরও দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বরবাদী এবং ভক্তিবাদী। প্রার্থনা-সমাজের গণ্যমান্যদের মধ্যে ছিলেন স্যর আর. জি. ভাণ্ডারকর, বিচারপতি রানাডে, স্যর এন্. জি. চন্দ্রাভরকার ও রমাবাঈ।

আর্য সমাজ—১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্যসমাজ স্থাপিত হয়। বৈদিক আদর্শে ফিরিয়া যাইবার নীতি প্রচারের জন্য প্রায়ই মার্টিন লুথারের সহিত তাঁহার তুলনা করা হইয়া থাকে। প্রতিমাপূজার প্রথা, বহুদেববাদ ও জাতিভেদের অসারতা দেখাইয়া, ত্যাগ-ধর্মের শ্রেয়ত্বের উপর জোর দিয়া তিনি বৈদিক ধর্মের পুনরভ্যুদয় ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দুদিগকে পুনরায় স্ব-ধর্মে ফিরাইয়া আনিবার জন্য এবং স্বধর্ম ত্যাগের দুর্যোগ হইতে তাহার আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মকে তিনি একদিকে সংগ্রামশীল, অন্যদিকে বিধর্মীকে ধর্মপ্রদানে সক্ষম করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন এবং সে-সাধনায় অংশতঃ জয়ীও হইয়াছিলেন।

থিওজোফিক্যাল সোসাইটি বা 'ব্রহ্মবিদ্যা' সমিতি—ভারতের নবজাগৃতির পক্ষে প্রভূত সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে থিওজোফিক্যাল সোসাইটি ছিল অন্যতম। ভারতবর্ষে থিওজোফি বা 'ব্রহ্মবিদ্যা' আমদানি করিয়াছিলেন শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কি ও কর্নেল অকৃলট এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের আদেয়ার অঞ্চল এই সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র হইয়া উঠে। এই থিওজোফিক্যাল সোসাইটি বস্তুতঃ বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান রূপেই স্বীকার্য কারণ, জগতের সকল ধর্মমতের উদ্দেশেই ইহার আমন্ত্রণ ছিল অবাধ; ইহা হিন্দু-মতের শাখা মাত্র নহে। তবে, হিন্দুদের নিকট প্রতীচ্য ভূখণ্ডের এই বিশেষ বাণী ইহাতে বাহিত হইয়া আসিয়াছিল যে হিন্দুর ধর্মমতে এমন সব শ্রেয় বস্তু রহিয়াছে যাহা অন্যেরাও গ্রহণ করিতে পারে। শ্রীমতী

অ্যানি বেসাণ্ট,—সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যিনি এই সমিতির নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন, এমন কথাও বলিয়া গিয়াছেন যে জগতের বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম। ইহার ফলে হিন্দুদের মধ্যে তাহাদের ধর্মমতের বিরোধী সমালোচনা প্রতিরোধ করিবার উদ্যম উৎসাহিত হইয়াছিল এবং নিজেদের ধর্মের যাবতীয় বিকৃত অভিব্যক্তি পরিহার করিয়া হিন্দুত্বের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ সত্যবোধ সন্ধান করিবার উৎসাহ জাগিয়াছিল। থিওজোফিক্যাল সোসাইটির পক্ষ হইতে একে একে ধর্মমতের মূল গ্রন্থগুলি এবং সেগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

লেড্‌বিটর প্রণীত 'টেক্‌স্‌ট্‌ বুক অব্‌ থিওজোফি'র মধ্যে আলোচ্য সমিতির প্রধান সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইঁহাদের প্রধান বা কেন্দ্রীয় বিশ্বাস বলিতে বুঝায় সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থা এবং মানুষে মানুষে ঐক্য বা সংহতির ধারণা। "ইঁহাদের গৌণতর সূত্রগুলির মধ্যে তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে পৃথিবীর সজীব ও গতায়ু যাবতীয় ধর্মমতের যাহা হইল সাধারণ শিক্ষা : একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ঈশ্বরে বিশ্বাস ; তাঁহার অভিব্যক্তির ত্রি-ধারা ; জড়ের মধ্যে আত্মার অবতরণ বা আত্মপ্রকাশের তত্ত্ব ও সেই প্রসঙ্গসূত্রেই মূলে অভিন্ন হইলেও বুদ্ধি-বিবেচনার ক্ষেত্রে মানুষে-মানুষে তারতম্যের বোধ ; চেতনার ক্রমোন্মেষ ও দেহের বিবর্তনের মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের ক্রমপরিণতির ধারণা,—অর্থাৎ জন্মান্তরবাদ,—পরিণতির অনিবার্য বিধিবশ্যতা,—কার্য-করণের আইন, অর্থাৎ কর্মন্‌,—এই পরিণতির পরিবেশ, অর্থাৎ ত্রি-জগৎ—শারীরিক, আবেগধর্মী ও মনন-সম্পর্কিত অথবা ভূলোক, স্বর্গলোক ও দুয়ের মধ্যবর্তী তৃতীয় লোকের অস্তিত্বে প্রতীতি ;—স্বর্গীয় বা দৈব প্রেরিত শিক্ষাদাতা বা মহামানবের অস্তিত্বে বিশ্বাস ('শ্বেত ভ্রাতৃসঙ্ঘ' বা 'মানবজাতির জ্ঞানপ্রৌঢ় ভ্রাতৃবৃন্দ' নামে যাঁহারা পরিচিত)।" ইহা হইতে দেখা যায় যে হিন্দুধর্মের অনেক কথাই 'থিওজোফি'র অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই যে সে মতবাদের আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নহে।

রামকৃষ্ণ মিশন—ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং ধর্মসংস্কারের প্রয়াস পৃথক করিয়া দেখা সহজ নহে। অধ্যাত্মবোধহীন সমাজ-সংস্কার নিরুৎসাহিত করিয়া প্রথমে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা মুখ্য ও গৌণের ভেদ বুঝিয়া দেখিবার প্রথম নির্দেশ দিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ; ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। সকলের অপেক্ষা সর্বাধিক সত্য করিয়া তিনিই অনুভব করিয়াছিলেন যে শূদ্রজাতির বেদাধ্যয়নে, বিধবার

পুনর্বিবাহে, অস্পৃশ্য জাতির এক ব্যক্তি উচ্চবর্ণের কাহাকেও স্পর্শ করিলে, অন্য ধর্মাবলম্বী হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইলে অথবা একজন হিন্দুর সহিত অহিন্দুর বিবাহ হইলেই হিন্দুর ধর্মনাশ ঘটিতে পারে না। সেইজন্য তিনি এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন যে নূতন নূতন দল না বাড়াইয়া হিন্দু-সমাজের মধ্যে থাকিয়াই সর্বপ্রকার সংস্কার-চর্চা চলিতে পারে,—সম্প্রদায়-বৃদ্ধির ফলে কেবল ভেদেরই বহুলতা ঘটিয়া থাকে এবং তাহাতে হিন্দুর সংহতি বিপন্ন হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রশংসা সূত্রে ইহা বলিতেই হয় যে এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল যে সুসঙ্গতভাবে সর্বপ্রকার জাতি-বর্ণগত ভেদবুদ্ধি অগ্রাহ্য করিয়া চলিবার সাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছে তাহা নহে, উপরন্তু জাতি-বর্ণের বৈষম্য পুনঃপ্রবর্তিত না করিয়া হিন্দু ঐতিহ্যের সহিত যতোটা নৈকট্য রক্ষা করা সম্ভব, এমন কি নিজেদের যতোটা হিন্দু বলিয়া মানিয়া লওয়া সাধ্য, এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সে-প্রয়াসও বিদ্যমান ; এবং ইঁহারা প্রশংসনীয় ভাবেই সে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

বিবেকানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ শিষ্যদের অন্যতম ; রামকৃষ্ণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে সকল ধর্ম একই আত্মিক সত্যের শিক্ষা দিয়া থাকে। রামকৃষ্ণ দর্শনশাস্ত্রের পড়ুয়া পণ্ডিত ছিলেন না এবং যুক্তি-তর্কের পথ ধরিয়া তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পান নাই ; প্রাচীন দেশীয় শাস্ত্রাদির জ্ঞানও তাঁহার সামান্যই বলিতে হইবে। কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে তিনি ছিলেন সামান্য একজন পূজারী ব্রাহ্মণ। কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রতিভাধর রামকৃষ্ণ দেবীর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির গুণে অন্তরাত্মার সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মূলগত ঐক্য উপলব্ধির প্রেরণাবশে তিনি এক গির্জায় ও এক মশজিদে গিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাই তিনি সকল ধর্মের ঐক্যের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দও সকল ধর্মমতের অন্তর্লীন আধ্যাত্মিক সত্য যে এক ও অভিন্ন, তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি এ-সত্য লাভ করিয়াছিলেন শঙ্কর-কৃত উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের টীকা-ভাষ্যে প্রচারিত বেদান্তের অদ্বৈত ভাববাদী ব্যাখান হইতে। অতএব দর্শন-শাস্ত্রের বিচারে রামকৃষ্ণপন্থীরা শঙ্করাচার্য-সম্প্রদায়েরই অনুগামী। তবে, হিন্দু-সমাজের সকল জাতি বা সম্প্রদায় হইতে তো বটেই, এমন কি অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীর মধ্য হইতেও ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী গৃহীত হয়।

বিবেকানন্দ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই এক বিশেষ নূতনত্ব প্রবর্তিত করিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে নবাগতমাত্রেরই কিছু কিছু সমাজসেবার

কাজ দেখাইতে হইবে এবং অনেককে সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও সে-সাধনা চালাইয়া যাইতে হইবে। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারসংস্থাগুলির নিকট হইতেই তিনি সে আদর্শের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। দীন-দরিদ্রের সেবার নাম দরিদ্রনারায়ণের পূজা,—সকলের মধ্যেই ঈশ্বর বিদ্যমান, এই পুরাতন সত্যেরই ইহা প্রয়োগ মাত্র। বিদ্যালয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া, হাসপাতাল এবং কারিগরী বা যন্ত্র-শিক্ষালয় চালাইয়া, সেবা ও সংকটত্রাণের ব্যবস্থা করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন এদিক দিয়া সুবিপুল কর্ম-সাধনায় পরিচয় রাখিয়া যাইতেছে। হিন্দুধর্মের এই আধুনিক অভিব্যক্তিতে এই সত্যই প্রদর্শিত করিবার প্রয়াস রহিয়াছে যে, নিঃস্বার্থ সমাজসেবা ও মানবসেবার সহিত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কোনো বিরোধ নাই। বরং সেইরূপ সেবাব্রতের সাহায্যে নিঃস্বার্থতা অনুশীলনেরই সুযোগ ঘটিয়া থাকে।

৩। রাজনীতি ক্ষেত্রের ভাবুকদল

প্রাচীন দৃগ্‌ভঙ্গির অসুবিধা—জাতীয়তাবোধের অভ্যুত্থান ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে যখন প্রবল ও আন্তরিকভাবে রাজনীতিক সক্রিয়তার প্রয়োজন অনুভূত হইল, তখন, ভারতের নেতৃবৃন্দ দেখিলেন এ দেশের সুপ্রাচীন ধর্ম ও দর্শনের অনাসক্তিবাদ হইতে উদ্ভূত ইহজগৎ সম্বন্ধে একপ্রকার নিস্পৃহতায় অনেকের মন আচ্ছন্ন থাকায় সে-কাজ বাধাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রেরণা সঞ্চার করিবার জন্য হিন্দুধর্মের নব-ব্যাখ্যান আবশ্যিক হইয়া উঠিল।

তিলক ও গীতার নূতন ব্যাখ্যা—লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ভগবদ্‌গীতার নূতন ব্যাখ্যানের সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন যে, ঈশ্বর-প্রাপ্তির সকল পথের মধ্যে গীতাতে কর্মমার্গেরই শ্রেয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ স্ব-কর্তৃত্বের মোহ ত্যাগ করিয়া কাজ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, ফলের কথা না ভাবিয়া কেবল কর্তব্য-পালনে ব্রতী থাকিতে বলিয়াছেন; নৈরাশ্য ও অবসাদে বিষণ্ণ অর্জুনকে কর্মে প্রেরণা দিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত গীতা-র অন্য কী-ই বা সার্থকতা থাকিতে পারে ?

ব্যক্তিকে শূন্যে বা শূন্যতায় লীন করিয়া দিবার যে নির্বাণমার্গের কথা বৌদ্ধমতে বলা হইয়াছিল,—পরবর্তী বৌদ্ধগণ কথাটা যেভাবে বুঝিয়াছিলেন,—হিন্দুমতে ততোধিক এই তিন প্রধান পথের কথা বলা হইল, জ্ঞানমার্গ—অর্থাৎ জ্ঞানের পথ, ভক্তিমার্গ—অর্থাৎ ভক্তির পথ এবং কর্মমার্গ—অর্থাৎ কর্মের পথ। প্রথমোক্ত দুই মার্গে সাধারণতঃ সর্বস্ব ত্যাগের আদর্শ, এমন কি কর্ম-ত্যাগের কথাও গৃহীত

হইয়াছিল—সর্বপ্রকার পার্থিব সম্পর্কের পরিহারই তাঁহাদের ঈপ্সিত। তৃতীয় মার্গের সাধনায় সত্তার অহং-কে নিজকৃত কর্মের কর্তারূপে না ভাবিয়া কেবল ঈশ্বরের নিমিত্ত মাত্র থাকিয়া কর্ম সম্পাদনের আদর্শ ঘোষিত হইয়াছিল। যেহেতু শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি অধিক সংখ্যক আচার্য-ই কোনো-না-কোনো কারণে কর্মমার্গের মূল্য ততোটা স্বীকার করেন নাই বা কম করিয়া দেখিয়াছেন, সেজন্য ভগবৎ সাধক মাত্রেই সাধারণতঃ কর্মে ও যাবতীয় জাগতিক বিষয়ে উদাসীন ছিলেন এবং এই মনোভাবের ফলে সামাজিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিস্পৃহতা দেখা দিয়াছিল। ইহা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

বিপ্লব আন্দোলন ও বীরতন্ত্রের পুনর্জাগরণ—বাংলার বৈপ্লবিক নেতারা প্রাচীন ধর্মমতের মধ্যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অনুকূল আর একটি প্রয়োজনীয় দিকের সন্ধান পাইয়াছিলেন। বাংলাদেশে ভগবানের শক্তি-স্বরূপের সাধনা-সূত্রে বহুকাল হইতেই তান্ত্রিকতার প্রচলন ছিল; কখনো কখনো বিশ্বের ভয়াবহ ধ্বংসশক্তির সহিত সে-শক্তির একাত্মতা স্বীকৃত হয় এবং পশু-হত্যার অনুষ্ঠান সেই শক্তি-সাধনারই আনুষঙ্গিক উপচার হিসাবে গণ্য। মহারাষ্ট্রেও (বোম্বাই) বিশেষ করিয়া সামরিক জাতিগুলির মধ্যে অনুরূপ উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে,—মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজী কর্তৃক ভবানী-পূজার বৃত্তান্ত হইতেই তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। সাহস ও বীরত্ববোধ জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা অতীতের সেই শক্তি-পূজার পুনরভ্যুদয় ঘটাইয়াছিলেন। ভয় ও আসক্তি পরিহার করিয়া কর্মে উদ্যত হইবার যে নির্দেশ ভগবদ্গীতার মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও তাঁহাদের অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। তাঁহাদের কল্পনা-নেত্রে মাতৃভূমি পরমা জননীরই প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তি হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন পূজনীয়া ভারত-মাতা রূপে; সেই দেশ-মাতৃকার সেবাই তাঁহাদের ধর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। গীতা-তে শ্রীকৃষ্ণ কর্তব্যের খাতিরে অর্জুনকে জ্ঞাতি-নিধনে সম্মত করাইয়াছিলেন, এই প্রামাণ্য বৃত্তান্তের সমর্থন অনুসরণ করিয়া মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য শত্রুনিপাতের বৈধতা বা ঔচিত্য স্বীকৃত হইল।

মহাত্মা গান্ধী—ভারতবর্ষের রাজনীতিক ধ্যান-ধারণাকে মহাত্মা গান্ধী এক নূতন দিকে চালনা করেন। তাঁহার নিকট যে-কোনো অবস্থায় যে-কোনো ক্ষেত্রে হিংসার পথ পাপেরই নামান্তর। ভিতরের দুর্বলতা, ভয় এবং মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশী সত্তায় অনাস্থা হইতেই হিংসার উদ্ভব ঘটিয়া থাকে। রাজনীতিক স্বাধীনতার

জন্যই রাজনীতিক স্বাধীনতা নহে,—তাহা স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে,—তাহা মানুষের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপায় মাত্র। কোনো সৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও যদি মন্দ উপায় গৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহাতে কর্তারও পতন হয়, সাধিত লক্ষ্যেও গ্লানির স্পর্শ লাগে। তাই তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রেও হিংসা-প্রয়োগ নিরুৎসাহিত করেন। তিনি এই দিক দিয়া ধর্মশাস্ত্রসমূহের, বিশেষ করিয়া গীতার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হিন্দু অধ্যাত্মবাদ এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের নব ভাবনা—ব্রিটিশ ও মার্কিন রাষ্ট্রাদর্শের মধ্যে গণতন্ত্রের যে ধারণা রূপায়িত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তো বটেই, তাহা ছাড়া সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ধারণাও ভারতীয় সমাজের উঁচু-নিচু সকল স্তরেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে হিন্দুধর্মের সহিত কোনোরূপ বিরোধ ঘটিবেও না, ঘটা সম্ভবও নহে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত হিন্দু-প্রতিষ্ঠানের ইহাই এক বড় পার্থক্য যে হিন্দুধর্মে ত্যাগের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। যীশু যদিও বলিয়া গিয়াছেন যে ধনীর পক্ষে স্বর্গে প্রবেশলাভ অপেক্ষা একটি ছুঁচের ছিদ্র দিয়া বরং উটের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ সহজসাধ্য, তথাপি অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্থা বা 'চার্চের' ইতিহাস হইল তাঁহার বাণী উপেক্ষা করিয়া চলিবারই জলন্ত উদাহরণ! উপরন্তু ইহ-জাগতিক বা মর্ত্য ব্যাপারে লিপ্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় 'চার্চ' এতোবার এবং এমনই আক্রমণাত্মক ভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে ক্রুশে যিনি আত্মদান করিয়াছিলেন, গ্যালিলি-র সেই শান্ত মানুষটির জীবনাদর্শের সহিত খ্রীষ্টীয় চার্চের অপ্রীতিকর বৈপরীত্যই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। য়ুরোপের জনচিত্ত কালক্রমে খ্রীষ্টধর্মের সহিত রাজশক্তি, ধনতন্ত্র ও পার্থিব ঐশ্বর্য-সমারোহের অবিচ্ছেদ্য সংযোগের কথা মানিয়া লইয়াছে এবং পারত্রিক নীতি-শিক্ষায় সে ধর্মের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ধনীর বিরুদ্ধে শ্রমিক আর যাহাই বলুক, সে একথা কখনোই মনে করে না যে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীও ধনীর দালালমাত্র, অথবা তাঁহাকেও যে দালাল করিয়া তোলা যায়, এ চিন্তা তাহার সন্দেহের অগোচর। তবে ভারতীয়েরা যেহেতু খুবই ধর্মভাবাপন্ন সুতরাং সে-দেশে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা কখনোই সম্ভব নহে ভাবিয়া লওয়া নিরাপদ নহে। ভারতবর্ষে ঐসকল মতবাদ ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণেই নহে। 'ধর্মভাবাপন্ন' কথাটাই অস্পষ্টতাদুষ্ট; যদি ইহার অর্থ হয় আধ্যাত্মিক বোধ-সম্পন্ন, তাহা হইলে সুনিশ্চিতভাবে

ভারতীয়েরা তাহাই ; যদি এই অর্থ ধরা যায় যে বাহিরের কতকগুলি আনুষ্ঠানিক রূপকেই ভারতীয়েরা সুদৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে চাহিবে, তাহা হইলে কিন্তু প্রমাদ ঘটিবে। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং ধনতন্ত্রবাদের যাবতীয় বহিরাচার রদ হইয়া যাইতে পারে, তাহার পরেও ভারতবাসীর পক্ষে আধ্যাত্মিকতার দাবি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলা সম্ভব এবং পাশ্চাত্ত্য সাম্যবাদের জড়বাদিতা ভারতীয়েরা অগ্রাহ্য করিতে পারে। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু তাঁহার 'ভারত ও বিশ্ব' সম্পর্কিত আলোচনায় অর্থগর্ভ এক গুরু সত্যের সংকেত দিয়াছেন—ভারত তাহার নূতন নূতন সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে সোভিয়েট রুশের নব্য সভ্যতার দিকে ঝুঁকিতে পারে বটে, কিন্তু নিজস্ব পথে, ভারতবর্ষের জনচিত্তের উপযোগী রীতিতেই তাহাকে সে কাজ করিতে হইবে। হিন্দুর অধ্যাত্ম-প্রকৃতির স্থিতিস্থাপকতার সত্যই ইহাতে পুনরায় অভিব্যক্ত হইতেছে।

৪। দর্শনচিন্তার বিভিন্ন ধারা

ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষে শাস্ত্রানুগামী ও শাস্ত্র-নিরপেক্ষ সমকালীন সকল শ্রেণীর দার্শনিক-সমাজে বিশেষ উৎসাহজনক পরিবেশের ধারণা জাগিয়াছে। তথাপি ইহা বলা সঙ্গত হইবে না যে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে সকলেই সমস্ত ধারার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। যাঁহারা এই সকল প্রবাহের শক্তি অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাও সকল দিকে তাঁহাদের মনন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। কিন্তু আশার কথা এই যে, ভারতবর্ষের দার্শনিকবৃন্দের নিকট নূতন যে সকল দায়িত্ব সমাধান কামনা করিতেছে, অনেকেই সে-বিষয়ে ক্রমে ক্রমে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ধারণা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন কবি, তিনি ঠিক পেশাদার দার্শনিক নহেন। কিন্তু তাঁহার কোনো কোনো গ্রন্থে তিনি জগৎ সম্বন্ধে এক সামগ্রিক সংগতির ধারণা প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ একতত্ত্ববাদী, তবে তিনি জগতের সত্যতাও অস্বীকার করেন না। অধিকাংশ সমকালীন ভাবুকের ন্যায় তিনিও জগৎ সম্বন্ধে নেতিবাদী মনোভাবের বিরোধী এবং অদ্বৈতবাদের লোক প্রচলিত কোন-কোন রূপভেদে জগৎ মায়ার সৃষ্টি বলিয়া যে ধারণা লালিত হইতে দেখা যায়, তিনি তাহাতেও বিশ্বাসী নহেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা পরমেশ্বর আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। অতএব জগতের আপাতপ্রতীয়মান সর্বপ্রকার সংঘাত ও ধ্বংসরূপের অন্তরালে ঈশ্বরের

সৃজনী ক্রিয়ার যে সৌন্দর্য ও সৌষম্য বিদ্যমান যথার্থ অন্তর্দৃষ্টির গুণেই তাহা উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে জগৎ মায়া হইতেও পারে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। তাহা ভগবানের শিল্পরচনা, ভগবানই তাহার শিল্পী। পটের উপর যে ছবিটি অঙ্কিত হইয়াছে, আমরা সেই চিত্রমায়ারই অনুরাগী, শূন্য পটে আমাদের স্পৃহা নাই।

রবীন্দ্রনাথ যদিও স্বীকার করেন যে তর্কের সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক পরম ব্রহ্ম অপ্রমাণিত হইতে পারে না, তথাপি এই প্রপঞ্চ জগতেরই অন্তর্ভূত ধর্মের ক্ষেত্রে বাস্তবতত্ত্ব বা 'রিয়ালিটি'-কে পরম পুরুষ রূপে কল্পনা করিয়া লইলেই তাহা সর্বাধিক বোধগম্য হয় বলিয়া তাঁহার ধারণা। রবীন্দ্রনাথের পরমবাদ সেই কারণেই ব্যক্তিবাদাত্মক। সসীম সত্তার অধিকারী হইয়া নৈর্ব্যক্তিক পরমকে আমরা বুঝিতে পারি না; কারণ, সসীমতা ও নির্দিষ্টতাই হইল আমাদের মননের স্বভাব,—অনন্তের উপর মন আপনার সীমা আরোপ করিয়া থাকে, এবং 'অসীমের মধ্যে সীমা রচনার নাম ব্যক্তিত্ব: ভগবান যখন সৃষ্টিকর্তা তখন তিনি ব্যক্তিত্বময়।'

পরম পুরুষ হইলেন সকল বিধানের বিধান। যাহাকে আমরা বিধি-নিয়মাদি বলিয়া থাকি, সেগুলি হইল বহুত্বের মধ্যে তাঁহারই একত্বের প্রতিচ্ছায়া। সুতরাং ব্যক্তি যদি সেই পরম পুরুষের নিকট তাহার ব্যক্তিবোধ সমর্পণ করিয়া তাঁহারই সহিত একাত্মতা লাভ করে, তাহা হইলে সে-অবস্থায় এই সকল আইন তাহার ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকর্ম সংকুচিত করিতেছে অথবা স্বাধীনতা খর্ব করিতেছে বলিয়া মনে হইবে না। এবং তাঁহার সহিত একাত্মতা লাভের অর্থ হইল প্রেমের প্রেরণায় তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ,—তাঁহার মধ্যেই আত্মহারা হইয়া যাওয়া। প্রেমই সত্য। জ্ঞানের রাজ্যে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে ব্যবধান থাকিয়াই যায়, কিন্তু প্রেমে সে ব্যবধান দূর হয়।

ডক্টর ভগবান দাস এবং তাঁহার নঞৈর্থকতা-স্বীকৃতিসূচক অদ্বৈতবাদ— ডক্টর ভগবান দাসের দার্শনিক চিন্তাতেও জগৎকে অস্তিত্বহীন ও মূল্যহীন নাস্তি-মাত্ররূপে দেখিবার অনিচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি মনে করেন শঙ্করের অদ্বৈতচিন্তা ত্রুটিহীন নহে, কারণ শঙ্কর 'অহং' এবং 'এতৎ', এই দুই বস্তুর মধ্যে প্রথমটি স্বীকার করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়টি অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু একটিকে ছাড়িয়া অন্যটি থাকিতে পারে না। চরণ সত্যের স্বভাবই এই যে তাহা ইহাদের উভয়কেই দুইটি ক্ষণ রূপে ধারণ করিবে। কিন্তু 'অহং' 'এতৎ' নহে। অতএব

বাস্তবের প্রকৃতি সর্বাধিক সুব্যক্ত করিতে গেলে বলিতে হয় 'অহম্ এতন্ন'—অর্থাৎ 'আমি—ইহা—না'।

'অহং' ও 'এতৎ' অর্থাৎ 'আমি' ও 'ইহা'-র সম্পর্ক হইল শক্তি অর্থাৎ নেতি। এই সম্পর্ক আবশ্যিক সংযোগের কারণ ইহা একই অবিভাজ্য পূর্ণের উপাদান নিচয়ের অন্তর্বর্তী। 'আমি—ইহা—না' এই তিনের সমবায়ে একটি ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে, এখানে পরস্পর স্বাধান ও পৃথক তিনটি শব্দের সমাবেশ মাত্র ঘটে নাই। "এই আবশ্যিকতাই সকল বিধির বিধি কারণ ইহা পরিবর্তনহীন, কালহীন, প্রসারহান (অর্থাৎ অপরিবর্ত ও স্থান-কালের অতিশায়ী) পরমের প্রকৃতিজাত; সকল বিধি-বিধান ইহা হইতেই নিঃসৃত হয় এবং ইহাতেই লীন থাকে।" ডক্টর ভগবান দাস এই শক্তিকে 'মায়া' নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং শঙ্কর যেমন অস্তিও নহে নাস্তিও নহে রূপে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেভাবে না দেখিয়া ইহাকে তিনি অস্তি ও নাস্তির সমবায় রূপে দেখিয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা সামাজিক সমস্যার আলোচক হিসাবেই তিনি অধিক পরিচিত। ।তনি মনে করেন যে দর্শনশাস্ত্র ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে উপযোগী হওয়া আবশ্যক এবং তাহা ব্যক্তির ও মানব-সমাজের সহায়ক হওয়া দরকার। 'রিপাবলিক' গ্রন্থে প্লেটো যেমন চিত্তবৃত্তি বিভাগের সূত্র ঘোষণা করিয়াছেন, সেই ধারাতেই তিনি তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে জাতিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জে, কৃষ্ণমূর্তি—একদা থিওজোফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্রীয় ব্যক্তিদিগের অন্যতম বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্তি কোন শাস্ত্রধারালব্ধ বা বিধিবদ্ধ দার্শনিক চিন্তার প্রতি আনুগত্য দাবি করেন না। হিন্দুর সাধনার এই নীতিরই তিনি প্রচারক যে মানুষকে তাহার নিজের চরিতার্থতার জন্য আত্ম-সাধনার উপরেই নির্ভর করিতে হয়, অন্য কাহারও মধ্যস্থতা মানিয়া জীবনের বন্ধন মোচন করা যায় না। গুরুর প্রতি নির্ভর, আচার-পালন অথবা প্রথাবিশেষের আনুগত্য, এই সকলের কোনোটিই মানুষকে সাহায্য করিবে না। আধ্যাত্মিক সত্য মানুষের সত্তার গভীরে নিহিত; তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে ব্যক্তিগত সাধনা ও প্রয়াসের দ্বারাই অগ্রসর হইতে হইবে।

বাস্তবতত্ত্ব বা 'রিয়ালিটি' হইল আপন প্রবাহে প্রবহমান বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র প্রাণ। অজ্ঞতার দ্বারা তাহারই মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বের ধারণা সৃষ্ট হয়। সেই অজ্ঞতা অপসারিত হইলে ব্যক্তি বিশুদ্ধ প্রাণের সাযুজ্য লাভ করে এবং তাহার সংগ্রামের অবসান হয়। প্রকৃতির নিম্ন-স্তরের প্রকারভেদের মধ্যে অজ্ঞান

পরমোৎকর্ষের রাজ্য পার হইয়া প্রাণ ক্রমশ 'অহং'-এর সজ্ঞান পরমোৎকর্ষে অগ্রসর হইয়া থাকে। আমাদের অজ্ঞতাবশতঃই আমরা সত্য বা ঈশ্বরকে আমাদের স্ব-ক্ষেত্র হইতে দূরবর্তী বলিয়া মনে করি।

এই প্রাণ দ্বৈততা-বর্জিত এবং মানুষের পক্ষে ইহার সহিত ঐক্য লাভ করাই স্বাভাবিক। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, ব্যক্তিও সেইরূপ সত্যের অভিমুখে নিজের করিয়া লইবে। কেবল তাহাই নহে, শেষ পর্যন্ত মানুষ যাহাতে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের খণ্ডতাবোধ অসীমে মিলাইতে পারে, প্রকৃতি নিজেই সে-বিষয়ে সজাগ রহিয়াছেন এবং সেই কারণেই ইহা অবধারিত বলা যাইতে পারে যে মোক্ষ অর্থাৎ চরিতার্থতা-লাভ আমাদের পূর্বনির্ধারিত বিধিলিপি।

ব্যক্তিত্বের এই প্রাতিভাসিক 'অহং' বা 'আমিত্ব' যাহা 'না-আমিত্বের' বিপরীত, কৃষ্ণমূর্তির মতে তাহা সেই আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারা অপসারিত করা যাইতে পারে যাহাতে আত্মচৈতন্যের ক্রমিক প্রখরতা-বৃদ্ধির ফলে পরিশেষে অহং-জ্ঞানই বিলুপ্ত হইয়া যায়। "চৈতন্য আমিত্বেরই আশ্রিত এবং যখন আমরা সেই চৈতন্য হইতে মুক্তিলাভ করি, তখন অহংজ্ঞানহীন বাস্তব অর্থাৎ সত্যই থাকিয়া যায়।"

অরবিন্দ ঘোষ—অরবিন্দ ঘোষ কার্যতঃ একজন যোগী ও অতীন্দ্রিয় মরমী সাধক। তিনি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ এবং জড় জগৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি অবশ্য এই উভয় মতই অদ্বৈতবাদের শৈব ও শাক্ত প্রস্থানের মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রভাব শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও তাঁহার দার্শনিক মতবাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তন্ত্রের মতে মায়া অলীক ভ্রান্তি নহে, ইহা একটি সৎ পদার্থ, ইহা শিবের শক্তি। এই শক্তির সাহায্যেই জগতের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, অবশ্য ইহা শিবের শুদ্ধ সত্তা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে না। শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে যোগের উদ্দেশ্য হইল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের শক্তিকে আহরণ করিয়া তাহাকে এই জগতে ভাবগত জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ করা। যেহেতু জীব ও শিব মূলতঃ অভিন্ন সেইজন্য ভাগবত জীবন এইভাবে প্রতিষ্ঠা করা জীবের পক্ষে সম্ভব। এই জগৎ সত্য এবং ইহা শক্তির পরিণাম। শক্তি হইতে যেমন জড়ের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে তেমনি জড়ও শক্তির মধ্যে অনুস্যূত থাকে। এই পরিণাম চক্রাকারে ঘটে। এই বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ বিবর্তনবাদের আধুনিক ভাষ্য গ্রহণ করিয়াছেন—যে মত অনুসারে জড় হইতে প্রাণ ও মনের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। অগ্নি যেমন তাহার দাহিকা শক্তি

হইতে অভিন্ন, তেমনি শক্তি শিব বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং এই জন্যই শক্তিও শিবের ন্যায় চেতন। মূল বিবর্তনের বিপরীত গতি হইল পরবর্তী ঘটনার পূর্ববর্তী ঘটনায় অবস্থিতি। বস্তুত, এক দিক হইতে দেখিলে জড় শক্তির মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে, অপর দিক হইতে বিচার করিলে প্রাণ ও মন জড় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। জড় প্রাণের উচ্চতর অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, প্রাণ আবার মন ও চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। এখানে যে মনের কথা বলা হইল তাহা জীব-মন। ইহার উপরে তিন প্রকার উচ্চস্তরের মন আছে, উচ্চ-মন (over mind), মহা-মন (super mind) এবং সর্বোচ্চ উপলব্ধ আদর্শ সচ্চিদানন্দ। এই উপলব্ধ যে মানুষের আয়ত্তাধীন তিনি স্বয়ং শিবের একরূপতা লাভ করেন এবং এই উপলব্ধিই শিবের শক্তি এবং সেই মানুষ তখন মহামানব। নিট্‌সের মহামানবের অসদৃশ এই মহামানব কিন্তু অহংবাদী স্বপ্রচারক বা পূর্ব পাক্ষিক নহেন, তিনি শিবের নিকট নিজের অহংকার সমর্পণ করিয়া সচ্চিনানন্দ ব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হইয়াছেন। তিনি নিজেই নিজের পরিচালক এবং জগতের সম্মুখে নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে ঘোষণা করিবার জন্যে সচেষ্ট নহেন।

অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য—অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য পূর্ণ অদ্বৈত্যবাদকে সমর্থন করেন। তিনি শংকরের মতবাদের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা না করিয়া কাণ্টের দর্শনের আলোকে নূতনপথে ইহার সত্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অবশ্য Ideas of Reason সম্পর্কিত কাণ্টের অজ্ঞাবাদ সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইতে পারেন নাই। কাণ্টের মতানুসারে বোধের কোন শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যই ইহাদের অন্তর্নিহিত বস্তুস্বরূপ সম্পর্কে সত্য নহে এবং সেইজন্য ইহারা জ্ঞানের অতীত। এই অবস্থায় শ্রীভট্টাচার্য ও কাণ্টের মত অভিন্ন এবং ব্রাহ্মণকে অব্যক্ত ও অচিন্ত্য কিন্তু তবুও বোধগম্যরূপে ব্যাখ্যাতা উপন্িষদের উপর আস্থাব্যঞ্জক।

স্বল্পপরিসরে তাঁহার জটিল যুক্তিসমূহকে ব্যাখ্যা করা শক্ত, তবে যেহেতু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে আমরা কথায় প্রকাশ করিয়া থাকি অতএব সমস্ত কিছুই বাচ্য, ইহাই মূলকথা বলিয়া মনে হয়। বাচ্য দুইপ্রকারের প্রতীক-রূপ-বাচ্য এবং আক্ষরিক-রূপ-বাচ্য। যাহা তথ্য প্রকাশ করে এবং যাহার সম্বন্ধে কেবল বলা হয় তাহারাই আক্ষরিক-রূপ-বাচ্যের অন্তর্ভুক্ত যাহার উল্লেখমাত্র করা হয় তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে যাহার সম্বন্ধে কেবল বলা হয় তাহা প্রতীকানুসারে অথবা অর্থানুসারে বলা হইয়া থাকে। সত্য কেবলমাত্র প্রতীকের

সাহায্যে বলা হয়, বাস্তব প্রতীকানুসারে আক্ষরিকরূপে বলা হয় এবং আত্মনির্ভর অস্তিত্ব (self-subsistent) অর্থানুসারে আক্ষরিকরূপে বলা হইয়া থাকে। "ইহাদের মধ্যে কোনটিই তথ্য হিসাবে বলা হয় না, প্রকৃত ঘটনাই তথ্য হিসাবে বলা হইয়া থাকে।" এইভাবে আমরা বক্তব্যের চারিটি বিষয় পাই, সত্য, বাস্তব, আত্মনির্ভর অস্তিত্ব (self-subsistent) এবং প্রকৃত ঘটনা। সত্য ও বাস্তবের পার্থক্য এই যে দ্বিতীয়টি উপভোগ্য, প্রথমটি নহে।

রাধাকৃষ্ণণ ও অখণ্ড ভূয়োদর্শনজাত অদ্বৈত—তিনি শংকরের মতবাদ মানিয়া চলিলেও শংকরের অধিকাংশ ঐতিহ্যিক শিষ্যের মত জগত তাঁহার নিকট অলীক ভ্রান্তিরূপে প্রতীয়মান হয় না। তিনি মায়াকে ব্যাখ্যালব্ধ-কল্পনা হিসাবে মনে করেন। ইহার অর্থ এই যে জগতের সৃষ্টি ব্যাখ্যার অতীত কিন্তু জগত মূল্যহীন এবং প্রয়োজনশূন্য নহে। তিনি ইহার অপেক্ষা বরং অধিকাংশ পরবর্ত্তী-কালের যুক্তিবাদী অদ্বৈত ব্যাখ্যাতাদের মত সৎ এবং অ-সৎএর বিদ্যমানতা অস্বীকার না করিয়া জগতকে সৎ এবং অ-সৎ, অর্থাৎ অস্তিত্ব ও অস্তিত্বশূন্যের সংযুক্তি বলিয়া মনে করেন। শংকর নিজে এক জায়গায় বাহ্যরূপকে সত্য ও অ-সত্যের মিশ্রণ বলিয়াছেন এবং এই দিক দিয়া রাধাকৃষ্ণণ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন একথা বলা যায়।

শংকর উল্লিখিত ব্রাহ্মণ হইতেছেন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এবং রামানুজ বর্ণিত ব্রাহ্মণ হইতেছেন ঈশ্বর এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া রাধাকৃষ্ণণ শংকর ও রামানুজের মতের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। ঈশ্বর বুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্য বস্তু কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে জানিতে হয় সজ্ঞা দ্বারা। সজ্ঞা বুদ্ধি অপেক্ষা উচ্চস্তরের বস্তু এবং ইহা মন ও বস্তু এই দ্বৈতবাদের উর্দ্ধে অবস্থিত। আমাদের চিন্তাশক্তি সীমিত এবং ইহা যখন সূক্ষ্মযুক্তি সাপেক্ষ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে তখন ইহা নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ব্রহ্মের উপর আরোপ করিয়া ফেলে। এ অবস্থায় চিন্তার ভিত্তিতে বিচার করিয়া ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন মনে করিলে আত্মা ও অন্যান্য পদার্থের বিভেদকে সুপ্ত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সেই সজ্ঞা যাহা চিন্তা ও উপলব্ধি অপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল এবং যাহা স্থূলতর যুক্তি সাপেক্ষ তাহা দ্বারা এই বিভেদ অতিক্রান্ত হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণণ যুগপৎ সর্বমুক্তিতে বিশ্বাস করেন কিন্তু তিনি প্রত্যেক-মুক্তিতে আস্থাবান নহেন। এই সব কিন্তু অদ্বৈতের নিকট নূতন কিছু নহে এবং বাচস্পতির অন্যতম অবর সমধর্মী দার্শনিক গোষ্ঠী দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। যেহেতু ঈশ্বর

জগতের স্রষ্টা অতএব ঈশ্বরকে জগতের অস্তিত্বকাল পর্যন্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত একত্বপ্রাপ্ত না হইয়া ঈশ্বররূপেই থাকিতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বর সৃষ্ট জীবকে ঈশ্বরের সহিত অবস্থান করিতেই হইবে। যতদিন একটিমাত্র অ-মুক্ত আত্মাও বর্তমান থাকিবে ততদিন জগতে অন্তর্হিত হইতে পারে না। সুতরাং একক মুক্তি কেবলমাত্র অসম্পূর্ণ মুক্তির নামান্তর এবং সেই সমস্ত আত্মা যাঁহারা পরম সত্যকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত জগতের শেষে পরিণতি পর্যন্ত অবস্থান করিবেন। রাধাকৃষ্ণণ একজন meliorist, প্রকৃতপক্ষে some form of meliorism শেষ পর্যন্ত অপরিহার্য কারণ ঈশ্বর কোন বিশেষ ক্ষমতা বা কোন অলৌকিক ঘটনা দ্বারা পৃথিবীর উন্নতি সাধন করিবেন এবং মানুষ কেবলমাত্র দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকিবে এরূপ কল্পনা করা অযৌক্তিক। ঈশ্বর মানুষ, তাঁহার সৃষ্ট ত্রাসী এবং চিন্তা ও কর্মে যাঁহারা মানবজগতের আদর্শ তাঁহাদের মধ্য দিয়াই নিজের কার্য করিয়া যান। হিন্দু অবতারবাদের মধ্যে এই সত্যই নিহিত কারণ প্রকৃত পক্ষে সেই সমস্ত মানুষই ইশ্বরের অমৃতস্পর্শের অধিকারী।

টীকা

আওারহীল: কন্টেমপোরারী থট্ অব ইণ্ডিয়া, পৃ ২০৬ ; পৃ ২০৯।

গ্রন্থ-বিবরণী

ফারুকৃহার: মর্ডান রিলিজিয়স মুভমেন্টস ইন ইণ্ডিয়া।

আওারউড: কন্টেমপোরারী ইণ্ডিয়ান থট্।

শর্মা, ডি. এস: হিন্দু রেনেশাঁ।

রাধাকৃষ্ণণ ও মুরহেড: কন্টেমপোরারী ইণ্ডিয়ান ফিলসফি।

দত্ত., ডি. এম: "দি কন্ট্রিবিউসন অফ মর্ডান ইণ্ডিয়ান ফিলসফি টু ওয়ার্ল্ড ফিলসফি" দি ফিলসফিকাল রিভিয়ু, নভেম্বর, ১৯৪৮।

রাজু., পি. টি: "রিসার্চ ইন ইণ্ডিয়ান ফিলসফি: এ রিভিয়ু", জার্নাল অফ দি গঙ্গানাথ ঝা ওরিয়াণ্টাল রিসার্চ ইন্সটিউট, ভলুম ১, পার্ট ২, ৩, ৪।

রাজু., পি. টি: "ইণ্ডিয়ান ফিলসফি: এ সার্ভে", প্রোগরেস অফ ইণ্ডিক স্টাডিজ।

রাজু., পি. টি: "দি আইডিয়ালিজম অফ মহাত্মা গান্ধী" দি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, জানুয়ারী, ১৯৪১।

রাজু., পি. টি: "দি আইডিয়ালিজম অফ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" দি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, জানুয়ারী, ১৯৪০।

রাজু., পি. টি: "দি আইডিয়ালিজম অফ ডঃ ভগবান দাস" দি হিন্দুস্থান রিভিয়ু, ১৯৪০।

রাজু., পি. টি: "দি আইডিয়ালিজম অফ স্যার এস. রাধাকৃষ্ণণ" দি ক্যালকাটা রিভিয়ু, আগষ্ট ১৯৪০।

রাজু., পি. টি: "দি আইডিয়ালিজম অফ জে. কৃষ্ণমূর্ত্তি'' ত্রিবেণী, নভেম্বর, ডিসেম্বর, ১৯৪০।

রাজু., পি. টি: "দি আইডিয়ালিজম অফ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ" দি অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি কলেজ ম্যাগাজিন, অক্টোবর ১৯৪০।

এণ্ড্রুজ, সি. এফ: মহাত্মা গান্ধী আইডিয়াস।

হেবর, লিলি: কৃষ্ণমূর্ত্তি এণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস।

ঠাকুর: সাধনা।

ঠাকুর: পার্সোনালিটি।

ঠাকুর: দি রিলিজন অফ ম্যান।

দাস, ডঃ ভগবান: দি সায়েন্স অফ পীস।

ঘোষ, অরবিন্দ: লাইফ ডিভাইন।

ভট্টাচার্য, কে. সি: দি সবজেক্ট এজ ফ্রিডম।

রাধাকৃষ্ণণ: দি আইডিয়ালিস্ট ভিউ অফ লাইফ।

রাধাকৃষ্ণণ: ইণ্ডিয়ান ফিলসফি।

জোড, সি. ই. এম: কাউণ্টার অ্যাটাক ফ্রম দি ইষ্ট।

লেডবিটার: টেক্সট বুক অফ থিওসফি।

হেলার: দি গসপেল অফ সাধু সুন্দর সিং।

সমসাময়িক ভারতীয় চিন্তাধারা (আ)

॥ এক ॥

সমসাময়িক ভারতবর্ষের কোন নির্দিষ্ট জন্মকাল নির্ধারণ করা সম্ভবপর না হইলেও আমরা আওরংজেবের মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পর হইতে ইহার জন্মলক্ষণ অনুধাবণ করিতে পারি। এই সময়ে ইউরোপীয় রাজনৈতিক প্রভাবের ক্রমশঃ বিস্তার লাভ এবং সমান্তরাল ভাবে ভারতীয় ক্ষুদ্র নৃপতিবর্গের শক্তির ক্ষয়িষ্ণুরূপও দৃষ্ট হইয়াছিল। Wandewash-এর যুদ্ধের অনুরূপ পাণিপথের চূড়ান্ত যুদ্ধও একই বৎসরে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ভারতীয় উপ-মহাদেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ভবিষ্যৎ পথও নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল।

কীভাবে এই সমস্ত আলোড়নপূর্ণ দিনের পরস্পরবিরুদ্ধতা ও অসম মতবাদ মুসলমান সমাজের নবজন্ম আনয়নের জন্য পুরাতন ও নূতনের সমন্বয় সাধনকারী শাহ ওয়াল্লিউল্লাহের অভ্যুত্থানের কারণ হইয়াছিল, তাহা পূর্ববর্তী কোন অধ্যায়ে নির্দেশিত হইয়াছে। তাঁহার দ্বারা প্রোথিত বীজ তাঁহার জীবদ্দশাতেই পরিণতি-লাভ করিলেও তাঁহার প্রভাব তাঁহার মৃত্যুর পর আরও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর মধ্যে রায়-বেরিলীর মোলবী সৈয়দ আহ্‌মদ এবং দিল্লীর মোলবী মোহম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে তাঁহার শিক্ষা এক সক্রিয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করিয়া ফলপ্রসু হইয়াছিল। সৈয়দ আহ্‌মদ শাহ ওয়াল্লিউল্লাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল কাদেরের শিষ্য ছিলেন। সত্যকার ঐসলামিক ভিত্তিতে এক আধুনিক রাষ্ট্র গঠন করিয়া ইসলামের মূলনীতির পুনঃ প্রবর্তন করাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল। সৈয়দ আহ্‌মদ তাঁহার বন্ধু ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান, অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও সুবক্তা মোলবী মহম্মদ ইসমাইলের সহযোগিতায় এই আন্দোলন সংগঠনের জন্য ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশে মুসলমান-প্রধান স্থান নির্বাচন করেন। এই স্থানের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রাথমিক সাফল্যকে অধিকতর সম্ভাবনাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল এবং সমগ্র উত্তর ভারতে এক শক্তিশালী মুসলমান দল তাঁহার পতাকাতলে একত্রিত হইয়াছিল।

এই আন্দোলনকে সংকীর্ণমনা ব্রহ্মবিদ্যাগত গোঁড়ামির পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা হিসাবে বিচার করা অন্যায়। এই আন্দোলনের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য শহীদ

(martyr) শাহ্ ইসমাইল ইহার প্রবর্তক শাহ ওয়ালিউল্লাহ্-এর মত একজন যথার্থ দার্শনিক এবং উদারচেতা ধার্মিক চিন্তানায়ক ছিলেন। তিনিও বিভিন্ন প্রকার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ঐক্য আছে ইহা বিশ্বাস করতেন এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে উক্তি করিয়াছেন যে সমস্ত মহান ধর্মের উৎস হইতেছে একই দৈব প্রেরণা। রূপগত এবং অনুষ্ঠানগত পার্থক্য তাহাদের আছে কিন্তু তাহা হইতেছে তাহাদের বাহ্যিক আবরণ মাত্র, যাহাকে দেশকালের প্রয়োজনে সময়ান্তরে পরিবর্তিত হইতে হইয়াছে।

শাহ্ ইসমাইল তাঁহার দার্শনিকগ্রন্থ 'আবাকতে' (Abaqat) দৈবপুরুষ সিদ্দিক (The Siddique) সম্পর্কে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন: "তিনি যদি তোরাহে (Torah) বাইবেলের পূর্বভাগ বিশ্বাসস্থাপনকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান করেন এবং তিনি তাঁহাদের মধ্যে বিচারকের আসন গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হন তাহা হইলে তিনি মোজেজ্ কর্তৃক প্রণীত অনুশাসন (Law of Moses) অনুসারে বিচার করিবেন এবং অনুরূপভাবে খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বাইবেলের অন্তভাগ (New Testament) অনুসারে এবং কোরাণ-বিশ্বাসীদের মধ্যে কোরাণের সর্ত অনুসারে বিচার করিবেন। প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির এক বৃহৎ অংশ কর্তৃক অনুসৃত প্রত্যেক মহান্ ধর্মেই এমন মানুষের সাক্ষাত পাওয়া যায় যাঁহারা দৈবশক্তির (Divine) সুরসাধনা করিতেছেন। খৃষ্টান যাজক, ইহুদী শাস্ত্রব্যাখ্যাতা, গ্রীসীয় দার্শনিক, পারসিক জরাথুষ্ট্র প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী এবং হিন্দুযোগী প্রত্যেকের আনন্দ-স্বরূপ জীবন (Life Divine) অভিসারী আধ্যাত্মিক পথের প্রকার ভেদ স্ব স্ব ধর্মের মূলনীতির সীমানায় ঐক্য-নিধৃত হইয়াছে। এই সমস্ত মহান্ ধর্মমত ঐ এক মূলনীতি হইতে উদ্ভূত। উৎসে ইহাদের প্রত্যেকটিই ছিল বিশুদ্ধ কিন্তু কালান্তরে ভ্রান্তমত এবং কুপ্রথা ইহাদের উপরে বিদ্বেষপূর্ণ উপলেপ দিয়াছে। বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রত্যেকটি ধর্মই পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে এবং ধর্মানুগামীদের নিকট সেই ধর্মমতের মূলীভূত নীতির উপলব্ধির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। পরবর্তীকালের উত্তর সাধকগণ মূলধর্মমতকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করে। এই সমস্ত বিকৃত বুদ্ধিকে অপসারণ করিয়া ধর্মের মূল রূপ এবং যথার্থ বাণীটিকে আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা মহাজ্ঞানীদের থাকে। তিনি ধর্মকে ইহার উদ্ভবকালীন পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতায় মূলনীতির আলোকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন কারণ তাহার আত্মা সদাজাগ্রত।"

এই আন্দোলনকে কলঙ্ক চিহ্নিত করিয়া ব্রিটিশ ইহাকে ওহাবি আন্দোলনের সমরূপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। মৌলবী সৈয়দ আহমদ্

যদিও আরবদেশে গিয়াছিলেন এবং ওহাবি চিন্তাধারার সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন তথাপি তিনি নেজ্‌দের (Nejd) মহম্মদ বিন্ আবদুল ওয়াহাব-এর অনুগামী শিষ্য ছিলেন না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে দুইজনের মূল লক্ষ্য প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। তাঁহারা উভয়েই ইসলাম-ধর্মীয় চিন্তা এবং নীতিকে বৈদেশিক প্রভাবস্পর্শ হইতে পবিত্র রাখিতে চাহিয়াছিলেন এবং জগৎসমক্ষে সত্যকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইস্‌লামিক ধারণার পরিপূর্ণ রূপ উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুইটি আন্দোলনের সাদৃশ্য এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছিল যে ভারতীয় আন্দোলন ওহাবি প্রেরণার অঙ্গস্বরূপ। বাস্তবিকরূপে ইহা একটি স্বদেশজাত বস্তু এবং ইহার মূল ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল দিল্লির শাহ্ ওয়ালিউল্লাহের মতবাদের উপরে, নেজ্‌দের মোহম্মদ বিন্ আবদুল ওয়াহাবের মতবাদের উপরে নহে। শাহ্ ওযালিউল্লাহের মতবাদ এবং মৌলবী সৈয়দ আহ্‌মদের সহিত যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সম্পর্কে সাধারণের অজ্ঞতা এই ভ্রান্তির আংশিক কারণবিশেষ।

এই ওযালিউল্লাহ আন্দোলন যাহা আজও চিন্তাবিদ্, বিপ্লবী এবং বিশিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্‌দের জন্মদান করিতেছে তাহা কোনও সামগ্রিক উন্নয়ন বা বিপ্লবের চেষ্টায় কৃতকার্য হয় নাই কিন্তু এমন এক সুপ্ত শক্তির সৃজন করিয়াছে যাহা বর্তমানকালের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে আংশিকভাবে কার্যকরী হইতেছে। পরলোকগত মৌলানা ওবাহিদুল্লাহ্ সিন্ধি (১৮৮১-১৯৪৮) জন্মলাভ করিয়া এই দৃঢ় বিশ্বাসে কাজ করিয়া গিয়াছেন যে এই মতবাদ যদি যথার্থরূপে উপলব্ধি করা যায় তাহা হইলে ইহা এক বৈপ্লবিক রাষ্ট্র সমাজের সৃষ্টি করিতে পারে। এইরূপ সমাজ সমস্ত প্রধান সংস্কৃতির উত্তরকালীন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়সাধন করিতে পারে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে তাঁহার নিজস্ব বিশেষ দক্ষতা অনুসারে উন্নত হইবার স্বাধীনতা দান করিতে পারে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিভেদের মধ্যে ঐক্যই হইতেছে নিযম এবং ইহাই বিভিন্ন জাতি এবং ধর্মের আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঈশ্বর মানবজাতির বৈশিষ্ট্যহীন একরূপত্ব চাহেন না। ভিন্ন সংস্কৃতি এবং পর-ধর্ম-অসহিষ্ণুতা অজ্ঞতার পরিচায়ক। সংকীর্ণমনা ধার্মিক মানুষ নিঃসন্দেহে অস্তিত্বহীন।

॥ দুই ॥

মুসলিম জীবনধারা ও মননের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত নব পর্যায়ের কোন আন্দোলনকে অনুধাবন করিতে হইলে আমাদের সেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে যখন ভগ্নপ্রায় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিঃশেষে ভূমিসাৎ করিয়া সিপাহী-বিদ্রোহ মুসলমান আধিপত্য ও প্রভাবের উপর মৃত্যুশেল বর্ষণ করিল। সর্বপ্লাবী জয়শীল নবীন শক্তিটির আবির্ভাব হইয়াছিল সাত সমুদ্রের পার হইতে। রাজা রামমোহন রায় এবং স্যার সৈয়দ আহম্মদ খানের মত মহান্ মনীষী এবং সংস্কারকগণ অবিলম্বেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, ইহা একটি সাধারণ সামরিক বিজয়-ঘটনামাত্র নয়, জ্ঞানের উৎকর্ষেই প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্ত্য তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে। বিদেশীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অনুষ্ঠান এবং বিদ্বেষ প্রচারের নিষ্ফল প্রয়াসের পরিবর্তে বিজ্ঞতর পন্থা হইবে আমাদের নিজেদের জীবনপদ্ধতির সংস্কারসাধন করিয়া পাশ্চাত্ত্য যে নূতন মূল্যবোধ আমদানী করিয়াছে তাহাকে আপনার মধ্যে ধারণ করা এবং আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারকে যথাসম্ভব সর্বপ্রকার অমঙ্গলকর ও বিঘ্নজনক অনাবশ্যক বস্তুভার হইতে মুক্ত করিয়া বস্তুবাদী বিজ্ঞানমুখী প্রগতির সহিত তাহার সমন্বয় সাধন করা। এই দুইজন মহান্ চিন্তানায়ক ও সংস্কারকের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দুইজনেই ছিলেন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পর্যালোচনায় নিবিষ্ট এবং নিজ নিজ মহান্ ধর্মের পরমার্থটিকে উদ্ধার করিবার কাজে তৎপর মহান্ জ্ঞানী পুরুষ। আপন আপন ধর্মের অন্ধসংস্কারের দুর্বিসহ পেষণ হইতে মুক্তি অর্জনের জন্যই তাঁহাদের উভয়ের সাধনা ছিল। দুই জনেই ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। দুইজনেই ছিলেন যুক্তিবাদী এবং তাঁহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, বিশুদ্ধতম এবং উন্নততম আস্তিকতাও এক ধরণের যুক্তিবাদী মতবাদ এবং তাহাই সহজধর্ম। দুইজনেই বিশ্বাস করিতেন যে, সর্বথা পরিবর্তন ও প্রগতিকে হেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়া কোন সমাজই সুস্থ জীবন লাভ করিতে পারে না। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের দুইজনেরই এই বিশ্বাস ছিল যে নিরেট শিলীভূত গুরু-বচনের নিষেধে মানুষের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক ও রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াপন্থী ভূমিকা গ্রহণ না করিয়া ধর্মের পক্ষে বরং মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও প্রগতির অনুকূল এক সচল শক্তিতে পরিণত হওয়াই সঙ্গত।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ এবং স্বভাবধর্মের আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। জঘন্য অন্ধ সংস্কারের বন্ধন হইতে

মুসলমান সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হইলেন। ইহা ছিল মোল্লা-বিরোধী আন্দোলন, সুতরাং সমগ্র মোল্লা-সমাজ তাঁহার সংস্কারকার্যকে পরাস্ত করিবার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হইল। ভারতে মুসলিম মননের ইতিহাস-ক্ষেত্রে সৈয়দ আহম্মদের ইসলামের প্রতি বিশিষ্ট ব্যবহারের পরিচয়টি এই যে, একদিকে তিনি ইসলামের শাশ্বত সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন, অন্যদিকে তাঁহার এই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে আধুনিক বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদের সহিত মৌল ইস্‌লাম-তত্ত্বের পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। পাশ্চাত্ত্য যেমন একদা অতীতে ইসলামের সংস্কৃতি-সম্পদকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই আধুনিক ইউরোপের বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিকে প্রাচ্যের পক্ষেও আত্মীকরণ সম্ভব হইবে ইহাই ছিল তাঁহার অভিমত। পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকারক তিনি একেবারেই ছিলেন না, তাহা ছাড়া পরবর্তী দুই পুরুষ ধরিয়া ভারতীয়েরা যে হীনমন্যতা-গ্লানির শোচনীয় আক্রমণে জর্জরিত হইয়াছে, তিনি সেই আধি হইতেও মুক্ত ছিলেন। যদিও তিনি আপন প্রগতিশীল মতবাদের আনুপাতিক সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, তবুও নিজেকে ঘিরিয়া এমন একদল সম-আদর্শে উদ্দীপ্ত কর্মীকে তিনি সংগঠিত করিয়াছিলেন, যাহারা আন্দোলনের বিরুদ্ধে উদ্যত প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাস্ত করিল। আলিগড় চিন্তা ও কর্মের নায়কদল সৃষ্টি করিয়াই চলিল, অবশ্য যদিও তাঁহাদের মধ্যে একজনও প্রতিষ্ঠাতার সামর্থ্যের স্তর পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন নাই। আধুনিক সভ্যতার সৃষ্ট মূল্যবোধের আত্মীকরণের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার স্বজাতি ব্রিটিশ অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিবে ইহাই ছিল তাঁহার প্রত্যাশা। মেকলে যেমন ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ইংরাজি শিক্ষার পরিণামে ভারতবর্ষে এমন এক শ্রেণীর কালা ইংরাজ সৃষ্টি হইবে যাহারা ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা শাসিত হইবার পক্ষেই দাবী জানাইবে, ঠিক তেমনই তাঁহার সমসাময়িক সৈয়দ আহম্মদও স্থির প্রত্যয়বান্ ছিলেন যে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক স্বাধীন জাতি গড়িয়া তুলিবার জন্য ইসলামের স্থায়ী মূল্যের সহিত আধুনিক বিজ্ঞান এবং সভ্যতা-প্রগতির সমন্বয় সাধন করা সঙ্গত এবং কর্তব্য। শাহ্‌ওয়ালিউল্লার মত তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী এবং বিপ্লবপন্থী ছিলেন না, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগের সেই মহান্ চিন্তানায়কের সহিত তাঁহার মিল এই দিক দিয়া যে বিকারমুক্ত বিশুদ্ধ ধর্মের যুক্তিবাদিতা এবং সার্বজনীনতায় তিনিও ছিলেন তাঁহারই মত বিশ্বাসী।

॥ তিন ॥

ইসলামের এবং কোরাণের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সৈয়দ আহম্মদ খান-কৃত ভাষ্যের পরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ভাষ্যটি, তাহা মৌলনা আবুল কালাম আজাদের রচনা। বহুযোগ্যতাসম্পন্ন সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক হিসাবেই তাঁহার প্রথম আবির্ভাব হয়, তাহার পর পথ-পরিবর্তন করিয়া প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং বিদেশী শাসন-শৃঙ্খল হইতে দেশকে মুক্ত করিবার সংগ্রামের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া তিনি একাধারে একজন মহান্ রাজনৈতিক নেতারূপে এবং কোরাণ ও ইসলামের উদারতম ব্যাখ্যাতারূপে তাঁহার কর্মজীবনকে পরিণতি দান করেন। যদিও তাঁহার প্রথম জীবনের শিক্ষার প্রকৃতি ছিল ইসলামপন্থী এবং প্রাচ্যমার্গী, তবুও তাঁহার অসাধারণ মেধাশক্তির প্রসাদে আধুনিক বিজ্ঞান-এষণার মূলমন্ত্রটি তিনি অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজস্ব বিবৃতি অনুসারেই জানা যায় যে, অশেষবিধ সংশয়ের কণ্টকে তাঁহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। মাঝে মাঝেই সংশয়বাদ তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোরাণ-আশ্রিত ইসলামে আন্তরিক বিশ্বাস লইয়াই তিনি জাগিয়া উঠিয়াছেন। যদিও আধুনিক বিজ্ঞান ও আন্দোলনধারা সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের সীমা সৈয়দ আহম্মদ খানের পক্ষে অধিগম্য সে যুগের ধারণার চেয়ে বিস্তৃততর এবং সম্পন্নতর ছিল, তবুও সৈয়দ আহম্মদ খানের মতই তিনিও বিশ্বাস করিতেন যে প্রকৃত ধর্মের সহিত বিজ্ঞান-এষণার মূলতঃ কোন বিরোধ নাই।

তাঁহার মানসভঙ্গি সৈয়দ আহম্মদ খাঁকে একদিক দিয়া স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া মনে হওয়া সম্ভব যে, তিনিও শাহ্ ওয়ালিউল্লার আন্দোলন-মালায় একটি সংযোজক অংশ। ধর্মের সার্বজনীনতা ও নানা ধর্মবিশ্বাসের মূলগত ঐক্য সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালিউল্লা এবং তাঁহার অনুগামীদের মতবাদ আমরা পূর্বেই পর্যালোচনা করিয়াছি। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, শাহ্ ওয়ালিউল্লা এবং শাহ্ ইসমাইল বিশ্বাস করিতেন যে, বিভিন্ন ধর্মের আনুষ্ঠানিক রীতি এবং চলিত বিধানের পার্থক্যের আবরণতলে একই আধ্যাত্মিক উৎস এবং ঈশ্বরস্বরূপ বিরাজমান। বিভিন্ন ধর্মের বিধিবিধান, চলিত প্রথা এবং পূজাপদ্ধতি তাহাদের মর্মবস্তুর বহিরঙ্গ আবরণমাত্র, এবং এই আঙ্গিকগুলি লইয়া কোন বিরোধ সৃষ্টি হওয়া সঙ্গত নয়। আবুল কালাম সবিস্তারে তাঁহার এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ইসলাম বলিতে ধর্মের নানা শ্রেণীর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ সম্বলিত ধর্ম-বিশেষকে বোঝায় না, এই নামে

বরং এমন একটি সার্বজনীন ধর্মমতের পরিচয় ফুটিয়া উঠে, যাহা সর্বাশ্রয়ী ও সর্বাতিশায়ী অদ্বয় ঈশ্বরে বিশ্বাসের ভিত্তিতে এবং নৈতিক শীল ও পারলৌকিক জীবনে আস্থার উপকরণে গঠিত। তাঁহার মতে ভগবৎ-স্বরূপের প্রধানতম ঐশ্বর্য হইতেছে সত্য-শিব-সুন্দর সকল পদার্থের সৃষ্টি কারণস্বরূপ তাঁহার লীলাময় প্রেম ও মঙ্গলবিধাতৃত্ব, এবং অনুশাসন তাঁহার প্রেম হইতেই উৎসারিত।

সার্বজনীন ধর্ম হিসাবে ইসলামের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার ফলে যে সকল আচার এবং অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন, সেগুলিকে আবুল-কালাম সঙ্গতভাবেই তুচ্ছ করিয়া পিছনে স্থান দিয়াছেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লার ধর্মব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁহার বরেণ্য আধুনিক শিষ্য স্বর্গত মৌলানা ওবাইদুল্লা সিন্ধি যে ধারণা দিয়াছেন, তাহার সহিত এই মত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামের অনুশাসন এবং অনুষ্ঠানপদ্ধতিকে ইসলামেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে মনে করেন, অথবা বহিরঙ্গ পরিচ্ছদমাত্র গণ্য না করিয়া যাহারা তাহাকে ইসলামেরই দেহাত্মাস্বরূপ গণ্য করেন, সেই সব গোঁড়াপন্থীদের প্রবল বিরোধিতাকে এই দুই মনীষী উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইসলামের শাশ্বত এবং স্থায়ী মূল্য যে অবস্থাচক্রে-নিয়ত-পরিবর্তনশীল রাষ্ট্রীয় বিধান হইতে পৃথক্, এই বিশ্বাস আধুনিক মুসলিম জাতিগুলির মধ্যে একমাত্র তুর্কীরাই প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছে, এবং ইহাকে তাহাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। যদি আবুল কালাম আজাদ তুর্কীতে থাকিতেন, তাহা হইলে ইসলামের তত্ত্বসার হইতে রাষ্ট্রীয় বিধানরচনাক্রমটিকে পৃথক করিবার কামালপন্থী আন্দোলনকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ও প্রচুর বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সমর্থন করিতে পারিতেন এবং প্রগতিকে স্বচ্ছন্দ ও অবাধ করিয়া তুলিতে পারিতেন।

ধর্ম হিসাবে ইসলামের স্বাতন্ত্র্যে লুপ্ত-বিশ্বাস আবুল কালাম ভারতবর্ষে এক অখণ্ড জাতি সৃষ্টি করিবার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, যে-বস্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতেছে তাহা নিতান্তই অযথার্থ, এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার নেতৃত্বের দ্বারা ভারতবর্ষে বিচিত্র শ্রেণীর মানুষের মধ্যে মৌলিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন যে জাতীয় আন্দোলনের নেতারূপে তাঁহার ভূমিকাটিরই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক মতবাদে, এবং অন্য ধর্মমতের বিশেষত্বগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারে এমন এক সার্বজনীন ধর্মরূপে ইসলামকে ব্যাখ্যা করিতে তিনি অনুপ্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আসল সত্যটি ইহার

একেবারে বিপরীত হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। ধর্মের সার্বজনীনতায় এবং সর্বমানবের ঐক্যে তাঁহার বিশ্বাসই খুব সম্ভব তাঁহাকে সর্বপ্রকার বিচ্ছেদকামী আন্দোলনের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। এই সত্য স্থাপিত হইয়া আছে যে, ইসলাম ও কোরাণ সম্পর্কে তাঁহার ব্যাখ্যা এবং সার্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত সমূহের একটি প্রবল আবেদন সমস্ত উদারহৃদয় মানুষের কাছেই আছে, তাহা ছাড়া সাধারণভাবে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে ইসলামের ক্ষেত্রে তাঁহার ভাষ্যটি একটি মহৎ সংযোজন।

॥ চার ॥

সমসাময়িক মুসলিম ভারতে মহান্ কবি-দার্শনিক স্যার মহম্মদ ইকবালই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ মনীষী। একদিকে প্রাচ্য ও ইসলামপন্থী শিক্ষায়, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় শিক্ষিত হইবার সৌভাগ্য ইকবাল লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল তারিখে। সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপকরূপে তিনি তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত করেন, কিন্তু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর আইন-ব্যবসায়কেই তিনি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়সেই কবি হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার কবিতা ছিল মনন সম্পদে পূর্ণ; সে মনন ভাবাবেগের দ্বারা অনুরঞ্জিত। সাধারণ বিষয়ের কবিতা রচনা ছাড়াও সারা দেশে যেখানেই উর্দু অথবা হিন্দুস্থানী সহজবোধ্য, সেই সব অঞ্চলে ব্যাপকভাবে উদ্গীত তাঁহার দেশাত্মমূলক কবিতাগুলি রচনার কাজে তিনি তাঁহার মহত্তম শিল্পটিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'হিন্দুস্থান হামারা' কবিতাটি একটি জাতীয় সঙ্গীতের পর্যায়ে গণ্য হইয়াছিল, এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের রাত্রিতে ভারতীয় পরিষদে সে গানটি গাওয়া হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর পূত ভস্ম যেদিন গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হইতেছিল, সেদিন ধারা-বিবরণীর মাঝখানেও তাঁহারই রচিত একটি কবিতা গানে পরিবেশন করা হইয়াছিল। অন্যদিকে পাকিস্তান সৃষ্টির লগ্নেও তাঁহারই কবিতা গান করা হইয়াছিল; একজন মহান্ কবির সত্তা কিভাবে সমস্ত রাজনৈতিক বিভেদের ঊর্ধ্বে জাগিয়া থাকে তাহারই পরিচয় এখানে।

ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে ইউরোপীয় ভাবধারা এবং সংস্কৃতির অনুশীলন করিয়াছিলেন। একদিকে পাশ্চাত্যের দানযোগ্য মঙ্গল-অর্ঘ্য, অন্যদিকে ইউরোপীয় জাতিগুলির অন্তর ছেদনকরী শিল্প-সাম্রাজ্যবাদী সংঘাত, এই দুয়ের সম্পর্কেই তিনি সচেতন ছিলেন। যে সময়টিতে তিনি পাশ্চাত্য দেশে ছিলেন, সেই সময়েই ইসলাম ও প্রাচ্যতত্ত্বের স্থায়ী মূল্য বিষয়ে তিনি উপলব্ধি করেন, ইহা স্ববিরোধের মতই মনে হয়। সম্ভবতঃ ইউরোপে থাকার সময়েই তিনি নূতন প্রাণশক্তিতে স্বদেশকে উজ্জীবিত করিবার কাজে তাঁহার কাব্য-প্রতিভাকে উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করেন। ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর তিনি সাধারণভাবে তাঁহার স্বদেশের এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের সমস্যাগুলি গভীরভাবে অনুধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিপর্যয় তাঁহার অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাঁহার স্বজাতির অবসন্ন আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার কবিতাকে তিনি নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমানদের উদ্দেশ করিয়া রচিত তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবন-সঞ্চারী ভাবগুলি ভরিয়া দিলেন। মুসলমানদের জন্য তিনি ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা করিলেন, এবং নিজস্ব চিন্তার মধ্যে তিনি এমন এক আবেগের রং সঞ্চার করিলেন যাহাতে সকলের হৃদয়তন্ত্রীতে সংঘাত উপস্থিত হইল।

পারসের ক্লাসিক ভাষায় রচিত 'আসূরারি খুদি' (আত্মার রহস্য) তাঁহার প্রথম দার্শনিক কবিতা। ইহার পরেই রচিত হইল অনুরূপ দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ তাঁহার দ্বিতীয় দার্শনিক কবিতা 'রমুজি বেখুদি' (অনাত্মতার রহস্য)। তিনি দার্শনিক ভাববাদ, নীট্‌শীয় শক্তিবাসনা, বের্গসঁর জীবনীশক্তিতত্ত্ব (élan vital) এবং ইসলামপন্থী ঐতিহ্যের সমবায়ে রচিত আত্মোপলব্ধি ও ন্যায়দাবীযুক্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁহার স্বদেশকে সাধনা ও ত্যাগব্রতে উদ্বুদ্ধ করিবার উপযোগী দার্শনিক কবিতা এবং প্রখর ভাবাবেগপূর্ণ গীতি তিনি একে একে রচনা করিয়া চলিলেন। নিজের সম্পর্কে তাঁহার অনুযোগ ছিল যে, তিনি স্বয়ং কাজের মানুষ নন, কিন্তু 'যে-কবিতা জাতির অন্তরে ভরসা জোগায় তাহাই এক কর্মানুষ্ঠান' এ-কথার যদি অর্থ থাকে, তবে তাঁহার জীবনই ছিল কর্মের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা। বৃত্তিতে তিনি আইনজীবী হওয়া সত্ত্বেও স্বজাতির জন্য নূতন আইন রচনার জন্য তিনি কোন যত্ন করেন নাই। 'দেশের জন্য আমাকে সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে দাও, দেশের আইন যার খুসি সে রচনা করুক' সম্ভবতঃ এই বক্তব্যে

তিনি বিশ্বাস করিতেন। মোসলেম ভারতের ইতিহাসে তিনি অদ্বিতীয়ভাবে ভারতীয় মুসলমানদের নৈতিক এবং বুদ্ধিগত চেতনার অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। একটি কবিতায় তিনি নিজেকে গ্যেটের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; কিন্তু বহুপ্রতিভাধর হিসাবে গ্যেটের শ্রেষ্ঠতা সত্ত্বেও, এবং জার্মান সংস্কৃতির উপর গ্যেটের বিরাট এবং ব্যাপক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও কিছু অতিরঞ্জনের আশংকা না করিয়াই এ কথা বলা যায় যে, ইকবাল যতটা পরিমাণে ভারতীয় মুসলিম চেতনার অঙ্গী হইয়া গিয়াছেন, সেই পরিমাণে গ্যেটে জার্মান চিত্তের অংশ হইয়া উঠিতে পারেন নাই।

তাঁহার প্রচারিত তত্ত্ব অল্প কথায় সংক্ষেপে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। অন্যান্য সকল মনীষীদের মতই তিনি নানা প্রান্ত হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা জীবনযাত্রার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকেই স্পর্শ করিয়া আছে, এবং তাহা সমুন্নত ও সুগভীর একটা কিছুর ইঙ্গিত আভাসিত করিয়া তোলে। শাহ ওয়ালিউল্লা এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক গুরু রুমির মতই বিপরীতের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার মহান্ সাধক তিনি। তাঁহার অন্তরে মরমিয়াবাদের স্পর্শ ছিল; কিন্তু তাঁহার মরমিয়াবাদ জীবনের সদর্থক স্বীকৃতিতেই রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল। কামনা-নিরোধের শিক্ষা তিনি দান করেন না, বরং কামনার প্রবলতা, গৌরব এবং দিব্য-স্বভাবই তিনি প্রচার করেন। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর-সন্ধানের আগ্রহ সৃষ্টি না করিয়া তিনি মানুষকে বরং আপন সত্যস্বরূপকেই সন্ধান করিতে নির্দেশ দেন, কারণ তাঁহারই কথায় 'ঈশ্বর নিজেই মানুষকে সন্ধান করিয়া ফেরেন'।

ইকবালের চিন্তা এবং জীবনভঙ্গি যেন সমকালীন মোসলেম ভারতের প্রাণ-কেন্দ্রস্থ খরবেগ শক্তি-স্বরূপ। যে মুসলিম চেতনার নবরূপায়ণ এবং নব-প্রবর্তনা-দান তাঁহার লক্ষ্য ছিল, প্রথমতঃ তাহারই প্রতি তাঁহার সম্ভাষণ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার সর্বগ্রাহী দৃষ্টিপরিধির মধ্যে এমন এক সার্বজনীন স্থায়ী সম্পদ আছে, যাহা বিশ্বসাহিত্যে তাঁহার স্থান রচনা করিয়া দিয়াছে। এই দিক দিয়া ফিক্‌টে (Fichte) এবং মজ্জিনির (Mazzini) সহিত তাঁহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তাঁহাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল যথাক্রমে জার্মান ও ইতালীয় চিত্তকে উদ্বোধিত করা, তাহাদের মানবতা এবং দিব্যভাবকে জাগাইয়া তোলা। মনীষী ও দার্শনিক হিসাবে তাঁহাদিগকে অবশ্য বিচারশক্তি এবং নীতিবোধের দৃঢ় প্রশস্ত ভিত্তিস্থান রচনা করিতে হইয়াছিল। গোষ্ঠি-চেতনার আবেগকে উত্তেজিত করিয়া সঙ্কীর্ণ ও স্পর্ধিত আত্ম-ঘোষণার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া

তোলার আশু লক্ষ্য তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহাদের স্বদেশকে একটি সাধনপন্থার নির্দেশ দেওয়া, পূর্ণ আত্মোপলব্ধির অভিসারী করিয়া তোলা।

ইকবালের মানবিক ও দিব্যানুভূতিসম্পন্ন গানগুলি পড়িবার এবং গাহিবার সময় কখনো কখনো মনে জাগে চিরন্তন সেই ভাগবদ্‌গীতার কথা, ইকবাল যাহাকে হিন্দু আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক বিবর্তনের ধারায় মহত্তম ও গভীরতম সৃষ্টি বলিয়া গণ্য করিতেন। ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করা যে প্রাথমিক কর্তব্যের অঙ্গ, পাণ্ডব যোদ্ধৃপ্রধানকে এই কথাটিই উপলব্ধি করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক সমস্যার সমগ্র পরিধি পরিক্রমণ করিতে হইয়াছিল। যে-কোনও দেশের ইতিহাসে যাহা নিতান্ত সাধারণ ঘটনা, সেইরূপ একটি প্রচণ্ড কুলবিরোধের প্রসঙ্গে বিষয়টির উদ্ভব, অথচ মানুষের কাছে চিরদিনের জন্য শাশ্বত সত্যকে উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে এক মহান্ পুরুষ কর্তৃক ঘটনাটির সদ্ব্যবহার হইয়াছিল। দেখা যায়, ইকবাল-সমসাময়িক ভারত-ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সদৃশ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। ইকবালও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্য এবং জীবন-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বলিস্বরূপ তাঁহার স্বজাতি নানা সংঘাতময়, শক্তির প্রভাবে বিভ্রান্ত। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ইসলামের যে মূল মর্মের সহিত চিরন্তন সত্যের প্রকৃতি অভিন্ন, তাহার উপলব্ধিই একটি জাতির মধ্যে জীবনবর্ধক ঋষিদৃষ্টি উন্মেষিত করিতে পারে। সত্যদৃষ্টি যখন আচ্ছন্ন হয়, এবং সত্যরূপা প্রেরণা যখন নিষ্ক্রিয় বা লুপ্ত হয়, তখনই সকল জাতির ধ্বংসের সূচনা দেখা দেয়।

একটি ছোট লিপিচিত্রের মধ্যে এই মহান্ কবি-দার্শনিকের কৃতিসমূহের সংক্ষিপ্তসার মাত্র নিবদ্ধ করা সম্ভব। তাঁহার মহত্ত্বের আসল রহস্য কোথায়? আসল সত্য এই যে, তাঁহার চিত্তের ও তাঁহার বিচারশক্তির মহিমাই জীবনগতির আপাত-স্ববিরোধগুলি উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে একটি মহৎ সমন্বয়ের মধ্যে সংহতি দান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আপনার ভারকেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইবার একটু আশঙ্কা না রাখিয়া যখন তাঁহাকে সর্বমতবাদ প্রসঙ্গেই আপন হৃদয় উন্মুক্ত করিতে দেখি, তখন মাঝে মাঝে মনে হয় যে, কেবল সারগ্রহিতাই তাঁহার মতবাদের স্বরূপ, যাহা প্রত্যেক মতবাদের সারবস্তু চয়ন করিয়া নানা বর্ণে অভিরাম একটি পুষ্পস্তবকের উপহার নিবেদন করে। কিন্তু কোন মহান্ ব্যক্তিই শুদ্ধ সারসংগ্রাহক হইতে পারেন না; যে শক্তি ইকবালের মধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা শুধু সারসংগ্রহ-জনিত হওয়া অসম্ভব ছিল। মরমীশ্রেষ্ঠ রুমির ন্যায়

এবং ডারউইনীয় বিবর্তনবাদী নাস্তিক নীট্শের মতন সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির মহাসত্ত্বদেরও তিনি একত্রে বিবৃত করিয়াছেন। নীট্শের অতিমানব সম্পর্কে দিব্যবোধ কখনও অতিজান্তবের ধারণায় বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এবং মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার দীর্ঘ বিবর্তন পথে যে-সমস্ত পারমার্থিক মূল্যবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বিকৃত চিন্তার রসাতলে বিসর্জন দিয়া বসে। নীট্শে সম্পর্ক ইকবাল বলেন যে, ধর্মবিশ্বাসীর হৃদয় তাঁহার, কিন্তু বিচারবুদ্ধিটি অবিশ্বাসীর মত। ইকবাল বিশ্বাস করিতেন যে, নূতন মূল্যমান নির্ণয়ের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টার কোন কোন দিক যথার্থ্যপূর্ণ, এবং তাহাকে সুস্থ আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে মিলাইয়া রূপান্তরিত করিয়া নেওয়া চলিতে পারে। রুমি বলিয়াছিলেন যে, মানবজাতিকে প্রকৃতি-পরিবর্তন করাইয়া উর্ধ্বগতি দান করিতে হইবে, ঠিক এই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে জরথুস্ত্রের বয়ানে নীট্শের লেখায়; কিন্তু পার্থক্য দেখা দিয়াছে লক্ষ্যে এবং পন্থায়।

ইকবাল-চিত্রের সুবৃহৎ পটে কালো ছায়াগুলিও চিত্রের মহিমাকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতেছে। বের্গসঁর স্ৃষ্টিমূলক বিবর্তনবাদের তত্ত্বের দ্বারা তিনি অনেকখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ন্যায়মাত্রসম্বল বিচারশক্তির অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তিনি বের্গসঁ ও অন্যান্য অতীন্দ্রিয়বাদীগনের সহিত একমত ছিলেন। সহজ প্রজ্ঞাদৃষ্টিকে বাদ দিয়া শুধুমাত্র বিচারশক্তির সহায়ে পরমাত্মার মূল তত্ত্বে পৌঁছানো যায় না, এবং মানুষের আপন আত্মার সহিত অনন্ত সৃষ্টিপরায়ণ সেই জীবনীশক্তির (élan) সুরসামঞ্জস্যও প্রতিষ্ঠা করা যায় না, যাঁহাকে আস্তিক্যবুদ্ধি-সম্ভূত ঈশ্বর বলিয়াই তিনি গণ্য করেন, এবং যাঁহাকে তিনি মরমীদের উপলব্ধিগোচর যুগপৎ স্থির ও চঞ্চল পরম সত্তার সঙ্গে অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। মানুষের জীবনে গতিসঞ্চার করা ইকবালের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া সেই গতিমান্ পরমেশতত্ত্বটির উপরই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, যাঁহার গতির অংশ আপনার মধ্যে লাভ করিয়া মানুষ একই সঙ্গে তাহার মানবিক এবং দিব্য প্রকৃতিটি যথার্থ রূপে অর্জন করিতে পারিবে।

বিবর্তনবাদ বলিতে সম্ভবতঃ ভাবপ্রবাহ বা যুগমানসকেই বোঝায়। ইকবালের সমসাময়িক মহান্ অতীন্দ্রিয়বাদী মনীষী শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র হিন্দু আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যকে এক গতিশীল পারমার্থিক বিবর্তনবাদের তত্ত্বে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। অরবিন্দ তাঁহার তত্ত্বের পরিধির মধ্যে উনবিংশ শতাব্দির বস্তুবাদ এবং বিংশ শতকের সমাজবাদ ও সাম্যবাদ সমস্ত কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করিয়া মানুষের

পূর্ণাঙ্গ উন্নতির এমন এক আদর্শ মানবজাতির সম্মুখে উপস্থিত করেন যাহা মানুষের কোন একটি দিককেই অনধিকৃত এবং অপরিবর্তিত রাখে না। শ্রীঅরবিন্দ একটি উন্নত আধ্যাত্মিক দিব্যদৃষ্টির ফলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমগ্র নূতন ও পুরাতন তত্ত্বৈশ্বর্যকে একটি সুশৃঙ্খল ঐক্যের মধ্যে গ্রথিত করিয়াছেন। ইকবালের সঙ্গে অরবিন্দের অবশ্য একদিক দিয়ে পার্থক্য আছে, ইকবাল আপনার জীবনে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করেন নাই, কিন্তু সহজ প্রজ্ঞার উপরে বেশী রকম গুরুত্ব দানের ফলে তিনি অতীন্দ্রিয়ানুভূতির প্রান্তসীমাতেই বিচরণ করিয়াছেন। কবি ও দার্শনিকের চেতনাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার জীবনে অতীন্দ্রিয় সত্যের আভাস মিলিয়াছে। বেদান্তের চেতনার মধ্যেই অরবিন্দের বাসা, এবং তিনি প্রাচীন ভারতের সত্যদর্শী ও সত্যসেবী ঋষিদের পথেই প্রয়াণ করিয়াছেন। ইকবালের দৃঢ়মূল আশ্রয় ছিল ইসলামের অধ্যাত্ম-চেতনার মধ্যে। ভিন্ন পথে যাত্রা সুরু করিয়া তাঁহারা প্রায় একই লক্ষ্যের অভিমুখে আসিয়া মিলিয়াছেন। ঈশ্বর এবং সৃষ্টিলোক মিলাইয়া যেমন ঐক্য, সত্যেরও যদি তেমনই অদ্বয় স্বরূপ হয়, তবে ভারতের দুইজন মহান তত্ত্ববিদের দৃষ্টিভঙ্গির এই সাদৃশ্যে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

বহু শতাব্দি পূর্বে ভারতবর্ষে নানক ও কবীর এই দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল; দুইজনেই ছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী অতীন্দ্রবাদী মনীষী কবি এবং বিপ্লবপন্থী; একজন হিন্দু ও অন্যজন মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে দুইজনে একই আধ্যাত্মিক চেতনায় উপনীত হন। নানা দৃষ্টিকোণ হইতে একই পরম সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব এই কথাই মানবজাতির নিকট ঘোষণা করিবার জন্য মহান্ পুরুষেরা আগামী বহু শতাব্দী ধরিয়া এই দুইটি ধর্মমতের পশ্চাদ্‌ভূমি হইতে আবির্ভূত হইতে থাকিবেন, নিঃসংশয়ে এই ভবিষ্যদ্বানী করা যায়। প্রত্যেক মহান্ ধর্ম প্রবক্তাই হইবেন সমন্বয়কর্মী। সময় এবং পরিবেশ তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির যতই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করুক, তাঁহাদের সকলের উপাস্য ভগবান হইবেন এক। বিবর্তনবাদী মরমী হিসাবে যিনি ইকবালকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, সেই রুমির ভাষা উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়, 'সঙ্কীর্ণচিত্ত মানুষেরাই শুধু পরস্পরে বিভক্ত, আর মহাত্মারা সকলেই যুথবদ্ধ, একই তাঁহাদের সম্প্রদায়'।

চতুর্থ খণ্ড

চীন ও জাপানের চিন্তাধারা

*

চীনদেশের চিন্তাধারার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

লেখক : এইচ. ই. ডঃ লো চিয়া-লুয়েন

ভারতে চীনা রাষ্ট্রদূত

কনফিউসিয়ান-বাদ ও তাও-বাদ

লেখক : ফুং উ-লান, বি-এ., পি. এচ-ডি., এল এল ডি.

দর্শনের অধ্যাপক, টিসিং হুয়া ইউনিভার্সিটি, পিকিং (চীন)

চীনদেশের চিন্তাধারায় ভারতবর্ষের প্রভাব

লেখক : প্রবোধচন্দ্র সেন, এম-এ (কলিকাতা), ডাঃ. এস. লেটার্স (প্যারিস)

অধিকর্তা, রিসার্চ ষ্টাডিজ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

চীনের দশটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়

লেখক : সুকুমার দত্ত, এম-এ., পি. এচ-ডি. (কলিকাতা)

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রামজাস কলেজ, দিল্লী

জাপানের চিন্তাধারা

লেখক : প্রফেসর ডি. টি. সুজুকী

কামাকুরা, জাপান

একবিংশ পরিচ্ছেদ

চীনদেশীয় চিন্তাধারার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১। পূর্বাভাস

কোনও জাতির মানসিক জীবনের ক্রমবিকাশে যে ভিন্ন ভিন্ন ধারা ও নানা উপাদান থাকে তাহার যথার্থভাবে নিরূপণ অতি দুরূহ।

যে জাতি একটি সুবিশাল ভূখণ্ডে বাস করে, যেখানে প্রাদেশিক বৈভিন্ন্য বিস্তর, সেই জাতির চিন্তা-ধারায় প্রাকৃতিক পরিবেশ কি কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সর্বপ্রথম তাহা বিবেচ্য। কূ-যেন-ব্যু (Koo-Yen-Wu ১৬৩২-১৬৮২) তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থগুলিতে, পীতনদ, (Yellow River) মধ্যবর্তী সীমানা ধরিয়া, দেখাইয়াছেন যে, 'উত্তর' চীন ও 'দক্ষিণ' চীন ঐ দুই ভূভাগস্থ চীনবাসীদের মানসিক ও প্রকৃতিগত ক্ষমতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বর্ত্তমান। সাধারণ বিশ্বাস এই যে উত্তরখণ্ডবাসীদের মনের গতি ব্যবহারিক (practical) ও বস্তুতান্ত্রিক,—দক্ষিণখণ্ডবাসীদের কল্পনাপ্রবণ speculative) ও দার্শনিক। উইলিয়াম জেম্‌সের (William James) ভাষায় উত্তরবাসীরা (শিষ্ট ও অশিষ্ট উভয় অর্থেই) 'শক্ত-মনের লোক', এবং দক্ষিণবাসীরা 'নরম-মনের'। অবশ্য এভাবের শ্রেণী-বিভাগ সিদ্ধান্তের অনুকূল বলিয়া ধরা যাইতে পারে না,—এমন কি সহজেই ভুলের পথ ধরাইয়া দিতে পারে। তথাপি ইহাতে যে উভয়-খণ্ডে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব সূচিত তাহা অগ্রাহ্য করিবার নয়।

কোনও জাতির সহিত অন্য জাতির কৃষ্টির সম্পর্ক উভয় জাতির মানসিক বিস্তারে বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়া থাকে। তাহাতে জাতির কৃষ্টিগত উত্তরাধিকার বৃদ্ধি পাইতে পারে, জাতির সাধারণ বিবর্তনের ধারাও ফিরিয়া কিংবা বদলাইয়া যাইতে পারে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ হইতে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত চীনের দার্শনিক চিন্তাধারার যে একটি অতি-উজ্জ্বল যুগ আসিয়াছিল তাহা চীনবাসীদের আভ্যন্তরীণ নানা কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের সমীকরণের ফলে। এই সমীকরণের ধারা চলিয়াছিল ও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল এক শত বৎসর পরে যখন চিঙ্‌ (Ching) রাজবংশ চীনসাম্রাজ্যকে এক দেশে পরিণত করে। তৎপরে দীর্ঘকাল যাবৎ চীন সাম্রাজ্যের বহু-বিস্তৃতির জন্য চীনদেশ পার্শ্ববর্তী ও অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত জাতিদের সংস্পর্শ হইতে কোনও কৃষ্টির প্রেরণা পাইতে পারে নাই। ইহার অধিকাংশই যাযাবর জাতি ছিল ও গোষ্ঠীগত জীবনপন্থী (Tribal) ছিল। ইহার পরে তৃতীয় হইতে

অষ্টম খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনবাসীরা ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে আসে এবং সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত কখনও কখনও ইউরোপের সম্পর্কে। তৎপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই সকল বহিঃ-সম্পর্ক চীনদেশের উত্তরকালের কৃষ্টি-গঠনে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়।

অধিকন্তু কোনও জাতির ইতিহাসের নানা যুগে, জাতীয় মনের ক্রিয়া কোনও বিশেষ দিকে মিলিত ধারায় প্রবাহিত হয়। জাতীয় মনের ভারকেন্দ্র সরিয়া সরিয়া যায় এবং সেই অপসরণ নানা আকারে স্বপ্রকাশ করে। সাধারণতঃ এই ঐতিহাসিক সত্যের কারণ ধরা হয়,—জীবনযাত্রার অবস্থা পরিবর্তন বা নূতন অবস্থার বা নূতন সমস্যার উদ্ভব, অথবা মানসিক পরিপক্কতা লাভ বা উন্মার্গগামিতা, বা কতগুলি ভাবের পরস্পর-সংঘাত বা সমন্বয়, কিম্বা কতিপয় প্রতিভাবান্ মনস্বীর অভ্যুদয় যাহাদের বর্ত-পথে সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলির মত অন্যান্য মনস্বীরা চলেন। ইহাকে বলা হয় 'কালের দৈব' (Spirit of Time),—জার্মান ভাষায় আরও প্রকৃষ্টরূপে বলা হয় 'কালের' দৈব আবির্ভূতি, (Zeitgeist)। এই কথাটি মনে রাখিলে আমরা জাতির মানসিক প্রগতির অর্থগ্রহণে অনেক অসংলগ্ন ও সুতরাং ভ্রান্ত ধারণা ও কাল-ক্রম-বৈষম্য (anachronism) হইতে মুক্ত হইতে পারি। চীনদেশের চিন্তাধারার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝিবার জন্য সংক্ষেপে চীনের বিভিন্ন যুগের মানসিক বিকাশ লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক হইবে।

২। চীনা দর্শনের প্রধান প্রধান যুগ

প্রাক্-কন্‌ফিউসিয়ান্-কালে চীনবাসীদের মানসিক বিকাশের নানা ভাবার্থ-গ্রহণ ছাড়িয়া দিয়া, আমি কন্‌ফিউসিয়াসের কাল খৃষ্টপূর্ব প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আমার প্রসঙ্গের অবতারণা করিব, ঐ কাল হইতেই চীনদেশে প্রণালীবদ্ধ নানা দর্শনের উদয় হয়। চীনদেশীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে ঐ যুগই প্রোজ্জ্বল ও সর্বাপেক্ষা পুষ্টি-দায়ক যুগ ছিল।

এই যুগ (খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দী) ইতিহাসে অতুলনীয়,—এই যুগে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বহু প্রধান প্রধান দার্শনিকের ও তাহাদের সুপ্রসিদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রগুলির জন্ম হয়। কেন ইহা ঘটিয়াছিল তাহার কারণ-নির্ণয় ঐতিহাসিকদের পক্ষে সুকঠিন। কন্‌ফিউসিয়াস্, বুদ্ধ ও সক্রেটিস্ প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। 'চৌ' (Chow) রাজবংশের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার পতনের পর চীনদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা-বিপর্যয়, পীত নদের (Yellow River) মধ্যখণ্ডের ও নিম্নখণ্ডের উভয় তীরস্থ যুদ্ধ-পরায়ণ সামন্ত-শাসকদের

(feudal lords) কর্তৃক পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ-প্রদান (যাহারা অধিকাংশই নৈয়ায়িকশ্রেণীর ছিলেন), এবং দীর্ঘকালের শান্তিপূর্ণ প্রগতির অবিশ্যম্ভাবী ফলে যথেষ্ট কৃষ্টি-সম্ভার অর্জন, যাহার ভিত্তির উপর চীনাবাসীরা তাহাদের দর্শনের নানা সৌধ নির্মাণ করিতে পারিয়াছিল,—এই সকল কারণ বহুল অংশে চীনদেশে ঐ যুগ-প্রবর্তনের কারণ হইয়াছিল।

সাধারণতঃ এই যুগকে "একশত দার্শনিক সম্প্রদায়ের যুগ" বলা হয়। গ্রীসদেশের ইতিহাসের সমসাময়িক যুগ ও চীনের এই যুগে বহু সাদৃশ্য আছে। উভয় দেশেই একই অবস্থার প্রভাবে মানসিক সক্রিয়তা জাগিয়াছিল। নানাভাবের দার্শনিক সমস্যা তোলা হইয়াছিল, তাহার উপর বিতর্ক চলিয়াছিল, নানা জল্পনা-কল্পনা হইয়াছিল ও নানা সিদ্ধান্ত উপস্থিত করা হইয়াছিল। যখন 'জু-চিয়া' (Ju Chia)[২] দার্শনিক সম্প্রদায়, যাহা পরবর্তীকালে 'কন্‌ফিউসিয়ান্' সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হয়, 'সোনায় রচা মধ্য পন্থা'রূপ (Golden Mean) মতবাদের মর্মার্থ-প্রকাশ ও মানুষের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক প্রণালী-বদ্ধ দার্শনিক মতের রচনা করিতেছিল, তখন 'ইয়ঙ্‌ চু' (Yang Chu)—প্রায় খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর,[৩] তাঁহার আত্ম-প্রীতি ও সুখান্বেষা (egoism and hedonism), 'মোতি' নামান্তরে 'মোত্‌সু' (M-Ti or Mo Tzu)—খৃষ্টপূর্ব ৪৮০-৪৩৯[৪], —তাঁহার পরপ্রীতি (altruism). কৃচ্ছ্র-সাধন (Stoicsim) এবং হিতবাদ (utilitarianism) ও 'চুয়াঙ্‌ত্‌সু (Chuang Tzu)—খৃষ্টপূর্ব ৩৬৫-২৯৩,[৫]—'তাও' দর্শন এবং তৎসঙ্গে প্রকৃতি-নিষ্পন্ন ধর্ম (naturalism) ও রহস্যবাদ (mysticism) প্রচার করিতেছিলেন। নৈয়ায়িকের দল[৬] বিশ্ব-প্রকৃতি (Universals) এবং বিশেষ-প্রকৃতি (Particulars) সমস্যা তাঁহাদের তর্ক-বিতর্কে প্রায়শই কেন্দ্রীয় বিষয় করিতেন। এই নৈয়ায়িকেরা 'যি চিঙ্‌' (Yi Ching) বা 'পরিবর্তন বিষয়ক গ্রন্থের' (Book of Change)[৭] কন্‌ফিউসিয়ান্ ব্যাখ্যা, যাহাতে বিশ্ব-জগতের গতিশীল ও সৃজনী শক্তির উপর জোর দেওয়া হয়, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্লেষণ দ্বারা গতির পরিমাপ লইয়া গ্রীক্‌দর্শন ক্ষেত্রে 'ঝেনো'-র (Zeno the Eleatic) মতই গতির সম্ভাবনার বিরুদ্ধবাদী একটি হেঁয়ালি তুলিয়াছিলেন। এই চীনা নৈয়ায়িকদের বিবৃতি এইরূপ "একখানা এক ফুট লম্বা লাঠি লও এবং রোজ তাহাকে দুই টুক্‌রা করিয়া ফেল। দেখিতে পাইবে যে দশ-সহস্র জীবিত-কালের মধ্যেও এই টুক্‌রা করার শেষ হইবে না"। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তা-বিকাশে ইহা যেন এক অদ্ভুত ও আকস্মিক সাদৃশ্য।

স্থানাভাবে চীনা দার্শনিকদিগের প্রত্যেক সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হইবে না। ইহাদের মধ্যে প্রধান চারটির উল্লেখই যথেষ্ট হইবে। এই চারটি,—'জু-

চিয়া' বা কন্‌ফিউসিয়ান্ সম্প্রদায়, 'তাও-চিয়া'[৮] বা 'তাও' সম্প্রদায়, 'মো-চিয়া'[৯] বা মো-ত্‌স্থর মতাবলম্বী দল এবং 'নিয়ম-পদ্ধতি' (Legalist) সম্প্রদায়[১০] যাহাদের মুখপাত্র হান্-ফেই-ত্‌স্থ (Han Fei Tzu—খৃষ্টপূর্ব ?—২৩৩)[১১]।

কন্‌ফিউশিয়ান্ (খৃষ্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৯) প্রধানতঃ ব্যবহার-নীতির উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার নিজের যুগের ও পরবর্তী যুগের মনুষ্য-সমাজের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর উন্নতির জন্য তিনি নূতন আদর্শ (যাহাদ্বারা মনুষ্য-জীবনে কি কি বস্তু যথার্থ মূল্যবান্ তাহা যাচাই করা চলে) ও নূতন নীতিশাস্ত্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বীয় নৈতিক, কৃষ্টিবিষয়ক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আস্থাবান্ ছিলেন। চীনের অতীতকালের অর্জিত ও তৎকালীন কৃষ্টির তিনি সংক্ষিপ্ত-সার দিয়া গিয়াছেন ও তাহার সমবায় করিয়াছেন। স্বীয় দার্শনিক মতের পরিবেশে তাহার মূল্যের নূতন নিরূপন ও তাৎপর্যের নূতন ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন। "কন্‌ফিউসিয়াস কিছু সৃষ্টি করেন নাই, কেবল যাহা ছিল তাহাই চালাইয়াছিলেন"—কেহ একথা বলিলে কন্‌ফিউসিয়াস্ নিজের সম্বন্ধে বিনয় করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই প্রতিধ্বনি করা হইবে। বস্তুতঃ কিন্তু কন্‌ফিউসিয়াসের অভিনব-সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁহার প্রাচীন গ্রন্থগুলির অর্থোদ্ধার ও বিশেষতঃ তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিজের ভাষ্যগুলির মধ্যে নিহিত ও ব্যাপ্তভাবে পাওয়া যায়। তাঁহার শিক্ষার প্রধান বিষয় মানুষের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ এবং সমাজের চরমহিতার্থে মনুষ্য সমাজে যে পরস্পর-সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহার যথা-সন্নিবেশ ও তাহার আদর্শ-স্থাপন। কিন্তু কন্‌ফিউসিয়াস্ অলৌকিক বা আধিভৌতিক সম্বন্ধে শিক্ষাদান সতর্কভাবে বর্জন করিতেন। কন্‌ফিউসিয়াসের পরবর্তীকালেই তাঁহার শিষ্যবর্গ, বিশেষতঃ 'মেন্‌সিয়াস্' (Mencius—খৃষ্টপূর্ব ৩৭১-২৮৯)[১২] ও 'শুঙ্‌ত্‌স্থ' (Hsuan Tzu—খৃষ্টপূর্ব ২৯৮-২৩৮)[১৩] কন্‌ফিউসিয়ান্ দর্শনের সহিত মনোবিজ্ঞান ও আধি-ভৌতিকতামূলক নিবন্ধগুলি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যে সত্য-সত্যই মানুষ তাহার ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে—'জেন' (Jen)[১৪] বা সদয় মনোভাব ও 'যি' (yi)[১৫] বা সদাচার,—কন্‌ফিউসিয়াস্-পন্থীর ইহাই ধারণা ও বিশ্বাস। এবং ব্যক্তিগত জীবনে পূর্ণতালাভের ও সমষ্টিগত জীবনে সমন্বয় লাভের সুনিশ্চিত পন্থা 'মধ্য-পন্থা' অবলম্বন।

'তাও' বাদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রধানতঃ 'লাওত্‌স্থ'[১৬] গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কন্‌ফিউসিয়াসের বহু পরবর্তীকালে রচিত, কিন্তু যে বিজ্ঞ ও প্রবীণ লাও-ত্‌সান (Lao Tsan)[১৭] নায়ক পণ্ডিতের সহিত কন্‌ফিউসিয়াসের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল তাঁহার এই গ্রন্থের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই। 'তাও' মতবাদের ভিত্তি হিসাবে 'চুয়াঙ্‌ত্‌স্থ'র রচনাগুলিও সমশ্রেণীর। বস্তুতঃ 'তাও' নামের সঙ্গে এই দুইটি দার্শনিকের নাম সাধারণতঃ যুক্ত করা হয়। প্রকৃতির মৌলিক নিয়মগুলির অনুধাবন করিয়া প্রকৃতি

এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা বা তাহার অনুসরণ এই মতবাদের প্রতিপাদ্য। ইহা হইতে 'বু-বেই' (Wu-Wei) বা 'নৈষ্কর্ম্য' বাদের উদ্ভব। 'তাও' কি তাহা কোন সংজ্ঞা দ্বারা নির্দেশ করা যায়·না,—ইহা সেই 'এক' যাহাতে স্থিতি ও অস্থিতির একত্র সমাবেশ। 'লাওত্‌স্থ'—যে গ্রন্থখানির নাম রচয়িতার নিজের নামে হইয়াছে, নানা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ উক্তিতে ভরা। তাহার দ্যোতনা ও ইঙ্গিত এমন চমক্‌প্রদ যে মনে হয় আমরা কোনও যাদুকরী-স্ফটিকে (crystal) নিরীক্ষণ করিতেছি। আমার নিজের মনে হয় ইহাতে বহু আধিভৌতিক তত্ত্বের আবরণে একটি অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন (empirical philosophy) নিহিত আছে যাহার যথার্থতা প্রকৃতির ঘটনাবলী এবং মানুষের অভিজ্ঞতামূলক। 'তাও' মতবাদের বর্তমান বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া ইতিহাসের দার্শনিক তত্ত্ব (Philosophy of History) বিষয়ক একখানি চমৎকার গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। 'লাও ত্‌স্থ' গ্রন্থের সাধারণ মত-বিরুদ্ধ বাক্যগুলিও স্বল্প-কথায় বিজ্ঞতার আধার বলিয়া উপভোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ "প্রকৃত নিপুণতা মূঢ়তার মত দেখায় এবং প্রকৃত বাগ্মিতা তোৎলামির মত শুনায়" "প্রেম আক্রমণে জয়ী হয়, আত্মরক্ষায়ও অপরাজেয়। দেবতারা যাহাদের মারিতে চাননা, তাহাদের প্রেমের অস্ত্রে ভূষিত করেন"। লাও ত্‌স্থর চিন্তাপ্রণালী অনুসারে কর্ম হয় নিষ্কর্ম্মোদ্বারা, অগ্রসর হওয়া যায় পশ্চাদ্‌গমনের দ্বারা। লাও ত্‌স্থর আশ্চর্যজনক যুক্তি এই যে "যখন দুই সমান-বল যোদ্ধপক্ষ পরস্পারের সম্মুখীন হয়, যে পক্ষ দুঃখে ম্রিয়মান সেই পক্ষই জিতিয়া থাকে"। 'হান্‌' (Han) রাজবংশে 'তান্‌' (Sze Ma-Tan) নামক রাজা যে বলিয়াছিলেন যে 'চৌ' (Chow) বংশের শেষ রাজাদের যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষার প্রতিষ্ঠান[১৯] 'তাও' বাদীদর্শন হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা ঠিক বটে।

এই নৈষ্কর্ম্যবাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত দার্শনিক ও ভবিষ্যবক্তা মোত্‌স্থর (Mo Tzu) কর্মের প্রতি কঠোর আহ্বান। 'মোত্‌স্থ' নামক গ্রন্থে এই দার্শনিক ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্যগুলির মত সংক্ষিপ্ত উক্তিতে তাঁহার শিক্ষাবলী দিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে যে সারি সারি ন্যায়ের সূত্র, জ্যামিতির সংজ্ঞা ও কতগুলি কৌতূহল-জনক জ্ঞান-দর্শন (Epistemology) সমস্যার আলোচনা আছে, তাহা দেখিলে বিস্ময়-বিমূঢ় হইতে হয়। মোত্‌স্থ বিশ্বপ্রেমবাদী ছিলেন। তাহার এই বিশ্বপ্রেম বোধ হইতে পরহিতের প্রেরণা জাগে। এই পরহিতব্রতে তিনি এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী মেন্‌সিয়াস্‌ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি এমন মানুষ ছিলেন যে কোনও লোকের কিছু উপকার করিবার জন্য তিনি নিজের মস্তক ও পদতল উভয়ই ক্ষয় করিয়া নষ্ট করিতে প্রস্তুত ছিলেন।" দার্শনিক হিসাবে তাঁহাকে 'কৃচ্ছ্র-বাদী' (stoic

বলা যায়, কারণ তিনি কোনও জাতীয় ও কোনও প্রকারের আরামের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, এমন কি সঙ্গীতকেও একটা বিলাসিতা মনে করিতেন। তাঁহাকে হিত-বাদী (utilitarian)-ও বলা যায়, এই হিসাবে যে পৃথিবীর সকল দার্শনিকদের মধ্যে প্রথমে তিনিই সুখ-দুঃখ-বাদ (theory of pleasure and pain) ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং বহুলোকের বহুল হিতের জন্য ; তথা সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য, প্রয়াসী ছিলেন। তিনি বিশ্বপ্রেম এবং শান্তি মানুষ-সমাজের ভিত্তিস্বরূপ এই মত প্রচার করিতেন। ইহা তিনি করিয়াছিলেন খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার চারশত বৎসর পূর্বে। তিনি যথার্থ-ই প্রাজ্ঞ ও ধার্মিক ছিলেন বলিয়া কার্যে পরিণত করিবার কোনও সুযোগই ছাড়িতেন না। যেহেতু তিনি আত্ম-বিশ্বাসানুযায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, সেইজন্য তিনি তাঁহার তিনশত শিষ্য লইয়া একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেন এবং তাহাদের অগ্রণী হইয়া ত্‌সু (Tzu) রাজ্যের আক্রমণকারী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সুঙ্‌ (Sung) রাজ্যের রাজধানীরক্ষায় সাহায্য করেন।

চীনে সামন্তরাজ্যগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে বিশৃঙ্খলা ছড়াইয়া পড়ে। চীনের জনসাধারণ রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সমাজের বন্ধন পুনঃস্থাপন এবং রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের জন্য ব্যগ্র হইয়া ওঠে। এই অবস্থার ফলে একটি নূতন দার্শনিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, তাহার নাম 'নিয়ম-পদ্ধতি' (Legalist) সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে যে অচিরে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা অবস্থাদৃষ্টে স্বাভাবিকই মনে হয়। এই সম্প্রদায়ের প্রধান মুখপাত্র ছিলেন—'হান্-ফেই-ত্‌সু' (Han Fei Tzu)। তিনি 'হান্' রাজবংশীয় ছিলেন এবং বিখ্যাত কন্‌ফিউসিয়ান্ দার্শনিক 'শুন্-ত্‌সু'র (Hsun Tzu) শিষ্য ছিলেন। সুতরাং তিনি কন্‌ফিউসিয়ান্ সম্প্রদায়ের মতবাদ হইতে 'সংজ্ঞা-বিশুদ্ধি (Rectifica-(tion of Names) নামক মতবাদ গ্রহণ করেন। ইহার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসেবাকার্য ও সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ড সকল যথা—যথাস্থলে ও সুশৃঙ্খলিত ভাবে সংস্থাপন করা। তিনি তাঁহার নিজের নিজের শিক্ষাগুরু হইতে এই বিশিষ্ট মত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে মানুষের প্রকৃতি আদিতে মন্দ থাকে। এবং 'তাও' মতবাদ হইতেও ঐ মতবাদের অনুমিত রাষ্ট্রনীতি ও রাজনৈতিক কৌশল। তিনি প্রাচীন ধারার পুনঃস্থাপন অপেক্ষা সংস্কারই প্রশস্ত মনে করিতেন এবং মানুষের শাসনের পরিবর্তে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী ছিলেন। তিনি প্রচার করিতেন যে ব্যক্তিগত অনুগ্রহলাভের অপেক্ষা আইনের অধীন হওয়াই ভাল। কেবলমাত্র শিক্ষাদ্বারা মানুষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করা যায়,—এ বিশ্বাস তিনি পোষণ করিতেন না। কন্‌ফিউসিয়াস্ বলিয়াছেন: "শাসনদ্বারা জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত করিলে, শাস্তির ভয় দেখাইয়া নিয়মানুবর্ত্তী করিলে, ফলে তাহারা জেলখানার

বাহিরে থাকিবার চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু তাহাদের লজ্জা কিম্বা আত্মসম্মান থাকিবে না। তাহাদের ধর্মদ্বারা চালিত করিতে হইবে এবং 'লী'র (সততা বা উপযুক্ততা-বোধ) দ্বারা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। তাহাতেই জনসাধারণের আত্মসম্মান জ্ঞান জাগ্রত থাকিবে ও তাহারা সদসৎ বিবেচনা করিবে।" 'হানফেই-ত্‌সু' ব্যতীত 'শ্বনত্‌সু'র আরেকটি মেধাবী শিষ্য ছিল। তিনি 'চিঙ্' প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী লীত্‌সু[২০] (Li Tzu), যিনি খৃষ্টপূর্ব ২৪৬ সনে চীনদেশের ঐক্য-সম্পাদনের বিরাট চেষ্টায় ঐ প্রদেশের রাজার সহায়ক ছিলেন। এই 'নিয়ম-পদ্ধতি' সম্প্রদায় আরও উন্নতি করিতে পারিত,— ইহার উন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে কন্‌ফিউসিয়াস্‌-বাদীরা ইহার বিরুদ্ধে প্রবল ও অবিরতভাবে লড়িয়াছিল। তথাপি ইহার প্রভাব স্থায়ী হয়। পরবর্তী যুগে চীনের নানা-পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সতত সামঞ্জস্য করিবার জন্য চীনদেশের কৃষ্টিবান্ সম্রাটেরা, সফলকাম প্রধান-মন্ত্রীরা ও উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীরা বাহ্যতঃ কন্‌ফিউসিয়ান্ পরিচ্ছদ লইয়াও অনেক সময় স্পষ্টতঃ বা গূঢ়ভাবে 'তাও' মতবাদের সহিত কিছু কিছু মিলাইয়া লইয়া ঐ 'নিয়ম-পদ্ধতি' সম্প্রদায়ের নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করিতেন।

'চিঙ্' (Ching) রাজাদের দ্বারা চীনদেশের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পাদনের পর ঐ প্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পায় অথবা নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইতঃপর নানামুখী মতবাদের বিশেষ সমর্থন ছিল না। খৃষ্টপূর্ব ২০৬ সনে যখন 'চিঙ্' রাজবংশের শেষ হয়, তখন 'হান্' (Han) রাজবংশ রাষ্ট্রীয় শক্তি দৃঢ়ীকরণ ও সামাজিক জীবনের স্থিরতা-সম্পাদন কার্যেই বেশী উৎসাহী হন। দার্শনিক গবেষণায় তেমন উৎসাহ দেন নাই। এই বংশের সম্রাট্ 'বু' (Wu), যিনি খৃষ্টপূর্ব ১৪০ হইতে ৮৭ পর্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন, তিনি 'তুঙ্ চিঙ্-শু' (Tung Ching-Shu—খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১৭৯-১০৪) নামে একজন কন্‌ফিউসিয়ান্ পণ্ডিতকে তাঁহার অধীনে উপদেষ্টারূপে রাখিয়া-ছিলেন। এই 'তুঙ্ চিঙ্-শু' সেই যুগের গতি ও সুযোগ বুঝিয়া সম্রাটকে কন্‌ফিউসিয়ানের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি রাষ্ট্রীয় শিক্ষার বিষয় হইবে ইহা ঘোষণা করিতে প্রবর্তনা দেন। এই সম্রাটের অলৌকিক বিষয়ের প্রতি মনের ঝোঁক ছিল। সেই জন্য 'তুঙ্ চিঙ্-শু'[২১] কন্‌ফিউসিয়ান্ দর্শনের মধ্যে 'যিন্-যঙ্'[২২] (Yin-Yang) নামে এক সম্প্রদায়, যাহা বহু পূর্বে 'চৌ' (Chow) রাজবংশের শাসনকালের শেষভাগে উদ্ভূত হয় ও যাহাতে রহস্য-বাদ ও দৈবজ্ঞানের রং ছিল, তাহারও কিছু কিছু মতবাদ ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে দার্শনিক গবেষণা ও বাদানুবাদ সাময়িকভাবে শান্ত হইয়াছিল। তথাপি রাজসভায় ও শিক্ষিত সমাজে 'তাও' মতবাদ সম্মানিত হইত। এই সময় হইতে দীর্ঘকাল

ধরিয়া কনফিউসিয়ান্ পণ্ডিতগণ প্রাচীন প্রমাণ্য কন্‌ফিউসিয়ান্ গ্রন্থগুলির উদ্ধার ও সম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন,—খৃষ্টপূর্ব ২০৬ সনে 'চিঙ্‌' রাজবংশের রাজধানী 'খ্রিয়েন যঙ্‌'[২৩] (Hsien Yang) সহরে যে বিরাট্ অগ্নিকাণ্ড হয় তাহাতে ঐ গ্রন্থগুলি প্রায় সম্পূর্ণই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই গ্রন্থগুলির পুনরোদ্ধার কার্যে, ব্যাখ্যান ও দার্শনিকতত্ত্ব গ্রহণ অপেক্ষা যথাযথ পাঠোদ্ধার এবং শব্দার্থ-গ্রহণ, বেশী গুরুত্বপূর্ণ না হউক, প্রয়োজনীয় মনে হইয়াছিল।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে 'হান্' রাজবংশের পতনের পরে এক বিশৃঙ্খলার যুগ আরম্ভ হয়। চতুর্থ শতাব্দীর আরম্ভে নানা বর্বর জাতিরা চীনদেশ আক্রমণ করে। ইহাদের আক্রমণের তীব্রতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চীনের উত্তরখণ্ডে তাহাদের ছোট ছোট রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। ফলে বহু চীনবাসী পলাইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বহু পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারা ইয়ংত্‌স (Yangtze) নদী পার হইয়া দক্ষিণ-পূর্বে সাময়িক বসবাস স্থাপন করেন। ফলে কন্‌ফিউসিয়ান্ সম্প্রদায়ের অবনতি হয়। বর্বর যাযাবর জাতিদের নীতিশাস্ত্রে কোনও রুচি ছিল না; পণ্ডিতেরা ক্লান্তদেহ ও বিষণ্ণ মন লইয়া কন্‌ফিউসিয়াসের সেই প্রাচীনযুগের কঠিন সংযম-ধর্ম গ্রহণে অপারগ ছিলেন। তাঁহারা 'তাও' ও 'বৌদ্ধ' মতবাদের দিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে যাহাতে তাঁহাদের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল তাহা ঐ দুই মতবাদ হইতে পাইবার সম্ভাবনা ছিল। এই প্রয়োজন—'তাও' বাদের রহস্যে মনকে ছাড়িয়া দেওয়া অথবা বৌদ্ধ-বাদের বৈরাগ্যে আশ্রয় গ্রহণ। সুতরাং 'লাও-ত্‌সু' ও 'চুয়াঙ্‌ ত্‌সু'র মতগুলি দ্রুত প্রচলিত হইতে লাগিল এবং সদ্যঃ-অনূদিত বৌদ্ধ সূত্রগুলি অবাধে ও সোৎসাহে গৃহীত হইতে লাগিল। সেই সময়কার বহু চীনা বৌদ্ধপণ্ডিতেরা হয় পূর্বে 'তাও' মতাবলম্বী ছিলেন, নতুবা 'তাও' ও 'বৌদ্ধ' উভয়-মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত 'হুই যন'[২৪] (Huei Yuan—খৃষ্টাব্দ ৩৩৩-৪১৬) বৌদ্ধ-দর্শন ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনবরতঃ 'চুয়াঙ্‌ ত্‌সু'র (Chuang Tzu) বাক্য উদ্ধৃত করিতেন বলিয়া কথিত আছে।

চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের এই আকস্মিক শ্রেষ্ঠতা-লাভ চীনদেশের চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। তাহার প্রভাব প্রবল ও বহুযুগব্যাপী হইয়াছিল। কুমারজীব[২৫] (খৃষ্টাব্দ ৩৪৪-৪১৩) সর্বপ্রথম ও সকলের আগে সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধসূত্র-গুলির বৃহৎ পরিমাণে অনুবাদ কার্য আরম্ভ করেন। তাঁহার পর পরবর্তী যুগে বহু চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিত এই অনুবাদ কার্য চালাইয়াছিলেন। তাহা সপ্তম শতাব্দীতে 'খ্বেন্ চোয়াঙে'র[২৬] (Yuan Chaung) প্রচেষ্টায় পূর্ণসফলতা লাভ করে। যে বহু বহু

বৎসর এই কার্যে ব্যয়িত হয় তাহার ফল এই অধ্যবসায় সার্থক করিয়াছিল,—এই সার্থকতা অনুবাদগুলির বিরাট পরিমাণ ও অসাধারণ সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠতা। বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে আসিয়া রোপিত হইল এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চীনের বৌদ্ধরা তাহাদের নিজস্ব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত করিল, তাহা 'ত্‌সুঙ্‌'[২৭] (Tsung) নামে পরিচিত। যদিও প্রত্যেক সম্প্রদায়ই কোনও সংস্কৃত বা পালি সূত্র তাহাদের মতবাদের মূলে বলিয়া দাবী করে, তথাপি বাস্তবিক তাহারা চীনদেশের নিজস্ব ধারায় কালক্রমে বৌদ্ধ মতবাদের নানা পরিবর্তন করিয়াছে। এই প্রকারের দশ বা ততোধিক সম্প্রদায় ছিল এবং তাহার অনেকগুলিই হীনযান অপেক্ষা মহাযানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র 'চিন্ তু-সুঙ্‌' (Chin Tu Tsung—'পবিত্র ভূমি সম্প্রদায়')[২৮] এবং 'চেন-যেন-সুঙ্‌' (Chen Yen Tsung) নামান্তরে 'মি সুঙ্‌' (Mi Tsung)[২৯], এই দুইটি সম্প্রদায়কে প্রধানতঃ ধর্মসম্প্রদায় বলা যাইতে পারে ; অন্য আটটি ধর্ম অপেক্ষা দার্শনিক মতবাদের সহিতই সংশ্লিষ্ট। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়গুলি দার্শনিক মনের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইত, প্রথমোক্ত সম্প্রদায়গুলি অল্পশিক্ষিত ও স্থূল-মনা জনসাধারণকে দেবতাদের বিগ্রহ, নৈষ্ঠিক পূজার প্রথা-পদ্ধতি, স্বর্গ ও নরক সম্বলিত ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা শিক্ষা দিত। কন্‌ফিউসিয়ান্ নীতিবাদ সাধারণ লোকের মনে অলৌকিক বিশ্বাসের যে স্থান শূন্য রাখিয়াছিল, এই সম্প্রদায়গুলি সেই শূন্যস্থান কতকটা ভরিয়া দিতে সমর্থ ছিল।

প্রায় ছয় শতাব্দী বৌদ্ধ-দর্শনের প্রবলতম প্রভাবে থাকিয়া চীনের স্বকীয় প্রতিভা আবার তাহার নিজস্ব পথে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কন্‌ফিউসিয়ান্ মতবাদ বৃদ্ধির দিকে চলিল। এই মতের প্রাচীন আকার হইতে পার্থক্য সূচনা করিবার জন্য এই মতবাদকে বর্তমানে 'নব-কন্‌ফিউসিয়ান্ মতবাদ, (Neo-Confucianism) বলা হয়। এই 'নব-কন্‌ফিউসিয়ান্' বাদের কয়েকজন প্রধান ব্যাখ্যাতা কেবলমাত্র কন্‌ফিউসিয়ান্ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন না, তাঁহারা পূর্বে বৌদ্ধশাস্ত্রেরও গবেষণা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ও বৌদ্ধ চিন্তা-পদ্ধতিতে (methodology) জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা কন্‌ফিউসিয়ান্ বাদকে একটি নূতন আধিভৌতিক বাদে (metaphysices) আকারিত করিয়াছিলেন। এই নূতন কন্‌ফিউসিয়ান্ দর্শনকে পূর্বে 'লি ত্‌সুয়ে'[৩০] (Li Hsueh) নাম দেওয়া হইত। কিছু কাল চীনদেশের পণ্ডিতদের চিন্তাধারায় একটি অভিন্ন ও প্রবল গতিতে এই মতবাদ প্রসৃত ছিল। পরে ইহা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। একটির নেতা ছিলেন—'চেন্ যি, (Chen Yi—খৃষ্টাব্দ ১০৩২-১০৮৫)[৩১] এবং 'চু ত্‌সি' (Chu Hsi—খৃষ্টাব্দ ১১৩০-১২০০)[৩২]। উভয় নেতার মতবাদ ছিল যে মানুষের আত্ম-সম্বিতের বাহিরে কতগুলি চিরন্তন সত্য (Eternal

Principles) আছে (যাহাকে প্লেটোর 'আদিম-রূপ' বা Ideas-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে)। অন্য সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন প্রথমতঃ 'লু চিয়ু য্‌ন্' (Lu Chiu Yuan—খৃষ্টাব্দ ১১৩৯-১১৯১)[৩৩] ও পরে 'যঙ্‌ শূ জেন্' (Wang Shou-Jen—খৃষ্টাব্দ ১৪৭২-১৫২৮)[৩৪]। ইঁহাদের মতবাদ ছিল যে মানুষের মন 'বিশ্ব-মনের' (Universal Mind) প্রকাশ এবং এই 'বিশ্ব-মন' প্রাকৃতিক সকল নিয়মের নিয়ন্ত্রা। এই প্রসঙ্গে আমি 'চু ত্‌সির' পুনরুল্লেখ করিতে চাই। কন্‌ফিউসিয়ান্-বাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলির উপর তিনি যে সকল ভাষ্য করিয়াছিলেন তাহা অনেক শতাব্দী ধরিয়া চীনের শিক্ষা-প্রণালীর উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল,—তাঁহার ভাষ্যগুলিই চীনের রাজাদের সমর্থিত কন্‌ফিউসিয়ান্‌বাদের একমাত্র কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ভাষ্য বলিয়া গৃহীত হইত।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে 'মাত্তেয়ো রিচি' (Matteo Ricci—খৃষ্টাব্দ ১৫৫২-১৬১০)[৩৫] চীনদেশে আসেন। একদল নির্বাচিত জেস্যুয়িট্, (Jesuit) ধর্মপ্রচারকদের দলের সঙ্গে তাঁহার আবির্ভাব চীনের মানসিক কৃষ্টি-ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঘটনা। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গীরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহারা সঙ্গে আনিয়াছিলেন পাশ্চাত্য দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব ও তাহার সহিত তৎকাল পর্যন্ত সমৃদ্ধ পাশ্চাত্যের গণিত-মূলক ও ভূত-তত্ত্ব-মূলক বিজ্ঞান। তাঁহারা অবিলম্বে চীনদেশের ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। রিচিসাহেবের চীনাভাষায় লেখা ইউক্লিড্-জ্যামিতি সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয় হিসাবেই একটি শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া সমাদরে গৃহীত হয়। প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রিচির পদানুসরণ করিয়া অন্যান্য পণ্ডিতব্যক্তি পাশ্চাত্যখণ্ড হইতে চীনে আসেন। চীন সরকার কয়েক বৎসরের জন্য 'আডাম স্বাল' (Adam Schall)[৩৬]কে সরকারী মান-মন্দিরের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন,—বিদেশী বৈজ্ঞানিককে এই সম্মান দান অসাধারণ। 'ফার্দিনাণ্ড ভেরবিয়েষ্ট' (Ferdinand Verbiest)[৩৭] এই সম্মানের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি চীনদেশে জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি-সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন ও চীনের পঞ্জিকা-সংস্কারে সাহায্য করিয়াছিলেন। 'টেরেঞ্জ'[৩৮] (Terrenz) ও 'গেরবিলিয়ন,[৩৯] (Gerbillion) খ্যাত-নামা ভূত-তত্ত্ববিদ্ ও গণিত-বিদ্ ছিলেন। 'আলেনি'[৪০] (Aleni) চীন ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিভিন্ন-বিভাগের গ্রন্থাবলী অনুবাদে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। চীনে এই নূতন পাশ্চাত্য জ্ঞান-প্রবর্তনের যুগ ইউরোপে 'গালিলেয়ো' (Galileo)। 'নিউটন' (Newton) ও 'লাইব্‌নিৎ্সে'র (Leibniz) যুগের সমসাময়িক। এতৎপ্রসঙ্গে আমার এই মনে হয় যে, যে আধুনিক বিজ্ঞান 'জেস্যুয়িট'রা (Jesuits) চীনে দেশে এইভাবে আনিয়াছিল তাহা যদি আরও ভাল করিয়া চীনবাসীদের মনের গতি মুখী করা যাইত বা বদ্ধমূল হইয়া পড়িবার, সংহত হইবার ও বহুল-বিস্তারের

আরও সুযোগ-সুবিধা পাইত, তবে ইউরোপ যেমন ঐ যুগে আধুনিক কৃষ্টি লাভ করিয়াছিল, চীনদেশে তেমন হইতে পারিত ও চীনের, তথা সারা প্রাচ্যখণ্ডের, সমগ্র কৃষ্টির ধারা বদ্‌লাইয়া যাইতে পারিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ চীনে আগত এই পাশ্চাত্য পণ্ডিত-প্রচারকদের মধ্যে দুইটি মতি-গতির বৃদ্ধি হওয়ায় এই পাশ্চাত্য জ্ঞান-প্রবাহ মন্দগতি হইয়া যায়। ফলে পাশ্চাত্যের সহিত এই নূতন কৃষ্টির গ্রন্থি, তখনও দুর্বল ও শিথিল, ছিন্ন হয়। প্রথম দুর্ঘটনা হইল এই যে 'জেসুয়িট' (Jesuit), ফ্রান্‌সিস্কান, (Franciscan) এবং 'ডমিনিকান্' (Dominican) এই তিনটি সঙ্ঘের মধ্যে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত চীনাদের পূজা-পদ্ধতি কিরূপ হইবে তাহা নিয়া অবিরত ঝগড়া-বিরোধ চলিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ 'জেসুয়িট'রা রাজদরবারের নানা কুটিল নীতিতে অতিরিক্ত মনযোগ দিতে থাকে ও ফলে নিজেদের তাহাতে জড়াইয়া ফেলে। পাশ্চাত্যের সহিত এই কৃষ্টির গ্রন্থিচ্ছেদ আরও পরিতাপের বিষয় এই জন্য যে অল্প সীমার মধ্যে ও চীন ইতিহাসের স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের কৃষ্টিসম্বন্ধীয় কার্যকলাপ অনেকটা সুফল প্রসব করিয়াছিল। যাহা হউক, যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি তাহারা চীনদেশে প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা রহিয়া গেল,—চীনে পরবর্তীকালে শব্দ-তত্ত্ব-মূলক গবেষণার প্রসার, প্রাচীন গ্রন্থের লিপি-উদ্ধার ও তদ্‌বিষয়ক সমালোচনা এবং জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল ও গণিতের অধ্যয়ন তাহার প্রমাণ। উনিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ছিন্ন গ্রন্থির উদ্ধার ও সংযোজন হয়, চীন ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কৃষ্টিগত যোগের পুনরারম্ভে এবং তাহার ফলে চীনদেশবাসীদের মধ্যে আবার নূতন করিয়া পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান নূতন উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত অধ্যয়নের অন্দোলন হয়। বিশেষতঃ উনিশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে চীনদেশীয়দের জীবনের প্রত্যেক দিক আধুনিক বৈজ্ঞানিক আদর্শে সমালোচনা, যাচাই ও সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা আরম্ভ হয় এবং এই আত্ম-সচেতন প্রচেষ্টার পশ্চাতে প্রধানতঃ ছিল চীনের 'নয়া-কৃষ্টি আন্দোলন' (New Culture Movement) যাহা 'ডাঃ হু শ্বী,[৪১] (Dr. Hu Shih) ও তাহার সঙ্গীরা ১৯১৭ সনে প্রবর্তন করেন। এই কৃষ্টি-সংযোগ ও তাহার ফলে নানা ক্ষেত্রে নানা প্রচেষ্টা এখনও দেখা যাইতেছে ও বর্তমানে বহুল হইতেছে। ভবিষ্যতে আরও হইবে।

৩। চীনের চিন্তাধারার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি

ইতিহাসের এই পশ্চাৎপটে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা চীনদেশীয় চিন্তাধারার কতগুলি বিশেষত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে পারি। এই সকল বৈশিষ্ট্য চীনের কৃষ্টিগত উত্তরাধিকারের

একটি বিশেষ অংশস্বরূপ এবং চীনবাসীদের জীবনযাত্রাপ্রণালীতে ইহাদের বহুল প্রভাব বর্তিয়াছে।

প্রথমতঃ চীনদেশীয় চিন্তাধারা মূলে মানবতা-ধর্মী (Humanistic)। কন্‌ফিউ-সিয়াসের নীতি-দর্শনের (ethical system) প্রধান কথা,—মানুষের পরস্পর-সম্বন্ধ উন্নততর ও সুসঙ্গত করা। ইহার প্রথম কথা, প্রত্যেকজনের আত্মানুশীলন এবং শেষ উদ্দেশ্য 'জেন্‌' (Jen) বা মানুষের প্রতি সহৃদয়তা বোধ (human-heartedness)। ইহার তাৎপর্য অন্যলোকের প্রতি অকপট ভালবাসা ও সঙ্গীভাব। মেন্‌সিয়াস্‌ (Menciuis) বলেন : "আমার পরিবারে বৃদ্ধদের প্রতি উপযুক্তরূপ ব্যবহার আমার কর্তব্য ও এই ব্যবহার অন্যান্য পরিবারের বৃদ্ধদের প্রতি প্রসৃত করিতে চাই। আমার পরিবারস্থ কম-বয়স্কদের প্রতি ও উপযুক্ত ব্যবহার ও অন্যান্য পরিবারের কম-বয়স্কদের প্রতি সম-ব্যবহার উচিত মনে করি। 'যি' (Yi) বা ন্যায্যতা বোধ 'জেনে'র একটি প্রধান প্ররি-পূরক গুণ (supplementary virtue)। 'কন্‌ফিউসিয়াস্‌' (Confucius) বলেনঃ 'উচ্চ-মনা ব্যক্তি বোঝে ন্যায্যতা, নীচ-মনা বোঝে লাভ'। 'লি' (Li) যাহাকে ভুল করিয়া 'ক্রিয়াকাণ্ড' (Ritual) বলিয়া অনুবাদ করা হয়, তাহার প্রকৃত অর্থ ন্যায্যতা বা ন্যায্যব্যবহার বা আত্ম-সংযম। কন্‌ফিউসিয়াসের মতে ইহা সম্পূর্ণ হয় 'য়ুয়ে' (yueh) বা সঙ্গীতে (Music),—যে সঙ্গীতের প্রভাবে মানুষের প্রকৃতি শান্তি ও মিলনের দিকে যায়। পরবর্তীযুগগুলির শিক্ষা-প্রণালীতে সঙ্গীত-সাহকার্যে মানুষের মন সরস রাখার অভাব বা ইহার প্রতি অবহেলার জন্যই কন্‌ফিউসিয়াসের নীতি-শাস্ত্র অপেক্ষাকৃত কঠোর এবং সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ চীনদেশীয়দের চিন্তায় ও জীবনে এই মানব-ধর্মিতার প্রবল প্রভাবহেতু চীনা মন অলৌকিক বিষয় হইতে অপসৃয়মান। কন্‌ফিউসিয়াস্‌ বলিতেন : 'ন্যায্যতা-ধর্ম গ্রহণ করিবে জনসাধারণের হিতার্থে। স্বর্গীয় ও পার্থিব দেবতাদের সম্মান করিবে, কিন্তু দূরে রাখিবে।' কন্‌ফিউসিয়াস্‌ কখনও দৈত্য-দানব, দৈহিক অসমসাহসিকতা-প্রদর্শন, অসংযত ক্রিয়াকলাপ বা স্বর্গস্থ দেবতাদের কথা বলেন নাই। কখনও কখনও স্বর্গের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বর্গের অর্থ তাঁহার কাছে ছিল পরমপুরুষ, (Supreme being), 'বিশ্ব-মন' (Universal Mind) 'নীতির রাজ্য' (Moral Realm) বা 'আদিম মূলতত্ত্ব' (First Principles)। একথা সত্য বটে যে তিনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গ কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে নিয়ন্তাদের সু বা কুশাসনের লক্ষণ বলিয়া মানিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাহাদের এই সদ্‌ভিপ্রায় ছিল, যে কোনও বিরাট বাস্তব ঘটনা মানুষকে উৎসাহ দিতেছে কিম্বা সতর্ক করিতেছে এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়া

রাজাকে ও তাহার কর্মচারীদের সৎপথে চালনা করা বা তাহাদের স্বৈরভাব সংযত করা। ফসলের প্রাচুর্য বা অনটন সাধারণতঃ প্রজাদের প্রতি রাজার পিতৃভাবের জন্য অথবা তাহার দৌরাত্ম্যের জন্য হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা সাধারণতঃ ধরিয়া লইতেন। মানুষের গুণাবলীর মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি ভক্তিকে কন্‌ফিউসিয়াস্ উচ্চস্থান দিতেন এবং পূর্ব পুরুষদের পূজার অনুমোদন করিতেন,—ধর্মের জন্য নয়, কিন্তু এই হেতু যে তাহাতে স্বর্গত পিতা-পিতামহদের সশ্রদ্ধ স্মৃতি স্থায়ী হয় এবং পরিবারের ভাল ভাল সংস্কার ও দৃষ্টান্তগুলি সন্তান-সন্ততিদের জন্য থাকিয়া যায়। পূর্বপুরুষদের পূজার সঙ্গে বিগ্রহ-পূজাও থাকিত এবং এই উভয় হইতেই সাধারণ লোকেরা কিছু মানসিক শান্তি ও পরমার্থিক সান্ত্বনা পাইতে পারে। কিন্তু বিগ্রহ-পূজা গ্রাহ্য হইয়াছিল যেমন মতানৈক্য গ্রাহ্য হইত, ইহাকে কখনও কোনও দার্শনিক সমর্থন দেওয়া হয় নাই।

অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে চীনদেশীদের কৌতূহল স্বল্প—প্রায় নাই বলিলেই হয়। তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের মিলাইয়া দিয়া ও প্রকৃতিতে আনন্দ খুঁজিয়াই সন্তুষ্ট। তাহাদের মনের এই ঝোঁক অধিকাংশে 'তাও' ধর্মের প্রভাবের ফল, বিশেষতঃ 'চুয়াঙ্ ত্সু'র (Chuang Tzu) শিক্ষার। চীনা কবি ও পণ্ডিতেরা নির্বিচারে ভালবাসে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মত্ত হইয়া থাকিতে বা নদী-পর্বত-শালিনী মাতা ধরিত্রীর বুকে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে। সেই জন্য চীনদেশীয় চিত্র-কলায় কোনও ভূ-ভাগের দৃশ্য (Landscape) যে স্থান পায় তাহা অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। যাহারা প্রকৃতিকে ভালবাসে তাহারা প্রকৃতিকে জয় করিতে ত চাহেই না, বরং তাহাকে মনের মধ্যে মিলাইয়া দিতে চায় এবং তৎপরে তাহা বর্ণে ও রেখায় ফুটাইয়া তুলিতে চায় অথবা কবির কল্পনা-মালার আকারে গাঁথিতে চায়। চীনের দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র 'শ্যুঙ্ ত্সু' (Hsun Tzu) প্রকৃতিকে জয় করিবার মত ধারণ করিতেন, কিন্তু তাঁহার অনুসরণকারীরা কখনও সেই মতে দৃঢ়তার সহিত জোর দেন নাই। সেই জন্য প্রকৃতি-বিজ্ঞানগুলি (Physical Sciences) চীনদেশে পাশ্চাত্যখণ্ডের সহিত সম্পর্ক-স্থাপনের কাল পর্যন্ত কখনও নিয়মিতভাবে বাড়িতে পারে নাই।

তৃতীয়তঃ চীনা মন ঐহিক ও সহিষ্ণু। যখন এই মন কোনও ধর্ম গ্রহণ করে, সেই ধর্মে যদি কোন অসহিষ্ণুতার ভাব থাকে তাহা সাধারণঃ এবং প্রায়শঃই অলক্ষিতে লোপ পাইয়া যায়। একটি ঘরোয়া প্রবচন এই: 'ধর্মমত অনেক হইতে পারে, যুক্তি কিন্তু এক'। যুক্তির সঙ্গে অসহিষ্ণুতা চলে না,—গোঁড়ামিত নয়ই। ধর্মবিষয়ে সহিষ্ণুতার অর্থ সকলকে ধর্মকার্যে স্বাধীনতা দেওয়া ও সকল ধর্মমতের সমান স্থান স্বীকার করা। অনেক সময়েই দেখা যায় আধুনিক কোনও চীনা পরিবারে নানা ধর্মের অধিষ্ঠান: পিতা

হয়ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, মাতা 'তাও' ধর্মী, পুত্র খৃষ্টান এবং এ সব পার্থক্য লইয়া কেহ ব্যতিব্যস্ত হয় না। ধর্ম নিজের মনোনয়নের বিষয়, এমন কি কখনও বা নিজের রুচি-অনুযায়ী, এবং অন্যের হস্তক্ষেপ বা পরিবর্তনের চেষ্টা হইতে ইহা সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা উচিত। চীনদেশে কখনও রাষ্ট্র-ধর্ম অর্থাৎ কোনও প্রণালীবদ্ধ এবং পারত্রিক ধর্ম ছিল না, কোনও রাষ্ট্র-স্থাপিত ধর্ম-প্রতিষ্ঠান বা বিধান—অনুবর্তীতা গ্রহণের আন্দোলন (Conformist Movement) ছিল না[৪২]। সুতরাং ধর্ম লইয়া দুইপক্ষে যুদ্ধ চীনদেশবাসীদের সম্পূর্ণ অভাবনীয়। চীনদেশীয়েরা সেই জন্য খৃষ্টনদের ধর্মযুদ্ধ (Crusade) বা ধর্মমূলক কোনও যুদ্ধ (Holy War) যে একরূপ ব্যাপার তাহা সহজে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারে না। চীনের চিন্তাধারায় বা ইতিহাসে ধর্মমত বিচারের প্রথা (Inquisition) বা ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী হইতে ভিন্ন-মত-পোষক গ্রন্থগুলি ছাঁটাই করিয়া দেওয়ার রীতি (Index) নাই।

ধর্মবিষয়ে সহিষ্ণুতা আছে বলিয়াই চীনবাসীদের সর্বপ্রকার মতবাদ বিচারে সহিষ্ণুতা আছে। যে কোনও নূতন মত,—তাহা বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক হউক —চীনাদেশীয়েরা পাইবামাত্র খোলা মনে গ্রহণ করিয়া আত্মস্থ করে। কোপারনিকাসের, (Copernicus) 'ডারউইনের' (Darwin) মতবাদ তাহাদের আপন জন্মস্থান পাশ্চাত্যখণ্ডে অনেক বিসম্বাদ উত্তীর্ণ হইয়া প্রচারিত হইতে পারিয়াছিল এবং অনেক নির্যাতনের পর গ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু চীনারা অন্যদেশীয় হইলেও এই নূতন তত্ত্বগুলি যখন প্রামাণ্য গ্রন্থ ও অকাট্য প্রমাণ হইতে জানিতে পারিল তখন তাহারা সহজেই গ্রহণ করিয়াছে। অতি-মাত্রায় সহিষ্ণুতার ফলে মনের এমন একটা অবস্থা জন্মিতে পারে যাহাতে সকল তত্ত্বের প্রতিই একটা প্রায় মানসিক ঔদাসীন্যের ভাব আসিয়া যায়। কিন্তু এই সহিষ্ণুতার জন্য চীনবাসীদের নূতন নূতন জ্ঞান আয়ত্ত করিবার সুবিধা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ চীনদেশের চিন্তাধারায় সাম্যবাদ (Democracy) প্রবল ও প্রত্যক্ষ। প্রধানতঃ 'কন্‌ফিউসিয়ান্' বাদের মানব-ধর্মিতা (Humanism) হইতে ইহার উৎপত্তি, কিন্তু এই সাম্যবাদে অন্যান্য উপদেষ্টার শিক্ষাগুলিরও আপন আপন অংশ আছে, যথা চুঙ্ ত্‌সু'র (Chuang Tzu) 'সকল বস্তুর সাম্যকরণ' বাদ ও মোত্‌সু'র (Mo Tzu) 'বিশ্ব-প্রেম' নীতি। গণ-তন্ত্রবাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন 'মেনসিয়াস্' (Mencius)। তাঁহার রাষ্ট্র-দর্শনে (Political Philosophy) তিনি সর্ববিষয়ে জনসাধারণ মান-নিরূপণ করিবে এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবতাদের ইচ্ছা তাঁহার মতে জনসাধারণের ইচ্ছার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয়। মেনসিয়াস্ বলিতেন: 'সর্ব-প্রধান জনসাধারণ এবং তাহার পরে রাষ্ট্র। শাসকের স্থান সর্বাপেক্ষা লঘু।' আরও

বলিতেন: 'রাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা কেবল লোকার্থের জন্য। রাজার কোন দেবত্ব নাই। প্রাচীনকালের ঋষি-রাজারা, 'যাও' (Yao)[৪৩] এবং 'শুন্'[৪৪] (Shun), আমাদেরই সম-জাতি।' গুরুতর দুঃশাসন বা রাষ্ট্রক্ষেত্রে অত্যাচার হইলে বিপ্লব সম্পূর্ণ সমর্থন-যোগ্য। প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ 'পরিবর্তন-বিষয়ক নিবন্ধে' ('Book of Change') লিখিত আছে যে 'তঙ্' [৪৫] (Tong) এবং 'ফু'[৪৫] (Wu)—দুই জন প্রাচীনকালের ঋষি-রাজা—যে বিপ্লবগুলি চালাইয়াছিলেন সে সকল দেবতাদের আজ্ঞায় এবং মানুষের ইচ্ছা অনুসারে। এই মতবাদই মেন্সিয়াস্ সোৎসাহে সমর্থন করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'হ্বঙ্ চুঙ্ ত্সি, (Hwang Chung Hsi—১৬১০-১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ)[৪৭] মেন্সিয়াসের এই সকল গণতান্ত্রিক মতবাদ পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার 'শাসক বিষয়ক' (On Ruler) এবং 'প্রজা বিষয়ক' (On Subject) নামক দুইখানি প্রসিদ্ধ নিবন্ধ 'রাজাদের ঈশ্বর-দত্ত অধিকার' (Divine Right of Kings) মতবাদের প্রতি দীপ্ত ও প্রবল আক্রমণ। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক যে চুক্তির উপর নির্ভর করে এই মতের যে তেজস্বী ব্যাখ্যান হ্বঙের নিবন্ধ দুইটিতে আছে তাহার সহিত বর্তমান কালের ইতিহাসে প্রায় আধুনিক যুগে রচিত রুসোর (Rousseau) 'সমাজ-সংগঠনের চুক্তি'র (Contract Social—১৭৬২) তুলনা হইতে পারে। কিন্তু 'হ্বঙে'র গ্রন্থ রুসোর নিবন্ধের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবিতকালে 'ত্সিঙ্' (Tsing) ও 'মান্চু' (Manchu) বংশের সম্রাটদের শাসন-ক্ষমতা সর্বোচ্চে ছিল বলিয়া তখন তাঁহার প্রভাব অনুভূত হয় নাই, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে তাঁহার মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের পুনরুত্থান হয়। তাঁহার উক্ত দুইটি নিবন্ধ সম্বলিত 'মিঙ্ যি তাই ফঙ্ লু'[৪৮] (Ming Yi Yai Fond Lu) নামক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয় এবং তাহার লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিতরিত হয়। যে বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সনে চীনদেশে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার সমর্থন, ও পরিপোষণ উৎসাহ বর্ধন কল্পে এই গ্রন্থ-বিতরণ হইয়াছিল।

কেহ এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ সঙ্গতভাবেই উত্থাপন করিতে পারেন যে চীনদেশে গণ-তান্ত্রিক মতের এত সম্পদ-প্রাচুর্য সত্ত্বেও আধুনিককালে চীন কেন অন্যান্য দেশের পূর্বেই গণতান্ত্রিক শাসন-নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ইহার কতগুলি সমাজগত ও রাষ্ট্রগত কারণ অবশ্য দেওয়া যায়। কিন্তু যাহারা দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাস গবেষণা করিয়াছেন তাহারা এই কারণ পাইবেন যে কন্ফিউসিয়ান্ নীতি-বাদ ও 'নিয়ম-পদ্ধতি' (Legalist) সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় নিয়ম (law) সম্বন্ধে ধারণা এই দুইয়ের মধ্যে ছিল বহু-ব্যবধান এবং সেই কারণেই কন্ফিউসিয়ান্ সম্প্রদায়ের মহৎ রাষ্ট্রীয় নীতিগুলি কোনও প্রতিষ্ঠানরূপে

গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। 'মোত্‌স্থ' সম্প্রদায়ের পতনের ফলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্কার বিষয়ে চীনদেশীয়দের প্রচারের উৎসাহ কমিয়া যায়। তৎসত্ত্বেও চিরকালই কিছু পরিদৃশ্যমান কিছু বা লুক্কায়িতভাবে চীনদেশের সমাজে একটি গণতন্ত্রতার অন্তঃস্রোত ছিল। সরকারি কার্যে ক্ষমতাপন্ন কর্মচারী নিয়োগের জন্য চীনদেশে বহুযুগ হইতে যে সর্ব-সাধারণের লভ্য পরীক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল তাহাতে জাতি-বিচার বা শ্রেণী-বিচার নিষ্কাশিত হইত। বিশেষতঃ চীনের ভিতরে ও গ্রাম্য অঞ্চলগুলিতে পিতার অধিকার সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা প্রত্যেক পরিবারের আয়তন-প্রাচুর্য ও স্থানীয় দুঃস্থদের সাহায্যের নানা প্রথা— এই সকল অতীতে মহৎ সামাজিক সাম্য-পোষক (socializing) শক্তিরূপে কার্য করিয়াছে এবং বর্তমানেও করিতেছে সন্দেহ নাই।

কন্‌ফিউসিয়াসের যে 'তা-তুঙ্‌' (Ta-Tung) বা 'বৃহৎ গণ-রাজ্যে'র (Great Commonwealth) কথা বলিয়াছেন, যাহা মানব জীবনের রাষ্ট্রগত, সমাজগত, অর্থ-নীতিগত ও কৃষ্টিগত সকল দিক্ ব্যাপ্ত করে—তাহা সর্বযুগেই মানবজাতির আদর্শরাষ্ট্রের নির্দেশকরূপে বর্তমান থাকা উচিত। কন্‌ফিউসিয়াসের বাক্য এই ঃ

> "যখন সেই মহান্ 'তাও' শক্তিমান্ ছিলেন, সমগ্র পৃথিবী ছিল এক রাজ্য। শাসকেরা তাঁহাদের বিজ্ঞতা ও ক্ষমতা অনুসারে নির্বাচিত হইতেন। পরস্পরের মধ্যে আস্থা ও শান্তি বিদ্যমান ছিল। সুতরাং লোক সাধারণ কেবলমাত্র নিজেদের পিতামাতাকে বা সন্তানদিগকে পিতামাতা বা সন্তান বলিয়া বিবেচনা করিত না। বৃদ্ধেরা তাহাদের বার্দ্ধক্যেও সুখে থাকিতে পারিত ; যুবকেরা তাহাদের ক্ষমতার নিয়োগ করিতে পারিত ; অল্পবয়স্কেরা বড়দের উপর নির্ভর করিতে পারিত, এবং সহায়হীন বিধবারা, পিতৃমাতৃহীনেরা, অসমর্থেরা ও বিকলাঙ্গেরা যত্ন-শুশ্রূষা পাইত। পুরুষদের আপন আপন কার্য ছিল এবং স্ত্রীলোকদের ঘর-সংসার ছিল। যদি জিনিস-পত্র উদ্বৃত্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিত, তাহা উঠাইয়া নিজেদের জন্য রাখিতে হইত না এবং যদি লোকের কার্য-ক্ষমতা থাকিত, তাহা কেবল নিজের লাভের জন্যই খাটাইবার প্রয়োজন হইত না। সুতরাং ধূর্তামি ও চক্রান্ত ছিল না এবং চোর-ডাকাত ছিল না এবং রাত্রিকালে বাহিরের ফটক বন্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন ছিল না। সে কাল 'তা-তুঙ্‌' বা 'বৃহৎ গণ-রাজ্যে'র কাল ছিল।[৪৯]

৪। পরিশেষ

চীনের চিন্তাধারার যে সকল উপাদান ও অভিব্যক্তির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে চীন-সভ্যতা তাহা দিয়াই গঠিত। এ সকলের দোষ-গুণ, স্থবিধা-অস্থবিধা, ভাল-মন্দ, স্মরণীয় কীর্ত্তি ও অপ্রীতিকর কুফল দুই-ই আছে। তবুও এই দর্শন-শাস্ত্রের ক্রমব্যক্ত দৃশ্যপটের সামনে দাঁড়াইয়া আগ্রহ হয় ইহাকে সমীক্ষণ করিতে, সমালোচনা করিতে, ইহার তাৎপর্য্য নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে।

কিন্তু শ্রেষ্ঠতর বিষয় এই যে, আমরা কৃষ্টির সংযোগ, সংঘাত ও সমন্বয়ের এক নূতন যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন প্রাচ্যখণ্ড প্রাচ্য ও পশ্চিমখণ্ড পশ্চিম নাই, কারণ ব্যবধান হ্রাস হইতেছে ও মানুষের চিন্তাগুলি দূরে পাঠাইবার ও ধারণাগুলি প্রচার করিবার উপায় অবিরত বাড়িয়া চলিয়া—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই দানবকে জোর করিয়া একত্র মিলাইতেছে। কোনও একটি অভিনব সভ্যতার জন্ম, হয়ত একটি বিশ্ব-মানবের সভ্যতা অথবা সম্ভবতঃ নানা প্রকারের সভ্যতা বিঘোষিত হইতেছে। পুরাতন বলিয়াই প্রাচীন কিছু তাহার আকার ও বস্তু রক্ষা করিতে পারে না এবং নূতন কিছু সম্পূর্ণভাবে অতীতকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া জন্ম নিতে বা স্থিতিশীল হইতে পারে না, কারণ এই অতীত অন্তর্নিহিত,—উত্তারাধিকারীদের প্রকৃতিতে জীবন্ত। ইহা অভিব্যক্তির বিরাট্ নক্‌সার অংশ,—যাহার তাৎপর্য্য চিরপরিবর্তন, পশ্চাৎকে কাটাইয়া অগ্রগমন নয়। প্রগতির উদ্দেশ্য থাকা চাই,—আমাদের সম্মুখে ও অগ্রেস্থিত কোনও আদর্শ। নূতন এক কৃষ্টিগঠনের স্থবিশাল কর্ম-প্রক্রিয়ার পূর্বে প্রয়োজন পৃথিবীর সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভূয়োদর্শন ও উচ্চ আদর্শ, যাহাতে সহযোগ-বদ্ধ চিন্তা-ক্ষেত্রে যৌথ-চেষ্টাদ্বারা মানুষের পূর্ণতা-লাভের দিকে কৃষ্টির প্রগতি দ্রুত অগ্রসর করার মহৎ ব্রত সিদ্ধ হইবে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কনফিউসিয়ান্‌-বাদ ও তাও-বাদ

১।

প্রথমেই বলা দরকার যে 'কন্‌ফিউসিয়ানিজ্‌ম্‌' (Confucianism) বা কন্‌ফিউসিয়ান্‌-বাদ একটি পাশ্চাত্য সংজ্ঞা। চীনদেশী 'জু চিয়া' (Ju chia) নাম ইহার সমতুল্য, যাহার অর্থ 'শিক্ষিতদের সম্প্রদায়'। ঐ পাশ্চাত্য সংজ্ঞাটিতে, চীনা নামটির মত, এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে এই সম্প্রদায়াবলম্বীরা চিন্তাশীল, তথা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারা প্রাচীন সদ্‌গ্রন্থগুলির (classics) শিক্ষক ছিলেন ও চীনের প্রাচীন কৃষ্টির উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই কারণে চীন-সমাজে চিরকালই ইঁহারা প্রাক্তন ঐতিহ্যের বাহক ছিলেন এবং দুই সহস্র বৎসরের অধিক এই সম্প্রদায়ের প্রচারিত মত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং চীনদেশীয়দের দৈনিক জীবনে রাজার অনুমোদিত মতবাদ বলিয়া স্বীকৃত হইত।

'তাও-ইজ্‌ম্‌, (Tao-ism) বা 'তাও-বাদ'ও পাশ্চাত্য সংজ্ঞা। ইহা দ্ব্যর্থবোধক। ইহা দুইটি চীনা কথার সমতুল্য—'তাও চিয়া' ও 'তাও চিয়াও'। যদিও এই দুইটি বাক্যের মধ্যে 'তাও' কথাটি সাধারণ, কিন্তু তাৎপর্য্যে পার্থক্য আছে। 'তাও চিয়া' একটি দর্শনের দ্যোতক ; 'তাও চিয়াও একটি ধর্মের। দর্শনস্বরূপে 'তাও'-বাদের শিক্ষা ও ধর্ম-স্বরূপে ইহার শিক্ষা কেবল পৃথক্ পৃথক্ নহে, পরস্পর-বিরোধীও বটে। 'তাও'-দর্শনের মতবাদ প্রকৃতিকে অনুসরণ করা ; 'তাও'-ধর্মের মতবাদ প্রকৃতির বিরোধিতা করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—'তাও'-দর্শনের মতে প্রকৃতির রীতি এই যে, জীবনের শেষে মৃত্যু আসিবে এবং মানুষের পক্ষে প্রকৃতির এই রীতি শান্তমনে মানিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু 'তাও'-ধর্মের প্রধান শিক্ষা কিভাবে ও কি কৌশলে মৃত্যুকে এড়ানো যায়, যাহা স্পষ্টতঃই প্রকৃতির বিরোধাচরণ করা। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আমি 'তাও'-বাদকে 'তাও'-দর্শন অর্থে গ্রহণ করিব, কারণ বাস্তবিক ঐ অর্থেই 'তাও' কন্‌ফিউসিয়ান্‌-বাদের প্রতিদন্দ্বী।

কন্‌ফিউসিয়ান-বাদ আদিতে সমাজ-সংগঠনের রীতি-নীতি বিষয়ক একটি দর্শন ছিল ; কিন্তু আদিম 'তাও'-বাদ সমাজ-বিরোধী ভাবাপন্ন দর্শন ছিল। কন্‌ফিউসিয়ান্‌-বাদ মানুষের সামাজিক দায়িত্বগুলির উপর জোর দিত, কিন্তু 'তাও'-বাদের জোর ছিল মানুষের মধ্যে যাহা স্বাভাবিক ও সহজাত তাহার উপর। চীনদেশীয়দের মধ্যে একটি প্রচলিত কথা ছিল যে, কন্‌ফিউসিয়ান্‌-বাদ মূল্য দিত 'মিঙ চিয়াও' (Ming Chiao) অর্থাৎ সামাজিক

সম্বন্ধ-সূচক নামগুলি শিক্ষাকে, কিন্তু 'তাও'-বাদ 'ত্সু জন্' (Tzu Jon) স্বাভাবিক ও সহজকে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় যে 'ক্লাসিসিজম্' (Classicism) রোমান্টিসিজম্ (Romanticism) বলিয়া দুইটি সংস্কারের ধারা আছে, চীনা দর্শনের এই দুইটি গতি তাহার মোটামুটি অনুরূপ। ইঁহারা যেন দুইটি শক্তির দুই তৌল এবং তাহাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় চীন ইতিহাসে চীনা-চিন্তাপ্রণালীর পরিপুষ্টি লক্ষিত হয়।

২। কন্‌ফিউসিয়ান্‌ বাদ

কন্‌ফিউসিয়ান্ মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের তিনটি মহাপুরুষ—'কন্‌ফিউসিয়াস্', খৃষ্টপূর্ব (৫৬১-৪৭৯), 'মেন্‌সিয়াস্', (খৃষ্টপূর্ব ৩৭১-২৮৯) এবং 'ত্সুন্ ত্সু' (Hsuan Tzu—খৃষ্টপূর্ব প্রায় ২৯৯-২৩৪)। পূর্বেই বলিয়াছি যে অধিকাংশ কন্‌ফিউসিয়ান্‌বাদীরাই পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কনফিউসিয়াসও ইহার ব্যত্যয় ছিলেন না। অধিকন্তু তিনি একজন প্রধান শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তাঁহার নিজের হৃদ্‌বোধ ছিল যে শিক্ষক স্বরূপে তাঁহার প্রথম কার্য তাঁহার শিষ্যবর্গের কাছে প্রাচীন কৃষ্টির তাৎপর্য বোধগম্য করা। সেইজন্যই তাঁহার নিজের উক্তি, যাহা তাঁহার শিষ্যেরা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, ছিল এই যে তিনি নিজে কিছু সৃষ্টি করেন নাই, যাহা ছিল তাহাই বহন করিয়া আনিয়াছেন (The Confucian Anatect, ৭ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়)। কিন্তু ইহা কন্‌ফিউসিয়াসের প্রতিভার একদিকমাত্র, তাহার অন্যদিকও আছে। তাহা এই যে প্রাচীন গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ যে ঐতিহ্য-গত অনুষ্ঠান ও ধারণাগুলি তিনি বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি স্বকীয় নীতিবাদের দ্বারা তাহার নূতন অর্থ করিয়াছিলেন।

ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে কন্‌ফিউসিয়াসের নিজের নীতিবিষয়ক কতগুলি ধারণা ছিল। তাঁহার মতে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গড়িতে হইলে সর্বাপেক্ষা গুরুতর করণীয় সংজ্ঞা-বিশুদ্ধি (Rectification of Names)। বস্তুনিচয় প্রকৃতপক্ষে যে রূপে থাকে তাহায় নাম-গুলির সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকা চাই। অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রত্যেক নামের মধ্যে কতকগুলি সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা আছে যাহাদ্বারা ঐ জাতীয় বস্তুর সারমর্ম আকারিত হয়। ইহার সহিত বস্তুর সাম্য থাকা চাই।

ইহা ঠিক প্লেটোর (Plato) মতবাদের মত শুনাইতে পারে। কিন্তু প্লেটো ধরিয়াছিলেন এই মতের নৈয়ায়িক ও আধিভৌতিক দিক্; কন্‌ফিউসিয়াস্ লইয়াছিলেন ইহার নৈতিক তাৎপর্য্য। যে তত্ত্বের উপর তিনি জোর দিয়াছিলেন তাহা এই যে

সামাজিক সম্বন্ধ-সূচক প্রত্যেক সংজ্ঞা কতগুলি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য নির্দেশ করে। পাঁচটি এইরূপ সামাজিক সম্বন্ধ :—পিতাপুত্র, শাসক-প্রজা, স্বামী-স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বন্ধু-বান্ধব। এ সকল সামজিক সম্বন্ধ-সূচক নাম এবং এইসব নাম যাহারা গ্রহণ করে তাহাদের নাম—নির্দিষ্ট দায়িত্বগ্রহণ ও কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। যদি সমাজের প্রত্যেকেই এইরূপ করে, তবেই সমাজ মহাশান্তিতে থাকিবে।

ব্যক্তিগত সদ্‌গুণগুলির মধ্যে কন্‌ফিউসিয়াস্ সদয়-হৃদয়তা (Jen—জেন্) ও ন্যায়পরতা (Yi—যি) এই দুই গুণের উপর জোর দিয়াছেন। ন্যায়পরতার অর্থ ; যে কোনও অবস্থার 'ঔচিত্য' সমাধান, কারণ যাহা উচিত তাহাই কর্তব্য। ইহা মানুষের একটি সুনিশ্চিত বাধ্যতামূলক ধর্ম ('Categorical Imparetive') সমাজে প্রত্যেকেরই কতগুলি কার্য আছে যাহা অবশ্য-পালনীয় এবং যাহা ফল-নিরপেক্ষভাবে করিতে হয়। ইহা অবশ্য নীতিধর্মের বাহ্যিক আকার। কিন্তু সদয়-হৃদয়তা ইহার অপেক্ষা বেশী বস্তুগত (concrete) ব্যাপার। সমাজে মানুষের কর্তব্যের সার-গুণ ন্যায্যতা বা অবশ্য-কর্তব্যতা। কিন্তু ইহার বাস্তবিক মর্ম পরের প্রতি ভালবাসায়,—'জেন্, অর্থাৎ সদয়-হৃদয়তায়। যে পিতা পুত্রকে ভালবাসে সে পুত্রের প্রতি যথা-কর্তব্য ব্যবহার করিবেই ; যে পুত্র পিতাকে ভালবাসে সেও পিতার প্রতি যথা-কর্তব্য ব্যবহার করিবে। কন্‌ফিউসিয়াস্ বলিয়াছেন : "সদয়-হৃদয়তা অন্যকে ভালবাসায়" (The Confucian Analects, ১২, ২২) যে লোক অন্যকে ভালবাসে সেই নিঃসন্দেহ সমাজে তাহার কর্তব্যগুলি পালন করিতে পারিবে।

কন্‌ফিউসিয়াস্ এই নীতিগত ধারণাগুলির পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন,—মেন্‌সিয়াস্ তাহার মনোবিজ্ঞানগত ও দার্শনিক সমর্থন দিয়া গিয়াছেন। মেন্‌সিয়াসের একটি প্রসিদ্ধ মতবাদ ছিল এই যে মানুষের প্রকৃতি মূলত সৎ। 'সদয়-হৃদয়তা' (Jen) মনুষ্য-প্রকৃতির অন্যথা নয়, ইহারই আন্তরিক। তাঁহার মতে সকল মানুষেরই "এমন একটি মন আছে যাহা অন্যের দুঃখ সহ্য করিতে চায় না" (The Mencius, ২ ক, ৬)। ইহাকে তিনি নাম দিয়েছেন, "অসহনশীল মন"। 'জেন্' বা সদয়-হৃদয়তার প্রকাশ কোনও ব্যক্তির পক্ষে তাহার "অসহনশীল মনের" স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা। মেন্‌সিয়াস্ এইভাবে কন্‌ফিউসিয়াস্-বর্ধিত গুণকে মনোভাব-মূলক ব্যাখ্যা দিয়া সমর্থন করিয়াছেন।

মেন্‌সিয়াস্ আরও বলিয়াছেন : "যে নিজের মনকে সম্পূর্ণ বিকশিত করে, সে তাহার নিজ প্রকৃতি বুঝিতে পারে। যে নিজ প্রকৃতি জানে সে স্বর্গকেও জানে" (The Mencius ৭ ক, ১)। এখন মেন্‌সিয়াস্ যে মনের কথা বলিয়াছেন তাহা সেই "অসহনশীল মন" যাহা আমাদের প্রকৃতির অন্তর্বস্তু। মনের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলেই আমরা

প্রকৃতিকে জানিতে পারি। মেন্‌সিয়াসের মতে: "স্বর্গ হইতে আমরা যাহা পাইয়াছি" তাহাই আমাদের প্রকৃতি (The Mencius ৬ ক, ১৫)। সেই জন্যই বলা হয় আপন প্রকৃতিকে জানা ও স্বর্গকে জানা একই কথা।

কিন্তু এই স্বর্গ কি? মেন্‌সিয়াসের মতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মূলতঃ নীতি-বিধৃত। যে সকল নৈতিক গুণ মানুষের প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত তাহাই আধিভৌতিক ভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে চলিতেছে ও মনুষের প্রকৃতি বিশ্ব-প্রকৃতিরই দৃষ্টান্ত। মেন্‌সিয়াস্ যখন স্বর্গের কথা বলিয়াছেন, তখন এই নীতি-বিধৃত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কথাই তাহার মনে ছিল। ইহাকে জানাই মেন্‌সিয়াস্ স্বর্গকে জানা বলিয়াছেন।

আত্ম-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিকাশদ্বারা মানুষ কেবলমাত্র স্বর্গকে জানে না, তাহার সহিত একত্ব সম্পাদন করে। মেন্‌সিয়াস্ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন: "সকল বস্তুই সম্পূর্ণ-রূপে আমাদের মধ্যে আছে। আত্ম-শিক্ষাদ্বারা ইহা প্রত্যয় করা অপেক্ষা আর মহত্তর আনন্দ নাই (The Mencius ৭ ক, ১)। তাঁহার মতে 'জেন্' বা সদয়-হৃদয়তার প্রয়োগ এই প্রত্যয়-লাভের পথ। এই গুণের প্রয়োগদ্বারা ক্রমে ক্রমে মানুষের অহমিকা ও স্বার্থপরতা কমিয়া যায়। তাহা যখন সম্পূর্ণ হ্রাস পায়, মানুষ তখন সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হয়। তখন এই বোধ জাগে যে ব্যক্তি ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোনও ভেদ নাই! তাহার অর্থ এই যে ব্যক্তি সমস্ত ব্রাহ্মণ্ডের সহিত এক হইয়া যায়। তখন "যাবতীয় বস্তুই আমার মধ্যে সম্পূর্ণ আছে"—এই বোধ জাগে। এই ভাবে মেন্‌সিয়াস্ কন্‌ফিউ-সিয়াস্-বর্ণিত গুণের আধিভৌতিক সমর্থন দিয়াছেন এবং ইহা কন্‌ফিউসিয়াস্-দর্শনের গূঢ়তত্ত্বও বটে। এগারো ও বারো শতাব্দীর কন্‌ফিউসিয়ান্ দর্শনে ইহা আরও অধিক বিস্তারিত হইয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আর একজন অতি প্রসিদ্ধ ও প্রভাববান্ কন্‌ফিউসিয়ান্ মতাবলম্বী ছিলেন, যিনি মেন্‌সিয়াসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিালন ও কন্‌ফিউসিয়ান্-বাদের অন্য একটি দিক বিস্তারিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তিনি 'শুন্‌ত্‌স্থ' (Hsun tzu—খৃষ্টপূর্ব প্রায় ২৯৮-২৩৮)। কন্‌ফিউসিয়ান্ বাদের এক দিক,—তাহার অপার্থিব (Idea-list) দিক—দেখাইয়াছিলেন মেন্‌সিয়াস্; অন্য দিক,—বাস্তবতার (Realistic) দিক,—শুন্‌ত্‌স্থ।

মানুষের প্রকৃতি মূলতঃ অসৎ—প্রধানতঃ এই মতবাদের জন্য শুন্‌ত্‌স্থ প্রসিদ্ধ। বাহ্যতঃ মনে হইতে পারে যে মানুষ সম্বন্ধে শুন্‌তস্থর অত্যন্ত মন্দ ধারণা ছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহার বিপরীত। শুন্‌ত্‌স্থর দার্শনিক মতকে আত্মোন্নতি-প্রয়াসের দর্শন বলা যাইতে পারে, তাঁহার মুখ্য বক্তব্য এই যে যাহা কিছু ভাল ও মূল্যবান, তাহা মানুষের প্রয়াসের

ফল। উৎকর্ষই সকল মূল্যের কারণ এবং উৎকর্ষ মানুষের সাধনা-লব্ধ। এই সাধনাতেই ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

মানুষের প্রকৃতিও এই সাধনার লক্ষ্য, কারণ শুন্ ত্সুর মতে যে প্রকৃতির কোনও কৃষ্টি লাভ হয় নাই, তাহা সৎ হইতে পারে না। তাঁহার মতে প্রকৃতি আদিম অসংশোধিত ধাতু; কৃষ্টিদ্বারা ইহা সম্পন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়। কৃষ্টি ব্যতিরিক্ত ইহাতে এমন কিছু নাই যাহাতে বাহির হইতে লব্ধ কোনও গুণের সংযোগ হইতে পারে। এই সংযোগ ভিন্ন প্রকৃতি আপনা-আপনিই সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে না (Hsun-Tzu—শুন্ ত্সু, ২৩ অধ্যায়)।

এখন প্রশ্ন জাগে : মানুষ তবে কি করিয়া সুনীতিপরায়ণ হইতে পারে? যদি সকল লোকই অসৎ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তবে সতের জন্ম কোথা হইতে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে শুন্ ত্সু দুই প্রকার মুক্তি-মার্গের নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ শুন্ ত্সু এই মত পোষণ করিতেন যে কোনরূপ সমাজের অন্তর্গত না হইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। শ্রেষ্ঠতরভাবে জীবন উপভোগের জন্য সহযোগ ও পরস্পরের সহায়তার প্রয়োজন। অন্যান্য প্রাণীদের উপরে জয়লাভের জন্যও তাহাদের ঐক্যের প্রয়োজন। সুতরাং তাহাদের সমাজের বন্ধনে থাকিতে হইবে এবং সমাজ-বন্ধনের জন্য ব্যবহারের রীতি-নীতি আবশ্যকীয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতি-নীতিগুলি এই নিয়মেরই দ্যোতক।

দ্বিতীয়তঃ শুন্ ত্সু এই সত্যগুলির নির্দেশ করিয়াছিলেন যে "সাধারণ লোকেরা একই বিধ বস্তু-সমূহকে আকাঙ্ক্ষা বা ঘৃণা করে", এবং "তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বহুল কিন্তু বস্তু-সম্ভার অল্প" (Hsun Tzu—শুন্ ত্সু, ১০ অধ্যায়)। মানুষের জীবনে কষ্ট-ক্লেশের ইহা একটি অসন্দিগ্ধ মূল-কারণ। যদি সকলে একই জিনিসগুলি আকাঙ্ক্ষা বা ঘৃণা না করিত, দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি এক দল অন্যকে পরাভূত করিয়া সুখী হইত ও অন্যদল পরাভূত হইতে ইচ্ছা করিত, তবে তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের কোনও কারণ থাকিত না ও তাহারা সহজেই মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারিত। অথবা যে সকল জিনিষ সকলে পাইতে ইচ্ছা করে তাহা যদি মুক্ত বাতাসের মত যথেষ্ট-লভ্য হইত তবে ও কোনও কষ্টের কারণ থাকিত না। অথবা যদি মানুষেরা পৃথক্ পৃথক্ থাকিতে পারিত, তবেও সমস্যা অনেকটা লঘু হইয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পৃথিবীতে এই আদর্শ সংস্থিতি নাই। মানুষকে একসঙ্গে থাকিতে হইবে এবং এই বিনা-বিবাদে একসঙ্গে থাকিবার প্রয়োজনেই প্রত্যেকের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও নীতির কার্য এই সীমা-নির্দেশ। কেহ

নিজের আকাঙ্খা-তৃপ্তির জন্য এই সীমা উল্লঙ্ঘন করিলে তাহা দুর্নীতির কার্য্য হইবে।

এইভাবে শুন্ ত্সু নীতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রয়োজন-বাদী (Utilitarian) ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কন্‌ফিউসিয়াস্ দিয়াছেন নীতি ও সৎগুণের উপর জোর কিন্তু তাহার দার্শনিক সমর্থন জোগান নাই। মেন্‌সিয়াস্ ও শুন্ ত্সু উভয়ে তাঁহাদের আপন আপন মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধীয় মতবাদদ্বারা এই দার্শনিক সমর্থন দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতবাদ ভিন্ন ভিন্ন এবং সমর্থনের কারণও বিভিন্ন।

৩। 'তাও'—বাদ।

'তাও'-বাদেরও বিশিষ্ট মুখপাত্র তিনজন—যঙ্ চু, (Yang Chu), 'লাও-ত্সু' (Lao Tzu) ও চুয়াঙ্-ত্সু (Chuang Tzu)।

দুইটি বাক্যে 'যঙ্ চু'র শিক্ষার সংক্ষিপ্ত-সার দেওয়া যায়—"প্রত্যেকে নিজের নিজের জন্য" এবং "বস্তু অবহেলা কর ও জীবন মূল্যবান্ মনে কর"। কথিত আছে যে তিনি এই শিক্ষা দিতেন যে "যদি তাঁহার দেহের একটি লোম উৎপাটন করিলে সমস্ত জগৎ উপকৃত হয়, তবু তিনি তাহা করিবেন না" (Mencius ৭ক, ২৬)। 'হান্ ফেই ত্সু' (Han-Fei-Tzu) নামক খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে যে 'যঙ্ চু'র একজন অনুবর্ত্তী বলিতেন যে "পৃথিবীর বহুল উপকারের জন্যও তিনি তাঁহার পায়ের একটি লোম দিতেও প্রস্তুত নন"। 'যঙ্ চু' সম্বন্ধে এই দুইটি প্রবাদ তাঁহার শিক্ষার দুইটি দিক্ নির্দ্দেশ করে। মেন্‌সিয়াস্-বিবৃত 'যঙ্ চু'র উক্তি যে তিনি সমস্ত পৃথিবীর জন্যও একটি লোম দিতে প্রস্তুত নন,—এই উক্তি "জীবন মূল্যবান্ মনে কর" তাঁহার এই শিক্ষার দ্যোতক। 'হান্ ফেই-ত্সু'-ধৃত 'যঙ্ চু'র উপদেশ যে সমস্ত পৃথিবীলাভের জন্যও পায়ের একটি লোম দেওয়া উচিত নয় ইহা "বস্তুকে অবহেলা কর" তাঁহার এই শিক্ষার সমর্থক। 'যঙ্ চু'র শিক্ষা এই যে প্রত্যেক মানুষেরই উচিত জীবনকে মূল্য দেওয়া ও বস্তুকে অবহেলা করা উচিত ও তাহার ফল এই যে প্রত্যেকে আত্মার্থে জীবনধারণ করিবে।

'যঙ্ চু'র শিক্ষাবলী প্রাচীন 'তাও'-মতের ক্রম-বৃদ্ধিতে প্রথম কলা-স্বরূপ। প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য জীবনকে মূল্যবান মনে করিয়া জীবন-রক্ষার চেষ্টা করা ও জীবনের কোনওরূপ হানি পরিহার করা। কিভাবে এই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে 'তাও'-মতে তাহাই প্রথমতঃ প্রধান সমস্যা ছিল। 'যঙ্ চু'র মতে কিভাবে ইহার উপায়—"এড়ানো" অর্থাৎ নিজেকে

মুক্ত করা, যেভাবে সন্ন্যাসীরা সমাজ হইতে পলাইয়া পর্বতে কি অরণ্যে আত্মগোপন করে এইভাবে মনুষ্য-জগতের সকল দুঃখ-দুর্দ্দশা তাহাদের মতে এড়ানো যায়। কিন্তু মনুষ্য-জগতে সর্ব-বিষয়ে এত জটিলতা যে, মানুষ যতই নিরালায় আত্মগোপন করুক, দুঃখ-দুর্দ্দশা, যাহা হইতে পলায়নের উপায় নাই, তাহা আসিবেই। সুতরাং সময়ে সময়ে এই 'এড়ানো'র পন্থা কার্যকরী হয় না।

বিশ্ব-জগতের নানা পরিবর্তনের অন্তরালে যে সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টাই 'লাও ত্‌সু'র (Lao-Tzu) মতবাদ। সকল বস্তুরই পরিবর্তন হয়, কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে তাহা অপরিবর্তনীয়। যদি কেহ সে সকল নিয়ম বুঝিয়া তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কাজ করে, তবে সব কিছু হইতেই সে সুবিধা নিতে পারে। এই মতবাদ 'তাও'-মতের দ্বিতীয় কথা।

প্রবাদ এই যে 'লাও ত্‌সু' কন্‌ফিউসিয়াসের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে 'লাও ত্‌সু' নামক গ্রন্থখানি এই হেতু চীনের ইতিহাসে সর্ব-প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া ধরা হয়। আধুনিক গবেষণার ফলে এই মত অধিকাংশ পণ্ডিতব্যক্তি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং কন্‌ফিউসিয়াসের অনেক পরে ইহা রচিত হয় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। ইহা খুবই সম্ভব যে 'লাওত্‌সু' নামে 'কন্‌ফিউসিয়াস্‌' হইতে বয়োবৃদ্ধ কেহ ছিলেন, কিন্তু ঐ নামে প্রচলিত গ্রন্থখানি পরবর্তীকালের। সুতরাং ঐ গ্রন্থে যে সব মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমি 'তাও'-মতবাদের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় কলা বলিয়া গ্রহণ করি, যদিও আমি তৎসঙ্গে এ কথা অস্বীকার করি না যে 'লাওত্‌সু' স্বয়ং কন্‌ফিউসিয়াসের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন।

'তাও'র ধারণা 'লাওত্‌সু', গ্রন্থে প্রধান স্থান অধিকার করে। 'তাও'র আক্ষরিক অর্থ 'পন্থা'। কিন্তু 'তাও'-বাদে ইহা সেই পরম পদার্থ যাহাকে 'তাও'-বাদীরা সংজ্ঞাতীত (unnameable) বলে। তাহাদের দর্শনে 'তাও' সেই পদার্থ যাহাদ্বারা সকল বস্তু উদ্ভূত হয়। যেহেতু ইহা সকল বস্তুর উদ্ভবের কারণ, সেই হেতুই ইহার কোনও বাস্তবিক সত্তা নাই। বস্তু হয় নামধারী,—অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুরই কতগুলি বিশেষ গুণ আছে যাহাদ্বারা তাহার সংজ্ঞা নিরূপিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত,—বৃক্ষকে গুণানুসারে বৃক্ষ বলা হয়, টেবিলকে টেবিল বলা হয়। কিন্তু 'তাও' স্বভাবতই নির্বস্তু এবং সেই জন্যই নামহীন। প্রত্যেক বস্তুরই সত্তা আছে, 'তাও' নির্বস্তু বলিয়া তাহার কোনও সত্তা নাই। 'তাও'কে 'তাও'-বাদীরা অস্তিত্বহীন বলিয়া বর্ণনা করে। 'লাওত্‌সু' গ্রন্থে এই ধারণাগুলি,—'তাও' সত্তা ও অসত্তাসম্বন্ধীয় (Being and Non-being),—স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

ঐ গ্রন্থের মতে 'তাও' হইতে সকল বস্তু আসে। বস্তু থাকিলেই, তাহার পরিবর্তনের নিয়ম-পদ্ধতি থাকিবে। এই নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে একটি মূলীভূত নিয়ম "তাওর গতির বৈপরীত্য সম্পাদন"। ইহার তাৎপর্য এই যে যদি কোনও বস্তু কতগুলি আত্যন্তিক গুণ বিকাশ করে তবে অলঙ্ঘ্য নিয়মে সেই গুণগুলি তাহার বিপরীত গুণে পর্যবসিত হয়।

ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং—"দুর্ভাগ্যের উপর সৌভাগ্য নির্ভর করে এবং সৌভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য" "কোনও বস্তুকে কমাইতে থাকিলে তাহা বাড়িয়া যাইবে, বাড়াইতে থাকিলে কমিবে"। 'লাও ত্‌স' গ্রন্থ এই রকমের সাধারণ মতের বিরুদ্ধবাদী কথায় পূর্ণ। কিন্তু এই বিরোধের নিরসন হয় প্রকৃতির মূলীভূত নিয়মের জ্ঞান-দ্বারা। কিন্তু যাহাদের এই জ্ঞান জন্মে নাই, তাহাদের কাছে ইহা বিপরীতই মনে হইবে। সুতরাং 'লাও ত্‌স' গ্রন্থে ইহা বলা হইয়াছে যে "স্বল্প-শিক্ষিত ব্যক্তি সত্য-শ্রবণে অট্টহাস্যই করিবে। সেই অট্টহাসি ভিন্ন কথাটি সত্যের মর্যাদালাভ করে না"।

যে প্রকৃতির নিয়ম বুঝিয়াছে, সে তদনুসারে আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিবে। তাহার আচরণের সাধারণ নিয়ম হইবে এই,—সে যদি কোনও সিদ্ধিকামী হয়, তবে তাহার বিপরীত পথে আরম্ভ করিতে হইবে, সে যদি কিছু রক্ষা করিতে প্রয়াসী হয়, তবে তাহার বিরোধী কিছু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—যদি কেহ বল পাইতে চায়, তবে সে যে দুর্বল এই ভাব লইয়া আরম্ভ করিবে এবং যদি কেহ মহাজনবৃত্তি (মূলধনের মালিকত্ব) রক্ষা করিতে চায়, তবে তাহার মধ্যে সমাজ-তান্ত্রিকতার কিছু কিছু গ্রহণ করিতে হইবে।

এই পন্থায় মানুষ সংসারে নিরাপদ হইতে পারে ও তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করিতে পারে। 'তাও' মতবাদীর উপস্থাপিত প্রথম সমস্যা,—কি করিয়া জীবন-রক্ষা করা যায় ও সংসারে ক্ষতি ও বিপদ্ বাঁচাইয়া চলিতে পারা যায়,—তাহার উত্তর ও সমাধান এই প্রকারে দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম যুগের 'তাও'-মতাবলম্বীদের মধ্যে 'চুঙ ত্‌সু' (Chang Tzu —খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৩৬১-২৮৬) সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার নামে 'চুঙ্‌ ত্‌সু' গ্রন্থ 'তাও'-সাহিত্যে একখানা বিশিষ্ট গ্রন্থ। কিন্তু এই গ্রন্থের কোন অংশ দার্শনিক স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের নাম 'সুখের যাত্রা' (Happy Excursion)। সুখের যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম আছে ইহাতে সেই ধারণা ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের প্রকৃতির অবাধ অভিব্যক্তিতে আমাদের আপেক্ষিকভাবের সুখ দিতে পারে, কিন্তু চরম সুখ লাভ হয় বস্তু-নিচয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে উচ্চতর জ্ঞানে।

এখন, প্রথম ইপ্সিত সুখ যাহা আমাদের স্বকীয় প্রকৃতির অবাধ অভিব্যক্তিতে লাভ হয়, তাহার জন্য আমাদের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার সম্পূর্ণ ও অবাধ পরিচালনের প্রয়োজন। এই

ক্ষমতাকে 'তাও'-বাদীরা 'তে' বলেন, অর্থাৎ যাহা 'তাও' হইতে প্রত্যক্ষভাবে আসে। 'চুঙ্‌ত্‌স্থ' গ্রন্থে বলা হইয়াছেঃ "বস্তু-নিচয় যাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার পুনঃপ্রাপ্তিকে 'তে' বলা হয়। অর্থাৎ 'তাও' হইতে আমরা যাহা পাইয়া থাকি তাহাই 'তে' (Te) এবং 'তে'র জন্যই আমরা যাহা তাহা হইতে পারিয়াছি। যখন এই 'তে' অথবা প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার পূর্ণ ও অবাধ বিকাশ হয় তখনই আমরা 'সুখী' হই।

এইভাবে আমাদের যে সুখের লাভ হয়, তাহা আপেক্ষিক। অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে বলিয়া ইহাকে আপেক্ষিক সুখ বলা হয়। এ কথা সত্য বটে যে নিজের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার পূর্ণ ও অবাধ সঞ্চালনে মানুষ সুখী হয়, কিন্তু নানাভাবে ইহা বাধা পাইতে পারে। যদি মানুষের সুখ এই ক্ষমতা-পরিচালনের উপর নির্ভর করে, তবে ইহাও ঠিক যে তাহার পরিচালনা অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাদ্বারা সম্ভব হয়। সুতরাঃ এই সুখ এই অবস্থাদ্বারা সীমাবদ্ধ এবং সেইজন্যই 'আপেক্ষিক'।

পরন্তু 'পরম' সুখলাভের জন্য উচ্চতর জ্ঞান ও বোধের প্রয়োজন। এই বিষয়টি 'চুঙ্‌ত্‌স্থ' (Chuang Tzu) গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত আছে। এই অধ্যায়ের শিরোনামা "বস্তুর সাম্য সম্বন্ধীয়।" প্রথম অধ্যায়ে এই মতের প্রকাশ আছে যে সুখের দুই স্তর; দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানের দুই স্তর। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার আপন ও নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোন হইতে দেখিয়া যে সকল মত গ্রহণ করে তাহা প্রথম বা নিম্নস্তর। ইহা সীমাবদ্ধ বলিয়া, এই মতগুলিও একদেশদর্শী হয়। তথাপি অনেকে জানেনা যে তাহাদের মতগুলি সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোন হইতে গৃহীত ও সেই জন্য সর্বদাই তাহাদের আপন মত সত্য এবং অন্য মত মিথ্যা বলিয়া মনে করে। এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা অনুসারে, সত্য ও মিথ্যায় প্রভেদ 'এতদ্' (এই) এবং 'তদ্' (সেই) এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা হইতে অন্য-রকমের নয়। প্রত্যেকেই স্বভাবতঃ নিজেকে 'এতদ্' মনে করে; অন্যকে 'তদ্' মনে করে।

যদি আমরা এই কথাটি বুঝিতে পারি যে সত্য ও মিথ্যায় প্রভেদ 'এতদ্' ও 'তদে'র মধ্যে যে প্রভেদ তাহা হইতে বিশেষ অন্যবিধ নয়, তবেই আমরা সকলবস্তু উচ্চতর স্তর হইতে দেখিতে পাই। ইহাকেই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "স্বর্গের আলোকে বস্তুনিচয় নিরীক্ষণ করা" বলা হইয়াছে, যাহার অর্থ,—এমন একটি দৃষ্টিকোন হইতে নিরীক্ষণ করা যাহা সকল সীমার ঊর্ধে, যাহা 'তাও'। 'চুঙ্‌ত্‌স্থ' গ্রন্থে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে কূপমণ্ডুকের দৃষ্টির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কূপের মধ্য হইতে মণ্ডুক এক ফালি আকাশমাত্র দেখিতে পায় ও মনে করে যে আকাশটা অতখানিই বড় হইবে।

'তাও'-মতের অনুসারে মতের বিভিন্নতা আপেক্ষিক,—বস্তুনিচয়ের বৈভিন্ন্যও আপেক্ষিক। যদিও সকল বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি তাহাদের সামঞ্জস্য এই যে তাহারা

সকলে মিলিয়া কিছু একটা গঠন করে ও প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয়। 'তাও' হইতে তাহাদের সমোৎপত্তি। 'তাও' মতানুসারে বস্তুসকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও একত্রীভূত হইয়া ঐক্যে পরিণত হয়।

'আমি' ও 'অন্যে'র মধ্যে যে প্রভেদ তাহাও আপেক্ষিক। 'তাও' মতে 'আমি' ও 'অন্য' সংযুক্ত এবং তাহাও একটি ঐক্য সম্পাদন করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে: "স্বর্গ, মর্ত এবং আমি একসঙ্গে সম্ভূত হইয়াছি এবং আমার সঙ্গে সংযুক্ত সকল বস্তু এক"।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই উক্তির অব্যবহিত পরেই একটি প্রশ্ন আছে: "সকল বস্তুই যদি এক হইবে, তবে বাক্যের স্থান কোথায়?" সকল বস্তু হইলে, এই ঐক্য ত মনোগম্য কিম্বা আলোচনায় ধৃত হইতে পারে না। কারণ ধারণা বা বাক্যে প্রকাশ হইবামাত্রই যে ধারণা করে বা বাক্যে প্রকাশ করে ইহা তাহার বহিঃস্থ হইয়া পড়ে। এই সর্বব্যাপী ঐক্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় যায়, তখন মোটেই সেই "এক" থাকে না। স্থতরাং ইহা জ্ঞান-লভ্য নয়। ইহা পাইতে হইলে ইহার সহিত একীভূত হইতে হয়।

এই "একে"র সহিত মিলাইয়া যাওয়াকে 'তাও' মতাবলম্বীরা বলেন "অনন্তের রাজ্যে" বাঁচিয়া থাকার অভিজ্ঞতা। যাঁহার এই অভিজ্ঞতা আসিয়াছে তিনি বস্তু-নিচয়ের সমস্ত ভেদ ভুলিয়া যান, এমন কি নিজের জীবনের মধ্যেও। তাঁহার অভিজ্ঞতায় থাকে কেবল-মাত্র এক অখণ্ড সম্পূর্ণতা,—তিনি এই সম্পূর্ণতার মধ্যে বাস করেন। তিনিই বাস্তবিক নির্ভরহীন ব্যক্তি এবং তাঁহার আনন্দ নির্গুণ।

এখানে' 'চ্বঙ্‌ত্‌স্থ' কি ভাবে 'তাও-'বাদীদের প্রাথমিক সমস্যার সমাধান করিয়া-ছিলেন তাহা আমরা দেখিতে পাই। যে ঋষি নিজের সঙ্গে একের মিলন, সাধন করিতে পারিয়াছেন, তাহার কাছে এ সমস্যা সমস্যাই নয়। 'চ্বঙ্‌ত্‌স্থ' গ্রন্থে আছে: "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্ত বস্তুর ঐক্য। যদি আমরা এই ঐক্যে পৌঁছাইতে পারি এবং এবং তাহার সহিত মিলিত হইতে পারি, তখন আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতগুলা ধূলা-ময়লা বলিয়া মনে হইবে; জীবন-মৃত্যু, আদি-অন্ত, দিন-রাত্রির পরিবর্তনের মত আমাদের অন্তরের শান্তির ব্যাঘাত করিতে পারিবে না। আর সাংসারিক লাভ-ক্ষতি, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ত নয়ই।" এই ভাবে চ্বঙ্‌ত্‌স্থ 'তাও'-বাদীদের প্রাথমিক সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়া। সমস্যা-সমাধানের ইহাই দার্শনিক রীতি। 'তাও'-মতের 'বিকাশের ইহা তৃতীয় বা শেষ কলা।

ব্যক্তির সহিত সমগ্রের মিলের উপায় উচ্চতর স্তরের জ্ঞানদ্বারা নিম্নস্তরের জ্ঞানের নিষ্কাশন। সাধারণতঃ যাহাকে জ্ঞান বলা হয়,—অর্থাৎ যাহা নিম্নস্তরের জ্ঞান,—

তাহার কার্য-বস্তু সকলের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করা। কিন্তু উচ্চতর স্তরের জ্ঞানদ্বারা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে সকল ভেদই আপেক্ষিক এবং সকল ভেদের সমাধানের শেষে এই জ্ঞানও নির্বূঢ় হইয়া যায়।

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে কন্‌ফিউসিয়ান্ বাদেরও চরম পরিণতি ব্যক্তিবিশেষের সহিত সমগ্রের মিলন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কন্‌ফিউসিয়ানদের উপায় ভিন্ন। 'তাও'-মতবাদীদের রীতি জ্ঞান-বিসর্জনের রীতি বলিয়া প্রসিদ্ধ; কন্‌ফিউসিয়ান্-মত-বাদীদের রীতি নীতি-সম্মত ক্রিয়াফল-সঞ্চয়। নীতি-সম্মত কার্যাবলীর মধ্য দিয়া মানুষের স্বার্থবোধ ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত আত্ম-পরের প্রভেদ লুপ্ত হয় এবং সমষ্টির সহিত ব্যক্তির মিলন হয়। কন্‌ফিউসিয়ান্‌বাদী যে ঐক্য সম্পাদন করে তাহা ভাবগত (emotional), 'তাও'-বাদীর ঐক্য চিন্তাগত (intellectual) সেই জন্য কন্‌ফিউ-সিয়ানবাদীরা "নিজের ভ্রাতার মত অন্য সকলকে এবং বন্ধুভাবে সকল বস্তুকে" ভালবাসিতে বলিয়াছে। কিন্তু 'তাও'-বাদীরা বলিয়াছে সংসার ত্যাগ করিতে ও সংসার হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বাঁচিতে। কন্‌ফিউসিয়ান্ ঋষিরা ছিলেন উৎসাহী-প্রাণের লোক,—'তাও'-বাদী ঋষিরা অবিচলিত শান্তির।

৪। নব্য কন্‌ফিউসিয়ান্ বাদ

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে কন্‌ফিউসিয়ান্ বাদ প্রথমে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধের উপরই বেশী জোর দিত এবং 'তাও'-মত মানুষের বিশ্ব-ব্রাহ্মণ্ডের সহিত সম্বন্ধের উপর। এই কারণে কন্‌ফিউসিয়ান্‌বাদ 'তাও'-মত অপেক্ষা কম আধিভৌতিকবাদী। পরবর্তী এগারো ও বারো শতাব্দীর কন্‌ফিউসিয়ান্-বাদীরা, যাহাদের নব্য কন্‌ফিউসিয়ান্-বাদী বলা হয়, এক পক্ষে বৌদ্ধমত ও অন্য পক্ষে 'তাও'-মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া মৌলিক কন্‌ফিউসিয়ানবাদের পরিবর্ধন করিয়া মৌলিক 'তাও'-মত হইতেও অধিক আধি-ভৌতিক দর্শন-পদ্ধতি তাহাতে যুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

নব্য কন্‌ফিউসিয়ানবাদীদের মধ্যে দুইটি প্রধান সম্প্রদায় আছে। এই দুইটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক দুই ভ্রাতা। তাঁহারা 'চেঙ্ শিক্ষক' নামে জ্ঞাত। কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'চেঙ্ যি' (Ch'engi Yi—খৃষ্টাব্দ ১০৩২-১১০৮) যে সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন তাহার পূর্ণগঠন হয় 'চু ত্সি' (Chu Hsi—১১৩০-১২০০) দ্বারা। ইহা 'চেঙ্ চু' সম্প্রদায় (Ch'eng Chu School) বা 'লি স্বেহ' (Li Hsueh) সম্প্রদায় (অর্থাৎ নিয়ম-নীতি সম্প্রদায়—

School of Laws and Principles) নামে খ্যাত। জ্যেষ্ঠ 'ভ্রাতা 'চেঙ্‌ হাও' (Ch'eng Hao) অন্য একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন যাহা 'লু চিউ-য়্‌ান' (Lu Chiu-Yuan—১১৩৯—১১৯৩) চালাইয়াছিলেন ও এবং 'যঙ্‌ স্থ-জেন, (Wang Shou-Jen), যিনি 'বঙ্‌ যঙ্‌-মিঙ' (Wang Yang-ming—১৪৭৩-১৫২৯) নামে বেশী পরিচিত ছিলেন, সম্পূর্ণ করেন। ইহার নাম 'লু-বঙ্‌' (Lu wang) অথবা 'তসিন্‌ খেহ' (Hsin Hsueh—অর্থাৎ School of Mind) সম্প্রদায়। পূর্বোক্ত দুই 'চেঙ্‌ শিক্ষকের' কালে এই দুই সম্প্রদায়ের পার্থক্য পুরাপুরি পরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু 'চুত্‌সি, ও 'লু চিউ-য়্‌ান' যে গুরুতর মত-বিরোধ আরম্ভ করেন তাহা আজ পর্যন্ত চলিয়াছে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান বিতর্কিত বিষয়টি মূলে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বটে। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে এই বিষয় ছিল যে প্রকৃতির নিয়মগুলির নিয়ন্তৃত্ব মানুষের মনে কি বিশ্ব-মনে (Legislated by the mind or Mind)। ইহার প্লেটোর বাস্তব-বাদ (Platonic Realism) এবং কান্টের অতি-বস্তু-বাদ (Kantian Idealism) এর মধ্যে বিরোধের বিষয় এবং বলা যাইতে পারে যে ইহা আধিভৌতিক·দর্শনের (Metaphysics) প্রধান সমস্যা। ইহার সমাধান হইলে, বিরোধের অধিক স্থান থাকে না।

এই অধ্যায়ের প্রথমে আমি কন্‌ফিউসিয়ান্‌ বাদে 'সংজ্ঞা-বিশুদ্ধি'র কথা কিছু বলিয়াছি। ইহার তাৎপর্য এই যে প্রত্যেক সংজ্ঞায় কতগুলি গুণের ধারণা থাকে যাহাতে সেই সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট কোনও বস্তুর শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের সারমর্ম পাওয়া যায়। যদি এই ধারণাটির আধিভৌতিক ইঙ্গিতগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ইহা প্লেটোর 'অতি-বস্তু-বাদ' হইয়া পড়ে। 'চেঙ্‌ যি' ও 'চু ত্‌সি' তাহাদের মতবাদের এইভাবের ব্যাখ্যাই দিয়াছিলেন।

যাহাকে প্লেটো 'আইডিয়া' (Idea) বা 'অতি-বাস্তব সত্য' বলিয়াছেন বা আরিস্‌-টোট্‌ল 'আকৃতি' (Form) বলিয়াছেন, তাহাকে 'চেঙ্‌ যি' ও 'চু ত্‌সি' বলিয়াছেন 'মৌলিক তথ্য' (Principle)। তাহাদের চিন্তাধারায়, যেরূপ প্লেটোর ও আরিস্‌-টোট্‌লের দর্শনে জগতের যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব (যদি তাহাদের প্রকৃতই অস্তিত্ব থাকে) কতগুলি পদার্থের মাধ্যমে কোনও 'মৌলিক তথ্যে'র (Principle) আত্ম-প্রকাশে। যদি কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহার অনুযায়ী কোনও একটি মৌলিক সত্তাও থাকিবে। ইহাকে তাহারা 'লি' (Li) বলিয়াছেন যাহা অনুবাদে 'নিয়ম' (Law) ও বলা চলে।

'চেঙ্‌ যি' ও 'চু ত্‌সি'র মতে এই মৌলিক সত্তাগুলি (Principle) চিরন্তন ও মানুষের অন্তর্চৈতন্য-নিরপেক্ষ। কিন্তু 'লু চিউয়্‌ান' ও 'যঙ্‌ স্থ-জেনে'র মতে মানুষের

মনই এই 'লি'। মানুষের মন বিশ্ব-মনেরই অভিব্যক্তি এবং এই বিশ্বমনই প্রকৃতির সকল নিয়মের নিয়ন্ত্রা।

'বঙ্‌, যঙ্‌-মিঙে'র মতে 'ব্যক্তির মন' বিশ্বমনের ব্যক্ত-প্রকাশ এবং এই 'ব্যক্তির মনে'র প্রকাশ হয় ব্যক্তির স্বতঃ-আগত জ্ঞানে (Intuitive Knowledge)। 'বঙ্‌, যঙ্‌-মিঙে'র কথা এই যে এই স্বতঃ-আগত জ্ঞান প্রত্যেকের অন্তঃস্থ ক্ষমতা। ইহা নিশ্চয় ও প্রত্যক্ষভাবে সৎ-অসৎ জানিতে পারে। ইহার কারণ এই যে সকল নিয়ম যাহার মধ্যে সুনীতির নিয়মগুলিও অন্তর্ভুক্ত, মনের নিয়ন্ত্রণ মাত্র। যদি কেহ এই স্বতঃ-আগত জ্ঞানের নির্দেশে কার্য করে, সে স্বভাবতই তাহার আচরণে সকল লোক, এমন কি সকল বস্তুকেই ভালবাসিবে। ইহার হেতু এই যে সকল লোকের মনেই একটি মূলগত অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। স্বার্থপর হইলে মানুষ সেই ঐক্য হারাইয়া ফেলে, নিঃস্বার্থ হইলে তাহার পুনঃ-প্রাপ্তি হয়।

যদিও আধিভৌতিক মত-বাদে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বহুল, এই উভয় সম্প্রদায়ই সামাজিক কর্তব্যগুলি অবশ্য পালনীয়, কন্‌ফিউসিয়াসের এই কথার উপর জোর দিয়া থাকে। মেন্‌সিয়াস্‌ অপেক্ষাও তাহারা জোরের সহিত এই মত প্রকাশ করে যে মানুষ মনস্তত্ত্ব বা নীতি সম্যক্‌ অবধারণ না করিয়াও কেবল তাহার সামাজিক কর্তব্যগুলি পালন করিয়া যায় সে বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর মূল্যবান কিছু অর্জন করে। নব্য-কন্‌ফিউসিয়ান্‌-বাদীদের মতে সেই আদর্শ মানব এবং ঋষিবাচ্য। সে কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটায় না এবং তাহা ঘটাইবার জন্য তাহার কোনও চেষ্টারও প্রয়োজন নাই। যাহা সাধারণ লোকে করিয়া থাকে, তাহার বেশী কিছুর চেষ্টা তাহার নাই, কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারে তাহার উন্নততর বোধ থাকায়, তাহার কার্যগুলি তাহার কাছে ঐ বিশ্বমনের ও মূল-তথ্যের দ্যোতক হয় এবং সেই জন্য তাহার তাৎপর্য ব্যক্তিক নয়, জাগতিক। তাহার মধ্যে ও সাধারণ লোকের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা ক্রিয়াকলাপে নয়, কিন্তু এই অর্থে যে সে যাহা যাহা কিছু করে করে তাহা জ্ঞানের আলোকে করিয়া থাকে, অন্য সকলের মত অজ্ঞানান্ধ-কারে নয়। তাহার কার্যের মূল কেবলমাত্র নৈতিক সদ্দৃষ্টান্তে নয়, তাহা নীতিবাদের ঊর্ধ্বে। আমরা ভাষান্তরে বলিতে পারি যে তাহার উন্নততর ব্রহ্মাণ্ড-জ্ঞানে তাহার কার্যাবলীর তাৎপর্য সকল নীতিবাদ ছাড়াইয়া যায়।

এই মতবাদে আমরা পাই চীনা দর্শনের সারমর্মের প্রকাশ। তাহার অনাবৃত রহস্য এই। চীনা দর্শন জীবনকে প্রকৃতির একটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহাকে পার-মার্থিক তাৎপর্যে উন্নীত করিবার চেষ্টা করে—এইভাবে যে প্রাত্যহিক জীবনের মূল্য ও তাৎপর্য এই রূপ হইবে যে জীবন শ্রেষ্ঠ-অর্থে যাপন-যোগ্য হয়। নব্য কন্‌ফিউসিয়ানুবাদ

বহুলাংশে ইহা করিয়াছিল। নব্য-কন্‌ফিউসিয়ান্ বাদ বারো শতাব্দী হইতে চীন-সমাজে যে সর্বপ্রধান দার্শনিক সম্প্রদায় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা অকারণ নয়। এই প্রাধান্ত গত শতাব্দীর শেষদিকে যখন পাশ্চাত্য চিন্তাস্রোত চীনদেশে আসিতে থাকে সেই পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তখন আবার নূতন অবস্থার গতিকে নূতনতর দার্শনিক চিন্তার প্রয়োজন হয়।

চীনদেশে এখন একটা সশস্ত্র বিপ্লব চলিতেছে। কিন্তু যে কোন বিপ্লবই শেষ পর্যন্ত প্রাচীনের ক্রমানুসারীই হইয়া থাকে। নব্যের মধ্যে প্রাচীনের শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু তাহা সংরক্ষিত হয়। চীনদেশের দর্শনে ও সমাজে ইহাই ঘটিবে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চীনদেশের চিন্তাধারায় ভারতবর্ষের প্রভাব

ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের প্রথম যোগাযোগের কথা বলিতে হইলে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সেই সময় সম্ভবতঃ পূর্বতুর্কীস্থানের যাযাবরদের মাধ্যমে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক ও বিশ্বতত্ত্বের ধারণা চীনদেশে প্রবেশ করিতেছিল। এই সময়েই তাও-সম্প্রদায়ের (Tao-ist) বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান প্রিন্স লিউ-য়ান (Lin-ngan) (Huai Non-tsou) প্রথম এক বিশ্বতত্ত্ববাদের প্রবর্তন করেন। এই মত অনুসারে এই বিশ্ব একটি পর্বতকে কেন্দ্র করিয়া নয়টি অংশ বিভক্ত হইয়া অবস্থিত। এই পর্বতের উপরেই দেবলোক। এই মতবাদ ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধসাহিত্যে বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

খৃষ্টপূর্ব 'প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে এই রকম একটি যাযাবর শ্রেণীর নিকট হইতে চীন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যেই তৎকালীন চীনরাজ্য এই ধর্মটিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দান করিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগের পর হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ চীনদেশে আসিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদের কর্মতৎপরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হানরাজত্বকালে (খৃষ্টাব্দ ৬৫-২২০) একদল বিদ্যার্থী চীনে আসিয়াছিলেন, চীনা পণ্ডিতগণের সহিত একসঙ্গে থাকিয়া কাজ করিয়াছিলেন এবং চীনভাষায় বহুসংখ্যক গ্রন্থের অনুবাদও করিয়াছিলেন ; তথাপি বৌদ্ধধর্মকে দেশীয় ভাবধারার সহিত ঘোরতর সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কনফ্যুসিয়াসের মতবাদ ঐ সময় রাজবংশপরম্পরায় চীনের রাজসভায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল এবং চীনের অভিজাত সাম্প্রদায়ের উপরেও উহা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেইজন্য কন্‌ফ্যুসিয়াস্ মতাবলম্বীগণ বৌদ্ধধর্মকে অসভ্য-বর্বরের ধর্ম বলিয়াই মনে করিতেন। গ্রীকদের ন্যায় চীনদেশের অধিবাসীরাও যে কোন বিদেশীকে অসভ্য-বর্বর ভাবিত। ভারতবর্ষের লোকদের প্রতিও তাহাদের সেইরূপ ধারণাই ছিল। হান-রাজত্বকালে (Han period) কন্‌ফ্যুসিয়াসের মতবাদকে একটি ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করার প্রচেষ্টাও হইয়াছিল ; কিন্তু ধর্ম হিসাবে উহা বৌদ্ধধর্মের ন্যায় সম্যক পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। ধর্ম হিসাবে তাও-মতবাদের (Tao-ism) সমধিক প্রতিষ্ঠা থাকিলেও বৌদ্ধধর্মের তুলনায় উহার দার্শনিক ভিত্তি অতি সামান্যই ছিল।

ইহার ফলে বৌদ্ধধর্ম তৎকালীন প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও আত্মবিস্তারের সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম কনফ্যুসিয়াসের মত অপেক্ষা অনেকাংশে সমৃদ্ধ ছিল এবং ইহার দর্শনও ছিল তাও-বাদ অপেক্ষা গভীর ও তত্ত্বসমৃদ্ধ। সেইজন্য অল্পদিনের মধ্যে উহা চীনাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। চীনাপণ্ডিতেরা নিজেরাই বৌদ্ধধর্মের পক্ষে প্রচার কার্য আরম্ভ করিলেন। হানরাজত্বের শেষভাগে (খৃষ্টাব্দ ১৭০-২২৫) বিখ্যাত পণ্ডিত মাও-ৎজু বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কনফ্যুসিয়স্ ও লাও-ৎজুর উপদেশের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া গ্রন্থরচনা করেন এবং উহাতে বৌদ্ধধর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস পান। তিনি বলিলেন, "এই পঞ্চ-পুরাণ গ্রন্থ (classics) হইল পঞ্চ রস (আস্বাদন) আর বুদ্ধের মত (ধর্ম) হইল পঞ্চশস্য (ভোজ্যসামগ্রী)। এই ধর্মমত গ্রহণ করা অবধি আমি ঘনমেঘের পাশে উজ্জ্বল সৌরতেজ লক্ষ্য করিয়াছি। আমার অন্ধকারময় যাত্রাপথে ইহা যেন উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। সংসার নির্বাহকরা, জাগতিক বিষয়ে নিজেকে ঘনিষ্ঠ করিয়া লওয়া, অবস্থা-অনুসারে নিজের সুখ সুবিধা আদায় করা এবং আপাতরম্য বিষয়ে আসক্ত হওয়াই সাধারণ শিক্ষিত মানুষের জীবনের লক্ষ্য, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীমাত্রই এইগুলি বর্জন করিয়া থাকেন। সাধুসন্ন্যাসীরা পূর্ণ-নির্বৃতির (বৌদ্ধমতে) পথে যাত্রা করেন। সে পথ আকাশের মতই রহস্যময়, সমুদ্রের মতই অতল।"

মাও-ৎজু-প্রমুখ পণ্ডিতদের রচনা ক্রমেই শিক্ষিত চীনাদের মনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। ইহা ছাড়া, যে-সকল ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিত চীনে গিয়াছিলেন তাঁহাদের নিজেদের এবং তাঁহাদের শিষ্যদের পবিত্র জীবনযাত্রা এই নুতন ধর্মের প্রতি চীনাদের আরও অধিকমাত্রায় অনুরাগী করিয়া তোলে। সেই সময় চীনে যে সব বিদেশী রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতাও এই নুতন ধর্মের বিস্তারে অনেকখানি সাহায্য করে। চতুর্থ শতাব্দীতে ওয়েই (Wei) রাজবংশ চীনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল এই রাজবংশ ছিল বিদেশীয়। এই বংশের রাজারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের সময়েই চীনে বৌদ্ধশিল্পকলার যাবতীয় উৎকর্ষের সুত্রপাত হয়। এই বংশের প্রথম সম্রাট বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্ম বলিয়া (State Religion) গ্রহণ করেন। তিনি ৩৩৫ খৃষ্টাব্দে সর্বধর্মে সমদৃষ্টি সম্পন্ন যে অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ :—

"বুদ্ধ চীনাদের উপাস্য নন, তিনি বিদেশীদের দেবতা। চীনের সম্রাট বা তাঁহার প্রজাবর্গ বুদ্ধের উপাসনা না করিলেও করিতে পারেন। আমি চীনের অধিপতি হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি কিন্তু আমি সীমান্তের অধিবাসী ; কাজেই আমার লোকেদের মধ্যে

প্রচলিত রীতিনীতি মানিয়া চলা আমার ধর্মানুসারী কর্তব্য। বুদ্ধ বিদেশীদের দেবতা বলিয়াই আমার পক্ষে তাঁহার পূজা করা সমীচীন; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সেই প্রাচীন রাজবংশের রীতিনীতি, বর্তমানেও মানিয়া চলিতে হইতেছে। আমার প্রজাবর্গকে লোকে বর্বর বলিয়া থাকে। আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধের উপাসনা করিবার অধিকার দান করিতেছি এবং তাঁহারা যদি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে অভিলাষী হন তাহা হইলে ঐ ধর্ম গ্রহণেরও সুযোগ এই সঙ্গেই দেওয়া হইতেছে। যদি কোন কিছু এমন থাকে যাহা নির্দোষ ও সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তবে কেন সেই পুরাতন রীতিনীতিকেই আশ্রয় করিয়া আমাদের চলিতে হইবে?''

সেই সময় হইতে প্রায় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ভারত হইতে আগত ভারতীয় পণ্ডিতগণ পরম্পরাক্রমে এই ধারা বহন করিয়া চলিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে চীনা-ভিক্ষুরা নিজেরাই ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় গভীরভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। চীনা পণ্ডিতেরা ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় ভারতের সুবিশাল বৌদ্ধ-সাহিত্যের মূল শাস্ত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের মধ্য দিয়াই চীনারা বৌদ্ধধর্মের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিলেন। এমন কি, ঐ অনুদিত গ্রন্থগুলির কতকগুলির সাহিত্যিক মূল্য এতই অধিক যে সেইগুলি চীনা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (Classics) বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

চীনদেশের ভাবধারা ও জীবন-যাত্রার উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অপরিসীম। চীনের বিখ্যাত মনীষী ডঃ হুঃ শি, (Hu Shih),—যিনি চীনের চিন্তাজগতে এক নূতন অভ্যুদয়ের সূচনা করিয়াছিলেন—তিনি বলেন, 'চীনকে যখন ভারতের মুখামুখী দাঁড়াইতে হইল। তখন ভারতীয়দের ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও প্রতিভার বিপুল সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চীন অভিভূত, চমৎকৃত ও হতবাক্ হইয়া গেল। চীন নতিস্বীকার করিল এবং সম্পূর্ণরূপে ভারতের অনুগত হইল।

চীনা চিন্তাধারার উপর ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাবের প্রথম যুগে এই দুই চিন্তাধারার এক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা লক্ষিত হইয়াছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত কুমারজীবের শিষ্য সেঙ্গ চাও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন। তিনিই ছিলেন এই ধারার

পথিকৃৎ। পণ্ডিত কুমারজীবের প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি পূর্ব-তুর্কীস্থানে জন্ম-গ্রহণ করেন, কাশ্মীরে শিক্ষালাভ করেন এবং ৪০১ খৃষ্টাব্দে চীনে আগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল (৪১৩ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত তিনি চীনেই কর্মব্যাপৃত থাকেন এবং চীনা ভাষায় বহু গ্রন্থের অনুবাদ করেন। সেই গ্রন্থগুলির অধিকাংশ চীনা-সাহিত্যের শাশ্বত সম্পদরূপে সমাদৃত। পণ্ডিত কুমারজীবের যেমন ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তেমনি ছিল বৌদ্ধদর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি—বিশেষতঃ নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শনে। এই শাস্ত্র তিনিই চীনদেশে সর্বপ্রথম প্রচার করেন। নাগার্জুনের মত ও লাও-ৎজুর দর্শনের ভিতর বহু বিষয়ের সাদৃশ্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। কাজেই তিনি নাগার্জুনের মতকে তাও-বাদের ভাষায় ব্যাখ্যা করার বিরোধী ছিলেন না অনেকের ধারণা এই যে তিনি তাও-তে-চিঙ-এর (Tao-te-king) টীকা রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই টীকা এখন আর পাওয়া যায় না। ইহা সম্ভবতঃ বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি হইতে তাও-বাদের ব্যাখ্যা। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে বহু যশস্বী চীনা পণ্ডিত ছিলেন। সেঙ্গ চাও তাঁহাদেরই একজন। সম্ভবতঃ তাঁহার গুরুর আদেশে নাগার্জুনের (মাধ্যমিক) দর্শনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ তাও-বাদের সহিত ঐ দর্শনের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা সর্বপ্রথম তিনিই করেন।

বৌদ্ধ-মতে ভূত-তথতা ও উৎপাদ-নিরোধ, শাশ্বত ক্ষণিক, নির্বাণ ও সংসারের মধ্যে বিরোধের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাও-বাদে ও ভূত-অভূত, নিত্য-অনিত্য, সদ্-অসদের (Yu-Wei : Wu-Wei) ভিতর ঠিক একই ধরণের বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। নিত্য ও অনিত্যের প্রসঙ্গে সেঙ্গ-চাও বলেন, "অনিত্যের সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের ধারণা এই যে, যে-বস্তু গত হইয়াছে বর্তমানে তাহা অ-সৎ। ফলে তাঁহারা বলেন, অনিত্যই আছে, নিত্য নাই। এই যে অতীত বস্তু বর্তমানে অবিদ্যমান, আমার মতে ইহাই নিত্য। সুতরাং আমি বলি, নিত্য আছে অনিত্য নাই। আবার এই যে অনিত্য আছে এবং নিত্য নাই, তাহার কারণ অতীত বস্তু বর্তমানে অবিদ্যমান। আবার এই যে নিত্য আছে, অনিত্য নাই, তাহার কারণ অতীত বস্তু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না।" 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো'তে জ্বলন্ত দীপশিখার উপমাটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রদীপটি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু প্রথম প্রহরের প্রদীপটি মধ্যম প্রহর বা শেষ প্রহরের প্রদীপের সঙ্গে এক নয়। এক পক্ষে মনে হইবে যে ইহা একই প্রদীপ, কিন্তু অন্যভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইহা একই প্রদীপ নয়; প্রতিমুহূর্তে প্রদীপ পরিবর্তিত হইতেছে। অস্তিত্বের প্রসঙ্গে সেঙ্গ-চাও বলেন, "প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে এমন কিছু আছে, যাহার জন্য উহা এক বিশেষ রূপ ধারণ করে না, এবং এমন কিছু আছে যাহার জন্য উহা একেবারে অসৎ হইতে পারে না। প্রথম কারণ বশতঃ যদিও উহা বিশেষ কিছু বলিয়া মনে হয়, তবু

বাস্তবে তাহা অসৎ (non-existent)। দ্বিতীয় কারণ বশতঃ তাহা অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান। সেঙ্গ-চাও যে দুইটি (লাও-ৎজু ও নাগার্জুন) মতের সমন্বয় সাধন করিলেন তাহার মূল ভিত্তি হইল তাহার কার্যকারণ বাদ (প্রতীত্য সমুৎপাদ)। জগতের সমস্ত কিছুই কোন-না-কোন কারণ হইতে উৎপন্ন। কোন কার্য নূতন বলিয়া মনে হইলেও আসলে তাহা যে কোন-না-কোন বিশেষ কারণের পরিণাম নয়, এরূপ মনে করা চলে না।

সেঙ্গ-চাও অন্য একটি বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে বিষয়টি হইল প্রজ্ঞা—পূর্ণজ্ঞান। জ্ঞানের অবশ্যই কোন বিষয় থাকে এবং সেই বিষয়ের বিশেষ ধর্মও থাকে। উহা নির্গুণ নয়, সুতরাং উহা পারমার্থিক (পরিনিষ্পন্ন) সত্য নহে। যদি তাহাই হয়, তবে প্রজ্ঞা দ্বারা কি ভাবে পরম সত্য লাভ হইবে? সেঙ্গ-চাও বলেন, 'সাধারণ অর্থে আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি ইহা তাহা নহে।' তিনি একটি দর্পণের সহিত ইহার তুলনা করিয়া বলেন, "দর্পণটি স্বচ্ছ বলিয়াই ইহাতে (বিশ্ব) প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়াই ইহা স্বচ্ছ (আবরণহীন—অর্থাৎ দর্পণের উপরে যে বিম্ব পড়ে তদ্বারা দর্পণের কোন বিকার জন্মে না)।" সুতরাং তাঁহার দৃষ্টিতে এবং বিবিধ জ্ঞানের ভিতর "পরমের পরিপূর্ণ সীমা মিলে; কিন্তু ইহা তখনও জ্ঞান পদবাচ্য নহে।" ইহার অর্থ এই নয় যে, পারমার্থিক সত্য আপেক্ষিকতার সীমার বাহিরে। "যদিও ইহা বস্তু-জগতের বহির্ভূত, তথাপি ইহা বস্তু-বিচ্ছিন্ন নহে। যদিও আত্মা দুরতিক্রম্য তথাপি ইহা সর্বদা বিশ্বের মধ্যে বর্তমান।"··· সুতরাং জ্ঞানী-পুরুষের নির্গুণের উপলব্ধি হইলেও তিনি বিষয়-ব্যবহারের শক্তি হারান না; পরন্তু কোন সময়েই নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি বস্তু-জগৎ হইতে সরিয়া থাকেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে যদিও তিনি পরিবর্তনশীল তথাপি তিনি নির্গুণ। তিনি ব্যবহারিক ও পরিবর্তনশীল জগতে বাস করিয়াও সেই নির্গুণ লোকেরই (Wn-Wei—অসদ্ লোক) অধিবাসী।

সাংস্কৃতিক ও পারমার্থিক তত্ত্বের এই ধরণের সমন্বয় আসলে নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন হইতে গৃহীত। কিন্তু তাও-বাদের ভাষাতেও একই ধরণের প্রয়োগ থাকার ফলে ইহা চীনাদের নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি বলিয়া প্রচলিত। চীনের মনীষীগণকে ইহা আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহারা সেঙ্গ-চাওকে বৌদ্ধ-মনীষী অপেক্ষা চীনা-দার্শনিক হিসাবে অধিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। সেঙ্গ-চাও চীনা-দর্শনের সহিত বৌদ্ধধর্মকে সংমিশ্রিত (সমন্বয়-সাধন) করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পরবর্তীকালে তিনি চীনের চিন্তা-জগতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্মকে বর্জন করা আর সম্ভবপর হইল না। ইহা রহিয়াই গেল। ইহা তখন চীনের নিজস্ব হইল।

তত্ত্ব-বিজ্ঞানের সুগভীর অনুধ্যানে চীনারা বড়ই বীতস্পৃহ হইয়া উঠিতেছিল। বৌদ্ধ-মতবাদ তথা বৌদ্ধদর্শন হইতে সাধারণের উপযোগী সহজবোধ্য নূতন নূতন গ্রন্থ-রচনা করার জন্য পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বহুবিধ চেষ্টা চলিয়াছিল। তাহারা অধিকতর সহজ ও সংক্ষিপ্ত ধরণের কোন কিছু অনুসন্ধান করিতেছিল। একদিকে যেমন প্রাচীন বৌদ্ধ-সংস্কার অনুসারে শিক্ষাপ্রাপ্ত চীনা-ভিক্ষুরা বিনয় পিটকের অনুশাসন মত কঠোর-ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন। তেমনি অনেকে আবার একটা সহজ-পন্থা আবিষ্কারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

৩

সেঙ্গ-চাওর সমসাময়িক পণ্ডিত হুই-ইউয়ান (Hui Yuan) অবশ্য কুমারজীবের শিষ্য ছিলেন না, তবুও তিনি কুমারজীবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। সেঙ্গ-চাওর মতো তিনিও কন্‌ফ্যুসিয়স ও তাও-এর দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাও-দর্শনের ছাত্র-রূপে তিনি বৌদ্ধতত্ত্বের ধ্যান-ধারণার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চার নিমিত্ত লু-শন (Lu-Shan) নামক স্থানে তিনি একটি নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিলেন এবং কতিপয় এক মতাবলম্বী অনুচর সংগ্রহ করিলেন। ধীরে ধীরে উহা এক নূতন সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হইল। ঐ শাখার নাম লু-শনের বৌদ্ধ-সম্প্রদায়। উহা শুদ্ধলোক-সম্প্রদায় (Pure Land School) বলিয়া পরিচিত। এই সম্প্রদায় চীনদেশে অমিতাভের উপাসনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহা এক নূতন ধরণের ঈশ্বরবাদ। ইহাতে অমিতাভই দেবতারূপে পূজ্য। অমিতাভ-স্বর্গ-প্রাপ্তিই ইহার সাধনার মূল কথা—সেখানে আছে অমিত জ্যোতি। অনন্ত আয়ু ও অফুরান আনন্দ। শ্রদ্ধা ও ধ্যান দ্বারাই সেই প্রার্থিত লোকের সন্ধান মিলে। হুই-য়ুয়ান (Hui-Yuan) স্বয়ং এই ধ্যানের উপর জোর দিয়া বলেন, "বৌদ্ধ-জীবনের তিনটি স্তরের (যেমন ঃ শীল, ধ্যান ও প্রজ্ঞা) মধ্যে ধ্যান এবং প্রজ্ঞাই হইল মূলতঃ প্রয়োজনীয়। প্রজ্ঞা ব্যতীত ধ্যান পরম নির্বিকল্প অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। ধ্যান ব্যতীত জ্ঞান গভীর প্রজ্ঞায় পরিণত হয় না।···আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে চাই যে প্রাচ্যদেশে এই সুমহান ধর্মের প্রবর্তনের পরেও অতি অল্পই ধ্যানের অনুশীলন করা হইতেছে। ফলে ইহা এখন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।—কারণ ইহাতে ধ্যান-মার্গের সুদৃঢ়ভিত্তি নাই।"

তাও-শেঙ্গ (Tao-Sheng) ছিলেন হুই য়ুয়ান ও কুমারজীবের শিষ্য। তিনি ধ্যানমার্গের ভিত্তিতে 'এক দর্শন' প্রবর্তন করেন। ইহা হইতেই পরে বিখ্যাত ধ্যান-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। উহা চীনের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার উপর প্রভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সম্প্রদায় চীনদেশে ছান (ch'an) এবং জাপানে জেন (zen) নামে পরিচিত। এই শব্দটি ভারতীয় "ধ্যান" শব্দেরই (প্রাকৃত—ঝান) প্রতিশব্দ। পরম সত্যের অনুভূতির জন্য অন্যান্য রহস্যবাদীদের ন্যায় তাও-সেঙ্গও শাস্ত্রের উপর বিশেষ নির্ভর করিতেন না। ধর্মশাস্ত্রের ভিতর দিয়া সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না। ঐগুলি সিদ্ধির উপায়মাত্র। তিনি বলেন, "মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই প্রতীকের প্রয়োজন। যখন অন্তরে এই ভাবের উদ্ভব হয় তখন প্রতীক নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মনের ভাব প্রকাশের জন্যই ভাষা। ভাব যেখানে অন্তর্মুখী, ভাষা সেখানে মৌন। প্রাচ্যদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচারের পর হইতেই অনুবাদকারী পণ্ডিতেরা বহুবাধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; ফলে জনসাধারণ তাঁহাদের অনুদিত গ্রন্থগুলির ভাষাই অবিকল গলাধঃকরণ করিয়াছে। অতি মুষ্টিমেয় লোকই তাহার সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। মাছ একবার যে ধরিতে পারে, সে-কি আর জাল খুঁজিয়া মরে? সত্যকে সে-ই জানতে পায়।"

তাও-শেঙ্গ যে দুইটি মত প্রচার করেন সেই দুইটিই চীনা পণ্ডিতদের মতে বৈপ্লবিক ভাবধারা তথা বিদেশীর ধর্মের বিরুদ্ধে চীনাদের একটা বিদ্রোহ। উহা বিদ্রোহ হউক বা যাহাই হউক, ঐ দুইটি মত চীনা ভাবধারাকে এক নূতন বিবর্তনের পথে ঠেলিয়া দিয়াছিল। এই মতগুলি এমন কিছু নূতন নয়, অনুসন্ধান করিলে বৌদ্ধশাস্ত্রেও অনুরূপ নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা মূলতঃ চীনদেশীয়। তাও-শেঙ্গের দুইটি সত্য হইল ১—নিষ্কাম সৎকর্ম, ২—সহসা-জাত সম্বোধি। "সৎকর্ম স্বভাবতঃই নিষ্কাম" তাও-শেঙ্গের এই উক্তি আপেক্ষিকভাবে না বুঝিয়া পারমার্থিকভাবেই বুঝিতে হইবে। তাঁহার এই উক্তি মুক্ত-পুরুষদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। মুক্তপুরুষ এই জগতে থাকিয়াও এই জগতের উর্ধে। প্রতিদান ও প্রতিশোধ কেবল আপেক্ষিক দৃষ্টিতেই সত্য। কিন্তু যিনি উৎপাদন-নিরোধ-প্রাপ্ত অর্থাৎ কার্য-কারণ-নিয়মের মধ্য দিয়া চলেন তাঁহার নিকট ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। এই মতটি বৌদ্ধ জীবন-যাত্রা পদ্ধতির পরিপূরক মাত্র। সম্বোধির অর্থ এই নয় যে ইহা পর্যায়ক্রমে লাভ করা যায়; ইহা সহসা প্রতিভাত হয়। বৌদ্ধধর্মের পক্ষে এই মত নূতন নয়। ইহার গঠনমূলক স্তরে নৈতিক (শীল) আবরণ, শুদ্ধ আধ্যাত্মিক জীবন ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়ে না। সম্বোধি যখন আসে তখন ইহা আকস্মিকভাবেই আসে। পরবর্ত্তীকালে এই মত কোন কোন ক্ষেত্রে চীনের জীবন-দর্শনকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয়না যে ভারতীয়

ভাবধারার বিরোধী কোন বিপ্লবে তাও-শেঙ্গ ইন্ধন যুগাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গী বৌদ্ধগণের মনে পাছে পরম ও আপেক্ষিক সত্য-সম্বন্ধে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য তৎকালীন আধ্যাত্মিক জীবনের কোন কোন বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।

তাও-শেঙ্গের মতবাদে তৎকালীন বৌদ্ধপণ্ডিতেরা উত্তেজিত হইলেও তাও-শেঙ্গ-মতাবলম্বীরা ঐ সময়ে নিজেদের কোন দল গঠন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধ-ধ্যান-সম্প্রদায়ের ন্যায় এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে ভারতের এক রহস্যবাদীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু পৌরাণিক গল্প রচিত হইয়াছিল। তবু তিনি আসলে ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার নাম বোধিধর্ম। তিনি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনে আসেন। খৃষ্টাব্দ ৪৮৬ হইতে ৫৩৬ পর্যন্ত তিনি চীনেই অবস্থান করেন। ৫৩৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত তখনকার কোন এক বিবরণ হইতে জানা যায় যে ইয়ং-নিঙ্গ-শে'র (Young-Ning-She) লো-ইয়াংস্থিত (Lo-Yang) নব-নির্মিত মন্দিরে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

বোধিধর্মের উপদেশে চীন তাহার পুরাতন রীতিনীতি বর্জন করিল। বোধিলাভের জন্য ধর্মানুশীলনের উপায় হিসাবে ধ্যান-চর্যার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করিলেন। যে তত্ত্ব বোধিধর্ম প্রচার করিলেন তাহা নাগার্জুনের মতবাদেরই এক নূতন ভাষ্য। ইহাকে কতকটা বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে প্রত্যেকের মধ্যেই বুদ্ধ-স্বভাব বিরাজিত, প্রকৃত বোধি বুদ্ধ-স্বভাবেরই জাগৃতি। তিনি বুদ্ধবচন (সূত্র ও আগমাদি শাস্ত্র) অধ্যয়নের ও সংঘের (বিনয়পিটক-লিখিত) আচার অনুষ্ঠানের এবং ধর্মের বহিরাচরণের জন্য অত্যধিক মনোনিবেশের বরং নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বুদ্ধ-স্বভাব-অনুভূতির পক্ষে ঐগুলি নিরর্থক। ধ্যান অন্তর্মুখী দৃষ্টি, ইহা বহির্মুখীনতা নয়। একমাত্র ঐ ধ্যান বোধিলাভের সহায়। তিনি বলেন, "প্রত্যেক মানুষের হৃদয় সকল মানুষের হৃদয়ের সহিত সর্বকালে সকল স্থানে যোগযুক্ত ছিল এবং এখনও আছে। এই হৃদয়ই হইল বুদ্ধ। ইহার বাহিরে অন্য কোথাও বুদ্ধ নাই। সম্বোধি এবং নির্বাণ দুই-ই হৃদয়ের বস্তু। যেখানে হৃদয় নাই সেখানে সব কিছুই কাল্পনিক। হৃদয়ের বাহিরে কিছু অন্বেষণ করা কেবল মিথ্যা বা শূন্যতাকে ধরিবার প্রয়াস মাত্র। হৃদয়ই বুদ্ধ এবং বুদ্ধই হৃদয়। হৃদয়ের বাহিরে বুদ্ধের কল্পনার নাম উন্মত্ততা। সুতরাং দৃষ্টিকে বহির্মুখী না করিয়া অন্তর্মুখী করাই আবশ্যক। আত্মসমাহিত হওয়া এবং নিজের অন্তরে বুদ্ধস্বভাবের অনুধ্যান করা প্রয়োজন।"

বোধিধর্মের দর্শন একই ভাবধারায় আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। যখন

প্রত্যেকেরই এই বুদ্ধ-স্বভাব রহিয়াছে এবং হৃদয়ের বাহিরে কোন বুদ্ধই নাই তখন 'কে রক্ষা করিবে এবং কাহাকে রক্ষা করিবে ?' এই প্রশ্ন আর থাকে না। কাহাকেও পূজা-বন্দনা করা ও ধূপদীপদান করারও কোন প্রয়োজন নাই। বুদ্ধই যদি হৃদয় হন, তবে হৃদয় এমনই যে সে সব কিছু জানিতে পারে। সত্যকে জানিবার জন্য কাহারও নিকট উপদেশ প্রার্থনা করা অথবা শাস্ত্রপাঠ করা নিষ্প্রয়োজন। ইহার জন্য ভিক্ষুব্রত, পূজা-বন্দনা বা প্রার্থনাদিরও কোন প্রয়োজন নাই। যদি কেহ নিজের মধ্যে বুদ্ধকে দেখিতে পায়, ইহাতেই তাহার মুক্তি—ইহাই নির্বাণ। এই দেখাতেই নির্বাণ পর্যবসিত। সুতরাং তাহার কৃত কর্মে ভালো বা মন্দ, পুণ্য বা পাপ বলিয়া কিছু নাই। কোন কোন পণ্ডিত বোধিধর্মের দর্শনের মধ্যে ভারতীয় বেদান্তদর্শনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করেন। বস্তুত ব্রহ্ম ও আত্মাকে বুদ্ধের প্রতিভূ-স্বরূপ ধরিলে আমরা যাহা পাই তাহা একপ্রকারের বেদান্ত বলিলেই চলে। নাগার্জুনের দর্শনে বিজ্ঞানবাদের যে ব্যাখ্যা, তাহাও অনেকটা এইরূপ। কিন্তু বোধিধর্ম দক্ষিণভারত হইতে গিয়াছিলেন এবং তিনি আচার্য শঙ্করের বহু পূর্ববর্তী-কালের। নব্য বেদান্ত শঙ্করাচার্যের এবং ঐ বেদান্তে মায়াবাদের স্থানই মুখ্য। শঙ্করা-চার্যের পূর্বেই সৌত্রান্তিক ও মাধ্যমিকপন্থী বৌদ্ধরা অনেকটা ঠিক মায়াবাদের ন্যায় একমত প্রচার করিয়াছিলেন।

বোধিধর্ম ও সম্রাট উ (Wu)র মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার বিবরণ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে বোধিধর্ম বৌদ্ধদর্শনের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। "সম্রাট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

> সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অবধি আমি অবিরত মন্দির নির্মাণ, ধর্মশাস্ত্রাদির অনুবাদ ও নূতন নূতন ভিক্ষুকদের সঙ্ঘে প্রবেশের জন্য উৎসাহ দিতেছি। ইহাতে আমার কি পরিমাণ পুণ্যসঞ্চয় হইল ?
>
> বোধিধর্ম বলিলেন : কিছুই না।
>
> সম্রাট : কেন ?

বোধিধর্ম : এই সমস্ত কোন স্বয়ংপূর্ণ বা সম্পূর্ণ করণের বিশেষ পরিণাম নহে। ইহা মূল সত্তার ছায়া মাত্র। ইহার বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নাই।

সম্রাট : তাহা হইলে প্রকৃত পুণ্য কি।

বোধিধর্ম : উহা শুচিতা ও বোধি-জ্ঞানের ভিতরেই বর্তমান—যেখানে গভীরতা ও পূর্ণতা বিরাজিত, সেখানে চিত্ত স্থির ও শূন্যতায় সমাবিষ্ট। এই জাতীয় পুণ্য জাগতিক উপায়ে সন্ধান করা যায় না।

সম্রাট : সমস্ত ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কোন্‌টি ?

বোধিধর্ম ঃ যেখানে সমস্তই শূন্যতা সেখানে পুণ্য বলিয়া কিছু নাই।

সম্রাট ঃ তাহা হইলে আমার সহিত কে কথোপকথন করিতেছেন?

বোধিধর্ম ঃ আমি তাহা জানি না।

বোধিধর্মের উপদেশ ধ্যান-সম্প্রদায়কে চীনদেশে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিল। তাও-শেঙকে কেন্দ্র করিয়া এই আন্দোলন বহু পূর্বে আরম্ভ হইলেও বোধিধর্ম যখন চীনে গিয়া এই একই দর্শনের পক্ষ সমর্থন করিলেন তখনই ইহা জনসাধারণের ব্যাপক অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। এই কারণেই পরবর্তী ধ্যান-পন্থীরা বোধিধর্মকেই তাঁহাদের আদিগুরু বলিয়া মনে করেন। এই সম্প্রদায় চীনে এবং পরে জাপানে বিপুল সমর্থন লাভ করে। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি শাখা বাহির হইল। ধ্যান-মতবাদের মধ্যে আবার দুইটি ধারা বর্তমান ছিল। একটি নাস্তি-প্রধান অন্যটি অস্তি-প্রধান। একটির মতে সর্বধর্ম শূন্যতাই পরম (তত্ত্ব), ইহা নির্গুণ এবং অনির্বেচ্য। চিত্ত এবং বুদ্ধস্বভাব দুই-ই এই শূন্যতা। এই মত 'অ-চিত্ত অ-বুদ্ধ' মতরূপে অভিহিত। অস্তি-প্রধান দৃষ্টিতে—চিত্তই শূন্যতার বোধক। চিত্ত ব্যতীত জাগতিক কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই চিত্তই বোধি বা নির্বাণ লাভ করে। সুতরাং স্বয়ং চিত্তই হইল সৎ-স্বভাব অথবা বুদ্ধ-স্বভাব। এই মত চিত্তোৎপাদ বা বুদ্ধোৎপাদ মত নামে পরিচিত। এই দুইটি ধারা সম্পূর্ণভাবে চীনের নয়। ইহারা শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদে বর্ণিত মহাযান-মতেরই দুই প্রাচীন সংস্থিতি। কিন্তু এই ধারা দুইটির মূল বিস্মৃত হওয়াতে ইহারা বৌদ্ধ-দর্শনের প্রকৃত চীনাভাষ্যরূপে বিবেচিত হইত। ইহাদের মধ্যে চীনের নিজস্ব কিছুও ছিল; এই কারণেই বিদেশীয় ধর্মের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল না তাঁহারাও ইহাদের গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধ্যান-সম্প্রদায় ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে চীনা বৌদ্ধদের মনে ঘোরতর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। এই সময়ে চীনে বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী ছিলেন। প্রধান প্রধান বৌদ্ধকেন্দ্রে বিরাট বিরাট বিহার নির্মিত হইয়াছিল। ভারতীয় এবং চীনা-পণ্ডিতদের কর্মতৎপরতায় বহু বৌদ্ধসাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাচীন মত অনুসারে এইগুলি 'বুদ্ধের বাণী সংকলন'। এতদ্ব্যতীত মহা মহা মনীষীদের গ্রন্থাবলীও ঐ সময় অনূদিত হইয়াছিল। ধ্যান-সম্প্রদায়ের শিষ্যেরা এই সকল ধর্মশাস্ত্রের উপর

কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। পরন্তু প্রচলিত ধর্মানুশাসন ; যথা : বিহারের নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিপালন, বুদ্ধ বা অন্যান্য দেবদেবীর পূজার্চনা বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা, ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ ইত্যাদি যাহা যাহা বৌদ্ধশাস্ত্রের নির্দিষ্ট—উহাদের ব্যাখ্যা করিয়া উহাদিগকে নিরর্থক প্রতিপন্ন করিবার এক ক্রম বর্দ্ধমান প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত চীনা-মনীষীদের অন্যতম চি-খাই এই পরস্পরবিরোধী মত-সমূহের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা দুঃসাহসিক হইলেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তিনি এক দ্বন্দ্বমুক্ত মত আবিষ্কার করিবেন। তিনি ৫৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধ্যান-সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন এবং তিনি ঠিক বোধিধর্মের শিষ্য না হইলেও বোধিধর্মের মতের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। থিয়েন থাই (Tien-Tai) নামক স্থানে তিনি একটি বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায় ঐ স্থানের নামেই পরিচিত। চি-খাই তাঁহার নিজস্ব একটি সুসম্পৃক্ত মত প্রচার করিলেন। এই মত তাঁহার শিষ্য তু-শুন (Tu-Shun) কর্তৃক পরিগঠিত হইয়াছিল। তু-শুন ৬৮০ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। ধ্যান-মতাবলম্বী হইলেও চি-খাই উক্ত সম্প্রদায়ের অন্যান্য আচার্যদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। সমস্ত সত্তাই বুদ্ধ-স্বভাবের অধিকারী, এ-কথা তিনি স্বীকার করিতেন। কিন্তু এই ধারণা তাঁহার দৃঢ় ছিল যে, বুদ্ধ-স্বভাবের উপলব্ধি মানুষের নিজের চেষ্টাসাপেক্ষ! সুতরাং গুরুর উপদেশের প্রয়োজন আছে—সেই সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের ভ্রান্তি—দূর করিয়া সত্যের উপলব্ধির জন্য চেষ্টারও প্রয়োজন আছে। চি-খাই-এর নূতন মতের ইহাই মুল ভিত্তি। বৌদ্ধ-সাহিত্যে গভীর অনুশীলনের ফলে তাঁহার এই প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, বুদ্ধের উপদেশ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহার মূলে কোন বিরোধ নাই। দার্শনিক বিচার ভিন্ন ভিন্ন থাকিলেও ইহাদের মুল পরিণাম একই। ইহা অসত্যকে অতিক্রম করিয়া সত্য ও পরম কল্যাণকে লাভ করিবার কথাই বলে। কে কি উপায়ে সেই পরিণামে উপনীত হইল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এই ধারণাতেই চি-খাই শাস্ত্রগুলিকে যথাযথ নিয়মানুসারে শ্রেণী-বিভাগের ও ভিন্ন ভিন্ন মতের সমন্বয় সাধনের প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার উদ্ভাবিত মত এতই যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল যে তাহা চীন এবং সুদূরপ্রাচ্যের দেশগুলিও গ্রহণ করিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত সেই মত আমাদের দেশেও আসিয়া পৌঁছিল। বৌদ্ধধর্মকে এইভাবে যুক্তিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস করিয়া তোলাই হইল চীন-প্রতিভার মহৎ কীর্তি।

সাহিত্যে সংগৃহীত বুদ্ধের উপদেশবলীর প্রসঙ্গে চি-খাই প্রস্তাব করেন যে তাহা কালক্রম-অনুসারে শ্রেণী-বিভক্ত হইবে। তিনি বুদ্ধের কর্মজীবনকে পাঁচভাগে বিভক্ত

করিলেন এবং তাঁহার উপদেশবলীকে অনুরূপভাবেই বিশেষ বিশেষ কালের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। বুদ্ধের সক্রিয়-জীবনের প্রথমভাগের কথা অবতংসক সূত্রে প্রকাশিত। বোধিলাভের অব্যবহিত পরে নির্বাণের দীপ্ত-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া বুদ্ধ একুশদিন বৃক্ষমূলে অবস্থান করিলেন। বুদ্ধকে অভিনন্দিত করিবার জন্য দেবতারা ঐ সময়ে বুদ্ধ-সমীপে উপস্থিত হন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে উপদেশ দান করেন। ঐ উপদেশবলীতে অত্যন্ত গভীর ও সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য (দুর্দর্শ) সত্যের প্রকাশ করেন। এই অবতংসকসূত্রের উপদেশবলীই মহাযান। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সক্রিয় জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত। ঐ সময়ে তিনি বোধিবৃক্ষতল ছাড়িয়া সাধারণ ধর্মোপদেশক জীবন-নির্বাহ করেন। তাঁহার এই সময়ের উপদেশবলী আগম (সূত্রপিটক) গ্রন্থে সংগৃহীত। এইগুলি হীনযান মতবাদ। এই উপদেশবলী শ্রমণদের জন্য নির্দেশিত। কোন গভীর তত্ত্ব ইহাতে নাই। এই পর্যায় বার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল।

তৃতীয় পর্যায়ে বুদ্ধ তাঁহার প্রচারিত মত হইতে স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও দার্শনিক গ্রন্থাদির উপর অভিযোগ আনয়ন করিলেন। এই সময়ের উপদেশ বিতর্কের আকারে বৈপুল্যসূত্রে গ্রথিত। ইহাতে হীনযান ও মহাযান মতবাদের লক্ষণ সংমিশ্রিত। এই পর্যায় আট বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। চতুর্থ পর্যায়ে বুদ্ধের বিরোধী সম্প্রদায়ের আক্রমণ তাঁহার উপরে খুব তীব্র হইয়াছিল। সুতরাং বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদের নিকট গভীরতর তত্ত্ব-বিজ্ঞান-মূলক সত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার এই পর্যায়ের উপদেশ "প্রজ্ঞা-পারমিতা"য় গ্রথিত হইযাছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে মহাযানীয়। এই পর্যায় বাইশ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল।

পঞ্চম পর্যায়ই শেষের অধ্যায়। প্রতিপক্ষদল তখন নীরব। বৌদ্ধধর্মও তখন সুদৃঢ়-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই সময়ের উপদেশ মুখ্যতঃ বোধিসত্ত্বের মার্গ ও চর্যা নির্দেশ করিতেছে। যাঁহারা বোধিলাভে প্রয়াসী তাঁহারাই বোধিসত্ত্ব। এই সময়ের উপদেশ 'সদ্-ধর্ম-পুণ্ডরীক', 'নির্বাণ-সূত্র' প্রভৃতি মহাযান-গ্রন্থে সংগৃহীত। এই পর্যায় আট বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল ; এবং নির্বাণেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল। সুতরাং চি-খাই-এর মতে বুদ্ধের উপদেশবলী বিশেষ এক ধারায় প্রবাহিত এবং এইগুলির একটিও গুরুত্বহীন নহে। প্রগতিমূলক পন্থায় এইগুলি সকল স্তরের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার উপদেশবলী আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হইলেও মূলতঃ ঐগুলির মধ্যে তেমন কিছু বিরোধ ঘটে নাই। ভারতীয় পণ্ডিতগণ, বিশেষতঃ যাঁহারা বিজ্ঞানবাদী, তাঁহারা বুদ্ধের উপদেশগুলিকে এই দৃষ্টিতেই দেখিতেন। এই কারণেই ঐ উপদেশগুলির স্বতঃবিরোধ তাঁহারা খণ্ডন করিতে পারিতেন। যে উপদেশগুলিকে তাঁহাদের ব্যাখ্যায়

সহিত সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে করিতেন সেগুলি সম্বন্ধে তাঁহারা বলিতেন যে, মহাযানের গভীর তত্ত্ব-বোধে অসমর্থ সাধারণ বিদ্যার্থীদের জন্যই ঐ সকল উপদেশ রচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন নয়; কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ মত-রূপে ইহাকে পরিণত করার মূলে রহিয়াছে চি-খাই-এরই কৃতিত্ব।

চি-খাই অবতংসক-সূত্রকে বুদ্ধের সর্বোত্তম ও সুমহান্ সৃষ্টি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি ইহাকে ভিত্তি করিয়াই বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যান অবশ্য ভারতীয় ব্যাখ্যানের অন্ধ অনুকরণ নয়—ইহা সম্পূর্ণই মৌলিক। ভিন্ন মতবাদকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার উপযোগী একটি বিশেষ প্রকৃতি ইহার রহিয়াছে, সে-কারণে বুদ্ধের কোন উপদেশের প্রতি কোনপ্রকার অশ্রদ্ধা কোথাও প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার মতে বৌদ্ধতত্ত্ব মনের তিনটি বৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট—যথাঃ জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা। জ্ঞান মানুষকে জীবনের প্রকৃত স্বভাব জানিতে সাহায্য করে; ভাব পূর্ণ সিদ্ধির প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসকে অবিচলিত রাখে, এবং ইচ্ছা লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কর্ম করিতে প্রেরণা দিয়া থাকে। চি-খাই বুদ্ধকে অসাধারণ কিছু বলিয়া মনে করেন না। তিনি মনে করেন যে বুদ্ধ ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ এবং তিনি নিজে তাঁহার হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিগুলির অনুশীলন দ্বারাই সম্বোধিলাভ করিয়াছেন। প্রত্যেকের মধ্যেই সেই বুদ্ধ স্বভাব রহিয়াছে। এই বুদ্ধ-স্বভাব এক সার্বজনীন সত্য। নৈসর্গিক জগতে যাহা কিছু বর্তমান তাহার মধ্যেই এই সত্য অংশত বিরাজ করিতেছে। ইহা ত্রি-স্বভাব যথা : সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল। সুতরাং প্রকৃতির সৌন্দর্যরাজ্যে পত্রে, পুষ্পে ও বিহগের কলতানে সেই একই সার্বজনীন সত্য তথা বুদ্ধ-স্বভাবের মূর্ত-প্রকাশ। আমাদের মধ্যেও এই অন্তর্নিহিত বুদ্ধ-স্বভাব জাগরণের অপেক্ষা করিতেছে। বুদ্ধের অন্তরে ইহা জাগিয়াছিল। ইহাই সম্বোধি। চি-খাই বহির্জগৎ ও চিত্ত-জগতের ভিতর কোন ব্যবধান লক্ষ্য করেন না; বলেন যে এইগুলি একই সত্যের দ্বিবিধ প্রকাশমাত্র। ইহাতে তিনি ধ্যান-সম্প্রদায়ের তথা নাগার্জুনের (মাধ্যমিক) দর্শনকে অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সম্বোধির 'আকস্মিক আবির্ভাব' বিশ্বাস করেন না।

চি-খাই বৌদ্ধ-দর্শনের প্রতীত্য-সমুৎপাদ (শাশ্বত কার্য-কারণবাদ) স্বীকার করেন। প্রতীত্য-সমুৎপাদ অনাদি এবং অনন্ত। প্রতিটি পরিণাম অপর পরিণামের কারণ-স্বরূপ। এই কার্য-কারণের সূত্রের কোথাও শেষ নাই। এই বিশ্বের মূল স্বরূপ শাশ্বত। নশ্বর (উৎপাদ বয়োধর্মী) জীবমাত্রেই কার্য-কারণ-সম্ভূত। ইহারা যেন বিরাট বিশ্বের সুচির-স্থায়িত্বের সমুদ্রের মধ্যে ক্ষণিক ও খণ্ড তরঙ্গমাত্র। ইহারা অনিত্য। ইহাদের দ্বারা চিরন্তন সত্যের কোনপ্রকার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটেনা।

একক ব্যক্তি-সংস্থা (পুদ্‌গল) ক্ষণিক, অনিত্য এবং অনাত্ম। এই জগতের অস্তিত্ব (ভব) হইল কর্মের কারণ ও পরিণামের সহিত সংযুক্ত সন্তান সমূহ। অতএব পুদ্‌গল অনাত্ম। পুদ্‌গল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ—এই উপাদান-চতুষ্টয়ে গঠিত। কর্মের বশে এই উপাদানগুলি জন্মকালে (জাতিসময়ে) সংযুক্ত হয় ; আবার মৃত্যুসময়ে বিযুক্ত হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে চি-খাই ভৌতিক কারণ (yuan-yin) এবং ফলোৎপাদক কারণ (yin-yuan) এই দ্বি-বিধ কারণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন ; যথা : ভৌতিক কারণ হইল বীজ আর ফলোৎপাদক কারণই হইল ঐ বীজের বপন।

চরম সত্যের সম্বন্ধে চি-খাই মাধ্যমিক বিজ্ঞান-বাদের মতকেও অবলম্বন করেন। এই সত্য অস্থায়ী পরিদৃশ্যমান্ জগৎ নহে। ইহা এই পরিদৃশ্যমান জগতে সমুদয় রূপের মধ্যে আবৃত। ইহা বিশ্বের চিরন্তন সত্তা মৌলিক বস্তু তথা সমস্ত বস্তুর মূল আধার। চিরন্তন সত্য জন্ম বা মৃত্যুর অতীত। ইহার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই। ইহা অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু পরিদৃশ্যমান জগৎ জন্মমৃত্যুর অতীত নয়। ইহার হ্রাস ও বৃদ্ধি দুই-ই আছে। ইহা সাদি ও শান্ত। প্রলয়ে ইহার পরিসমাপ্তি হয় না, বরং পরিদৃশ্যমান বস্তুর এক নূতন প্রবাহ সূচনা করে। এই জগতের ঊর্ধে যে সত্য বিরাজমান তাহা পরম, একক, অসীম, স্বতন্ত্র এবং স্বলক্ষণ (অসাধারণ)। পরিদৃশ্যমান জগৎ সে তুলনায় আপেক্ষিক, বিশেষক, সসীম, অস্বতন্ত্র এবং সাধারণ।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, চি-খাই বলেন যে, বিশ্বের মূল সত্তা ও তাহার পরিদৃশ্যমান্ স্বরূপ যেন সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ। এই দুইটির মতোই নির্বাণ ও সংসার অভিন্ন। "(জীব) সত্তা" তথা "বুদ্ধ-স্বভাব" যখন নিত্য-অবস্থায় বিরাজ করেন তখন নির্বাণ ; এবং তাহা যখন অনিত্য-অবস্থায় তখনই সংসার। নির্বাণের নিত্যসমুদ্রে পুদ্‌গল ক্ষণিক তরঙ্গমাত্র।

বৌদ্ধ-দর্শনের তিনটি প্রধান বিষয় বিশেষ লক্ষ্যনীয় : ১—এই জগতের ঊর্ধে যে সত্য বিরাজমান তাহা সামগ্রিকভাবে বিশ্বের স্থানে কালে ওতঃপ্রোতভাবে ব্যাপৃত হইয়া আছে। ইহা অনাদি এবং অনন্ত। ইহা অসীম এবং শাশ্বত। ২—এই মৌলিক সত্য হইতেই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ কার্য কারণ বশে সমুদ্ভূত। ৩—এই মৌলিক সত্যের উপর নির্ভর করিয়া আছে বলিয়া পরিদৃশ্যমান্ জগৎ মিথ্যা নহে। কার্যকারণ বশেই বহুর মধ্যে এক এবং একের মধ্যে বহু বিরাজ করে।

ইহাই চি-খাই-এর মতের সার-সংক্ষেপ। বস্তুতঃ ইহা নাগার্জুনেরই সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই বিশেষ দৃষ্টি দিয়া সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্য ও দর্শনের উপর যে আলোকপাত তাহা চি-খাই-এর সম্পূর্ণ নিজস্ব। এই মত তাঁহার জীবদ্দশায় এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও সমাদৃত

হইয়াছিল এবং বিপুল সফলতালাভ করিয়াছিল। সাধারণ সাম্প্রদায়িকতা হইতে যে-সকল অসঙ্গতি বা বিরোধ উৎপন্ন হইতে পারে সে-রকম কিছুই এই মতের মধ্যে ছিল না; সুতরাং চীনারা একটি বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ মত আশ্রয় করিতে পারিয়াছিল। ইহা পরবর্তীকালের চীনা দার্শনিকদের বৌদ্ধ তথা চীনা চিন্তাধারায় এক নূতন সমন্বয় সাধনের সহায়তা করিয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই নূতন সমন্বয়াত্মক মতের সৃষ্টি। সে-বিষয়ে পরে বলিতেছি।

৮

সেঙ্গ-চাও (Seng-Chao), হুই য়ুয়ান (Hui-Yuan), চি-খাই এবং তাঁহাদের মতাবলম্বীরা যখন স্ব-স্ব প্রেরণায় বৌদ্ধ-চিন্তাধারা ব্যাখ্যানে সচেষ্ট তখন য়ুয়ান-চোয়াঙ (Huen-Sung) তাও-সিওয়ান (Tao-Siuan) প্রমুখ একজন প্রাচীনপন্থী বৌদ্ধ পণ্ডিত ভারতীয় বৌদ্ধ-দর্শনের মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যসম্ভার চীনাদের উপর চাপাইবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারা ভারতের কোন কোন বৌদ্ধ-দার্শনিক-মত—চীনেও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই মতগুলি চীনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উহাদের কোন কোনটি এখনও চীন এবং জাপানে প্রচলিত।

যোগাচার-বিজ্ঞানবাদের প্রচারে য়ুয়ান-চোয়াঙ নিজে যথেষ্ট আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্বাদি বিশেষরূপে জানিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। নালন্দার শীলভদ্র ছিলেন এই সম্প্রদায়ের অতন্যম শ্রেষ্ঠ আচার্য। য়ুয়ান-চোয়াঙ তাঁহার নিকট থাকিয়া যোগাচার-বিজ্ঞানবাদে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই সম্প্রদায়ের মুল গ্রন্থগুলির চীনভাষায় অনুবাদ করিলেন এবং ইহার নয়জন আচার্যের কৃত টীকা হইতে প্রচুর উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া চীনাভাষায় বিজ্ঞান-বাদের এক দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিলেন। বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদে তাঁহার গভীর উপলব্ধি ছিল। তাঁহার নিজের রচনা ছাড়াও তাঁহার বিখ্যাত শিষ্য "কুই-চি"র (Kui-ki) রচনার মধ্যে তাঁহার গভীর জ্ঞানের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

চীনদেশে এই সম্প্রদায়ের নাম ধর্মলক্ষণ (ফা-সিয়াঙ্গ) এবং জাপানে ইহারই নাম হোসো (Hosso)। এই সম্প্রদায়ের নাম ধর্মলক্ষণ দেওয়া হইয়াছিল, কারণ এই সম্প্রদায়ের দর্শনে ধর্মের সত্যকার স্বরূপ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই ধর্ম হইতেই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী-দর্শনের সত্যকার ব্যাখ্যা এই

মতের ভিতর রহিয়াছে। এই মত অনুসারে বিজ্ঞানই পরম সত্য। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ বিজ্ঞানের আভাসমাত্র। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই সম্প্রদায়ের মনীষীরা আলয় বিজ্ঞানকে চূড়ান্ত বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন। ইহা সকল সৃষ্টির বীজ স্বরূপ এক অবচেতন অবস্থা। ধর্ম তথা পরিদৃশ্যমান্ বস্তু সবই অলীক স্বপ্নবৎ। কেবল বিজ্ঞানই সত্য। য়ুয়ান-চোয়াঙের পর চুইচি এই মতের আচার্য-রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। চীন ও জাপানে তিনিই আলয়-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার বলিয়া সম্মানিত। মধ্যযুগের পাণ্ডিত্য-প্রভাবিত এই একটিমাত্র সম্প্রদায় অদ্যাবধি চীনদেশে বর্তমান।

চীনে অন্য আরেকটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার মূলেও য়ুয়ান-চোয়াঙের নাম মনে আসে। ইহা কোশ সম্প্রদায় (Kiu-She) নামে পরিচিত। এই নামটি বসুবন্ধুর বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ "অভিধর্ম কোশ" হইতে সংগৃহীত। ইহাতে সর্বাস্তিবাদী-সম্প্রদায়ের দর্শনের ব্যাখ্যা সংকলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদ প্রচলিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বসুবন্ধুও এই (সর্বাস্তিবাদ) সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সর্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের সাতটি আধ্যাত্মিক গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া অভিধর্ম কোশ রচিত। য়ুয়ান-চোয়াঙ এই সাতটি গ্রন্থই চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। এই সম্প্রদায়ের মত বিজ্ঞানবাদের মর্মকথা উপলব্ধির সহায়ক বলিয়া তিনি উহা চীনদেশে প্রচার করিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। বস্তুতঃ বসুবন্ধু নিজেই এই অভিধর্ম কোশকে বিজ্ঞানবাদ-উপলব্ধির সোপান বলিয়া মনে করিতেন। কোশ-সম্প্রদায়ের দর্শন এক ধরণের জড়বাদ। বুদ্ধের মূল উপদেশেরই অনুসরণ করিয়া কোশ-সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, আত্মার কোন অস্তিত্ব নাই ; ইহা পঞ্চ স্কন্ধের এক ক্ষণস্থায়ী সম্মেলন। স্কন্ধগুলির অবশ্য অস্তিত্ব আছে। ইহারা অতি ক্ষুদ্র অগণিত পরমাণু লইয়া গঠিত। এই পরমাণুগুলিই কেবল বাস্তব। ইহাদের সম্মেলন অবাস্তব ও মায়িক। য়ুয়ান-চোয়াঙের পরে তাঁহার কতিপয় শিষ্য এই সম্প্রদায়ের মত প্রচারে ব্রতী হইলেন। তাহার পর ইহা যখন জাপানে প্রচলিত হইল তখন ইহা "কুশ" (Kush) নামে পরিচিত হইল।

য়ুয়ান-চোয়াঙের অন্য একজন শিষ্য তাও-সিওয়ান (Tao-Siuan) আরও একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায় বিনয় (Lin) সম্প্রদায় নামে পরিচিত। জাপানে উহার নাম রিওৎসু (Riotsu)। উহার মতবাদ প্রচারের কাজে উহার প্রতিষ্ঠাতা তদীয় গুরু য়ুয়ান-চোয়াঙের দ্বারা কতখানি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন সে-কথা আমরা বলিতে পারি না। সমকালীন অন্যান্য বৌদ্ধদের সহিত তাঁহার মতামতের অসঙ্গতি ছিল না। চি-থাই এ-কথা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধ-পিটকের কোন অংশই অপ্রয়োজনীয় নহে। তাও-সিউয়ানও সেই কথাই বলেন। বৌদ্ধবিহারের শীল ও চর্যা কোন অংশেই

উপেক্ষনীয় নহে। জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই কঠোরভাবে (বৌদ্ধ বিনয়-পিটকোক্ত) শীল আচরণ না করিলে কেহ নিজের চরিত্র গঠন করিতে পারে না এবং পরিণত বয়সে সুগভীর ধ্যানলোকে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। জীবনের প্রথম অবস্থায় শীল আচরণের জন্য তাও-সিউয়ান বলেন যে ধর্মগুপ্তক সম্প্রদায়ের বিনয় পিটকই ভিক্ষুজীবন আচরণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী গ্রন্থ।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রবোধি চীনদেশে আরও একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার শিষ্য অমোঘবজ্র সেই সম্প্রদায়কে বিস্তৃত করেন। ইহা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম হইতে উদ্ভূত। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ নালন্দা ও দাক্ষিণাত্যে এই মতবাদ বর্তমান ছিল। বজ্রবোধি ও অমোঘবজ্র দুইজনেই বহু গ্রন্থ চীনদেশে লইয়া যান এবং চীনাভাষায় ঐগুলির অনুবাদ করেন। চীনে এই সম্প্রদায় "চেন-এন" (সত্য-কথা) নামে এবং জাপানে উহাই "সিংগন" নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের মতে মহাবৈরোচন-ই হইলেন আদি তত্ব। এই মহাবৈরোচন দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় ভূত-তথতা ছাড়া আর কিছুই নহেন। কায়, মন, বাক্য, এই তিনটি গূঢ়-তত্বই এই সম্প্রদায়ের আলোচ্য বিষয়। চেতন অচেতন সকল বস্তুতেই এই তিনটি তত্ব বিরাজমান। নৈসর্গিক জগতে সর্বত্র ইহাদেরই প্রকাশ। সাধারণ মানুষের ন্যায় বুদ্ধের মধ্যেও এই তিনটি তত্বই রহিয়াছে। সুতরাং যে কোন জীবকেই বুদ্ধত্বের দিকে লইয়া যাওয়া সম্ভব। পুণ্যার্জনের দ্বারা চিত্তকে নিয়ত বুদ্ধাভিমুখী করিবার জন্য বোধিলাভের পথে এই এক নূতন প্রয়াস দেখা দিল।

এই দর্শন সম্পূর্ণ নূতন কিছু নয়। ইহা চীনা বৌদ্ধদিগকেও বিশেষ আকৃষ্ট করে নাই। কিন্তু জাপানে ইহা প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। (তান্ত্রিক) বৌদ্ধধর্মের ঋদ্ধি-শক্তির দিকে চীনাদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কেন না, এই সময়ে তাও-বাদের মধ্যে এই ঋদ্ধিবিদ্যা প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান ছিল। তদুপরি নূতন নূতন মন্ত্র, যাদু ও সম্মোহনী-বিদ্যার প্রচলন হইল। চীনের অধিকাংশ জনসাধারণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সেগুলিকে গ্রহণ করিল। বৌদ্ধধর্ম তখন মৃতপ্রায়। সুতরাং চীনকে তাহার আর নূতন কিছু দিবার ছিল না।

ইহার পরে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ ও চীন — উভয় দেশেরই অবক্ষয়ের যুগ চলিতেছিল। তখন যে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছিল এমন নহে। বহু সংখ্যক চীনা ভিক্ষু বৌদ্ধদের "পবিত্রভূমি" ভারতবর্ষ দর্শনে আসিতেন। চীনেও তখন বহু ভারতীয় ভিক্ষু চীনাভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থগুলির অনুবাদ করিয়া কাল কাটাইতেন। সে-সব গ্রন্থ তেমন মূল্যবান ছিল না।

একাদশ শতাব্দীতেই কর্মতৎপরতার একটি নূতন পর্ব আরম্ভ হইল। সারা চীনদেশে এক নূতন দার্শনিক আন্দোলন দেখা দিল। উহা মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত না হইলেও বৌদ্ধধর্মের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত এবং বৌদ্ধ দর্শনের অনেকগুলি মূল তথ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছিল। উহাকে চীনা-চিন্তা-ধারার বিকাশের পক্ষে বৌদ্ধধর্মের শেষ দান বলা চলিতে পারে। এই নূতন আন্দোলনই নব্য কন্‌ফ্যুসীয় দর্শন (Neo-Confucianist Philosophy) নামে পরিচিত।

৬

বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া প্রাচীন চীনা দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্যই এই নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত। বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে পূর্বতন সমস্ত সংগ্রামই ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম তখন ভারতবর্ষ ও চীন উভয় দেশেই পতনের মুখে। বৌদ্ধদর্শনগুলি সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাহাতে মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যবহুল দার্শনিক মতগুলি জনসাধারণের নিকট দুর্বোধ্য ছিল। বৌদ্ধ তত্ত্ব-বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলির মধ্যে যে-গুলি সর্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল সে-গুলিই সেঙ্গ-চাও, চি-খাই ও ধ্যান-সম্প্রদায়ের অন্যান্য আচার্যের ব্যাখ্যার দ্বারা চীনদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। গৌরবোজ্জল ঐতিহ্যের অধিকারী বলিয়া বৌদ্ধধর্ম তখনও লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। এই কারণেই আরও বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে পুনরায় এই আন্দোলনের স্থচনা।

এই নূতন আন্দোলন মুখ্যতঃ প্রাচীন দর্শনের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়াছিল। যদিও বৌদ্ধধর্মকে বিনষ্ট করাই উহার মুল উদ্দেশ্য ছিল। তথাপি যে নূতন মত গড়িয়া উঠিল তাহার মধ্যে প্রাচীন দর্শনের উপাদানের তুলনায় বৌদ্ধধর্মের উপাদানই অধিক পরিমাণে বর্তমান রহিল। অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি যে-সব বিজ্ঞান দর্শনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, বৌদ্ধধর্মই চীনদেশে সে-গুলি প্রচার করিয়াছিল। সাংখ্য দর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব, বৈশেষিকের পরমানুবাদ, সর্বাস্তিবাদি-দর্শনের জড়বাদ ও তাহাদের ক্রমবিবর্তনের তথ্যগুলি ঐ সকল শাস্ত্রের মূলগ্রন্থের অনুবাদ এবং চীনা বৌদ্ধ-পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যার মাধ্যমে চীনারা অবগত হইয়াছিল।

চাও-ৎজু (খৃঃ ১০১৭—১০৭৩), শাও-ৎজু (খৃঃ ১০১১—১০৭৭), ছেঙ্গ-হাও (১০৩২—১০৮৫), ছেঙ্গ-ই (খৃঃ ১০৩৩—১১০৭) ও চু-সি (খৃঃ ১১৩০—১২০০) এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন। চু-সি তাঁহাদের উদ্ভাবিত মতকে পূর্ণ রূপ দান

করেন। তিনি প্রাচীন দার্শনিদের বিপরীত মত প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন যে ঈশ্বর নাই। সর্বশক্তিমান, বিধাতা বা জগৎপিতা বলিয়াও কেহ নাই। সমগ্র বিশ্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত দুইটি শাশ্বত তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত। এই দুইটি তত্ত্বের নাম "লি" ও "ছি"—একটি বিশ্বের নিয়ামক শক্তি, অন্যটি ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের জড় উপাদান। ধর্মে পৃথক হইলেও ইহারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। প্রথমটিকে চীনা-ভাষায় 'থাইকি' বলে যেহেতু ইহাই নিয়ামক শক্তি। ইহাকে 'উ-কি'-ও বলা হয় যেহেতু ইহা অতীন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম পূর্ণতর বিবরণে ইহাকে অদ্বৈত, অনন্ত, শাশ্বত, অক্ষর, অব্যয়, একরস, অচেতন ও অবোধ বলা হইয়াছে। এই নিয়ামক শক্তির প্রেরণাতেই জড় উপাদানে কখনও 'য়িয়াং' অর্থাৎ অগ্রগতি, কখনও 'য়িন্' অর্থাৎ পশ্চাদ্-গতির উদ্ভব হয়। 'থাইকি' রূপহীন। সুতরাং কেবল ইহা হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। রূপহীন হইলেও ইহার বাস্তব-সত্তা আছে। 'থাইকি' ও বৌদ্ধধর্মের পরমতত্ত্বের মধ্যে চু-হি এই পার্থক্য দেখান যে "থাইকি-তে পঞ্চমূল উপাদান-যুক্ত 'লি' এবং 'য়িন্' ও 'য়িয়াং' বিরাজ করিতেছে। এই-গুলি মিথ্যা নহে। যদি ইহারা মিথ্যা হইত, তবে এইগুলি বৌদ্ধদর্শনের বস্তু-স্বভাবেরই সমান হইত।" তিনি আরও বলেন, "বৌদ্ধপণ্ডিতগণের মিথ্যার কল্পনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নহে। কিন্তু এই মিথ্যার মূলেও 'লি' রহিয়াছে। ইহা বলাও সঙ্গত নয় যে আমরা অসত্য এবং 'লি'র সত্য-স্বরূপ আমরা জানিনা।" বৌদ্ধ জীবন-দর্শনের ইহা এক ভুল ব্যাখ্যা। জগৎ মিথ্যা—এই কথার অর্থ এমন হইতে পারে না যে ইহা সম্পূর্ণ নিরধিষ্ঠান। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে ইহা অন্য সমস্ত জিনিসের মতোই সত্য। পরমার্থ বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বব্যাপ্ত। ইহা অনির্বচনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা অলভ্য নহে।

নিয়ামক শক্তি ও জড় উপাদানের সম্বন্ধ এবং ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে চু-হি বলন যে নিয়ামক নিয়ম্য হইতে স্বতন্ত্র থাকে না এবং থাকিতে পারে না। নিয়ামক স্বয়ং অপরি-বর্তিত থাকিয়াও বিশ্বপ্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিয়া যাবতীয় বস্তুর বিকাশ ঘটায়। এই বিকাশ ক্রমিক বা পর পর ঘটে না ; যুগপৎই ঘটে। বিকশিত বস্তুনিচয় শক্তিরই সক্রিয় রূপ এবং সূক্ষ্মের স্থূলে পরিণতিমাত্র। প্রতিটি পুদ্গলে যে নিয়ামক শক্তি তাহা বিশ্বব্যাপী শক্তিরই অঙ্কুর। ইহা বিশ্বশক্তি হইতে পৃথক নহে। পুদ্গল ও বিশ্বনিয়ামক শক্তির সম্বন্ধ তুলনা করিয়া ইহা বলিতে পারা যায় যে শত সহস্র জলাধারে একই চন্দ্রের শতসহস্র প্রতিবিম্ব দেখা গেলেও চন্দ্র একই থাকিয়া যায়। সে এক এবং অপরিবর্তিত।

চু-সি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সকলই উপাদানে লীন হইয়া যায়। নিয়ামক শক্তি ও উপাদান এই দুই মহান্ উৎস হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির নব নব বিকাশ হয়। কিন্তু সত্তা পুরুষানুক্রমে ধারার ন্যায় চলিতে থাকে।

পূর্বপুরুষের কিছু না কিছু উত্তর পুরুষে অনুস্যূত হয়। তরঙ্গের সঙ্গে সমুদ্রের যে সম্বন্ধ, সন্ততির সঙ্গে বংশ প্রবাহের ও সেই সম্পর্ক। প্রত্যেক তরঙ্গ স্বয়ং সম্পূর্ণ। প্রথম তরঙ্গ দ্বিতীয় তরঙ্গ নয়, কিংবা দ্বিতীয় তরঙ্গ তৃতীয় তরঙ্গ নয়। কিন্তু ইহারা যেমন একই জলের বিভিন্ন পরিণাম তেমনই এক একটি ব্যক্তিও স্বর্গমর্তব্যাপী নিয়ামক এবং উপাদানেরই এক একটি বিশিষ্ট রূপ মাত্র। পূর্বপুরুষও অধস্তন পুরুষেরই ন্যায় নিয়ামক ও উপাদানেরই পরিণাম। অতএব দেখা যাইতেছে যে একই কারণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া পূর্ব ও অধস্তন পুরুষের মধ্যে ঐক্য বর্তমান রহিয়াছে।

এই মতের মূল ভিত্তি 'থিয়েন-থাই'র মত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে। আমরা দেখিয়াছি যে চি-খাই বৌদ্ধদর্শনের শাশ্বত কার্যকারণ-বাদকে গ্রহন করিয়াছেন্। এই কার্যকারণ-বাদ দেশ-কাল-নিরেপক্ষ। এই ধারা অনন্ত। যে পরিণাম পূর্ববর্তী কারণের কার্য তাহাই আবার তাহার পরবর্তী কার্যের কারণ। এইভাবেই কার্যকারণ-প্রবাহ চলিতে থাকে। এই বিশ্বের মুলতত্ত্ব শাশ্বত, কিন্তু যাবতীয় কার্যদ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায়, ক্ষণস্থায়ী। সমুদ্রের তরঙ্গসমূহ সমুদ্রের জলের কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় না ; ক্ষণিক বস্তুসমূহের সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। বিশ্বের কারণ বিবিধ : উপাদানও নিমিত্ত। একই উপাদান-ব্যক্তি হইতে অসংখ্য নিমিত্ত কারণ অসংখ্য প্রতীয়মান্ ক্ষণিকদ্রব্যের সৃষ্টি করে। 'থাইকি' নামক অনন্ত, অসীম ও অব্যয় নিয়ামকশক্তির প্রেরণাতেই বিশ্বের অগ্রগতি ও পশ্চাদ্-গতি ঘটিয়া থাকে। চু-সির বিকাশবাদও এই দর্শনেরই ভাষান্তরমাত্র।

নিয়ামকশক্তি ও সংসারের মধ্যে অর্থাৎ পরমার্থ ও দৃশ্যমান্ জগৎ (বৌদ্ধ নির্বান ও সংসার) সম্বন্ধে নব্য কনফ্যুসীয় দার্শনিকেরা বৌদ্ধ-মতই স্বীকার করেন। সুতরাং ছেঙ্গ-হাও (C'heng Hao) বলেন, "আমি আধ্যাত্মিক প্রশান্তি বলিতে এই বুঝি যে, কর্মের মধ্যে এই প্রশান্তি আছে, কর্মবিরতির মধ্যেও আছে। ইহার না আছে অতীত, না আছে ভবিষ্যৎ ; না আছে বাহ্য, না আছে অন্তর। যদি তুমি বাহিরের বস্তুকে বাহিরের বলিয়াই মনে কর এবং তাহা অনুসরণ করিতে ব্যস্ত হও, তাহা হইলে তুমি তোমার নিজের স্বভাবকে দুইভাবে দেখিতে পাইবে—একটি বাহ্য ও অপরটি অন্তর। উপরন্তু, তুমি যদি তোমার স্বভাবকে বাহিরের বস্তুর প্রতি অনুসরণশীল করিয়া লও, তবে তুমি যখন বাহিরের ব্যাপারেই ব্যস্ত রহিয়াছ, তখন তোমার ভিতরে কি আছে ? তুমি যখন বাহিরের মোহ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিতেছ তখন তুমি একটি কথা ভুলিয়া যাও যে, মানুষের স্বভাবের মধ্যে বাহিরের দিক ও ভিতরের দিক বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। বাহিরের দিকটি ঠিক নয় কিংবা ভিতরের দিকটি ঠিক, এই ধরণের চিন্তা করার তেমন বিশেষ মূল্য নাই। বরং বাহিরের দিক ও ভিতরের দিক বলিয়া কিছু আছে ইহা ভুলিবার চেষ্টা করা উচিত। তুমি

যদি এই ভেদ ভুলিয়া যাইতে পার তবে তুমি এমন এক নির্মল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে—যেখানে কোনপ্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারিবে না। ইহাই তোমার স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা। তুমি যখন স্থিতপ্রজ্ঞ, তুমি তখন শুদ্ধচিত্ত। তুমি যখন শুদ্ধচিত্ত তখন কি বস্তুসমূহের আকর্ষণে তোমার শ্রান্তচিত্ত ধরা দিবে?" বৌদ্ধ-ধ্যান-সম্প্রদায়ের মতে সকল কিছুই বুদ্ধস্বভাব। এই দৃষ্টিতে দেখিলে বাহির বা ভিতর বলিয়া কিছুই নাই। উভয়ে একই সত্যের মধ্যে বিরাজমান। নির্বান ও সংসারের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহারাও একই সত্যে স্থিত। ছেঙ্গ-হাও নিজেও জীবন সম্বন্ধে এই একই ধারণা ভাষান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন।

নব্য কনফ্যুসীয়রা প্রাচীন ও নূতনের সমন্বয় সাধনের প্রয়াসে যে নূতন দর্শন সৃষ্টি করিলেন এখনও চীনদেশের সাধারণ জনচিত্তের উপর তাহার প্রভাব অপরিসীম। পরবর্তী কালে যখন চীনে বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটিল তখন এই নূতন আন্দোলনে বৌদ্ধধর্মের স্থান কতটুকু ছিল তাহা লোকে ভুলিয়া গেল। এই কথা অস্বীকার করা যায় না যে বৌদ্ধ ধ্যান ও থিয়েন-থাই-সম্প্রদায় ইহার সহায়তা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদর্শনের মূল তত্ত্বগুলি গ্রহণ করিয়া এই নূতন দর্শন বিশ্বজনীনতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং চীনের পণ্ডিত ও জ্ঞানীদের কাছে বৌদ্ধমতবাদ অনাবশ্যক তথা প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল।

চীনা সভ্যতার বিকাশে ভারতবর্ষের দান প্রভূত। ভারত হইতে কয়েক প্রকার ধর্মবিশ্বাস চীনদেশে প্রসার লাভ করে; তাহা ছাড়াও বৌদ্ধধর্ম চীনে পুনর্জন্মতত্ত্ব, কার্যকারণবাদ, প্রতিদান ও প্রতিগ্রহ-বিশ্বাস ইত্যাদির প্রবর্তন করিয়াছিল। যদিও কনফ্যুসীয় নীতিদর্শন জীবনের ভাবধারার উপর কতকগুলি ব্যবহারিক নীতি আরোপ করিয়াছিল তথাপি উপরোক্ত তত্ত্বগুলি চীনাদেশের মনের গভীর অন্তঃস্থলে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল যে তাহা সহজে বিনষ্ট হয় নাই। বৌদ্ধদর্শন এবং বিশেষভাবে তদোক্ত পরমতত্ত্বের বিশ্বব্যাপকতা ও জগতের ক্ষণিকতা চীনের কবি ও শিল্পীদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহা চীনের বৌদ্ধধর্ম সৌন্দর্য সৃষ্টি ও নন্দনতত্ত্বের এক নূতন অধ্যায় রচনা করিল। চীনের থাং-রাজত্বকালে (T'ang) কবিগণ এই ধারাই অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের অন্তরের সুনিবিড় যোগ ছিল। প্রকৃতির সহিত তাঁহারা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ মনে করিতেন। জগতের সমস্ত কিছুই ভাসমান মেঘের মতো ক্ষণিক ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। সেই হেতু তাঁহাদের

অন্তরে গভীর বেদনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীরা গাছের সবুজ পাতা, পাখীর মধুর গান প্রভৃতি প্রকৃতি-রাজ্যের বিভিন্ন বস্তুতে সেই পরমতত্ত্বের ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাইতেন। বৌদ্ধধর্ম চীনাদের হৃদয়ে প্রগাঢ় ধর্মবোধ ও গভীর বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ প্রেরণায় চীনের বিখ্যাত শিল্পসৃষ্টি অদ্যাবধি য়ুন-কাঙ্গ (Yun-Kang), লুঙ্গ মেন (Lung-men), তুঙ্গ-হুয়াঙ্গ (Tung-Huang) এবং অন্যান্য স্থানের চিত্রাবলীর মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্মের স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

গ্রন্থবিবরণী

বাগচী, প-সি : ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড চায়না।

এলিয়ট, সার চার্লস্ : হিন্দুইজম্ অ্যাণ্ড বুদ্ধিজম্ ৩য় খণ্ড।

য়ু-লান্, ডাঃ ফুঙ্ : দি স্পিরিট অব চাইনীজ ফিলসফি, ই, আর চিউজেস্ অনূদিত।

শি, ডাঃ যু : ডেভেলপমেণ্ট অব ঝেন্ বুদ্ধিজম্ ইন চায়না (চাইনীজ সোশ্যাল অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ, ১৫শ খণ্ড ১৯৩১)

পেলিয়োঁ, পি : মো-ৎস্থ ওঁ লৌ হুত্ লেভে (তুঙ্ পাও, ১৯শ খণ্ড)।

উইগের : প্যের-এল্ : ইস্তোয়ার দে ক্রোয়াইয়ঁস্ রেলিজিয়ুস্ এ দেজ্ ওপিনিয়ঁ ফিলসফিক্ অঁ চায়না।

ফুজিশিমা : লা বুদ্ধিস্‌ম্ জাপোনায়।

লিবেন্‌থাল, ডব্লিউ : সেক্রেড বুকস্ আব চাও।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

চীনের দশটি বৌদ্ধসম্প্রদায়

'চীনা বৌদ্ধধর্ম' অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম চীন দেশে যে বিশিষ্ট আকার লইয়াছিল তাহার সূচনায় কতগুলি চীনা বৌদ্ধধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব লক্ষিত হয়। এইরূপ চীনা বৌদ্ধধর্ম-সম্প্রদায়ের নাম—ত্‌সুঙ্‌ (Tsung)। ভারতবর্ষের বৌদ্ধসম্প্রদায়ের (হীনযান কিম্বা মহাযান) নামগুলি হইতে ইহাদের নাম পৃথক এবং চীনাসম্প্রদায়গুলি ভারতীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায়গুলির অনুকরণ কিম্বা অনুসরণ নয়। ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতবাদ চীনদেশবাসীরা যে রকম বুঝিয়াছিল ও ধারণা করিয়াছিল তাহা হইতেই ইহাদের উদ্ভব। এই সকল মতবাদগুলি চীনে পৌঁছায় ঘটনাবশতঃ,—ভারতবর্ষের বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা ও চীনের তীর্থান্বেষী পণ্ডিত সন্ন্যাসীরা (monks) চীনদেশে ইহা আনিয়াছিলেন।

অধিকাংশ চীনা বৌদ্ধসম্প্রদায়গুলির প্রতিষ্ঠা হয় পঞ্চম হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যকালে। ইহাদের ক্রমবিকাশ ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলির বৈশিষ্ট লুপ্ত হয়,—তাহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিয়া যায় ও পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। চীনা বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের আশ্রমে (monasteries) নানা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা একত্র থাকে,—সম্মিলিতভাবে ও একই সঙ্ঘে বাস করিতে তাহাদের কোনও অসুবিধা-বোধ হয় না। ইহাতেই তাহাদের সাম্প্রদায়িকত্ব-বোধের লঘুতা প্রতিপন্ন হয়।

চীনা বৌদ্ধসম্প্রদায় দশটি—চিরাগত মত অনুসারে এই গণনা ধরা হয়। ইহাদের নামগুলির উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের গৃহীত মুখ্য ধর্মশাস্ত্র হইতে, অথবা মৌলিক মতবাদ হইতে অথবা যে যে স্থানে তাহাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কিম্বা পরবর্তীকালে প্রাধান্য হইয়াছিল সেই সকল স্থানের নাম হইতে। যথা :—

১। ছঙ্‌-ষ (Cheng Shih অর্থাৎ 'সত্য সিদ্ধি')।

২। সান্‌ লুন্‌ (San Lun অর্থাৎ 'তিন শাস্ত্র')।

৩। ছান্‌ (Meditation অর্থাৎ 'ধ্যান'। সংস্কৃত 'ধ্যান' শব্দের চীনা বিকৃতি)।

৪। ত্যেন্‌-তাই (Tien-Tai—চীনের চেকিয়াং প্রদেশের একটি বৌদ্ধমঠের নাম হইতে। নামান্তরে ফা-হ্‌বা—Fa-Hwa সৎ-ধর্ম)।

৫। ল্যেন্‌ (Lien অর্থাৎ 'পদ্মফুল'। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কোনও পদ্মফুল-ময় জলাশয়ের তীরস্থ একটি মঠে থাকিতেন বলিয়া)।

৬। ফা-শিয়াঙ্ (Fa-Hsiang—নামটি এই সম্প্রদায়ের 'ধর্মলক্ষণ' নামক প্রধান ধর্মশাস্ত্রের চীনা অনুবাদ)।

৭। ছু-ষ (Chu-Sha—'অভিধর্মকোশ-শাস্ত্র' ইহাদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র। নামটি সংস্কৃত 'কোশ' শব্দের চীনা অনুলেখন)।

৮। হ্বা-যন্ (Hua-Yen—ইহাদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র 'অবতংশ-শাস্ত্রে'র চীনা অনুবাদ)।

৯। লু (Lu—সংস্কৃত 'বিনয়' শব্দের চীনা অনুবাদ। নামান্তরে Nan-San অর্থাৎ 'দক্ষিণের পর্বত'। চীনের 'ষষি' (Chensi) প্রদেশের যেস্থানে এই সম্প্রদায়ের প্রধান্য হয়।

১০। চন্-যন্ (Chen-Yen অর্থাৎ 'সত্য-বাণী'। নামান্তরে 'মি-চ্যা-ও' Mi-Chino বা 'গুহ্য-শিক্ষা')।

এই সম্প্রদায়গুলি পরস্পর-বিরোধী নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ৩নং, ৫নং ও ১০নং সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর কালক্রমে এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে এই তিন সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় না বলিয়া চীনা বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন মতবাদ-দ্যোতক বা বিভিন্ন আকৃতি-ব্যঞ্জক প্রতিষ্ঠান বলা সমীচীন হইবে।

এই দশটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ৫নং সর্ব-প্রাচীন। ইহা ৩৩৫ হইতে ৪১৬ শতাব্দীর মধ্যকালে প্রতিষ্ঠিত হয় ও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ইহার প্রভাব চলিয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম—হ্বি-য়ে্বন (Hui-Yuan) চীনে 'তাও' ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের যে সমীকরণ চলিয়াছিল এই সম্প্রদায় সম্ভবতঃ তাহার প্রথম ফল-স্বরূপ। ইহার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং একজন উৎসাহী 'তাও' পুরোহিত ছিলেন এবং তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার পরও 'তাও' ভাবাপন্ন ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের তিনটি প্রধান ধর্মগ্রন্থ,—তাহার মধ্যে দুইটি দীর্ঘ ও হ্রস্ব সংস্করণে মহাযানী সংস্কৃত 'সুখাবতী-ব্যূহ' গ্রন্থ বৌদ্ধ স্বর্গধামের বর্ণনা করে। এই চিরসুখের স্বর্গ, যেখানে ভক্তিমান্ সাধক একবার প্রবেশ করিলে অমৃতত্বের অধিকারী হয়, ইহা 'তাও' ধর্মের প্রকৃতিগত সৌন্দর্য ভোগ-স্পৃহা ও অতীন্দ্রিয়ের লিপ্সার অনুকূল ছিল ও 'তাও' ধর্মীদের মন তাহাতে উপবিষ্ট হইয়াছিল।

চীনদেশে তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে 'বু' (Wu) নামক যাজক-দল যে একটি ঐন্দ্রজালিক তন্ত্রের সাধন করিতেন তাহার মূলে ছিল অমরতা-লাভের স্পৃহা। প্রাচীন 'তাও গ্রন্থে'র (Book of Tao) 'তাও'-বাদে ও 'তাও' দার্শনিক 'চুঙ্-ত্সে'র (Chungtse) লেখায় যে অতীন্দ্রিয়ের অনুবর্তিতা (Mysticism) দেখা যায় তাহাতে এই 'বু' মতবাদের মিশ্রণ ও বিকৃতি রহিয়াছে। 'বু' যাজকগণ স্বর্গলাভের পন্থা ও অমরত্ব-প্রাপ্তির[১] উপায়

স্বরূপ একপ্রকার 'স্বর্ণতন্ত্রের' (Alchemy) সাধনা করিতেন। 'পদ্ম-সম্প্রদায়ে'র (Lotus School) 'তাও'-ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা এই সাধনার একটি অধ্যাত্মিক আকার দিয়াছিলেন ও ইন্দ্রজাল এবং স্বর্ণতন্ত্রের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক উপায় ধার্য করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের একটি মতবাদ—'পাই-তো' (Pai-to) অর্থাৎ স্বর্গ প্রাপ্তির 'শ্বেতবর্ণ পথ' (White Way) যে পথে স্বয়ং বুদ্ধদেব (মহাযানী 'অমিতাভ' নামে) তাঁহার বিশ্বাসী ভক্তগণের আত্মাকে চালাইয়া লইয়া যান। এই মতবাদ এইভাবে ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতা ও কাঠিন্য বাদ দিয়া কেবলমাত্র অমিতাভের কাছে নিরন্তর আবেদনে সরল বিশ্বাস-স্থাপন প্রচার করে। এই মতবাদ হইতে চীনদেশীয় 'অমিতাভ-ভক্তি'র পথ, (Amidism) প্রবর্তিত হইয়াছে।[২] অমিতাভ-পন্থীরা শাস্ত্রীয় 'সুখাবতী ব্যূহকে' 'পশ্চিমেস্থিত স্বর্গ' বা 'নিষ্কলুশ দেশ' বা 'পবিত্র রাজ্য' (Pure Land) নাম দিয়া থাকে।

সম্ভবতঃ চীনা-বৌদ্ধধর্মে ৩নং সম্প্রদায় ইহারই পরবর্তী। 'পদ্ম-সম্প্রদায়ে'র প্রধান শিক্ষা—বিশ্বাস ; ছান-সম্প্রদায়ের—স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের শক্তি (Power of Intuitive Knowledge)। এই পরিত্রাণকারী স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বিশুদ্ধ ধ্যানের দ্বারা সহসা কোনও মুহূর্তে লাভ হয়। এই বিশুদ্ধ ধ্যান শূন্যের ধ্যান। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের মতানুসারে সর্বপ্রধান ক্রিয়া ধ্যানে মনঃস্থাপন। বৌদ্ধধর্মে ধ্যান-তত্ত্ব প্রাচীন,—হীনযান হইতে মহীযান বৌদ্ধধর্মে চলিয়া আসিয়াছে। ইহার মূলে স্বীকৃত কথা (Postulate) এই যে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে বুদ্ধদেবের 'বোধি-চিত্ত' বা 'ধর্ম-কায়' (যাহাকে চীনাভাষায় 'ফা যন্' বলে) গুহ্যভাবে বর্তমান আছে। বিশুদ্ধ ধ্যানের দ্বারা ভক্ত তাহার সহিত একাত্ম হইতে হইবে,—এই সাধন প্রণালীকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হয় 'বোধিচিত্ত-উদ্বোধন'।

প্রবাদ এই যে বোধিধর্ম নামে একজন ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই মতবাদের প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে ৫২০ হইতে ৫২৬ শতাব্দীর মধ্যকালে চীনের কেন্‌টন্ সহরে আসেন তাঁহার কার্যকলাপ ও জীবনী সম্বন্ধে চীনদেশবাসীরা অনেক অলৌকিক কাহিনী রচনা করিয়াছে।[৩]

চীনের ইতিবৃত্তে তৎকালীন চীন সম্রাট 'বুতি' (Wu-ti) ও বোধিধর্মের সাক্ষাৎ-কালের একটি বিবরণ আছে। তাহা হইতে প্রতীত হয় যে বোধিধর্ম নাগার্জুন-প্রবর্তিত মহাযানী শূণ্যবাদের অনুবর্তী ছিলেন।[৪]

বোধিধর্ম প্রচার করিতেন যে সৎকার্যের দ্বারা গুণ লাভ হয় না, শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারাও নয়। এবং চীনা সম্রাটকেও তিনি বলিয়াছিলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলই যখন শূন্য তখন

পবিত্র (Holy) বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই মতবাদ প্রচারের ফলে 'তাও'-ধর্মীদের কাছে বোধিধর্ম 'ত্সিন্ (Tsin) রাজবংশের প্রারম্ভ কালের প্রসিদ্ধ 'বংশকুঞ্জবাসী সপ্ত-ঋষির' (Seven Sages of the Bamboo Grove) দলের এক-জন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিলেন। এই 'তাও' ঋষিদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া জনৈক কন্‌ফিউসিয়ান্ ঐতিহাসিক এইরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন: "ইহারা 'শূন্য' ও 'নৈষ্কর্ম'কে (Non-action) শ্রদ্ধা করে ও উচ্চ প্রতিষ্ঠা দেয় ও নীতি এবং ক্রিয়াকর্মকে অবজ্ঞা করে। মদ্যপানে বিভোর থাকে ও সাংসারিক বিষয়-কর্ম অবহেলা করে।"[৫]

'তাও' গ্রন্থ 'তাও তে চিঙ্' (Tao Teh Ching) ও 'তাও' লেখক চুঙ্‌ত্সের চটক্‌দার রসিকতা ও গাম্ভীর্য মিশ্রিত নিবন্ধগুলির সহিত বোধিধর্মের প্রচারিত মত যেমন করিয়াই হউক মিলিয়া গিয়াছিল। চীনা পণ্ডিত লিন্ যুতাঙ্ (Lin Yutang) বলেন: "চুঙ্‌ত্সের রহস্যবাদের কোনও কোনও বৈশিষ্ট্য, যথা আত্ম-জ্ঞান-বর্জন, সমাহিত ধ্যান ও 'নির্জনের' দর্শন-লাভ ("Seeing the Solitary") হইতে উপলব্ধি হয় যে চীনের নিজস্ব কতগুলি কল্পনা 'ছান্' বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশের পশ্চাতে রহিয়াছে।"[৬]

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে 'ছান্' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয় ও সেইকাল হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া চীনে ইহার প্রভাব ছিল। ইহা হইতে পাঁচটি উপ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় ও তন্মধ্যে 'লিন্-চি' (Lin-Chi),—স্থানগত নাম,—সম্প্রদায় এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু চীন অপেক্ষা জাপানেই 'ঝেন্' নামান্তরে এই সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তারলাভ করে এবং এখন পর্যন্তও এই সম্প্রদায়ের জাপানী কেন্দ্র কিয়োটো-সহরে ইহার বহুল প্রভাব।

এই চীনা 'ছান্' সম্প্রদায়ের মতবাদ কন্‌ফিউসিয়ান্ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পঞ্চাশৎ-শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক 'ওয়াঙ্-ইয়াং-মিঙ্' (Wang Yang Ming) তাহার এক গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে 'ছান্' সম্প্রদায়ের মূলগত মতবাদ কন্‌ফিউসিয়ান্ দার্শনিক মেন্‌সিয়াসের 'লিয়াঙ্ চি' (Liang-Chih) অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ বা সহজ জ্ঞান, (Intuitive knowledge), যাহা মানুষের মন আপন মনের ধ্যান করিয়াই লাভ করে, তাহার পরিকল্পনাতেই নিহিত ছিল।[৭]

৪নং সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল 'ছান্' মতবাদ হইতে এবং ইহার আত্যন্তিক মায়া-বাদের প্রতিবাদরূপে। বৌদ্ধধর্মে একটা আভ্যন্তরীন সমন্বয়-সাধনের জন্য চীনা-মনের একটা স্বকীয় প্রচেষ্টা ইহার মতবাদে দেখিতে পাই। এই মতের ভিত্তি নামতঃ 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' শাস্ত্র এবং সম্প্রদায়ের অন্যতম নাম এই শাস্ত্রের নাম হইতে গৃহীত। কিন্তু ঐ শাস্ত্রে 'মৌলিক বুদ্ধত্ব' (পন্-Pen) ও 'ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ বুদ্ধত্ব' (চিন-Chin)

লইয়া যে পার্থক্য সূচিত হইয়াছে, যাহা 'পদ্ম' সম্প্রদায়ে'র শাস্ত্রেও স্বীকৃত, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া বুদ্ধদেবের সমগ্র শিক্ষাবলী (হীনযান ও মহাযান উভয় জাতীয়) এক নূতন সমন্বয়ে আনিবার চেষ্টা আছে। এই সমন্বয়-চেষ্টায় বুদ্ধদেবের জীবন পাঁচটি কালে এবং তাঁহার শিক্ষাবলী এই কালানুক্রমে বিভক্ত করা হয়। বুদ্ধ-বচনগুলিতে বাহ্যতঃ যে সকল অসামঞ্জস্য গোচর হয় তাহা মহাযানীদের স্বীকৃত এই মতবাদ—যে বুদ্ধদেব তাঁহার শ্রোতাদের বোধ-ক্ষমতা অনুসারে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাহার বাক্য দ্ব্যর্থবোধক,—এক অর্থ সাধারণ লোকের বোধের উপযোগী ও অন্য অর্থ গূঢ়,—তাহাদ্বারা নিরসন হয়।

শাস্ত্রীয় বাক্যের অর্থ গ্রহণের জন্য এই সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ ব্যাখ্যা-পদ্ধতি ছিল। এড্‌কিন্‌স (Edkins) বলেন : "'ত্যেন-তাই' সম্প্রদায়ের (Tien Tai) বিশিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল এই যে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি বিনা বিচারে আক্ষরিকভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ও তাহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা (যাহা মায়াবাদ-মতাবলম্বীরা করিতেন),—এই দুইয়ের মধ্যে একটি মধ্যপথ বাহির করা। বৌদ্ধ ধর্মের এই উভয় প্রকারভেদই ইহার ক্রম-বিকাশের অঙ্গ ইহা মানিয়া লইয়া সেই সঙ্গে উভয়ের সামঞ্জস্য-সাধনের জন্য একটি তৃতীয় রীতি যাহাদ্বারা এই উভয় প্রকার স্বতন্ত্র করিয়া, তুলনা করিয়া ও সমঞ্জস করিয়া একটি মধ্যপথ গ্রহণ করা যায়,—ইহাই 'ত্যেন-তাই' সম্প্রদায় সমীচীন মনে করিত।[৮]

১নং ও ২নং সম্প্রদায় অল্পকালই জীবিত ছিল ও সম্ভবতঃ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। প্রথম সম্প্রদায়টির মূল শাস্ত্র একখানি গ্রন্থ যাহার সংস্কৃত ভাষায় নাম —'সত্যসিদ্ধি শাস্ত্র'। এই নাম হইতেই সম্প্রদায়ের নাম 'সত্যসিদ্ধি' হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়কে ভারতবর্ষীয় মহাযানী মাধ্যমিক-পন্থীদের 'সৌত্রান্তিক' শাখার চীনা সংস্করণ বলা যাইতে পারে। ২নং সম্প্রদায়ের মূল-শাস্ত্র আচার্য নাগার্জুনের দুইখানি ও নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেবের লিখিত একখানি গ্রন্থ।

৬নং, ৭নং এবং ৮নং সম্প্রদায় ভারতবর্ষীয় কোনও কোনও মহাযানী সম্প্রদায়ের অধ্যাত্ম-দর্শনের মতবাদ-পুষ্ট,—ইহাতে চীনা বৌদ্ধদার্শনিকদের নৈয়ায়িকতা প্রতিফলিত। ইহার প্রত্যেকটিকেই কোনও বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাসের প্রতিপাদক না বলিয়া, কোনও নৈয়ায়িক দর্শনের প্রস্তাবক বলা যায়। ৬নং সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বিখ্যাত চীনা পণ্ডিত ও অনুবাদক য়ুয়ান চোয়াঙ (Yuan Chwang)। তিনি ষোল বৎসর ভারতবর্ষে শিক্ষালাভ ও তীর্থপর্যটনে কাটাইয়া ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন ও বাকি জীবন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগ্রন্থরাজি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতবর্ষের মগধপ্রদেশে নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নিকট তিনি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেইজন্য য়ুয়ান চোয়াঙ-স্থাপিত এই সম্প্রদায় শীলভদ্রকেই ইহার আদি-

প্রতিষ্ঠাতা মনে করে। ৮নং সম্প্রদায় একাত্ম-বাদী (Monoist) ছিল। তাহাদের প্রধান মতবাদ 'তাও' দর্শনের সহিত সমঞ্জস ছিল,—তাহা কোনও অদ্বিতীয় পরম অস্তিত্বে বিশ্বাস, যে অস্তিত্বের মধ্যে সকল পার্থক্য মিলাইয়া যায় এবং সকল বৈপরীত্যই পরম একের (Primal one) বিভিন্ন প্রকাশরূপে প্রতিভাত হয়।[৯]

কতগুলি প্রধান প্রধান চীনা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল 'তাও' মতবাদের পৃষ্ঠ-ভূমিতে, কারণ 'তাও' ধর্মের সহিত ভারতীয় মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতগত ও মতবাদগত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘনিষ্ঠতা আছে। ইহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি।

কিন্তু কনফিউসিয়ান্ মতের সহিত বৌদ্ধমতের অনেক বিষয়ে প্রতিবাদিতা ছিল। প্রথমতঃ উহার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তীক্ষ্ণভাবে ইহলোকে হিতের দিকে ও সম্পূর্ণভাবে মানুষের জীবন-যাত্রার দিকে—বৌদ্ধধর্মের দিক্ পারলৌকিক। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে উহার মূলগত মতবাদ গার্হস্থ্যজীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত,—ইহা বৌদ্ধধর্মের যে সন্ন্যাস-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে তাহার বিরুদ্ধ। চীনা বৌদ্ধধর্মের সুদীর্ঘ ও বিচিত্র ইতিহাসে কন্‌ফিউসিয়ান্ লেখকদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি আক্রমণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাহার মধ্যে চীনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ৮১৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট 'শ্যেন্-ত্‌সুঙ্গের (Hsien Tsung) প্রতি কন্‌ফিউসিয়ান্ লেখক 'হান্-য়ু'র (Han Yu) একখানা পত্র-লিপি। ইহাতে লেখক সম্রাটের বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার নিন্দা করিয়াছেন।[১০] চীনা পণ্ডিতরা এই লিপিখানিকে প্রাচীন চীনা-ভাষার লেখন-ভঙ্গীর সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনাস্বরূপ মনে করেন।

তথাপি হীনযানী বৌদ্ধধর্ম ও কন্‌ফিউসিয়ান্ মতবাদের মধ্যে একটি মিলনের স্থল ছিল। তাহা আত্ম-সংযম ও ব্যক্তিগত ব্যবহারে সমীচীনতার গুরুত্ব-নির্দেশে। কন্‌ফিউসিয়ান মতবাদকে কেহ কেহ 'লী'র ধর্ম বলিয়াছেন। চীনা 'লী' (Li) কথাটির অন্য ভাষায় অনুবাদ দুরূহ। ইহা কন্‌ফিউসিয়ান্ শিক্ষার মর্মকথা। 'লী' কথাটির দুইটি ভাবার্থ,—প্রথম অর্থে, যাহা ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে প্রযোজ্য, 'লী' সকল কর্তব্য বিষয়ে উপযুক্ততা বা সমীচীনতা প্রকাশ করে; দ্বিতীয় অর্থে, যাহা সমাজের জীবনযাত্রায় প্রযোজ্য, 'লী' প্রকাশ করে সুশৃঙ্খলতার পদ্ধতি অথবা প্রত্যেক বিষয় যথাস্থানে স্থাপনের রীতি।[১১] প্রথম অর্থে 'লী'র সহিত হীনযানী বৌদ্ধধর্মের 'বিনয়ের' সাদৃশ্য আছে। সেই কারণে অন্ততঃ একটি চীনা বৌদ্ধসম্প্রদায় 'বিনয়ের' উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ৯নং সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম—তাও-শ্বেন (Tao Hsuan)। ইঁহার জীবিত-কাল ৫৯৫-৬৬৭ খৃষ্টাব্দ। তাও-শ্বেন তাঁহার নিয়মাবলীতে সংযম ও কৃচ্ছ্র-সাধনের উপর জোর দিয়াছেন। হীনযানী বৌদ্ধধর্মের ভাব ইহাতে অনেকটা গৃহীত হইয়াছে এবং এই

সম্প্রদায়ের প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ ভারতীয় 'ধর্মগুপ্ত'—বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিনয়পিটক। এই 'লূ' সম্প্রদায় এখনও চীনদেশে বর্তমান আছে: কিয়াঙ্‌সু (Kiangsu) প্রদেশের 'পাও-হুয়া-শুন' (Pao-hua-shun) মঠ এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল। এই 'লূ' সম্প্রদায়ের কনূফিউসিয়ান্ ভাবান্বিত, কিন্তু ইহার অন্তর্বস্তু (Contents) বৌদ্ধ।

সর্বশেষ চীনা বৌদ্ধ সম্প্রদায়—১০ নম্বর; অষ্ট শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা একটি গুহ্যজ্ঞানাবলম্বী সম্প্রদায়,—সেই জন্য ইহার নাম 'সত্য বাণী, বা 'গুহ্য শিক্ষা'। ইহার প্রেরণা ছিল ঐ যুগের ভারতীয় বৌদ্ধধর্মে প্রবর্তিত তান্ত্রিকতায়। বজ্রবোধি-নামক জনৈক ভারতীয় সন্ন্যাসী (যিনি ৭৩০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে মারা যান) চীনা জনসাধারণের মধ্যে ইহা প্রচলিত করেন। ইহার উচ্চাঙ্গে একমাত্র বুদ্ধ-আত্মা বৈরোচনের সাধনা, যিনি নানা নির্গমন-পথে ও নানা প্রতিবিম্বে (emanations and reflexes) আত্ম-প্রকাশ করেন। কিন্তু ইলিয়ট্ (Eliot) সাহেবের মত যে, "ইহার নিম্নশ্রেণীর ও সাধারণ-গ্রাহ্য অংশ নানা দেবতার পূজা, জড়পদার্থে-যাদু-ক্ষমতা আরোপ (Fetishism) ও যাদুবিদ্যার চর্চা মাত্র।[১২]

চীনদেশীয় লোকের জন্য এই সম্প্রদায়ের প্রধান আকর্ষণ ছিল ইহাদের যাদু-প্রক্রিয়ার ও মন্ত্র-তন্ত্রের বহুল ব্যবহারে। স্মরণাতীত কাল হইতে চীনদেশবাসীরা ক্রিয়া-কাণ্ড দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অদৃশ্য শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করা যায় এই বিশ্বাস পোষণ করিয়াছে। এখনও মৃতব্যক্তিদের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য একশ্রেণীর প্রাচীন ক্রিয়া-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহা সমধর্মিত্ব-মূলক যাদুর (Sympathetic Magic) উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি চীনদেশের দার্শনিক মতবাদও এই প্রকার যাদু-ক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করে নাই: চীনের প্রাচীন গ্রন্থ 'ক্রিয়া-পদ্ধতি' (Book of Rites) তেরোখানা প্রাচীন ও প্রামাণ্য কনূফিউসিয়ান্ গ্রন্থাবলীর অন্যতম। সুতরাং তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ যাহার পশ্চাতে আছে রহস্যান্বেষী (Mystic) একটি বিশেষ চিন্তাধারা, তাহা চীনা মনোভাবের সহিত অসঙ্গত হয় নাই এবং এই তান্ত্রিক 'সত্য বাণী' সম্প্রদায়ের এত প্রভাবশালী হইয়াছিল যে ইহার প্রভাব অন্যান্য সম্প্রদায়ে ও ব্যাপ্ত হয় এবং চীনদেশে সাধারণে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের পরবর্তীকালের রূপে এমন একটি বিশেষ রং ফলাইয়াছিল যে তাহাতে তিব্বত হইতে প্রবর্তিত লামা-ধর্মের সহিত চীনা বৌদ্ধধর্ম মিশিয়া যায়।

ধর্মগ্রন্থ-সংগ্রহ—চীনদেশীয়দের সহজাত সাহিত্যিক পটুতা ও লিখিত বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবচন-গত। চীনে বৌদ্ধধর্মের ভারতবর্ষীয় প্রথম প্রচারকেরা চীনদেশীয়দের প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য বুঝিয়া তাহার অনুযায়ী কার্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা চীনের লোকদিগকে এই নূতন ধর্মবিষয়ক লিখিত গ্রন্থ অপর্যাপ্ত পরিমানে জোগাইতে লাগিলেন।

চীনের প্রথম বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান,—লোয়াঙ (Loyang) সহরের 'শ্বেতাশ্ব বিহার' (White Horse Monastery),—বহু শতাব্দী ধরিয়া গ্রন্থপ্রণয়ণের মধুচক্র (Bee-hive) স্বরূপ ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ তাহাদের হস্তগত হইলেই তাহা চীনাভাষায় অনূদিত হইত। ইহাতে চীনাভাষায় অনেক নূতন নূতন শব্দ-সংগ্রহ হইতে লাগিল,—তাহা বৌদ্ধ-শাস্ত্রের পরিভাষার ও বৌদ্ধনামের আক্ষরিক চীনা অনুবাদের প্রয়োজনেই নয়, এতৎসঙ্গে একরকম নূতন ভাষা-বিশেষেরও স্মৃষ্টি হইল। তাহাকে 'বৌদ্ধ মাণ্ডারীণ' (Buddhist Mandarin) ভাষা বলা হয়,—তাহা চীনের প্রাচীন-গ্রন্থগত শুদ্ধ-ভাষা ও ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির ভাষা হইতে পৃথক।

ইতিহাসের দিক্ হইতে চীনা বৌদ্ধগ্রন্থসংগ্রহের মূল্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ভারতবর্ষে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের ক্রম-বিকাশের ধারা সম্বন্ধে বর্তমানে যে অজ্ঞতা আছে তাহাতে এই সকল গ্রন্থ হইতে রশ্মিপাত হয়, কারণ ভিন্ন ভিন্ন মহাযানী সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থগুলির কিছু কিছু আমরা কালানুক্রমে স্থাপিত করিতে পারি। অধিকন্তু বহু মহাযানী গ্রন্থ, যাহার প্রথম লিপি এখন আর পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা এই চীনা গ্রন্থ-সংগ্রহে চীনাভাষায় অনূদিত হইয়া আছে, যদিও সেই সকল অনুবাদের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ হীনযানী বৌদ্ধধর্ম ও মহাযানী বৌদ্ধধর্মের পারস্পরিক সম্বন্ধ, যাহা এখনও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অদ্যাবধি অনির্ণীত প্রশ্ন, তাহা এই গ্রন্থগুলি হইতে নূতন দৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে, যদিও চীনের বৌদ্ধদের হীনযান ও মহাযানের পার্থক্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারনা ছিল না। কয়েকটি ভিন্ন এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে অনুবাদ, কিন্তু ইহার কোনও কোনও বাক্য ও প্রকাশ ভঙ্গীতে মনে হয় যে লেখকেরা ইহার পূর্বের লিখিত পালিগ্রন্থগুলিও ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেক সংগ্রহের এক অংশ 'হীনযানী' বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু যে সকল গ্রন্থ ভারতবর্ষে মহাযানী গ্রন্থরূপে ধরা হয় তাহারও কিছু কিছু ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। ইহাতে এই দুরূহ প্রশ্ন ওঠে যে এই হীনযান ও মহাযান শ্রেণী বিভাগ চীনা তালিকা-কারের অজ্ঞতাপ্রসূত অথবা ভারতবর্ষেই হীনযান ও মহাযানের মধ্যে কোনও দুর্জ্ঞেয় অন্তঃসংযোগের ফল।

টীকা

১। চায়না: এ শর্ট কালচারাল হিষ্ট্রী পৃ ২৬২-৯ দ্রষ্টব্য

২। "আমিদা বাদ এ আদি গৌতমের পরিবর্তে আমিদা বা অমিতাভের নাম ব্যবহার করা হয়...... তিনি চীনা বর্ণিত শি তিয়েন (Hsi Tien), পশ্চিম স্বর্গ বা অপূর্ব সুখাবতী স্বর্গে পদ্ম হইতে জাত......নরক

যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পশ্চিম স্বর্গে পুনর্জন্ম লাভার্থে আমিদার নাম গ্রহণই যথেষ্ট"—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২৮১

৩। হিন্দুইস্‌ম্ অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্‌ম্ ৩য়খণ্ড পৃ ২৫৫-৬

৪। ঐ পৃ ২৫৫

৫। চায়না : এ শর্ট কালচারাল হিষ্ট্রী পৃ ২৬২-৩

৬। উইস্‌ডম্ অব চায়না পৃ ৬৭

৮। চাইনীস্ বুদ্ধিস্‌ম্ ৩য়খণ্ড পৃ ১৮৬

৯। চায়না ; এ শর্ট কাল্‌চারাল্ হিষ্ট্রী পৃ ২৮৪

১০। গিল্‌স্-এর 'চাইনীজ লিটারেচার' এ পৃ ২০১ ও ২০২-এ এই বিখ্যাত পত্রের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ উদ্ধৃত আছে এবং 'হিন্দুইস্‌ম্ অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্‌ম্' এ পৃ ২৬৬-৭ তে গিল্‌স্-এর অনুবাদের আংশিক উদ্ধৃতি আছে,

১১। উইস্‌ডম্ অব কন্‌ফুশিয়াস

১২। হিন্দুইস্‌ম্ অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্‌ম্ ৩য়খণ্ড পৃ ৩১৭

পুস্তক বিবরণী

এলিয়ট, সার চার্লস : হিন্দুইস্‌ম্ অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্‌ম্ ৩য় খণ্ড (১৯২১)

ম্যাকনেয়ার, এইচ্, এস্, সম্পাদিত : চায়না, (১৯৪৬)

বীল : ক্যাটেনা অব বুদ্ধিস্ট স্ক্রিপচারস্ (১৮৭১)

য়ুটাঙ্, লিন্ সম্পাদিত : দি উইস্‌ডম অব চায়না (১৯৪৮)

লা তুরেৎ, কে, এস্ : দি চাইনীজ্, দেয়ার হিষ্ট্রী অ্যাণ্ড কাল্‌চার (১৯৪৬)

বাগচী, পি, সি : ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড চায়না (১৯৪৪)

ফিট্‌জেরাল্ড, সি, পি : চায়না, এ শর্ট কাল্‌চারাল্ হিষ্ট্রী (১৯৪২)

য়ুটাঙ্, লিন্ : দি উইজডম্ অব কন্‌ফুশিয়াস (১৯৩৮)

এডকিন্স, জোসেফ : চাইনীজ্ বুদ্ধিস্‌ম্ (ট্রুবনারস্ ওরিয়েণ্টাল সিরীজ্)

নানজিও, বি, : এ ক্যাটালগ্ অব বুদ্ধিস্ট ত্রিপিটক (১৮৩৩)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জাপানের চিন্তাধারা

'শিন্‌তো' ধর্মকে 'দেবমার্গ' (The Way of the Gods) বলা হয়। ইহাতে এত অধিক পৌরাণিক কুসংস্কার আছে ও উগ্র-জাতীয়তাবাদের প্রলাপ আছে যে জাপানের চিন্তা ও কৃষ্টির পুষ্টিকর না হইয়া ইহা বরং হানিকরই হইয়াছে। তথাপি ইহাতে একটি ধারণা আছে যাহার সম্বন্ধে বলা যায় যে ইহা জাপানী জাতির পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার স্বকীয় ও বিশিষ্ট প্রকাশ। আমি 'কান্নাগরা' বা 'কান্নাগরা নো মিচি' (Kannagara বা Kannagara no michi) এই বাক্যটির নির্দেশ করিতেছি।

পণ্ডিতেরা, দেশ-ভক্তেরা এবং ঐতিহাসিকেরা, যাঁহাদের মন দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতায় ও ভাব-প্রবণতায় আতিশয্যে বক্রতা-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা এই বাক্যের অপব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতার্থে এই কথাটি জাপানী চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত-সার-স্বরূপ।

'কান্নাগরা' কথাটি যৌগিক : 'কান্‌ বা 'কামি'র অর্থ 'দেবতা' এবং 'নাগরা' অর্থ 'অনুসারে' 'সামঞ্জস্যে' বা 'যথা-ভাবে'। সুতরাং 'কান্নাগরা' কথাটির অর্থ : 'দেবতাদের অনুসারী হইয়া' বা 'দেবতাদের মতন হইয়া'। বিপদার্থে 'দেবতাদের ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া' অথবা 'দেবতারা নিজেরা যেমন সেইভাবে তাহাদের অনুসরণ করিয়া' অথবা 'দেবতাদের মতন হইয়া' বা 'নিজের মধ্যে দেবতাদের মূর্ত্তি প্রতিফলিত করিয়া'।

এই কথাটি প্রথম পাওয়া যায় 'নিহঙ্‌ শোকি' (Nihon Shoki) নামক জাপানের পৌরাণিক ইতিবৃত্তে। ইহা জাপান সম্রাট্‌ কোতোকু (Kotoku)-র রাজত্বকালে (খৃষ্টাব্দ ৬৪৫-৬৫৪) রচিত হয়। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে জাপান দেবকুল হইতে অবতীর্ণ রাজাদের দেশ। যে দেবগণ ছিলেন স্বর্গ-মর্ত্তে প্রারম্ভের সমকালীন জাপানের রাজারা তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া তাঁহাদের শাসন দেবতাদেরই ইচ্ছানুযায়ী।

ঐ 'কান্নাগরা' বাক্যটির অর্থ প্রথমতঃ রাজনৈতিক ছিল। কালক্রমে উহার অর্থ বহু-ব্যাপক হয়। ইহা কেবল রাজনীতি সম্পর্কেই ব্যবহৃত হইত না। ইহার তাৎপর্যে ধর্ম ও নীতিবাদের সুর আসিয়া পড়িল এবং 'দেবগণ ও বিশ্ব-প্রকৃতি একার্থদ্যোতক হইল। দেবতাদের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করা কি জীবন-যাপন করা আর প্রকৃতিকে তাহার সত্য-স্বরূপ গ্রহণ করা, অর্থাৎ প্রকৃতির উপর মানুষীবুদ্ধি চালনা না করা, একই কথা হইল। অষ্ট শতাব্দীর শেষ অংশে সম্ভবতঃ ওতোমো-নো-যাকামোচি (Otomo-

no-Yakamochi) সঙ্কলিত একখানি প্রাচীন জাপানী কবিতা-সংগ্রহ হইতে এই অর্থ পাওয়া যায়। এই কবিতা-সংগ্রহের নাম 'মান্যয়ো-শূ' (Mannyo-Shu) বা 'দশ সহস্র পত্রের সংগ্রহ'। 'মোতো-ওরি-নরিনাংগা' (Moto-ori Norinaga—খৃষ্টাব্দ ১৭৩০-১৮০১) 'কান্নাগরা' কথাটির ঐ অর্থ-ই স্ফুট করিয়া দিয়াছিলেন।

'দেবতাদের অনুযায়ী হইয়া'—এই কথাটির যতদিন রাজনৈতিক অর্থে প্রযুক্ত হইত, ততকাল ধারণাটি সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ বা দেবতার প্রতিনিধিভাবে রাজ্যশাসন-বাদের সহিত সম্বন্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল। এই সম্বন্ধ যে কি দুর্ঘটনাপ্রসূ জাপানের ইতিহাসে সম্প্রতি যাহা ঘটিয়াছে তাহা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। ধর্মান্ধ জাতীয়তা-বাদীরা ও আমার মতে অত্যন্ত কুসংস্কারাপন্ন শিন্-তো পণ্ডিতরা তাহাদের সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক পক্ষপাত সমর্থনের জন্য জাপানের চিন্তাধারা বিপথে চালাইয়াছিল। নরিনাংগা স্বয়ং এই সকল পক্ষিপাতিত্ব হইতে মুক্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মনের প্রসারের জন্য তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যবর্গ, যাঁহারা 'হিতারা আত্সুতানে'র (Hirata Atsutane—খৃষ্টাব্দ ১৭৭৬-১৮৪৩) নেতৃত্বাধীনে ছিল তাঁহাদের মত চরমপন্থী ছিলেন না।

যাহাকে আমরা ঠিক 'জাপানী চিন্তাধারা' বলিতে পারি তাহা অষ্টদশ শতাব্দী পর্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। যখন 'কামো-নো-মাবুচি' (Kamo-no-Mabuchi—১৬৯৭-১৭৬৯) ও 'মোতো-ওরি-নরিনাংগা' কন্ফিউসিয়ান্ মতবাদের বিরুদ্ধে জাপানের প্রাচীন 'দেবপন্থা'র চর্চা আরম্ভ করেন তখন ইহা স্পষ্ট হয়। তাঁহারা কন্ফিউসিয়ান্ মতের যুক্তিবাদ (rationalism) ও জাপানী কন্ফিউসিয়ান্-বাদীদের আক্রমণশীলতায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। এই জাপানী কনফিউসিয়ান-বাদীরা 'শিন-তো' সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিত এবং তাহার ফলে জাপানের রাজনৈতিক ও কৃষ্টিসম্বন্ধীয় ইতিহাসের যে বিশেষ তাৎপর্য আছে তাহা মানিত না। নরিনাংগা এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে জাপানদেশের পৌরাণিক কাহিনী যাহা কোজিকি, (Kojiki) ও নিহঙ শোকি, (Nihon Shoki) গ্রন্থে বর্ণিত আছে জাপানী কনফিউসিয়ানবাদীরা তাহার যুক্তিগত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 'মানুষী' (human) ব্যাখ্যার দিকেই ঝোঁক দিয়াছে। তিনি এই কথার উপর জোর দিতেন যে দেবতারা মনুষ্যপদবীর নন এবং পুরাণ-বর্ণিত তাঁহাদের অযৌক্তিক কার্যাবলী সেই বোধেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তাহার 'মানুষী' অর্থ করি, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে,—তাহাতে জাপানের ইতিহাসে কোনও অলৌকিক তাৎপর্য থাকিবে না এবং জাপানের শাসকদের স্বর্গ হইতে অবতরণের দাবী আর গ্রাহ্য হইবে না। দেবতাদের কাহিনী হইতে যৌক্তিকতার প্রশ্ন বাদ দিতে হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে আমরা পৌরাণিক কাহিনীগুলি যেমন

পাইয়াছি, তেমন ভাবেই আমরা বিনাযুক্তিতে গ্রহণ করিব, আমাদের আধুনিক নীতিবাদী আদর্শে তাহার মাপ করিব না,—ইহাই ছিল নরিনাংগা ও তাঁহার মতবাদীদের প্রবন্ধ।

কনফিউসিয়ান্-বাদী ও বিরুদ্ধবাদী অন্যান্যদের মতই 'শিন্-তো' পণ্ডিতেরাও এই সকল উক্তিতে মানবিক যুক্তি ও নীতির আদর্শ ধরিয়াছেন—একথা বর্তমানকালের দৃষ্টিতে অতি আশ্চর্য বলিয়াই মনে হয়। 'শিন্-তো' পণ্ডিতেরা ভুলিয়াছিলেন যে, যে কোনও বিতর্কই যুক্তির উপর স্থাপন করা উচিত।

তাঁহারা মানুষেরই লিখিত ও মানুষের দ্বারাই বংশ-পরম্পরায় প্রচলিত দেবতাদের কার্যাবলীর তাৎপর্য নির্ধারণ করিতে যে অযৌক্তিক যুক্তি-পদ্ধতি দেখাইয়াছেন তাহা ভ্রান্তিমূলক সন্দেহ নাই। তথাপি তাঁহারা যে মানুষের অভিজ্ঞতায় কিছু কিছু অমানুষী ঘটনা থাকিয়া যায় যাহা যুক্তির বহির্ভূত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, যাহা কোনও পরম সত্য, প্রাকৃতিক হউক কিম্বা অলৌকিক, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক নয়। কিন্তু তাঁহাদের ভ্রম যাহা এ-সম্পর্কে দারুণ ভ্রমই ছিল তাহা এই যে তাহারা দেবতাদের যুক্তির বহির্ভূত কার্যগুলি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা জাপানী সম্রাট্-পরিবারের দৈব-আবির্ভাব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক কৃষ্টির সহিত জাপানীদের সংস্পর্শ জাতীয় ইতিহাসের অতি প্রাক্‌কালে হইয়াছিল। সেই হেতু এই সকল কৃষ্টির কি বিশেষত্ব তাহা বুঝিবার সুযোগ তখন তাঁহাদের ঘটে নাই। চীনা ও ভারতীয় কৃষ্টি ও চিন্তার অত্যধিক চাপে অন্তর্দেশীয় কৃষ্টি রুদ্ধ বা নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

যে কালে জাপানীরা তাহাদের পরিবেশের প্রতি নিজস্ব প্রতিক্রিয়া বোধ করিবার উপযুক্ত হইয়াছিল এবং প্রাক্তন পুরাণ-কাহিনী-গত মনের অবস্থা হইতে বহির্গত হইতে-ছিল, তখন তাহারা এসিয়া মহাদেশের মধ্য হইতে আগত চীনা ঔপনিবেশিকদ্বারা প্রচলিত 'তাও'-বাদ ও কনফিউসিয়ান-বাদের সম্মুখীন হইল। ইহাদের কৃষ্টিগত প্রভাবে তাহারা অভিভূত হইয়াছিল। এই সকল মতবাদীদের পদাঙ্ক নতভাবে, এমন কি সাগ্রহে ও লুব্ধমনে, অনুসরণ না করিয়া তাহাদের আর কোনও গতি ছিল না।

জাপানীরা তাহাদের চীনা প্রতিবেশীদের হইতে প্রথম গ্রহণ করে তাহাদের 'চিত্র-লেখা' (ideograph) প্রণালী। এই প্রণালীতে বর্ণমালা শুধু শব্দ-সাঙ্কেতিক ছিল না, ধারণাগুলিও প্রকাশ করিত। 'মান্যয়ো' গ্রন্থে যে চীনা বর্ণমালা আছে তাহার অধিকাংশই জাপানী শব্দের ধ্বন্যাত্মক এবং 'কোজিকি' গ্রন্থে জাপানী শব্দ ও চীনা ধারণাগুলির একটা জটিল সংমিশ্রণ। 'নিহোন শোকি'র সমস্তটাই চীনা লিখন ভঙ্গীতে চীনা 'চিত্র-লেখা'য় রচিত।

এই চীনা ও জাপানী সংযোগ ইহাই নির্দেশ করে যে জাপানী চিন্তারীতি চীনা প্রকাশ-পদ্ধতিতে আকারিত হইতেছিল।

জাপানের জাতীয় মনোভাবে পূর্বপুরুষের পূজা অঙ্গীভূত এইরূপ ধরা হয় বা এইরূপ বুঝানো হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব পক্ষে ইহা চীন হইতে লওয়া।

জাপানের প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী রচনার যে 'যিঙ্' (Ying) এবং 'যাঙ্' (Yang) দর্শন-বাদের ভিত্তি তাহাও আমাদের প্রতিবেশী চীনাদের হইতে ধার করা।

শাসকদের দেবতার আসন দেওয়ার মতবাদও সম্ভবতঃ চীন হইতে গৃহীত হইয়াছিল, কারণ চীনদেশে শাসকদের ক্ষমতা স্বর্গ হইতে আসিয়াছে এইরূপ মনে করা হয়—ইহার অর্থ চীনদেশীয়দের কাছে যাহাই হউক না কেন জাপানীরা এই ধারণা আরও পুষ্ট ও স্থূল করিয়াছিল। তাহারা স্বর্গের স্থলে দেবতা ধরিয়া এবং শাসনকর্তা মিকাডোকে সাক্ষাৎ বংশধর বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। এই সম্পর্কে আমরা জাপানীদের চিন্তাপ্রণালীর একটু আভাস পাই। এই প্রণালীতে যাহা ভাবাত্মক (Abstract) তাহা বাস্তবিক (Concrete)-এ পরিণত হয়।

এই ধারণাগুলি 'নিহোন শোকি' গ্রন্থে ওতপ্রোত। ইহা সরকার-অনুমোদিত জাপানের ইতিহাস ও শিন্-তো-বাদীদের পবিত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এগুলি কন্ফিউ-সিয়ান্ চিন্তা হইতে জাপানীদের চিন্তায় গাছের কলমের মত রোপিত হইয়াছে। জাপানীরা 'তাও'-বাদীদের কাছেও বহু ঋণী। জাপানীদের বালকোচিত স্বভাব-অনু-বর্ত্তিতা (naivete), প্রাচীনকালের উপযুক্ত সরলতা, আদিযুগের বিশুদ্ধতা (original purity) এবং অভিজ্ঞতা-মূলক বস্তুতন্ত্রতা (empirical realism) 'লাও-ত্সে'র শিক্ষাবলী হইতে আসিয়াছে। ইহা বিশেষভাবে দেখা যায় 'মোতোরি'র (Motori) 'দেবগণের প্রাচীন পন্থা'র (Ancient Way of the Gods) ব্যাখ্যায়। তাঁহার 'কান্নাগরা' (Kannagara) মতবাদ 'লাওত্সে'র মানুষের কপটতা ও কৃত্রিম উপায়ে মানুষের সামাজিক শৃঙ্খলা-গঠনের বিরুদ্ধে অভিযোগের জাপানী 'রকম-ফের'।

জাপানী 'শিন্-তো'র তথা-কথিত 'পবিত্র গ্রন্থগুলি'র বিচার করিতে গিয়া জাপানে সম্রাট্-শাসনের প্রবর্তন সম্বন্ধে ঐ সকল গ্রন্থকর্তাদের সুবিশাল বর্ণনাভঙ্গীর একটু উল্লেখ করিতে চাই। প্রথম সম্রাট 'জিম্মু' (Jimmu) যিনি ২৬০৯ বৎসর পূর্বে জাপানের সিংহাসন আরোহণ করেন বলিয়া বলা হয় তিনি যে কাল্পনিক ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাহার রাজত্ব 'হন্‌শু' (Honshu) নামক ভূখণ্ডের কিঞ্চিৎ অংশ হইতে অধিক বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু 'নিহোন শোকি'র রচয়িতারা তাহার মুখ দিয়া বলাই-তেছেন: "আমার এই অভিপ্রায় যে আমি ছয়টি দিক্ একত্র বাঁধিয়া একটি কেন্দ্রীয়

রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিব এবং তাঁহার আটটি সীমান্ত একটি সুবিশাল ছাদ নির্মাণ করিয়া আচ্ছাদিত করিব"। এই 'ছয়টি দিক্' ও 'আটটি সীমান্ত' আলঙ্কারিক ভাষায় ব্রহ্মাণ্ড কি পৃথিবীকে নির্দেশ করে,—ইহা তাহাদের বিশিষ্ট চীনা-রীতিতে পৃথিবীর ধারণা প্রকাশ করিবার উপায়।

কন্‌ফিউসিয়ান্-বাদ উত্তরখণ্ডবাসীদের কৃষ্টির দ্যোতক; 'তাও'-বাদ দক্ষিণখণ্ডবাসীদের। চীনদেশ প্রধানতঃ উত্তরখণ্ড এবং সেই হেতু কন্‌ফিউসিয়ান্-বাদের প্রভাব সর্বত্রই দেখা যায়। একথা সত্য বটে যে 'তাও'-বাদ, যেভাবে লাও ত্‌স, চুয়াঙ্‌ ত্‌স এবং অন্য শিক্ষকেরা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরাও গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু চীনা চিন্তাধারার প্রধান স্রোত কন্‌ফিউসিয়ান্-বাদেই উদ্ভূত হয়। কন্‌ফিউসিয়ান্-বাদ সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এবং যুক্তি ও মানবধর্মের (Humanism) সমর্থক; 'তাও'-বাদ মতে সংসার 'এড়ানোর'র রীতি (Escapism) ও অতীন্দ্রিয় পদার্থের সন্ধান (Transcendentalism) প্রশস্ত।

জাপান যতদিন কন্‌ফিউসিয়ান্ মতবাদের প্রভাবে ছিল ততদিন জাপানের স্বীয় পরিবেশের প্রতি আপন-স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় যাহা কিছু 'তাও'-ভাব ছিল তাহা বিকাশ পাইতে পারে নাই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে জাপান প্রধানতঃ দক্ষিণ দ্বীপগুলি হইতে আগত জাতিদের দ্বারা অধ্যুষিত এবং তাহাদের মনের আকার-প্রকার স্বভাবতই উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণের বেশী। যদি তাহাদের স্বভাব-অনুযায়ী জীবন যাপনে হস্তক্ষেপ না হইত তবে তাহারা নিশ্চয়ই 'তাও'-মত অনুসারেই বাস্তবের মর্ম গ্রহণ করিত।

কিন্তু ইতিহাসে ইহার অন্যথা ঘটিয়াছে। চীন হইতে আগত লোকেরা আগেই তাহাদের উচ্চতর কন্‌ফিউসিয়ান্ কৃষ্টি লইয়া এইদেশে দৃঢ় হইয়া বসিয়াছিল এবং জাপানের ইতিহাসের প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলি তাহাদের প্রভাবে রচিত হয়। ইহা ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং এই ইতিহাসের প্রথম অবস্থায় ইতিহাস-রচনায় এইমুখী গতির জন্য কৃতজ্ঞ হইবারও কারণ আছে। কিন্তু আমাদের দেশের লোক সেই যুগে 'তাও'-মতের যথোচিত গুণাবধারণের জন্য বাস্তবিক প্রস্তুত ছিল না, কারণ ইহা বুঝিতে বিস্তর গবেষণার ও চিন্তাশক্তির প্রয়োজন এবং যে জাতি তখনও সভ্যতার প্রথম অবস্থা পার হয় নাই, তাহার পক্ষে ইহা আশার অতিরিক্ত।

যখন জাপানের লোকেরা কন্‌ফিউসিয়ান্ আদর্শ অনুসারে তাহাদের গোষ্ঠী-গত জীবন নিয়মিত করিতেছিল, তখনও তাহারা ভোলে নাই,—এবং তাহা ভোলাও অসম্ভব ছিল—যে তাহাদের দক্ষিণ-দেশীয় প্রাণে যে ভাবের গভীর সঞ্চালন ছিল তাহা 'তাও'-মতের আকারেই প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল।

এই ব্যাকুলতা কেন? তাহাদের অন্তর্গূঢ় আকাঙ্খার প্রকাশের জন্য কি খুঁজিতেছিল তাহারা? তাহা এই 'কান্নাগরা'র অনুভব। কিন্তু অনুভবের কোন মূল্য নাই যতক্ষণ তাহা চিন্তায় পর্য্যবসিত না হয় এবং চিন্তা কখনও প্রাণবন্ত হয় না যতক্ষণ অনুভবের দ্বারা তাহা সুস্থির না হয়। জাপানী চিন্তার ধারা জাপানী হৃদয়ের ভাব হইতে উঠিয়াছে। সেই 'কান্নাগরা' একাধারে জাপানীর ভাব ও চিন্তা।

কিন্তু 'কান্নাগরা' সম্বন্ধে 'মোতো-ওরি'র (Moto-Ori) ধারণা জাপানী ভাবের সমতুল নয়। এই ভাব 'শিন-তো' বাদের চিন্তা ছাড়াইয়া যায়। যতক্ষণ 'মোতো-ওরি' কন্‌ফিউসিয়ান্ যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে 'শিন্-তো' মতের মুখপাত্র ছিলেন, ততক্ষণ তিনি কন্‌ফিউসিয়ান্ চিন্তার স্তর হইতে উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। জাপানী চিন্তার ব্যাখ্যাতা-স্বরূপ তাঁহার যোগ্যতা এই যে তিনি 'শিন্-তো'বাদের তথা-কথিত 'পবিত্র' গ্রন্থগুলি হইতে 'কান্নাগরা' কথাটি বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার 'শিন্-তো' অন্তর্দৃষ্টি 'কান্নাগরা'র গভীরতর অংশে পৌঁছায় নাই, কিন্তু তিনি এই কথাটি পাইয়া আপন হৃদয়ে কিছু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন,—তাহা যতই বাহ্য এবং যুক্তিশূণ্য হউক না কেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক ছিলেন এবং সেই সময়ে বৌদ্ধ চিন্তাধারা জাপানীদের ধর্মানু-ভূতিতে গভীরভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার 'যুক্তিহীন' অন্তর্দৃষ্টি জাপানের আত্মা যাহা বাস্তবিক চাহিতেছিল 'কান্নাগরা' কথাটিতে তাহা দেখিতে পায় নাই। ইহার কারণ ছিল এই যে তিনি 'শিন্-তো' বাদের অনুসরণকারী ছিলেন এবং শিন্-তো' বাদীর স্বভাব যে সে তাহার 'পবিত্র' গ্রন্থগুলিতে স্থিতিশীলতা, বা সঙ্কীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা অথবা অন্ধ জাতীয়তা ভিন্ন বস্তুতপক্ষে পরমার্থিক কিছু দেখিতে অক্ষম।

মহাযানী বৌদ্ধধর্মই জাপানীর আত্মাকে 'কান্নাগরা' অনুভবের গভীরতলে প্রবেশ করিতে সাহায্য করিয়াছিল এবং 'কান্নাগরা'কে বর্দ্ধিতভাবে জাপানী চিন্তার প্রকাশ-স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। কথাটি দিয়াছিল 'শিন্-তো' কিন্তু বৌদ্ধধর্ম তাহার পরমার্থিক ব্যঞ্জনা দিয়াছিল, যাহাতে জাপানীদের ধর্ম ও দর্শনের প্রতি ব্যাকুল আকাঙ্খা তুষ্ট হয়।

যখন মহাযানী বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবর্তিত হয়, তখনই 'প্রিন্স্‌ শোতোকু' (Prince Shotoku) তাহা এই বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন যে মহাযানী শিক্ষার জন্য বাস্তবিক জাপানই উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাহার অর্থ ছিল এই যে মহাযানের শিক্ষাই সেই শিক্ষা যাহা জাপানী মনের সংলগ্ন হইবে, কারণ জাপানী মন যাহা চাহিয়াছে মহাযান তাহাই দেয়। এই রাজবংশধর মহাযানের তিনটি বৃহৎ গ্রন্থের উপর ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি জাপানীদের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। জাপানীয় আত্মায় যাহা

গভীরভাবে সঞ্চারিত ছিল, তিনিই জাপানীদের মধ্যে প্রথম চিন্তাশীল ব্যক্তি যিনি তাহা ধরিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি প্রত্যুত জাপানের অভিজাত-সমাজের একজন ছিলেন। সুতরাং তিনি জাপানীর অন্তঃকরণে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা ঊর্দ্ধ হইতে। নিজে জাপানী বলিয়া তাঁহার নিজ হৃদয়ের সহিত জনসাধারণের হৃদয়ের যে সমতন্ত্রিতা ছিল তিনি সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজের কালের ও জনসাধারণের বহু অগ্রবর্তী ছিলেন। তাঁহার ভাব ও চিন্তার স্তর পর্যন্ত পৌঁছিতে জনসাধারণের বহু শতাব্দী লাগিয়াছিল। পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনসাধারণের ধর্মসম্বন্ধে এবং ফলতঃ দর্শনসম্বন্ধে আত্ম-বোধ প্রস্ফুট হইয়াছিল।

'শোতোকু তাইশি' (খৃষ্টাব্দ ৫৯৩-৬২১) ও 'কামাকুরা' (Kamakura) যুগের (১০৮৩-১৩৩৮) মধ্যবর্তীকালে জাপানী বৌদ্ধধর্মে দুইজন মহান্ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়,—দেংগ্যো দাইশি (Dengyo Daishi—খৃষ্টাব্দ ৭৬৭-৮২২), যিনি 'সাইচো' (Saicho) নামে খ্যাত, এবং 'কোবো দাইশি, (Kobo Daishi : খৃষ্টাব্দ ৭৭৩-৮৩৫), যিনি 'কূকাই' (Kukai) নামে খ্যাত।

এই দুই জন সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহাদের আপন আপন ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রথম জন জাপানী 'তেন্দাই' (Tendai) বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং দ্বিতীয় জন 'শিঙ্গন্' (Shingon অর্থাৎ 'মন্ত্র-বাদী') সম্প্রদায়ের। 'দেংগ্যো' অপেক্ষা 'কোবো' জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্টতর ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কিন্তু দুইজনের কেহই জনসাধারণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না : তাঁহারা নীচ হইতে উপরে ওঠেন নাই, উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই জাপানের জনসাধারণ ধর্মবিষয়ে সচেতন হইয়াছিল এবং ধর্মের সহিত 'পরম পদার্থ' বিষয়ক দার্শনিক চিন্তায়। এই কালেই 'কিওটো'র অভিজাত সম্প্রদায় ও রাজ-পারিষদ্‌দের রচিত অভিজাত কৃষ্টি নূতন এক কৃষ্টির নমুনার কাছে পরাজিত হইয়াছিল। এই নূতন কৃষ্টির রচয়িতা ছিলেন যোদ্ধশ্রেণীর লোকেরা যাহাদের জীবিকা-অর্জন হইত পল্লী-অঞ্চলে এবং জীবন-যাত্রা ছিল জমির সান্নিধ্যে। 'কিওটো' কৃষ্টির জমির সহিত কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না, ইহা প্রকৃতই 'মেঘরাজ্যের'। ইহার গাঢ়ত্ব ছিল না, কারণ ইহা কতগুলি ভাবাত্মক ধারণা দ্বারা (Abstractions) গঠিত হয়। 'কামাকুরা' যুগ ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাহা স্বাভাবিকই বটে, কারণ 'কিয়োটো'-কৃষ্টি আপনা হইতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে বাধ্য ছিল।

এই অবস্থা 'হোনেঙ' (Honen : খৃষ্টাব্দ ১১৩৩-১২১২) এবং শিনূরাঙের (Shin-

ran : খৃষ্টাব্দ ১১৭৩-১২৬২) শিক্ষাবলীতে প্রতিফলিত। পণ্ডিতেরা বলেন যে জনসাধারণের জন্য তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য করিয়াছিলেন, কারণ পূর্ববর্তী বৌদ্ধধর্মে এত ভাবাত্মক ধারণা ও উচ্চস্তরের গবেষণা ছিল যে তাহা বুঝিতে বিস্তর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হইত। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা জনসাধারণের জন্য ধর্ম শিক্ষা বলিয়াই, ইহা সকলেরই প্রাপ্য—অভিজাত-শ্রেণীর যোদ্ধ-শ্রেণীর, কৃষক সম্প্রদায়ের, পণ্ডিতের, অশিক্ষিতের। বৌদ্ধধর্মে এমন কিছু নাই যাহাকে সহজ-বোধ্য বা কষ্ট বোধ্য বিষয়ে পরিণত করা চলে। বৌদ্ধধর্ম ধর্ম হিসাকেই গ্রাহ্য,—পণ্ডিতদের অর্থনির্ধারণের চেষ্টা সম্পূর্ণ অবান্তর।

সত্য এই যে 'হোনেঙ্' ও 'শিন্‌রাঙে'র শিক্ষাগুলি যাহা সাধারণ জাপানীদের হৃদয়ে ও মনে যাহা তৎকালে সঞ্চরিত ছিল তাহারই যথাযথ প্রতিধ্বনি। ইহা ঐ শিক্ষকদ্বয়ের রচা কিছু নয়। ইহা যথার্থতঃ ঐ কালের লোকদের মনে যে ধর্মাকাঙ্খা ছিল তাহারই তৃপ্তি-সম্পাদনকারী। বৌদ্ধধর্ম অতঃপর জাপানীদের ধর্ম হইয়াছিল, তাহারা নিজেদের দরকার মত ইহার পুনর্গঠন করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের 'পূত-ভূমি, সম্প্রদায়, (Pure Land school) জাপানীদের স্বকীয় ধর্মবোধের সৃষ্টি।

চীনদেশেও এই সম্প্রদায় আছে এবং জাপানী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 'হোনেঙ্' কয়েকজন চীনা শিক্ষককে তাঁহার পূর্ববর্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই তখন তাঁহার হৃদ্-বোধ ছিল, কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রমে ধরিতে গেলে 'হোনেঙ্' তাঁহার নিজের অবস্থান ঠিকভাবে ধরিতে পারেন নাই,—বোধ হয় ধরা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে তাঁহার নিজেকে সমালোচনা করার তাঁহার নিজের কোনও উপায় ছিল না। সত্যই এই 'হোনেঙ' ও তাঁহার 'শিন্‌রঙ' জাপানের জনগণের হৃদয়ে যে ধর্ম-লিপ্সা ছিল তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

'শিন্-তো'-বাদীদের বৌদ্ধধর্মের দিকে অগ্রসর হওয়াতেও ইহা দৃষ্ট হয় যে ঐ কালে জাপানীরা পরমার্থিক কিছু পাইবার সন্ধানে ছিল। সেই কাল পর্যন্ত বৌদ্ধেরাই 'শিন্-তো'র দিকে চলিয়াছিল এবং মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বৌদ্ধ মতবাদ 'শিন্-তো' ধর্মের বিশ্বাসগুলির সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টিত ছিল। 'শিন্-তো' ছিল এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। কিন্তু এ কারণে নয় যে 'শিন্-তো'-বাদে এমন কিছু ছিল না যাহা দ্বারা বৌদ্ধ শিক্ষাবলী 'শিন্-তো'র অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা করা করা যাইতে পারিত না অথবা বৌদ্ধধর্ম জাপানী ভাব ও চিন্তার প্রতিবাদী বলিয়া ইহার ধ্বংস-সাধন সম্ভব হইত। 'শিন্-তো' তখনও আত্ম-বোধের স্তরে আসে নাই। ইহাতে 'কান্নাগরা'র ধারণাটি সদ্য-আগত ছিল বটে, কিন্তু তাহা তখনও ইহাতে বহিঃস্থ, তখনও ইহা সাবালকত্বের বয়স, পায় নাই। 'কান্নাকুরা'

যুগের 'শিন্-তো'-বাদীরাই সর্বপ্রথম 'ইসে শিন্তো' (Ise Shinto) নাম গ্রহণ করিয়া আত্ম-ঘোষণা করে। 'ইসে' (Ise) জাপানীদের পূর্বপুরুষদের নামে নিবেদিত মন্দিরের স্থল। 'ইসে শিন্-তো' সম্প্রদায় ঐ যুগে প্রকাশ্যভাবে বৌদ্ধধর্মের নিন্দাবাদ করিত, কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহা ছিল 'শিন্-তো'-বাদের স্বকীয় বিশ্ব-সৃষ্টি দ্বারা বৌদ্ধধর্মকে নিজস্ব করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

'ইসে শিন্-তো' (Ise Shinto) মহাযান দর্শনে ধৃত ও 'লোও ত্সে'র প্রকল্পিত 'গুণ-বস্তু-পার্থক্য-বাদে' (Conceptualism) প্রভাবিত হইয়া 'কান্নাগরা'র একটি নূতন প্রকাশ-ভঙ্গী দিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহা এই : "যে দেবতাদের মনোনীত মানুষ হয় সে পরমাণুপুঞ্জের (Chaos) আরম্ভ পর্যন্ত মনোযোগসহকারে নিরীক্ষণ করে" এবং "যে পবিত্র দর্পণ হইতে স্বর্গ-মর্তের আরম্ভ হইয়াছে তাহা পবিত্রভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইবে, দেবতাদের মন নিয়া তাহার সন্ধান করিতে হইবে এবং সেই পরম-সত্তার (the Absolute) মত রূপ-ও-ক্রম নিরপেক্ষ হইয়া তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।" 'কান্নাগরা' এইরূপ অর্থে গ্রহণ:করিলে তাহাতে জাপানী চিন্তার সহজ প্রত্যক্ষ-দর্শন-রীতি থাকে না।

'নিহোন শোকি' গ্রন্থে, যাহাতে এই 'কান্নাগরা' কথাটি সর্বপ্রথম পাওয়া যায়, তাহাতে এই কথাটি রাজনীতির সম্পর্কে ধরা হইয়াছে,—তাহার অতিরিক্ত তাৎপর্য ইহাতে নাই। কিন্তু কথাটির নিম্নে একটি ভাষ্য জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ : "'কান্নাগরা'র অর্থ 'দেবতাদের রীতি অনুসারে' এবং প্রত্যেকেরই নিজের মধ্যে এই রীতি বিদ্যমান আছে।" এই ভাষ্য পরবর্তীকালের, কিন্তু ইহাতে জাপানীদের চিন্তায় 'কান্নাগরা' সম্বন্ধে যে ধারণা তাহা অতি সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করে।

এখন 'কান্নাগরা'র ধারণা বাস্তবিক কি কি সূচিত করে এবং ইহা বিশেষভাবে জাপানী চিন্তার দ্যোতক কেন তাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

যখন জাপানীদের আত্মবোধ (Conscionsness) বিকাশের প্রথম স্তরে ছিল, তখন জাপানী মন স্বাভাবিক সরলতা ও স্বভাবানুবর্তী ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান (naive empiricism) ছাড়াইয়া যায় নাই। ইহা ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা কিম্বা উদ্ভট কল্পনা যাহা বুদ্ধির বিশ্লেষণে কিছুমাত্র টিঁকিতে পারে না সেই সকলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। বলা হইতে যে দেবতারা 'তকমগহর' বা স্বর্গক্ষেত্র হইতে অবতরণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। এই দেবতারা ছিলেন উৎকট, দুর্নীতি পরায়ণ, জ্ঞানহীন ও অস্বাভাবিক। তাঁহাদের ব্যবহার মানুষী আদর্শের মাপে নয়। সেই আদিমকালের জাপানীরা এই দেবতাদের সম্বন্ধে যাহা বলা হইত তাহাই গ্রহণ করিত,—এমনকি তাহাদের কার্যকলাপ যতই যুক্তিবিরুদ্ধ এবং

অস্বাভাবিক হউক না কেহ তাহাতে গর্ব অনুভব করিত। এবং এইভাবে দেবতাদের ও তাহাদের কার্যকলাপ গ্রহণ করাকে 'তাহাদের অনুযায়ী হওয়া' 'তাহাদের বংশধরদের ভক্ত প্রজা হওয়া' ও 'ধর্মের সান্ত্বনা লাভ করা' বলিয়া মনে করিত,—ইহার অর্থ যাহাই হউক না কেন। জাপানীদের অগ্যঠিত মন তখনও 'কান্নাগরা' কথাটির গভীরতর ইঙ্গিতগুলি সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। তাহারা ইহার অর্থ বুঝিত শুধু স্বাভাবিক হওয়া সরল-অন্তঃ-করণ হওয়া,—সকল বস্তু যেমন আছে সেইভাবেই গ্রহণ করা, কিছু অপ্রমাণ্য বলিয়া উড়াইয়া না দেওয়া, সকল কিছু যে আকারে আসে তাহাই গ্রাহ্য করা। এবং ঐ সকলই ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের স্তর হইতে। 'কান্নাগরা' তখনও স্পষ্ট, সুনিরূপিত ধারণা হয় নাই, একটা ছায়াপাত করিয়াছে মাত্র।

'হেই-য়াঙ্' যুগে (Heian Period—খৃষ্টাব্দ নয় হইতে বারো) 'কান্নাগরা' একটি কবিত্বপূর্ণ ধারণায় পরিণত হয়, ইহা আর রাষ্ট্রনীতির কথা রহিল না। যতকাল পর্যন্ত শাসনকর্তা ও দেবতা এক বলিয়া মনে করা হইত এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এমন অবস্থা ছিল যে তাহা এই ধারণার পরিপোষক, ততকাল ইহার একটা আসল মূল্য ছিল। কিন্তু যখন জাপানের অধিবাসীরা তাহাদের দ্বীপপুঞ্জে শান্তিতে, তাহাদের অধিপতি দেবতাদের নিরাপদ শাসনাধীনে অধিষ্ঠিত হইল (যদিও তাহা নামে মাত্র ছিল), এবং সভ্যতার অনেকটা উন্নত স্তরে উঠিয়াছিল ও চীনা সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া একরকম কৃষ্টি-লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের স্বকীয় কৃষ্টিও কিছু বিকশিত করিয়াছিল,—সেই যুগে জাপানীরা প্রকৃতির (Nature) দিকে মনোনিবেশপূর্বক প্রকৃতির গভীরতর আকার-প্রকারের গুণাবধারণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহারা যে অনুভূতিকে 'মোনো-নো-আবারে' (Mono No Aware) বলা হয় তাহাতে আনন্দ-লাভের দীক্ষা পাইল। এই অনু-ভূতির সঙ্গে 'কান্নাগরা'র কোনও সম্বন্ধ আপাততঃ মনে হয় না। ইহা প্রকৃতির প্রতি কবির, সৌন্দর্য-লিপ্সুর, ভাবুকের চিত্তবৃত্তি, কিন্তু 'কান্নাগরা' রাষ্ট্রনীতি ও ব্যবহার-নীতির রংয়ে গাঢ়ভাবে রঞ্জিত। কিন্তু আমার মন্তব্য এই যে উভয়ই একটিমাত্র জাপানী-মন-সুলভ অনুভূতির দুইটি পৃষ্ঠ,—এবং 'অনুভূতি' ও 'চিন্তা'র জাপানী মনে বিভিন্নতা নাই।

'মোনো-নো-আবারে' যাহা 'হেই-য়াঙ্' যুগের, (Heian Period : খৃষ্টাব্দ ৮৯৭-১১৮৫) কবিদের মনের উপর প্রবহমান্ ছিল তাহা কতকটা ভাবপ্রবণতার মত মনে হয়। জাপানী জাতিও ভাবপ্রবণ জাতি। 'মোনো' (Mono) কথাটি অর্থ সাধারণ বস্তু-নিচয়, 'নো' (No) কথাটি 'র' (ষষ্ঠী বিভক্তি) বাচক এবং 'আবারে' কথাটির অর্থ 'ভাবের মিল' (Emotional Response) বিস্তৃতার্থে। সুতরাং সমস্ত বাক্যটির অর্থ হয় : "নিজের চতুষ্পার্শে যে সকল বস্তু আছে তাহাদের অন্তরের ভাব উপলব্ধি করা"।

এখানে 'বস্তু' অর্থে জড়পদার্থ ও প্রাণবান্ জীব যাহাদের ভাবাবেগ আছে দুইই বুঝিতে হইবে।

যখন শরৎকালের চন্দ্র কোনও একটি ক্ষুদ্র কুটীরে উঁকি দেয়, বসন্তের পল্লবদল সূর্য-কিরণে উদ্ভাসিত হয়, শীতকালে ক্ষেত্‌গুলি বরফে ঢাকিয়া গিয়া সাদা হইয়া যায়, তখন 'হেই-য়াঙ্' যুগের কবিরা উপলব্ধি করেন যে প্রকৃতিতে ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা ভাবাবেগ চলিতেছে। বলা যায় যে প্রকৃতির এই সকল ভাবাবেগ আমাদের মধ্যেই আছে, আমাদের ভিতর দিয়াই চলিয়া প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে, যদিও প্রকৃতিতে তাহার কোনও বোধ নাই। কিন্তু যে জাপানীরা 'কান্নাগরা' কথাটি বানাইয়া ছিলেন তাঁহারা অনুভব করিতেন যে মানুষ যেমন এই ভাবগুলির প্রতীক, প্রকৃতিও তেমনি। তাঁহাদের মতে, এই কারণে আমরা অর্থাৎ প্রাণী বা জড়-পদার্থ, যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেকেই দেব-মন্ত এবং এই সত্যটি যখন ভাবগম্য কি অভিজ্ঞতা-গম্য হয়, যদিও তাহা বুদ্ধির বিশ্লেষণে না আসিতে পারে, তখন আমাদের ভিতর হইতে স্বচ্ছন্দে যে কোনও বাণীই আসুক তাহা অবশ্যই 'কান্নাগরা'র ছন্দে বাজিবে। 'হেই-য়াঙ্' যুগের কবিরা এই স্বর্গীয় ছন্দ ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাকে তাঁহারা 'মোনো-নো-আবরে' নাম দিয়াছেন।

'মোনো' অর্থ সাধারণ বস্তু নিচয়। শুধু জড় প্রকৃতি 'মোনো' নয়; আমরা অনুভব-ক্ষম জীবেরাও 'মোনো'। যখন আমাদের চিত্ত সমস্ত আত্ম-কেন্দ্রিক উত্তেজনা হইতে এবং যুক্তির সূক্ষ্মজাল হইতে মুক্ত হইয়া যায়, তখন তাহাতে দেবতাদের সত্তারই ধ্বনি বাজে, তাহাই 'কান্নাগরা'—এবং তখনই আমরা মানুষের ভাবপ্রবণতার তাৎপর্য গভীর-ভাবে দেখিতে পাই। তখন সমাজের সকল কর্ম-ব্যাপারের সর্বাংশে আমাদের চিত্ত 'মোনো-নো-আবরে' বোধ করে এবং তাহার নানা প্রকার-ভেদে নানা ভাবের প্রতিক্রিয়া জানায়। প্রাকৃতিক ঘটনায় ও মানুষের কার্যাবলীতে 'মোনো-নো-আবরে' বোধ করা জাপানী হৃদয়ে 'কান্নাগরা'র জাগরণের এক অন্য-রূপ ভিন্ন আর কিছু নয়।

তেরো শতাব্দীর পূর্বে কিন্তু 'কান্নাগরা'র এই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বোধগম্য হয় নাই,—সর্বপ্রথম সেইকালে 'হোনেঙ' ও 'শিনুরঙ' তাঁহাদের 'হিয়েম্নি' পার্বত্য আশ্রমে বসিয়া ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। 'পবিত্র রাজ্য' (Pure Land) বাক্যটি স্বতই বৌদ্ধধর্ম নির্দেশ করে, কিন্তু জাপানী ঐতিহাসিকেরা এ সম্বন্ধে একটি বিষয় ধরিতে পারেন নাই। আমি তাহা একটু বিশদভাবে বিবেচনার জন্য লইতে চাই।

'পবিত্র-রাজ্য'বাদের প্রধান কথা ইহাই নয় যে সেখানে আমাদের পুনর্জন্ম হইবে, এই জীবনেই সেই দিকের পথ বাঁধিতে হইবে ইহাই প্রধান কথা। এই পথ মূলতঃ

জাপানী মনেরই সৃষ্টি। যে বৌদ্ধধর্ম ইহার আদি জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে চীনা মনের মধ্য দিয়া বাস্তব-অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের (Pragmatic empiricism) দিকে ঝুঁকিয়া জাপানে আসিয়াছে, সেই বৌদ্ধধর্ম এই পথের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করিয়াছে বটে, কিন্তু তেরো শতাব্দীর জাপানীরা যুক্তিবাদ বা আধিভৌতিকতার মধ্য দিয়া সেদিকে অগ্রসর হয় নাই। তাহারা সর্বাপেক্ষা সোজাসুজি ও সুগম পথেই গিয়াছে।

'পবিত্র-রাজ্য' সম্প্রদায়ের 'শিন্' শাখার প্রতিষ্ঠাতা 'শিন্‌রঙ' শিক্ষা দিয়াছেন যে 'আমিদা'র (Amida) প্রচারিত প্রথম অঙ্গীকার, (Original Vow) সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিলেই যে কেহ তাহার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করিতে পারে। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ, 'শিন্‌রঙে'র কথায় বলিতে গেলে, 'একপাশে লাফাইয়া পড়া'। শিনরঙের নির্দেশ যে অবিচ্ছিন্ন নৈয়ায়িক পথ অনুসরণ না করিয়া, সমস্ত বুদ্ধির গণনা ত্যাগ করিয়া, সেই নিরুপাধিক (absolute)-এর অন্ধকার অতলস্পর্শ প্রতীয়মান গর্তে লাফাইয়া পড়িতে পারিলে, 'পবিত্র-রাজ্যের' শ্বেতবর্ণ পথ আমাদের সামনে খুলিয়া যায়। এই 'একপাশে লাফাইয়া পড়া' 'শিন্-তো'-বাদীদের মনোমত কথা, আর 'কান্নাগরা'-রীতিতে চলা একার্থক। ইহা দেবতাদের রচিত পবিত্র দর্পণে নিজের আসল ছবি প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া, পরমাণু-পুঞ্জের প্রারম্ভে আত্ম-নিমজ্জন ও এই আত্ম-নিমজ্জনে কালাতীতের সার-মর্মে ফিরিয়া যাওয়া।

'শিন্-তো' পরিভাষা সাধারণতঃ আমাদের কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা দিয়া থাকে। ইহা ইহা ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিষয়গুলির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত এবং শাসকদের উপর দেবত্ব-আরোপ করার মতবাদের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে—এবং অভিপ্রায় লইয়াই—সংমিশ্রিত। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে এই 'শিন্-তে'-বাদেই আমরা পাই জাপানীদের মর্মকথা যাহা সবেমাত্র পর্যাপ্ত-প্রকাশের চেষ্টা করিতেছে। ইহা আমরা পাইতে পারি তখনই যখন ইহাকে আমরা বৌদ্ধচিন্তা ও অভিজ্ঞতার চালুনিতে ছাঁকিয়া লই। এই কথাটি এইভাবেও বলা যাইতে পারে যে জাপানী চিন্তা বৌদ্ধ অভিজ্ঞতার সহায়ে ও তাহা হইতে গভীরতা লাভ করিয়া তাহার সকল অন্তর্গত তাৎপর্য প্রস্ফুট করে ও জাপানের অনেক শতাব্দী-ব্যাপী ইতিহাসে জনসাধারণ কোন কোন ভাবগুলি মূল্যবান্ মনে করিয়াছে তাহার উপর রশ্মিপাত করে।

জাপানী মন বিশ্লেষণ-পরায়ণ নয়, স্বতঃসিদ্ধ (intuitive) জ্ঞানের প্রয়াসী। এই মন অনুমান-প্রয়োগে কতকগুলি স্বীকার্য বিষয় একত্র করা (*inductively collecting data*) এবং তাহার অন্তর্গত কোনও মূলনীতি (Principle) বাহির করার শিক্ষা পায় নাই। এই মন কেবল অভিজ্ঞতার বস্তু ধরিতে চায় এবং তাহার মুক্তিতে নিজেকে

মিলাইয়া দিতে চায়। কিন্তু এই বস্তুর অন্তর্দেশে কিছু রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে চায় না। সামনে যাহা কিছু উপস্থিত তাহার অতীত অন্য কিছুর দিকে যায় না। ইহার অর্থ এই নয় যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা যেমন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ঘটনার মধ্যেই আটকাইয়া থাকে জাপানীদেরও মন-জগৎ সেইরূপই সঙ্কীর্ণ। ইহার অর্থ এই যে জাপানীদের চিন্তাধারা এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ চালায় স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের স্তরে বা মৌলিক অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের (radical empiricism) স্তরে। 'কান্নাগরা' এই দিকই নির্দেশ করে,— 'শিন্-তো'-বাদীদের দেবতারা যেমন সেই ভাবেই গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় এবং দেবতাদের মানুষী ন্যায়-বুদ্ধি অনুসারে রূপান্তর করার অনিচ্ছায়। যে জাপানী বৌদ্ধেরা 'শূন্যে'র অভিজ্ঞতার (experience of negation) মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহারা 'শিন্-তো'-বাদের ঐ বটিকা গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছুক হইবে না। তাহারা দেবতাদের আরও উচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিয়া বসাইবে। তাহারা 'শিন্-তো'-বাদের অন্ধ, আদি-যুগের প্রকৃতি-পূজা (Naturalism), গভীরতর আধ্যাত্মিক-বোধে পর্যবসিত করিবে— যেখানে সম্পূর্ণ নৈষ্কর্ম্য বিরাজমান। ইহা অর্থতঃ তাহাই যাহাকে বৌদ্ধেরা 'তথতা' (Seeing in to the suchness of things—বাস্তনিচয়ের যথার্থ রূপ-দর্শন) বলেন।

আধ্যাত্মিকভাবে অর্থ ধরিলে 'কান্নাগরা' আর কিছু নয়—কেবল সকল বাস্তব-ব্যাপারে 'আমিদা'র (Amida) আহ্বান, যাহাকে 'পবিত্র-রাজ্য' সম্প্রদায়ের শিক্ষকেরা 'আমিদার প্রথম অঙ্গীকার' (Original Vow of Amida) বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহাকে শিরোধার্য করা। ইহাই 'তারিকি' (Tariki) বা 'অন্য বল' ('Other Power')। 'হোনেঙ' ও 'শিন্‌রঙে'র পূর্বে মহাযান যাহা শিক্ষা দিয়াছিল তাহা ছিল এত বস্তুহীন (abstract), এত আধিভৌতিক (metaphysical) এবং এত 'ভারতবর্ষীয়' যে তাহা জাপানী ভাব ও চিন্তার ধারা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্মকে জাপানীর স্বভাব-অনুযায়ী আধ্যাত্মিক শিক্ষারূপে পরিণত করার জন্য ইহা হইতে সমস্ত অবাস্তব ধারণা (abstractions) স্বতঃ-স্বীকার্য তথ্য-সমূহ (postulations) এবং বুদ্ধি-গ্রাহ্য বিষয়-গুলি সকলই বাদ দেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। জাপানীরা দেবতাদের পথ অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু 'শিন্-তো'র স্বভাব-সরল প্রথা, যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না, তাহার মধ্য দিয়া নয়।

জাপানী কৃষ্টি সম্বন্ধে কোনও বিষয়ের আলোচনা করিলেই একটি সমস্যা আমরা ভুলিতে পারি না—তাহা 'সাবি' (Sabi) সম্বন্ধে। জাপানী চিন্তাধারার প্রধান স্রোত ইহাতে দেখিতে পাই। ইহা রুচি-বিজ্ঞানের অন্তর্গত, কিন্তু 'কান্নাগরা' হইতেই বহিয়া আসিয়াছে।

অল্পকথায় 'সাবি' (Sabi) কি তাহা বর্ণনা করা কঠিন। তবু আধ্যাত্মিক বা আত্মিক অর্থ লইয়া আমি ইহাকে 'একান্ত একাকিত্বের ভাব' (Feeling of absolute aloneness) বলিয়া বর্ণনা করিব। কিন্তু এই একাকিত্ব জনশূন্যতা বা সঙ্গীহীনতার অর্থে নয়। যখন কেহ ব্যক্তিত্বের (individuality)-র গভীরতম স্তর স্পর্শ করে তখন তাহার এই 'একান্ত একাকিত্বে'র অনুভূতি হয়। এবং এই অনুভব কেবল ধারণায় কিম্বা কোনও প্রস্তাবিত অবস্থায় (Conceptually or Postulationally) নয়,—ইহা একশ্রেণীর দার্শনিকদের কথায় বলিতে গেলে প্রাণ-কোষে (Existantialy)। কোনও কোনও জাপানী পণ্ডিত এই অনুভবকে সরলতা-গুণ-লাভের (Virtue of Sincerity) সহিত একার্থবাচক বলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু তাহা অনেকটা কন্‌ফিউসিয়ান্‌ মতবাদ অনুসারে। 'শিন্‌-তো'-বাদী এই গুণকে বলিবে সততা, স্বাভাবিকতা, স্বপ্রবৃত্তির অনুসরণ, সাদাসিধা ভাব অথবা হৃদয়ের ঋজুতা (Straightness of heart)। ইহা সেই পথে গমন যাহা মানুষের বাঁকা যুক্তিতে দুষ্ট হইবার পূর্বে দেবতাদের স্বাভাবিক গতি ছিল।

'বাশো'র (Basho) শিষ্যদের প্রতি এই নির্দেশ ছিল যে 'হাইকু' (Haiku—সতেরো শব্দাংশের কবিতা) কবিতায় যে সরলতা আছে তাহা কোনও দেবদারু বৃক্ষের সামনে দাঁড়াইয়া সেই দেবদারুর ভাবাপন্ন কিম্বা একটি বংশখণ্ডের সামনে দাঁড়াইয়া তদ্‌ভাবাপন্ন হওয়ায়। এবং তিনি চাহিতেন আত্ম-কেন্দ্রিক (self-centered) মনের সকল সংস্পর্শ বাদ দিয়া শুধু এই উপলব্ধ ভাবটির প্রকাশ। 'বাশো'র কথাগুলি ঠিক এই : "দেবদারুর কথা হইলে দেবদারুর অনুবর্ত্তী হও,—বাঁশের কথা বলিলে তাহারই অনুবর্ত্তী হও"। 'অনুবর্ত্তী হওয়া' কথাটি জাপানী ভাষায় 'নারাউ' (Narau)—ইহার অনেক অর্থ আছে, যথা 'অনুবর্ত্তী হওয়া' 'অনুকরণ করা' 'শিক্ষা করা' 'ব্যবহার করা' 'সংযত করা' 'সামঞ্জস্য করা' 'নিজেকে অভ্যস্ত করা' ইত্যাদি। একজন শিষ্য ইহার এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন : " 'নারাউ' (Narau)-র তাৎপর্য এই, কোনও বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তরে যাহা আছে তাহা বাহিরে আনিয়া সাহিত্যিক রূপ-দান। যখন সেই বস্তু হইতে স্বতঃই যে অনুভব আসে তাহার সহিত ও তাহার বাহ্য প্রকাশের সহিত মিল থাকে না, তখন বস্তু ও তাহার প্রকাশের মধ্যে বিচ্ছেদ থাকিয়া যায়। সুতরাং সত্য ক্ষুণ্ন হয়"। অন্য কথায় বলিতে গেলে, যখন 'কান্নাগরা' ইহার ঐক্য-অবস্থা হারাইয়া দ্বিধা হইয়া পড়ে, তখন তাহা আর মানুষের দ্বারা দুষ্ট হইবার পূর্বকার দেব-পন্থা থাকে না। বস্তুর 'তথতা' (suchness) বিকৃত হইয়া যায়।

এখন আমরা দেখিতে পারি যে 'অবরে' (Aware), 'তারিকি' (Tariki), 'সাবি' (Sabi) এই সকল ধারণার পিছনে কি রহিয়াছে,—রহিয়াছে তাহা, যাহাকে

'শিন্-তো' পরিভাষায় বলে 'কান্নাগরা বা 'কান্নাগরা নো মিচি'—দেবতাদের স্বাভাবিক পন্থা বা সেই পন্থা যাহা দেবতারা আপন আপন স্বরূপে, মানুষের যুক্তিবাদে রূপান্তরিত না হইয়া, অনুসরণ করে।

সেই জন্যই আমরা বলিতে পারি যে 'কান্নাগরা' জাপানী চিন্তার সংক্ষিপ্তসার। জাপানী মন তাহার গবেষণা শক্তির উদ্বোধনকাল হইতেই ভিন্ন-দেশীয় কৃষ্টির প্রভাবে পড়ে,—কনফিউসিয়ানবাদ, 'তাও'-বাদ বৌদ্ধমত,—এবং আধুনিক-কালে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী এই দেশে আসিয়া পড়িয়াছে ও পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্য প্রণালী গ্রহণ করিয়া জাপানীদের মর্মকথা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ জাপানী যুবকেরা পাশ্চাত্য চিন্তায় আজকাল অতিশয় ব্যাপৃত। যাঁহারা অত্যাধুনিক জাপানী সাহিত্য পাঠ করেন তাঁহারা তাহাতে পাশ্চাত্যের সর্বপ্রকার ছায়াপাত দেখিতে পাইবেন। কিন্তু বিদেশ হইতে আহৃত এই সকল সত্ত্বেও যাহা নিম্নে গভীরভাবে প্রবাহিত তাহা এই জাপানী 'কান্নাগরা'র ধারণা ও অনুভব। বাহিরের আবরণ যাহাই হউক এই ধারণা ও অনুভূতি কোনও না কোনও প্রকারে সর্বকালে আত্ম-ঘোষণা করিবেই।

পুস্তক বিবরণী

আনাসাকি, ম্যাসাহারু : হিষ্ট্রি অন জাপানীজ রিলিজন, লণ্ডন ১৯৩০।

নক্স, জর্জ উইলিয়াম : দি ডেভেলপমেণ্ট অব রিলিজন ইন জাপান, নিউইয়র্ক ১৯০৭।

নুকারিয়া, কাইতেন : রিলিজন অব দি সামুরাই, লণ্ডন ১৯১৩।

সুজুকী, দাইসেৎজ তেইতারো : ম্যানুয়্যাল অব ঝেন বুদ্ধিজম্, কিয়োতো ১৯৩৫।

স্টাইনিল্‌বার-ওবেরলিন, ই : দি বুদ্ধিসট সেক্‌টস অব জাপান, ফরাসী হইতে অনূদিত, লণ্ডন ১৯৩৮।

এলিয়ট, সার চার্লস : জাপানীজ বুদ্ধিজম্, লণ্ডন ১৯৩৫।